

চেতনিক



১

৩

৪

১

সম্পাদক ॥ আব্দুলচল্লি বসোয়াপাখ্যায়



চৈতনিক

● প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল
হরেন্দ্রনাথ কলেজ (মহিলা), কলকাতা-২

● প্রকাশক যুগ্মক ও স্বত্বাধিকারী

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

● সহযোগী

দীপক ঘোষ, এডভোকেট
২০, পণ্ডিতরা রোড, কলকাতা-২২

● প্রচ্ছদশিল্পী

পঞ্চানন চক্রবর্তী

● আদায়ক

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ
অধ্যাপক, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ
অগরতলা, ত্রিপুরা

● সহ-সম্পাদক

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৪/২৭/১, বেলগাছিয়া রোড
কলকাতা-৩৭

● সহযোগী

পুলকেন্দ্র সিংহ
পাঁচধুপী, মুর্শিদাবাদ

WITH BEST COMPLIMENTS

FROM

INDIA CARBON LIMITED

Manufacturers of

CALCINED PETROLEUM COKE

CALCINED ANTHRACITE COAL

CALCUTTA ★ GAUHATI ★ DELHI

ভারত সরকারের সংস্থা

ব্যাশন্যাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন-এব

দুটি ইউনিট

বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস্-এব

সূতা

ও

মণীন্দ্র মিলস্-এব

গুণে উঁচু

ও

দামে নীচ

ধুতি শাড়ী স্মার্কিং

বাবহার করেছেন কি "

কলিকাতা: অফিস

৫নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট

ফোন : ২২-১৪০৭

॥ বেং অফিস ॥

স্বাক্ষরিত বিন্দিং

কম্বোয়া গার্মেন্ট ম্যান

নিউ জিল্লী

বিস্টেল শপ

১। মিল গেট নং ১, কাশিমবাজার

২। নিম্নতলার ঘোড়, চুনাখালি

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণতম কবিদের তালুতম
মণিকান্ত হালদার মহাশয় গত ১৩ই অক্টোবর
সকালে তাঁর মুর্শিদাবাদ শহরস্থ বাসগৃহে পর
লোক গমন করেছেন। আমরা এই অজ্ঞেয়
কবির আত্মার শান্তি কামনা করি।

স. ১৭.

‘চৈতন্যিক’-পাঠক সমাজকে ••••• মনোমোহন সঙ্গীত প্রদান

অভিনন্দন জানাই



ডে'ক মেডিক্যাল স্টোম

নেতাজী রোড

কলিকাতা মুর্শিদাবাদ

সাপ্তাহিক

মুর্শিদাবাদের খবর

পড়ুন ও পড়ান

পো: খাগড়া ৥ মুর্শিদাবাদ

“কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি ।

শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি

মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিলু স্বামী

আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি ।”

বহুগর্ভ দিবাকরের মত প্রচণ্ড আলোকবিস্তারের শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু ঐ মাটির প্রদীপের স্তায় স্নিগ্ধ আলোকটুকু আমরা বিতরণ করতে পারি ।

বিরাট ভারতের বিপুল কর্মযজ্ঞের সাথে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা নগণ্য হইতে নগণ্যতম কিন্তু কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধ্যমত যেটুকু করিতে পারি সেটুকু নির্ভার সাথেই করিবার চেষ্টা করি ।

চন্দ্রকান্ত মলিতমোহন রেশম খাদি প্রমিতি

খাদি ও গ্রামোद्यোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত

বহরমপুর ॥ পোঃ খাগড়া ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন : বি-এইচ-বি ২০৮

- ◆ বিদগ্ধ সমাজ কর্তৃক সমর্থিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারী ও আদর্শবাদী পত্রিকা 'চেতনিক'-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (শারদীয় ১৩৮০), মূল্য ২ টাকা ৫০ পয়সা এবং ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, মূল্য ২ টাকা ২৫ পয়সা এখনো কিছু পাওয়া যায় ।

- ◆ পরবর্তী (২য় বর্ষ ৩য়) সংখ্যায় অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনাবলীর সঙ্গে থাকছে চিত্তরঞ্জন দাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বাংলা মঞ্চে ত্রেণ্ট নাটকের চর্চা' ।

৯

। মূর্তী ।

সম্পাদকীয়

৩

প্রবন্ধ

ডক্টর সরোজমোহন মিত্র	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপস্থাপনা	৫
মণি বাগাচ	হুগো হুগো ইত্যাদির বিবৃতি - কার স্বার্থে	৯
ডঃ সত্যেন ঘোষাল	রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও কাকতালী	১৮
ডঃ সত্যেন কবির	অগ্নিভাষ্য প্রাগায় প্রভাব	২১
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র	কবিতা সম্পর্কিত	২৫
ডঃ সত্যেনকুমার নন্দী	লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ	৩৭
ডঃ শ্যামকুমার সত্য	বাংলা নাটকের স্রষ্টা বাবা	৪৫
ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	বিভূতিভূষণ প্রসাদ	৬৭
দীনেন্দ্র সত্য	লোক সঙ্গীতের সামাজিক প্রভাব	৭৩

গল্প-নাটক-নক্সা

শৈবদ মুস্তাফা সিদ্দিকী । পল্লব সেনগুপ্ত । ডঃ অমলেন্দু মিত্র । ডঃ সত্যেন মুনোপাধ্যায়
রতন চট্টোপাধ্যায় । দিলীপ লাহিড়ী । অনিমেষ বায় । প্রবন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

কিরণকর সেনগুপ্ত । বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় । বাসুদেব
বসু । কবিরাজ ঈশ্বরাম । ফজল-এ-খোদা । অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সাগর
চক্রবর্তী । বল্লভাম বায়চৌধুরী । দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্রজগোপাল বায়
মল্লিকার দাশগুপ্ত । বিনোদ বেরা । সুনীতি চট্টোপাধ্যায় । মল্লভাষ্য মিত্র
মনীষীমোহন বায় । পীযুষ ভট্টাচার্য । অমিত্রাভ দাস । শান্তি বায় । মদনগোপাল
বায় । শ্যামলা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আসুন বিষ্ণুপুরে গোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে



TCP/TS 200 A3

মন্দির। বীর হৃদীরে আরলে
ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির
এবং তার অপরূপ গোড়ামাটির
অলংকরণ বহন করছে বাংলার
স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।
রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে
যাওয়া যায়। জয়রামবাড়ী এবং
কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের
দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।
সুনিশ্চিত বাস্কন্দের জন্য যেনো রম
বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লঞ্জে উঠুন।

বিবরণীর জন্য যোগ দিন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিমল-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি কোমার) ইস্ট কলিকাতা-১
ফোন : ২৩৮২৭১ গ্রাম : TRAVEL TIPS
বরাহ (পল্টন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ফোন নং : বি-এইচ-বি ১৪২

শারদীয়ার

অভিনন্দন

জানাই



স্কুল কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ তুলতে

ও

সময়ে সরবরাহ করি

ভূজঙ্গভূষণ কুণ্ড এণ্ড সন্স

থাগড়া । মুর্শিদাবাদ

★★★★★★★★★
 ★ সম্পাদকীয় ★
 ★★★★★★★★★★

ভূমপাড়ানি মাসিপিসি, বাটা ভ'রে পান দেবো, দোহাই তোমাদের, গালপূবে
 খেতে খেতে তোমরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাও
 সমুদ্রপারে, কিংবা পৃথিবী ছাড়িয়ে মঙ্গলগ্রহের জঙ্গলে। আমাদের ধেড়ে
 খোকাপুকুদের আর ভূম পাড়িয়ে রেখো না। ওদের জাগতে দাও। নইলে,
 সর্বনাশের উন্ননের আগুন লোভী জিভ মেল ওদের ধরলো ব'লে। শুধু কি
 ওরাই ম'রে রেহাই দেবে! গোটা দেশটাই যে অভাবে-স্বভাবে জলে পুড়ে
 মরতে বসেছে। আর ক'দিন পর পুজো। দশগ্রহরণধারিণীর নৈমিত্তিক
 পুজো মহাসমারোহে সম্পন্ন করবে ভঙ্গলোকের ভিকিরি ছেলেরা। কোথাও
 কোথাও উপাদেয় পানীয়ের পিপে উপুড় হবে তাদের পিপাসার্ত পাকস্থলীতে।
 ভোটভিকিরি রাজাগজাধা আসবেন তাদের 'হাতে রাখবার' নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যে,
 সাজানো মায়ামঞ্চে উঠে তাদের বিগলিত ধন্যবাদ কুড়োবার জন্তে বহু দামী,
 কিস্তি অর্থহীন, 'ঋতবাক্য' উচ্চারণ করবেন, অনর্গল উদ্দেশ্যহীন অজীর্ণ বাণী
 উদ্গীৰণ করবেন। অজস্র বাজি পুড়বে। সহস্র সঙ্ নাচবে। আর হাজার
 পাওয়ারের শত শত বিজ্জ্বলি রঙের আলোয় কল্মস পুজাপ্রাঙ্গণের অঙ্ককার
 আনাচে-কানাচে বর্ষাবিহীন জন্তর মতো অসংখ্য অনাদৃত কৃৎসন অমৃতস্ত পুত্র
 কস্তুরা মুখ গুবড়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাবো না।
 কারণ দেখবার মতো আমাদের চোখ নেই। আমার সবাই খারাপ লোক
 নই। সবাই কিছু চুরি-জোচ্চুরি করিনে, দুঃস্বপ্নের ঈশ্বর পায়ে নে। তবু
 আমরা তা দেখতে পাবো না। কারণ দেখতে হ'লে মন চাই। সে-মন
 আমাদের নেই। স্থান টেবিডের ভাষায় 'We are too lazy to be
 critical.' কৌটোভতি চিন্তার চিনির ডেলাগুলো আমাদের মুখের মধ্যে
 চামচ-চামচ ফেলে দেওয়া হয়। আর আমরা পরম পরিতৃপ্তিসহকারে তা

গলাধঃকরণ ক'রে সোজা মস্তিষ্কের কুঠুরিতে চালান ক'রে দিই। মস্তিষ্ক হ'য়ে যায় শ' বর্ণিত 'বিলিয়ার্ড বল'-এর মতো 'সলিড'। স্বাধীন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় না, স্থান হয় না সেখানে তাই। তাই চারপাশে আগুন লাগলেও তার আঁচ লাগে না আমাদের আচরণে, আমাদের 'বন্ধা গংদা' মনে ও মননে। তাই আমরা অভ্যস্ত আবেগে ডিমক্রেসির ডিমে তা দিয়েই চলেছি, সে-ডিমে আস্ত আছে, না পেচে ঢোল হয়ে আছে তা যাগাই না ক'রেই। ডিমক্রেসি যদি যথার্থই হয় জনকল্যাণপ্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র তা হলে তাকে মাধায় তুলে রাখা শুধু আমার আপনায়ই নয়, আমাদের পিতৃপিতামহেরও পবিত্র দায়িত্ব। আর ডিমক্রেসি মানে যদি হয় নিজেব জাত ও জীবন বুইয়ে ক'জন অভিজাত বা রাঁত জাত নবাব বাদশার নবাবি কায়ম রাখার কসরৎ মাত্র + তাহ'লে তার ওপর আস্থা বজায় রাখতে পারে কোন্ স্বচ্ছদৃষ্টি, স্বজ্ঞমার্গ, বিবেকবান ব্যক্তি ?

দেশের এই চরম দুদিনে নেতাদের মধ্যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে, এমন কি লেখক শিল্পীদের মধ্যেও নির্লজ্জ পৈশুষ্ঠ্যপ্রিয়তা দেখে, আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন দ্বৈপ জীবনযাপনের লিপ্সা দেখে, স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে নিঃসাড় নিস্পৃহতা দেখে দেশের সব সাধারণ মানুষ লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে অত্যন্ত উদ্বেগ, বিপন্ন ও অসহায় বোধ করছে। অধিকাংশ সাহিত্যিক আজও, দাছ জতুগৃহে বাস ক'রেও, ইলিয়া এডেনবুর্গ-কথিত 'স্নপ্পোংপাদনের কারখানা' (dream factory)-র অংশ হয়ে, 'বিস্তৃক' সাহিত্যসৃষ্টির নামে নিরালস্য কিছুতকিমাকার সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। এইসব আত্মপ্রবঞ্চক বুদ্ধিবাজের দল, চারিত্রিক দৈন্তা ও শঠতাবশতঃ, যে 'বিস্তৃক' বল্পনানিত্য উপগাস-নাটক কবিতা প্রসব ক'রে যাচ্ছেন তা ভবিষ্যতের উত্তরোত্তর অধিকতর বাস্তবচেতন সমাজ নিষ্টব-ভাবে অশ্রুকা করবে, প্রত্যাখ্যান করবে। পৃথিবী ও প্রকৃতির দাবিকে উপেক্ষা ক'রে, সমাজের চাহিদাকে অস্বীকার ক'রে কোনো সার্বক কালজয়ী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে না। কোনোদিন তা হয়ওনি। বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত না ক'রে, যুগকে, যুগযন্ত্রণাকে বিস্মৃত হ'য়ে যুগোত্তর সাহিত্যসৃষ্টির স্বার্থ এক-মাত্র মুখেই প্রদর্শন করতে পারে। কারণ, সংস্কৃতির মতো, সাহিত্যও বৃহত্তর অলাভ নয়। সাহিত্য নিবিড়ভাবে যুগবক্ষে লিপিত হয়েই যুগোত্তরগণের সফল স্বপ্ন দেখতে পারে।

✓ সামাজিক বন্দোবস্তাধ্যায়ের একটি উপন্যাস

ডঃ সরোজমোহন মিত্র, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্.

প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ : বর্তমান সমাজব্যবস্থার কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই থাকা সম্ভব কি ? প্রশ্নটা মূলত সাহিত্যের নয়, সমাজ-অর্থনীতির। কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে ত সাহিত্য হয় না। তাই সমাজজীবনে যা কিছু গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে সাহিত্যে তার কোন না কোনভাবে প্রতিফলন থাকবেই।

মাত্রাধিক নিয়েই সমাজ। পরিবর্তনশীল মানবজীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে খাপ খাটিয়ে সমাজেরও পরিবর্তন হয়। তার জন্য পুণিবীটাকেশব বদলে ফেলার একটা অসীম শ্রম পর্যায় অব্যাহত চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে মাত্রাবের আবেগেরও পরিবর্তন হয়। ধনতন্ত্রের প্রথমদিক সাহিত্যের যৌক্তিক ভিত্তি বান্ধি প্রবণতার দিকে। সামাজিক সম্পর্কে অস্বীকার করে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে জাহির করাই ছিল প্রধান উপজীব্য। শেক্সপীয়ারের এটনি এবং ক্রিয়োপাট্টা কিংবা রোমিও জুলিয়েট-এ নিবাস প্রেমের জয়গান। এখানে স্বল্প সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির। শ্রেয় এবং প্রেয়-এ স্বন্দ।

তারপর ধনতন্ত্রের শোষণের তীব্রতা বেড়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ মতো তুলে উঠেছে। বেপারোয়া এই শোষণের বিরুদ্ধে জীবিকার সংগ্রামে স-বন্দ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অসহায়ের শক্তি সংহতির মতো। নদীর এপাড় যেমন ভাঙে অস্ত্রপাড় তেমন গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনেও চলেছে নিরন্তর এই ভাঙাগড়ার খেলা।

সাহিত্যে তার প্রতিফলন থাকতে বাধ্য। সার্বভিত্তিক নিরন্তর শ্রম করে চলেন সামাজিক উপাদান সংগ্রহের জন্য। কিন্তু কেবল টেট কাঠ কুড়িয়েই যেমন কোন বাড়ি তৈরি করা যায় না তেমনি কেবল উপাদানেই সৃষ্টি হৃদয় হয়ে ওঠে না। তারজন্য পরিকল্পনার অভিনবত্ব চাই, বস্তুবোরে দৃঢ়তা চাই, অস্বাভাবিক এবং বহিঃস্বাদের পরিচয় চাই। বাড়ি তো সকলেই তৈরি করে কিন্তু সব বাড়ি তো একরকম হয় না। সৌন্দর্য কেবল ভিন্নতর মতো নয়, প্রকাশ এবং প্রয়োজনের দৃঢ় সমন্বয় থাকা দরকার, তাছাড়া আছে রুচি, সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি।

যে কোন সং এবং মহৎ সাহিত্যিক সমাজ-দৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারেন না। মানবিক মূল্যবোধে সমাজের অন্তর্নিহিত অন্তরায়গুলো সাহিত্যিক বড় করে তোলেন। তার বিকল্পে নিয়ত সংগ্রাম করে মানুষ তার সমাজকে উদ্ভিষ্ট লক্ষ্য সাধনে বদলে নিতে চায় ধনতাত্ত্বিক শোষণ ব্যবস্থার বিকল্পে সংগ্রাম করে মানুষ যখন ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র আনয়নের জন্য তৎপর হয় তেমনি তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যক্তি প্রবণতার পরিবর্তে সমষ্টিবোধই আধুনিক কালে প্রধান হয়ে উঠেছে। “সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমার সীমা ভেঙে নিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে” মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলা উপন্যাসে তাকে প্রথম রূপদান করলেন। ‘সার্বজনীন’ উপন্যাস তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কৃট চক্রান্তে দেশ ভাগাভাগির মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা আসে। এই ভাগাভাগির পটভূমিকা তৈরী করার জন্য তারা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল তা চরমাকার ধারণা করল ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট থেকে। ভ্রাতৃত্বাভী দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যে আমরা যা লাভ করলাম তার নাম ‘স্বাধীনতা’। তার মূল্য দিতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তবতা ত্যাগ করতে হোল। লিওনার্ড মসলে-র হিসেবে দেখা যায় মোট এক কোটি ৪০ লক্ষ বাস্তবতাগী হয়েছিল এবং ৩ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

সে এক নারকীয় দৃশ্য। হিংসাময় মানুষগুলো যেন মত্ত হয়ে গিয়েছিল। আর অসহায় মানুষদের দিয়ে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক ভাল ব্যবসা ফেঁদে রাতারাতি আরও বড়লোক হয়ে গেল। কিন্তু মার্কসবাদে বিশ্বাসী মাণিক জানতেন সমাজে এই প্রচণ্ড ভাঙনেও মানুষগুলো একেবারে চুরমার হয়ে যাবে না। অতীতকে মানুষ আবার গতিশীল হয়ে নতুনরূপ লাভ করবে।

হোলও তাই। শেয়ালদা স্টেশনে পথে ঘাটে উষ্মাস্ত্রর ভীড়ে একদিকে যেমন ভাঙনের রূপ চরমাকার লাভ করেছিল অতীতকে সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মোহ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বহু ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে রাতারাতি বহু পড়ে জায়গায় নতুন নতুন মানুষের উপনিবেশ গড়ে উঠলো। উষ্মাস্ত্র জীবনের এই দিক তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ লোকেবই চোখে পড়ে নি। তারা যখন উষ্মাস্ত্র মেয়েদের নিয়ে নানা রসাল কাহিনী ফাঁদছিলেন তখন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত করলেন এক উজ্জ্বলতর কাহিনী।

ভিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন, “দশটা মাহুঘের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়ায়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।” বোগ-শোক দুঃখ বেদনার বস্তা মাহুঘকে কখনো ভাসিয়ে নিতে পারে না। সাময়িক ভাবে মুবড়ে পড়লেও মাহুঘকে সেই ধাক্কা সামলে নিতে হয়। আর পাঁচজনের দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখটাকে মিলিয়ে দেখলেই তবে সেই দুঃখের বোকাটা অনেক হালকা হয়ে সুখের উপলব্ধি জন্মে। ‘সার্বজনীন’ উপজ্ঞানে মানিক অতি হৃদয়ভরাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

কেবল নিজের হিসাব ধরলে আজকের দিনে চলে না। দশজনের কথা ভাবতে হয়। বিভূতিভূষণের ছেলের এবং মহেশ্বরের জামাই সমীর কেবল নিজের হিসাব ধরেছিল বলে সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যেতে বসেছিল। তিনশ টাকা মাইনের চাকরিতে তার তৃপ্তি ছিল না। রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে সে ব্যবসায় নেমেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্বপ্নের টাকা চুরি করতে হোল। চেনা জানা বহু লোককে প্রবঞ্চিত করতে হোল। কিন্তু সবই তার ধ্বংসের পথে খড়কুটোর মত ভেঙ্গে গিয়েছিল। অবশেষে সে গিয়ে-আশ্রয় নিল শেয়ালদা স্টেশনে উষাস্তর মধ্য। সে তাদের দেখেছে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েও কি অসীম ক্রেশ ও চেষ্টার দ্বারা তারা নতুন জীবন গড়ে তুলেছিলো। সেখান থেকে সে বাঁচবার পথ পেয়ে গেল! মদের নেশা তাকে আত্মবিনষ্টির পথে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পরে সে বুঝতে পারল বাঁচার নেশা আরও বেশী উত্তেজক। সে নেশাটা একাকী জমে না। তারজন্য দশজন প্রয়োজন।

কতগুলো মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনা আঁকড়ে ছিল বলে মহেশ্বরের ছেলে সাধন ও সমীরের সঙ্গে ব্যবসায় নেমে বুঝতে পারেনি কি করে বাবার দশ দশ হাজার টাকা জলের মত উবে গেল। সবিতার বাল্যকাল থেকেই অস্বাভাবিক নিষ্ঠা ছিল। সেজন্য মধ্যবিস্তৃত আবেশ আর স্বপ্নের চোরাগর্মেতে কখনো সে পা দেয়নি। প্রথম থেকেই সে হিসেব করে চলেছিল বলে তার জীবনে কোন প্রচণ্ড আশাভঙ্গের বেদনা এসে জীবনটাকে অর্থহীন করে দেয় নি। বরং অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত সাহসিকতা তার আছে। তাই দরকার পড়লে সে যেমন পুরুষ সেজে নিজের মা ভাইবোনদের নিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে পারে আবার তেমনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেশের দুঃখ-দুর্দশার গান গেয়ে ঘোড়া বিক্রী করে নিজেদের সংসার চালাতেও পেছপা

হয় না। কারণ সে বুঝতে পারে সমাজের গতিপথ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। নতুনভাবে নতুন উপায়ে এখন যেমন শোষণ বাবদ্য চালু হয়েছে তেমনি তার প্রতিরোধও করতে হবে সংহত ভাবে। বাঁচবার কৌশলও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়।

এই কথাটা আশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করল মহেশ্বর। পূর্বক্কে তারা ছিল ব্যবসাদার জোতদার অনেক টাকা পরসী প্রতিপত্তি চিরকাল ভোগ করে আসছে। সাতপুরুষ ধরে তাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে এপার বাংলায় এসেও সে তার ঐতিহ্য থেকে সরে দাঁড়াতে চায় নি মশামারোহে সে এ বন্ধেও পূজা করে। কিন্তু যেখানে আর নেই কেবল বায় থাকে এবং তার ওপর সমীরের মত বাটপাড় থাকে দেখানে গহন্য বন্ধ দ্বিগ্নে দ্বিগ্নের ঝড়কে রাখা যায় না। সাতপুরুষের পূজা তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। এ বেদনা যেকী মর্মান্তিক ভুক্তভোগী ছাড়া উপলব্ধি করা তা সম্ভব নয়। কিন্তু এতক্ষণ মহেশ্বর কেবল নিজের কথাই ভেবেছে। মুহূর্তে সে বুঝল পাড়ায়ও যদি কোন পূজা না হয় তাহলে কেবল সে একা নয়, পাড়ার লোকগুলোও পূজার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। নিজেকে নিয়ে মশগুল থেকে সে কেবল মর্মান্তিক পাঁড়ার বোধ করছিল, সঙ্গীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের কবল মুক্ত সাবজনীন দুর্গোৎসবের তামস্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিষণ্ণতা দূর হয়ে গেল। তাদের বংশাচক্রমে পূজা হয়ে পূজা গেল পাড়ার সকলেও পূজা। একে ব্যক্তিগত দায় কমে গেল অথচ আনন্দ বাড়লো অনেকগুলি বেশী।

সাবিক এত অশ্রুভাঁটার ধাক্কা এসে লাগলো সদা হাসিমুখী কর্মবিমুখ পরমেশ্বরের মতো। চিরকাল সে তাহরের পাঠানো টাকায় সংসারের কোন দায়িত্ব না নিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে হাবুডুবু খাওয়া সংসারের হাল দেখে বুড়ো বয়সেও তাকে চাকরী নিতে হোল। প্রত্যেক সমাজের মধ্যে বাস করেও সে সামাজিকভাবে কোন সমস্তাকে দেখে নি তাই পদে পদে জমেছিল অসংখ্য ভুল ধারণা। তাই তো তার পাড়ার ছেলে সাধনের জুতোর সেল ফেরি করার বিক্রী করার মধ্যে সে কোন দোষ দেখতে পায় না।

স্বরমারও পরিবর্তন চোলে। স্বামী সমীরের অধঃপতনে সে নিজেকে বিধবা বলে ভাবতে শুরু করেছিল। এতদিন সে কেবল নিজের হিসাব আর স্বামীর হিসাব নিয়ে ছিল বলে দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু সবিতার কথায় তার জ্ঞান হোল। জগতে তার মত কত বৌ কত স্বামী আছে। জগতের হিসাবের সঙ্গে নিজের হিসাবটা মিলিয়ে নেওয়ার পরে সমীরকে নিয়ে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখা দিল। এমান করে মার্কিন ব্যক্তিমানসিকতার ফাঁকির দিকটা চমৎকার করে এই উপস্থাপ্তি তুলে ধরেছেন। কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে সকলে আনে দুঃখ মানি। আর দশজনের সঙ্গে সংহতির মধ্যে আছে যথার্থ আনন্দ ও মুক্তির পথ। দশজনকে নিয়ে চেষ্টা না করলে সমাজকে কখনো বদলে দেওয়া যাবে না, নিজে শান্তি পাবে না।

যুগ যুগ ইতিহাসের বিকৃতি—কার স্বার্থ

মণি বাগচি

প্রাচীন কাল থেকে অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা পর্বে বহুবিধ বিকৃতি আরম্ভ লক্ষ্য করে থাকি। উনিশশো সূড়ি লাল থেকে আরম্ভ তখনে আসছি : জাতির জনক গান্ধী। কথাটি তাহা মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক বিকৃতির একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত। বহু সত্য বলছি, বহু প্রবন্ধ আলোচনা করেছি যে, জাতির জনক একজনই, তিনি রাজা রামমোহন রায়। গান্ধী Pseudo-father, এর বেশি কিছু নয়। তবে এই বিকৃতিটা কার স্বার্থে? এই বিকৃতির উদ্ভব হয়েছিল বিদেশী শাসকের স্বার্থে ও এদেশের একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে যাদের চোখে বাঙালীর বৈপ্লবিক মনীষা চিরকালই শিরঃ-পীড়ার কারণ হয়ে এসেছে। গান্ধীর প্রথম আন্দোলন—অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথাটা ধরা যাক। এই আন্দোলন যখন সাফল্যের কাছাকাছি এসেছিল, গান্ধী মাঝপথে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন চৌকিচৌরার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। এটাও ছিল ইতিহাসের বিকৃতির আর একটা দৃষ্টান্ত। এইভাবে আন্দোলনকে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে গান্ধী প্রকৃত পক্ষে সেদিন যাদের নিকিত করতে চেয়েছিলেন ভায়া হলো ভারতের ধনিকগোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতির দল। গান্ধীকে বলা হয়ে থাকে ভারতের জনগণের বন্ধু। আসলে তিনি ছিলেন এদেশের ধনিকগোষ্ঠীর বন্ধু। তাঁর কংগ্রেস তহবিলে এদেরই দান ছিল সর্বাধিক, আজও তাই। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বলবে, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে না ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, না ছিল প্রথর চিন্তাগত বিপ্লব অথবা বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক অত্মপ্রেরণা। গান্ধীর রাজ-নৈতিক দর্শন, নিরপেক্ষ ইতিহাসের দৃষ্টিতে, অনেক কিছুর মিশ্রণে (থিওক্রাফি, টেলিউর, বেদ ও সার্মন অন দি মাউন্ট) গঠিত ছিল। এ, শুধু রহস্যময় নয়, দুর্বোধ্যও বটে। আজ যখন আমরা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার করতে চাই, তখন দেখতে পাই যে, এ ছিল জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মাত্ম গোড়ামির এক আশ্চর্য জগা-খিচুড়ি। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত বিশ কোটি সেইটি উপদেশ মনে করেছিল। আসল কথা, কোন আন্তর্জাতিক চিন্তা চেতনা থেকে এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি। তেমনি ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখটিকে আমরা

স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা দিয়েছি। এটাও ইতিহাসের আর একটা বিকৃতি। ভবিষ্যতের সভ্যসঙ্ঘ ঐতিহাসিক বলবেন, আসলে ঐদিন যেটা ঘটেছিল তা ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত একটি বিলের মাধ্যমে একীভূত বশব্দ ও নিরাপদ রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর-এর অধিক কিছু নয়। ক্ষমতা হস্তান্তর আর স্বাধীনতা এক জিনিস নয়। অথচ গত সাতাশ বছর ধরে আমরা দেশের লোককে বলে এসেছি ঠিক উল্টো কথা। যদি আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করতাম তা হলে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কঠামোকে ভেঙে ফেলতাম কিন্তু তা করা হয় নি। ধর্মের হাতে ক্ষমতা এলো এবং সেই ক্ষমতা আজো ধর্মের করায়ত্ত তাঁরা সেই কঠামোকে পুরোপুরি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত সম্পদ গড়ে তুলেছেন বৃহত্তর জাতীয় জীবনে এই যে ঘনকণ্ঠ অঙ্ককার বিরাজমান, সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ হলে এটা কি সম্ভব হতো ?

১২৭৭ থেকে যদি ১৮৫৭-তে চলে যাই, সেখানেও প্রত্যক্ষ করি ইতিহাসের একটা প্রকান্ত বিকৃতি। ঐ বছরে সংঘটিত সিপাহী যুদ্ধকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়! এই প্রসঙ্গে একালের একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'The rebellion which broke out in 1857 was neither a military mutiny nor a national war for independence. It was not a mutiny because it was not confined to the troops, but was supported by the vast majority of the peasants and people of northern India ; and it was not a national war because as yet there was no nation in India, although the unifying policy of the British was rapidly creating one. It was a revolt precipitated by the revolutionary changes introduced by British capitalism into India. Historically considered, it was a revolt against nationalism and against modernity : it was an attempt to turn the clock of history back to feudal isolation and to feudal tyranny, to the handloom and the spinning-wheel, and to primitive methods of transport and communication.' (Lister Hutchinson :

'The Empire of the Nabobs') অতএব নিম্নোক্ত বিব্রোহের অসাক্ষ্য ইতিহাস-বিবর্তারই অভিপ্রেত ছিল। অথচ এটাকেই আমরা জাতীয় অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে গণ্য করি বোধ করে থাকি। যদি জিজ্ঞাসা করি—কান্ন স্বার্থে এই বিকৃতি বা সত্যের অপলম্প, উদ্ভব হবে—তাহেই স্বার্থে স্বাধীনতার ভাবভাবকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিল। হাল আমলের আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। চাটিলের ওয়ার মেমরিস' অনেকেই পাঠ করেছেন। এই বইটির (কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত) জন্মই ঐক্য সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল: 'Sir Winston Churchill is certainly a maker of history, but he can never be a writer of history, for he hardly understands the function of history'। ষাণ্ড এই বইটি পড়েছেন তাঁরা দেখেছেন চাটিল কোথাও ইতিহাসিকের নিরস ইতিভাবীর পরিচয় দিতে পারেন নি।

আমল কথা, ষাণ্ড ইতিহাসের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে না পারেন, তাঁদের হাতে ইতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্থজাতির গৌরব পরিকীৰ্ত্তিত হয়ে থাকে, বলা হয়ে থাকে, তাঁরা স্বস্বতা ও মহান ছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু মহেচ্ছাদারো আবিষ্কারের পর আমরা জানতে পারলাম যে, আর্থদের ভারত আগমনের বহুপূর্ব থেকে সিদ্ধান্তের তীরে যে ড্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ছিল মূল মূল দিরেই উন্নত। আর্থরা তাকেই ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আর্থসভ্যতা ড্রাবিড় সভ্যতার তুলনায় যে খুব বেশি উৎকৃষ্ট ছিল না, তার অকাটা প্রমাণ এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের সেই সভ্যতাকে আর্থ পরবর্তী ভারতবাসীর জীবনে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইতিহাসের যে সব পাঠ্য বই আছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে রাস্তিকৃত distortion of facts বা তথ্য বিকৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতীয় জাতি (Indian race) কথাটাই তো ভুল, তেমনি জাতীয় ভাষা কথাটা ভুল, আমাদের দেশে যে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা নেই তার প্রমাণ যদি কেউ দেখতে চান তবে একটা পাঁচ বা দশ টাকার কারেন্সী নোটের ওপর তিনি যেন চোখ বুলিয়ে নেন। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে এক ভজন ভাষা ও অক্ষরের নির্দর্শন। ভারতীয় খাস্ত বা ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদের

মধ্যে যে বৈচিত্র্য পরিচলিত হয়ে থাকে তার থেকে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, বৈচিত্র্য আর ঐক্য—এই দুই পারস্পরিক বিরোধী বৈশিষ্ট্য ভারাই চিহ্নিত হয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের চিবস্তন ধারায়।^১ ভারত-ইতিহাসের যথার্থ আলোচনা বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাধা কোথায় সেই কথা বলতে গিয়ে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক লিখেছেন : ‘India has virtually no historical records worth the name. In India there is only vague popular tradition with very little documentation above the level of myth and legend.’ (D. D. Kosambi : The Culture and Civilisation of Ancient India) যে অর্থে রোম বা গ্রীসের বিস্তারিত ও সঠিক ইতিহাস আমরা পাই, ঠিক সেই অর্থে আমরা যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাই না তার প্রকৃত কারণটা তো এইখানেই।

আচার্য যত্ননাথ সরকার বলতেন : ‘No document, no history’ অর্থাৎ দলিল ভিন্ন ইতিহাস লেখা যায় না। আবার সেই দলিল বা ডকুমেন্ট সাক্ষ্য হওয়া চাই। এইভাবেই তো তিনি মুঘল ভারতের ইতিহাস, বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অর্থশতাব্দীকালব্যাপী রাজত্বের ইতিহাস, লিখতে পেরেছেন ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন সভ্যসঙ্কলনী ঐতিহাসিক। আকবর থেকে ইংরেজের ভারত ত্যাগের দিন পর্যন্ত যে ইতিহাস সেটা আসলে কী? মোহমুক্ত চুষ্টি দিয়ে যদি অবলোকন করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, আকবরের যুগে গণদেবতা নেই, দেশ নেই, জাতি নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের অসকল স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করবে বলে কেউ কেউ আশা করেছিলেন, যেহেতু তৎকালীন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু হযত অজান্তেই আকবরের পথেই চলেছিলেন। যাকে আমরা ‘জাতি’ বলে ভ্রম করেছি। এ আকবর-নেহেরুর কারা সেই মহাজাতি নয়। বর্তমান ভারতীয় জাতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এখনো সংকীর্ণবুদ্ধি সম্প্রদায়-সহস্রের সাময়িক ঐক্য এবং মৌখিক ঐক্য, এইজন্যই জহরলাল মাঝে মাঝে ক্রান্তনালিঙ্গমের মুখোলের আড়ালে regionalism, casteism, communalism এর নয়মুখি দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। সেই শ্রবণীয় ১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট দিনটির কথা মনে পড়ে। স্বাধীনতার দিনেই ভারতমাতাকে পরশম্যা নিতে হয়েছিল ;

ঊন্থ বন্ধ পক্ষে দুইটিকে আধবৈধা ধাটালো ছুটি, শেটের স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা বাতালী-ইচ্ছা, অস্বেচ্ছা চিত্তিত নামাবলী। আকবরের স্বাক্ষরে ভারতীয় মহাজাতি পায়ের ওপর ভর করে না দাঁড়াতেই হিন্দু মুসলমান রাবণী ধলা টিপে রেখেছে। এই পাপে হিন্দু জাতি আলমসীরশাহী মৌরবে পড়েছে। মুসলমান মুঘল সাম্রাজ্য হারিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান দেড়শো বছরের বেশি বিলাতি লাঙল টেনে যুক্তবহি করেছে। আকবরের অসাকল্যের পত্তিণাম আওরংজীব, আওরংজীবের অসাকল্যের পত্তিণাম মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান।

ইতিহাসের বিকৃতি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, একথা কোন বুদ্ধি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। আজ তাই ভারতবর্ষের নতুন করে লিখবার দিন এসেছে। মাহুকের ভুলের নীচে ছোটো চোখ ছাড়া ওপরে অজ্ঞাতস্থানে আর একটা চোখ স্ফটিকর্তা লুকিয়ে রেখেছেন—এটাই প্রজাচক্ষু, যার দ্বারা সত্যের স্বরূপ দর্শন হয়, ইতিহাসের বিশ্বরূপ দর্শন হয়—ঐ প্রজাচক্ষু জাতির স্বাধীনতার দিনে উন্মীলিত হয়, দাসত্বে অন্ধ হয়ে যায়। এই স্বাধীনতা নয়, চিন্তার স্বাধীনতা এবং স্ফলস্করকম সহজ সংস্কার থেকে বুদ্ধি ও বিচারের মুক্তি। এই রকম মুক্তপুরুষই ইতিহাস চর্চার প্রকৃত অধিকারী। (ওদেশে যাক্কে, লড এ্যাকসন, টরেনবি আর এদেশে, বাগাডে, যত্ননাথ, ভাণ্ডারকরকে আমরা এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করতে পারি।) প্রকৃত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক দেশকালনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারযুক্ত—মতবাহীর সংস্কার এবং বাহবা-স্ফোটনের বহু উদ্দেশ্য। ইতিহাসের ধর্ম্যধিকরণে নিম্নকৃত ও জীবকের বন্ধ, বন্ধ ও অতিশয়োক্তি বাগাডের স্বল্প বিচারধারাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এইজন্যই মনে হয় হিন্দুর মহাভারত আধুনিক সংস্কারমূলে ইতিহাস না হলেও, কল্পিত কিংবা বাস্তব ‘বেদবাস’ একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বেদবাসের রচনার কোথাও বিকৃতির লেশমাত্র দেখা যায় না, পক্ষপাতিত্বও নয়। ইতিহাসের বিশ্বরূপ তিনিই দর্শন করেছেন। যারা হরিমুন্ডের বাতালার সন্তুষ্ট হওয়ার মতো মাহুকের সাধারণতঃ সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের হাতেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে থাকে।

বলেছি, ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। কথটা একটু বিশদ করে বলি। কোচে বলেছেন, ইতিহাসের কাজ সত্যকে প্রকাশ করা—‘History should unfold the truth’—এবং এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লিখবার দিন এসেছে। সত্যের উন্মীলন

বড় সহজ কাজ নয়—নিরপেক্ষ ও নিরাসক্তদৃষ্টি ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যের উন্মোচন আরো সম্ভব নয়। অতীত গৌরবের প্রতি অন্ধ অহুসার অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে আবিল করে দেয়। ঐক্যত ইতিহাস অহুসারের মধ্যে ঘোষাটিক কল্পনার স্থান নেই। যেখানে ঘোষাটিক কল্পনা, সেখানেই ইতিহাসের বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর একটা দৃষ্টান্ত বাংলার বাঘভূঁইয়া। কল্পনা ও আবেগের আভিযায়ে আমাদের নাট্যকাররা যশোরের প্রতাপাদিত্যকে মেবারের রাণাপ্রতাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ তাঁর সম্পাদিত ‘হিন্দী অব বেঙ্গল’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের বাগদশ অধ্যায়ে লিখেছেন : ‘A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiya of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort. These mushroom captains of plundering bands have been likened to the hereditary chieftains of the homes they had bought with the blood of their ancestors through centuries of struggle. The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessor as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is therefore necessary to debunk the Bengali hero by turning the dry light of history on him.’

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিদেশীদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু ত্রুটি, সত্যের অপলোপ ও তথ্য-বিকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন স্বনামধন্য ভারতবর্ষবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ইতিহাস-বিজ্ঞানী ভাউ দানী। আমাদের দেশে কোন হেরোজেটাস বা থুসিডাইডস, লিভি অথবা ট্যাসিটাস জন্মায় নি। তাই ইংরেজ শাসনের আমল থেকে এদেশের মূল-কলেজের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস জাতীয় যেসব বই স্থান পেয়ে এসেছে। সেগুলির লেখক প্রধানত বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর লোক অথবা মিশনারি পাদরি। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লেখার কথা উঠতে থাকে। গিবন বলেছেন, একটি জাতির উত্থান, বিকাশ ও পতনের সামগ্রিক পটভূমিকাতেই তার ইতিহাস রচিত হতে পারে। তিনি নিজে এই পদ্ধতির অহুসার করে তাঁর কালজরী ইতিহাস (Decline and fall of the Roman Empire) রচনা করেছিলেন। অনেকে বলেন, ইংরেজ-পূর্ব ভারত-

ইতিহাসের কিছু উপাদান বাণিজ্যের, ট্যাক্সানিয়ার, বাহুলী প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকরা
 রেখে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক যত্ননাথ এইসব বিষয়কে 'Bazar gossip'-এর
 অন্তর্ভুক্ত মূল্য দেন নি। তিনি বলেছেন, এইসব বিষয়কে ইতিহাস রচনার
 নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। কারণ এইসব পর্যটকদের
 কেউই ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি কববার চেষ্টা করেন নি।

ভারত ইতিহাসের প্রবাহ ধারা (continuity) চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।
 যত্ননাথ বলেছেন : "The civilisation and culture of India has
 outlived the shock of dynastic revolutions, foreign inva-
 sions, religious conflict and widespread natural disaster"
 ভারতীয় সভ্যতার এই যে প্রাণশক্তি, পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা খুব কমই
 দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে,
 এই নিরবধি প্রবাহধারা ইতিহাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। মানবসভ্যতার
 ইতিহাসে এমন জাতি বিরল নয় যাদের ইতিহাস বলতে কিছু নেই, অথচ তারা
 প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সুতরাং প্রাণশক্তির দোহাই দিয়ে প্রাচীন ভারতীয়
 সভ্যতার প্রবাহধারার মহিমা কীর্তন ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে নিরর্থক।
 শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মজীবন অপরিবর্তিত ও
 অনড় অবস্থায় ছিল, বহির্বিষ থেকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন কাটিয়েছি,
 বাইরের অন্তর্জাতির চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছি—নিত্যন্ত গভীর মধ্যে
 থেকে আমরা দীর্ঘ শতাব্দীকাল কাটিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে continuity
 বা প্রাণপ্রবাহের কথা এলা হয়, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তার মূল্য সামান্যই। মানব
 সভ্যতার বড় কথা হলো synthesis বা সমন্বয়। এর ভেতর দিয়েই পৃথিবীর
 বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিকাশলাভ করে পারস্পরিক ঐক্যবোধ। প্রাচীন
 ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে আর যাই থাকুক, এই সমন্বয়বোধ, এট ঐক্যবোধটা
 ছিল না। রাজা দ্বায়মোহন রায়ের অবির্ভাবকাল থেকে আমরা এ জিনিস
 লাভ করলাম উনিশ শতকের স্বাধীনতা সময় থেকে এবং তখন থেকেই
 আমাদের ইতিহাস-চর্চায় স্বেচ্ছা দেখা দিল সামগ্রিক অনুশীলনের আগ্রহ।
 তখন থেকেই এলেন একদল নতুন ইতিহাস বিজ্ঞানী, ধারা বিশ্ব সভ্যতার
 পটভূমিকাটি সামনে রেখে ভারত-ইতিহাসের আলোচনার প্রবৃত্তি হন। এইভাবে
 এঁরা শুধু ইতিহাসের সত্য উন্মোচন করলেন না, এর মর্ম অনুধাবন করলেন ও
 ভাবের সমন্বয় সাধন করলেন। ভারত ইতিহাস তাঁদের হাতেই বিকৃতি-মুক্ত

হলো ও তার সত্যকার রূপরেখাটি আমাদের দৃষ্টিপথে উন্মোচিত হলো। এঁরা দেখালেন, রাষ্ট্র ও দেবতা অপ্রিয় সভা ওনতে ~~অগ্রহণীয়~~ নয়; অথচ প্রকৃত ইতিহাসে হিংস্র মনোহাঙ্গি চ ছলভং বচঃ।’

আমাদের ‘সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্য’ রাষ্ট্রকে (welfare state) রূপায়িত করার জন্য সম্প্রতি জাতিগঠনধর্মী সাহিত্যের প্রয়োজন হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, যথেষ্ট সংখ্যায় মার্কসবাদী সাহিত্যিক উৎপাদন করার জন্য দিল্লী কি অন্তত একটি সর্ব বিশ্বাপ্রসিদ্ধী কারখানাও স্থাপিত হয়েছে, সত্যমিথ্যা খোঁড়াভালা জানেন। অথচ ভারত খতিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হিন্দুধর্ম ও পাকিস্তানের জন্য মুসলমান যুগের দুই প্রবন্ধ ইতিহাস লোকশিক্ষার জন্য নতুন পদ্ধতিতে রচনাও পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং ‘সত্যমেব জয়তে’ এই ছাপ-মারা কিছু ইতিহাস-গ্রন্থও ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বমঙ্গল্যের রূপায় ভারতীয় গণতন্ত্রে অপ্রিয় সত্যের অণুলাপ করে মিলন প্রশস্তি রচনা করলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। গোদের ওপর বিষ-ফোড়ের মতো আমাদের ইতিহাসে নানাবিধ ism বা মতবাদ ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, যে ism দিল্লীর মসনদ দখল করলে, ধূর্ত ঐতিহাসিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাক ছাডবে, ‘জয় মামুর জয়!’ বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও শাকাহারি (নতুবা ‘অহিংস’ হয় না) সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, কাউকেও চটানার প্ররুতিও নেই, হিন্দুতও নেই। জওহরলালের মতো রোমান্টিক ঐতিহাসিককে যখন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের যুথের ওপর বলতে শুনি, ‘I am a better historian than you,’ তখনও আঁচ পাওয়া গিয়েছিল যে, স্বাধীনতার অর্থে সত্যকার ইতিহাস চর্চার বাগেটা বেজে গিয়েছে। কাকনমুল্যে ক্রীত একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিককে দিয়ে নেহেরু স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস লিখিয়েছেন, তার পাতার পাতার আছে তার বিকৃতি। এই বিকৃতি যে কাদের স্বার্থে, তা বলে দিতে হবে না। এমন অবস্থার ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্’ নাটকের মতো সর্বদর্শন এবং সর্ববিধ ইজমের চমৎকার সমন্বয় করে রাষ্ট্রভাষার একখানি ঐতিহাসিক নাটক যিনি লিখতে পারবেন তিনিই জাতীয় ঐতিহাসিকের পৌরব লাভ করবেন, যেহেতু পূর্বতন ঐতিহাসিকগণ জাতির মনের ওপর দুঃস্বপ্নের মতো চেপে রয়েছেন। বর্তমানে মূল-কলেজে সরকার কর্তৃক অল্পমোদিত ইতিহাস-পুস্তকে যা থাকবে তা-ই আদি-অকৃত্রিম ইতিহাস! ইংরেজ-আমলের সেই গোড়ার যুগ, শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে?

জানি, ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন হয়, কিন্তু তা যে এমন সাংঘাতিকভাবে হয়, সেটা আশা করার জায়গা ছিল না। তাইতো এখনকার ইতিহাসে ছেলেদের পঙ্কতে হয় : জাতির জনক গান্ধী । স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেহেরু !!

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও ‘ফাল্গুনী’

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাটনা ও কান্দী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের প্রধান রূপক নাটকগুলির মধ্যে অন্ততম ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৫) । ‘শারদোৎসবে’ (১৯০৮) যেমন শৈশব ও যৌবনের মহিমা কীতিত হয়েছিল ‘ফাল্গুনী’তে তেমনি যৌবন শেষের মহিমার কীর্তন দেখা যায় । ফাল্গুণীর অন্ততম চরিত্র ‘কবি’ বলেছেন—

“হ্যাঁ মহারাজ সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবন নিবাসক্ক যৌবন । তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের আভা দেখতে পেয়েছে, তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায় ।”

‘পূর্ববী’র তপোভজ কবিতা আর ফাল্গুনীর বাণী একই । ফাল্গুনীর বাণী হচ্ছে—

“ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বলস্করূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নৃতন ।” কবিও বলেছেন—

“আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মাহুঘের আসক্তি মোচন করবার জন্ত ।”

দীর্ঘকাল পরে লেখা ‘তপোভজ’রও (১৯২৪) ঐ একই বাণী—

“তপোভজহৃত আমি মহেন্দ্রের, হে কল্প সরাসী, ।

স্বর্গের চক্রান্ত আমি । আমি কবি বুগে বুগে আমি তব তপোবনে ।”

ফাল্গুনী নাটকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের যে ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে বাণীমুখিত পন্নিগ্রহ করেছে সে প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের মূল নীতির অবতারণা করা আবশ্যিক । ভগবান বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন ছবিটি যেমন রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে বুদ্ধের বাণীর নানা অংশের প্রতিও তেমনি কবির নিরঙ্কুশ প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বুদ্ধদেবের ধর্মশিক্ষার যা মূলগত

(fundamental) নীতি তার সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের তথা কান্তনীর ছনিবার্ষ প্রভেদ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধের চরম নীতি হচ্ছে 'প্রজ্ঞা' বা বৈরাগ্য। এই নীতি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শননীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" কবি 'অলংখ্য বন্ধন মাঝে'-ই মুক্তির স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। কান্তনী নাটকেও এই বাণী-ই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয় প্রজ্ঞা নীতির উদ্ভব দেবার জন্যই যেন কান্তনীর সৃষ্টি। সেই কথাই এখন স্পষ্টাক্ষরে আলোচনা করা হচ্ছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মথাদেব জাতকে প্রজ্ঞার মহিমা যে-ভাবে কীভাবে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের তা মনঃপূত না হওয়াতেই যেন 'কান্তনী' নাটকের সৃষ্টি। জাতকের গল্প আছে—পুরাকালে মথাদেব নামে এক রাজা ছিলেন তিনি কল্পককে (কেশমণ্ডনকারী) বলে রেখেছিলেন : 'সিবস্মিং ফলিতানি পস্‌সয়েসি অথ নে আরোচেস্সাসিত্তি', অর্থাৎ মাথার পলিত কেশ দেখলে তখনই আমাকে জানাবে। কল্পক'ও একদিন রাজাকে তা জানালেন : 'কেসাণং অস্মরে এবং এব ফলিতাং দিস্সাদেবো,' অর্থাৎ আপনার কেশের মধ্যে একটি পক্ষ কেশ দেখা গেছে। তখন রাজা কল্পককে বললেন : তং ফলিতং উদঘরিত্বা পানিং হি ধরোহীতী', অর্থাৎ এই পলিত কেশটিকে তুলে আমার হাতে দাও। অতঃপর রাজা পক্ষকেশ থেকে মৃত্যুর আগমনের বার্তা পেলেন মচ্ছু রাজাণং আগস্তা সমীপে ষিতং', অর্থাৎ মৃত্যু রাজার সমীপস্থ হয়েছে। রাজা মথাদেব তৎকণাৎ পক্ষকেশ হাতে নিয়ে 'তং দিবসং এব বজ্জং পহায় ইসিপক্বজাণং পস্বজ্জিত্তা ' অর্থাৎ সেই দিনই রাজা ত্যাগ করে ঋষি প্রজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

'কান্তনী নাটকের সূচনা অংশের শুরুতে মহারাজ তাঁর মাথার দুগাছি পক্ষকেশের উল্লেখ করে বৈরাগ্য-সাধনের কথা বললেন। মহারাজের বক্তব্য এই যে, পাকা চুলের মাধ্যমে যমরাজ মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, সুতরাং পাকা চুল ছুটি তুলে ফেলে দিলেও কোনও লাভ নেই, কারণ "যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলেখককে তো সরানো যায় না।" রবীন্দ্রনাথের নাটকে মহিষী-ই রাজার পক্ষকেশ তুলতে চাইলেন, পক্ষান্তরে জাতকে রাজা নিজেই কল্পককে দিয়ে পক্ষকেশ তুলিয়ে হাতে নিলেন। যাই হোক, জাতকের কাহিনীতে যেমন, কান্তনীতেও তেমনি রাজা পক্ষ কেশ থেকে মৃত্যুর আগমনের 'নোটিস' পেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রদর্শন বৌদ্ধদর্শনের একেবারে বিপরীত, তাই

কাস্তুনী নাটকে কাস্তুনীর উপলংঘ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটি যেন অব্যবহৃত
আকারেই ফুটে উঠেছে। ‘কাস্তুনী’র রাজ্যও প্রথমে সংসার ভ্যাগের বাসনা
প্রকাশ করেন। কিন্তু নাটকের অন্তিম চরিত্র কবিশেষের এসে রাজ্যের মত
সমূলে বদলে দিলেন। কবিশেষের বললেন : “...এই সাদা ভূমিকার উপরে
আবার নুতন রঙ লাগবে...” মহারাজ এ যৌবন জ্ঞান যদি হল তো হোক না।
আর এক যৌবন-লক্ষী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার
মালা পাতিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।” এই হচ্ছে
কাস্তুনীর বাণী ‘তপোভঙ্গে’র ভাষায় এই বাণী হচ্ছে—

“বন্দী যৌবনের দিন

আবার শৃঙ্খলহীন

বারে বারে বাহিরবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

কিস্রোহী নবীন বীর, স্ববিষের শাসন নাশন,

বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন

তারি সজ্জাবধি।”

বস্তুতঃ, কাস্তুনীতে জীবন যুদ্ধের অনন্ত চক্র অবিশ্রাম গতিতে চলেছে।
এই দিক দিয়ে ‘কাস্তুনী’র বাণীর সঙ্গে ‘বলাকা’র (১৯১৬) বাণীরও পূর্ণ সাহস
লক্ষ্য করা যায়। ‘বলাকা’র সৃষ্টির জন্মমতাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,
সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি অবিশ্রাম গতিতে চলেছে, সে চলার বিরাম
নেই, সমাপ্তি নেই। কাস্তুনী’র বাণী’ও সেই অন্তহীন চলার বাণী—“সংসারে
যে কেবলই সন্ধ্যা কেবলই চলা, তাইই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে
নৃত্য করতে করতে কেবলই সন্ধ্যা, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো
পাণ্ডিত্য, সেই তো কবি বাউলের চেলা।” ‘বলাকা’তে কবি লিখেছেন—

তব নৃত্য মন্দাকিনী

নিত্য কপ্তি ধর

তুলিতেছে তুচি করি

যত্নান্নানে বিশ্বের জীবন।”

‘কাস্তুনী’তেও এই বাণীরই সার্বকতা দেখা যায়। এখানেও যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই
জীবনের গতি অপ্রতিহত আছে। ববীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় “কাস্তুনী
ভিতরের কথাটা অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে
● যুদ্ধের মঞ্চ দিয়েই বারে বারে নতুন করে নিতে হয়।”

প্রসঙ্গক্রমে এ'কথাও বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রদর্শনের প্রায় সবচেয়ে দিকভুলিই ফাল্গুনী নাটকে সার্থক হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমনঃ দুঃখে এড়িয়ে যে মুক্তি বহু ধর্মগুরু পরম কাম্য, রবীন্দ্রদর্শনে তার স্থান নেই—“তোমার হাতের বেদনার দান এড়িয়ে চাহি না মুক্তি।” তিনি চান “ছুখ হবে মোর মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও তুমতি।” ফাল্গুনীর মন্ত্রও তাই—

“মহারাজ এ দুঃখে তো আমরাই বহন করতে পারি।... .. . ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে, ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে। ঐ যে কান্না, ও যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না জ্বলে ওঠে তবে অকর্তব্য হল বলে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি বলে।”

‘শারদোৎসবে’ যেমন ‘ফাল্গুনী’তেও তেমনি মানবজীবনের, আনন্দময় অস্তিত্বেই জয় ঘোষিত হয়েছে। ফাল্গুনী’র সূচনাংশ কবি রাজাকে বলেছেন—
“আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে উঠেছে—সুখে দুঃখে কাজে বিশ্রামে জন্মে মৃত্যুতে, জন্মে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে . এই আনন্দময় ‘আমি আছি’র জয়।” রবীন্দ্র দর্শনের একটি মূল কথা এই বাণীর মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে।

ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নাটক যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র দর্শনের মর্মকথা, বা তাকে যদি তত্ত্ব বলি তাহলে সেই তত্ত্ব, নাট্যবস্ত্র অপেক্ষা কিছু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ এখানে নাটকীয়তা গোপন হয়ে গিয়ে তত্ত্বকথার প্রাধান্যটাই যেন বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু সঙ্গীত ও গীতমাধুর্যে এর নাট্যকৃতির অনেকখানি ক্ষতিপূরণ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ ফাল্গুনীর গানগুলি অপূর্ব। এগুলির মধ্য দিয়ে সমস্ত বস্তু প্রকৃতির আত্মাকে কেন মূর্ত ক’রে তোলা হয়েছে। টমসন সাহেব ফাল্গুনী নাটকের প্রতি অভ্যস্ত বিরূপ, কিন্তু তিনিও লিখেছেন—

“The music is the play in wild-wood music, such as the spirit of bamboo, the spirit of the south wind, the spirit of the flowers might sing if they took human voice”

এ কথা বিশেষভাবে সত্য। ‘ফাল্গুনী’ নাটকে ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে এমন চঞ্চল, এমন মুগ্ধ করে তুলেছে যে গাছপালা, পাখি, সব যেন এখানে জীবন্ত ভূমিকা পেয়েছে।

আর্যভাষায় প্রাগার্য প্রভাব

ড: সুধীর কুমার করণ

প্রাচীন ইরাণী এবং বৈদিকভাষার উৎস একই। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর গভীর সম্পর্ক ছিল। আবেস্তার প্রাচীনতম শ্লোক-গুলিকে, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র ধরে অনায়াসে সংস্কৃত ভাষায় এবং বৈদিক ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। উভয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্ণের মধ্যে অল্পপস্থিত। যার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে—প্রাচীন ইরাণী-ভাষী এবং বৈদিকভাষী জনগোষ্ঠীর আর্যজাতি অনেক পূর্বেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নতুন এক ভাষাগোষ্ঠীরূপে দেখা দিয়েছিল। —ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই প্রাচীন গোষ্ঠীর ভাষাগতসাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে 'হিরণ্য' শব্দের প্রাচীন ইরাণীয় রূপ ছিল জরণা*—যার অর্থ স্বর্ণ। সংস্কৃত ভাষার সেনা অস্থর যজ্ঞ হোতর সোম প্রভৃতি শব্দের আবেস্তীয় রূপ ছিল যথাক্রমে—হয়েনা, অহর, ইয়সন্, জওতর এবং হওম। বৈদিক দেবতা মিত্র এবং বিবস্বত্ (পুত্র) যম—আবেস্তার ভাষায় মিহ্রব(অ) এবং বিবহওস্ত্ (পুত্র) ইয়ইম্।

কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে—আবেস্তার দএব (সংস্কৃত—দেব) শব্দের অর্থ হয়েছে—অপদেব। ইন্দ্র এবং নাসত্য, আবেস্তার অপদেবতা হিসেবে গৃহীত। অস্থর শব্দের অর্থও বিপরীত ধর্মী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের ফলেই এই ধরণের ব্যাপার ঘটেছে।

ইন্দো-ইরাণীয় বর্ণের আর্যভাষা যখন ভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে বিভিন্ন অন-আর্যভাষার অল্পপ্রবেশ-ও ঘটে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে পানিনি এবং অন্ত বৈয়াকরণগণ যখন সংস্কৃতভাষার নিয়ম সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে ভাষার ক্রমরূপান্তর বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তখনও লৌকিক ভাষায় সেই পরিবর্তন অব্যাহত থেকে গেল। বলাবাহুল্য ভাষার

*ভুলনীয় বাংলা শব্দ—জরি (জরিব কাজ)

এই গ্রন্থ বৰ্জনের কবিতার মধ্যেই তাহার প্রাণশক্তি নিহিত থাকে।

ভারতবর্ষের, বিভিন্নসময়ে বিভিন্ন আৰ্যভাষী গোষ্ঠী এসে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সবসময় লড়াই ছিল, তা-ও নয়। বিভিন্নগোষ্ঠীর সংঘাতের কিছু কিছু চিত্র বেদের মধ্যেই আছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তো বার বার আৰ্যজনের সংঘাত ঘটেই ছিল। পরিণামে অনেক অনু-আৰ্যভাষী জনগোষ্ঠী দাসত্ব স্বীকার করে অস্তিত্ব বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। এদের ভাষার অনেক শব্দই শেষ পর্যন্ত আৰ্যভাষার মধ্যে স্থান লাভ করে। এবং অনেক অনু-আৰ্য ভাষা শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। যারা ভাষা ও সংস্কৃতি বন্ধার সচেষ্ট হয়, তারা গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে আৰ্যভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যায়।

বৈদিক আৰ্যগোষ্ঠীর ভাষায়, ভারতীয় প্রাগাৰ্য গোষ্ঠীর ভাষার কিছু কিছু ধ্বনি ও শব্দ গৃহীত হয়েছিল। বেদের মধ্যে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়, কিন্তু তার প্রমাণ আছে। বৈদিক মুখ্য ধ্বনিগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অলভ্য বলে, সহজেই অনুমান করা যায় যে উক্ত ধ্বনিগুলি ভারতীয় ড্রাবিড বর্ণের ভাষা থেকে গৃহীত। ধ্বনিগতভাবে খাটি বৈদিক আৰ্যশব্দ NIZDA-র ক্ষেত্রেও এই ধ্বনি পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে 'নীড়' শব্দের উদ্ভব।

ইন্দো-ইরাণীয় অনেক শব্দই সংস্কৃত ভাষায় ঐবৎ পরিবর্তিত রূপে অবস্থান করলেও তারই পাশাপাশি অনেক সমার্থক অনু-আৰ্যভাষার শব্দও গৃহীত হয়। অশ্বের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় ঘোটক। শুধু পাশাপাশি থাকা নয়, পরবর্তী-কালে ঘোটকই প্রাধান্য লাভ করে। যার ফলে ঘোটক শেষ পর্যন্ত ঘোড়া হলেও অশ্বের কোন রূপান্তর ঘটেনি। বৈদিক 'শ্বন' শব্দের পরিবর্তে প্রাগাৰ্য কুয়কুয় বা কুক্কর শব্দও এইভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—কুয়কুয় বা কুক্কর শব্দ মূলতঃ ধ্বনিসূত্র অনুসারে গঠিত।

একই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি শব্দও পাশাপাশি প্রচলিত—যার একটি আৰ্য অন্তর্গত প্রাগাৰ্য। ব্যাঘ্র-শার্ঙ্গল, মর্জার-বিড়াল ঋক-ভল্লুক প্রভৃতি শব্দগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের প্রথমটি আৰ্যগোষ্ঠীর—দ্বিতীয়টি প্রাগাৰ্য। হস্তীর প্রতিশব্দ গজ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, ইভ, নাগ প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ প্রাগাৰ্য ভাষা থেকেই গৃহীত। মহিষের প্রতিশব্দ হেয়ষ, সৈরিত, কাসর, ল্লাইক্স প্রভৃতি এইভাবে প্রাপ্ত।

প্রাগার্য ভাবার মধ্যে যেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল, সেগুলির পরিচয় অজ্ঞাত বলে অনেক প্রাগার্য শব্দের উৎস আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু সেগুলি যে ইন্দো-ইরানীয় বর্ণের নয়, তা সহজে বলা যায়।

ভারতীয় প্রাগার্য দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিকভাষী গোষ্ঠীর শব্দ এবং ধ্বনি অধিকতর ভাবে ভারতীয় আর্থভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত থাকার সত্ত্বেও ঐ ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দ আর্থভাষায় গৃহীত হয় নি। বৈদিকযুগ থেকেই আর্থভাষায় দ্রাবিড় ও প্রাগার্য ভাবার প্রভাব সূত্র হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষায় অষ্ট্রিক ভাষাবর্ণের যুগারী ও সাঁওতালী ভাষার প্রভাব ও যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছিল। যুগারী ও সাঁওতালীবর্ণের অস্ত্রান্ত্র অষ্ট্রো এশিয়াটিক ভাষায় ভুলনামূলক আলোচনা না হলে ঐ কথা বলা সহজ হবে না,—সংস্কৃত ভাষায় তার প্রভাব কোন্ পথে এসেছিল।

বিশাল অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাবর্ণের মন্থ্মের ভাষার সঙ্গে যুগারী-সাঁওতালীর সম্পর্ক বিষয়ে ধারা স্ববেষণা করেছেন তাঁদের মতে—সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত অনেক প্রাগার্য শব্দের উৎস বহির্ভারতীয়। তাঁদের মতে মাতঙ্গী শব্দটি বহির্ভারতীয় অষ্ট্রো-এশিয়াটিক। শব্দটির অর্থ—হস্তযন্ত্র প্রাণী। মালয়ী ভাষায় মইন্ডঃ শব্দের অর্থও তাই। লবঙ্গ শব্দটি যবদ্বীপীয় ভাষায় লওঃ শব্দের প্রতিরূপ বলেই অনেকের ধারণা।

সংস্কৃত অলানু, উদ্ভুরা, কদলী, কর্পাস, জম্বাল, লাজল, সর্ষপ, মরিচ প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে মালয়ী, খ্মের, শবৎ, হেয়, এবং সাঁওতালী রূপের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকে অনুমান করেন, ঋগ্বেদে প্রাপ্ত ইন্দ্রানি ‘শব্দ্য’ শব্দটি শব্দ হরিণের টোটেম। আর্থভাষায় গৃহীত অসংখ্য অষ্ট্রিক শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে। যথা :—কুকুট, পতঙ্গ, ভিষ, বাতুলি (বাহুড়) পঙ্ক, লঙ্ক, খোঁড়া, কুজ, লিঙ্গ, পুণ্ডরীক, লম্পট, কুঁক, লোল, কদলী, নারিকেল, তাম্বুল, বাতিঙ্গন, অলানু নিষুক, কর্পাস, শাল্মলী, দাড়িম, কোকিল, হল, অর্গভ, শৃঙ্খল, লাজল লগুড় বাণ তীর কনক, মুকুর শৃঙ্খার, কুমুভি পটহ, রাকা, কুঞ্জ ইত্যাদি।*

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল

ত্ৰাবিড় বৰ্গেৰ ভাষাগুলি।^{১০} বৈদিক বৃক্ষ খেজেই ত্ৰাবিড় ভাষা ও ত্ৰাসিঙ্কলভাতা আৰ্হভাষাৰ ও সংস্কৃতিৰ উপৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰতে থাকে। অনেক অহুমান কৰেন,—পুনৰ্জন্মবাদ বেদ-বহিৰ্ভূত ত্ৰাবিড় ধ্যানধাৰণাৰই ফল। অনেকেৰ ধাৰণা পৌৰাণিক দেৱতা শিবও ত্ৰাবিড় দেৱতা হতে পাৰেন। তামিল শিবন্ এবং শেহু শব্দ দুটি এই ধাৰণাৰ পৰিপোষক। শিবন্ শব্দেৰ অৰ্থ লাল এবং শেহু শব্দেৰ অৰ্থ তামাটে। পৌৰাণিক হুহুমান বা হুহুমন্ত তামিল অনুম্ভাতি শব্দজাত বলে মনে হয়। অনুম্ভাতি শব্দটিৰ অৰ্থ হজে পুৰুষ কপি, বৈদিক ভাষাৰ বৃষকপি। লিঙ্গপূজা সৰ্পপূজা প্ৰভৃতি ত্ৰাবিড়দেৱ দান।

প্ৰসঙ্গতঃ উল্লেখ কৰা যেতে পাৰে ঋগ্বেদে প্ৰাপ্ত বেশ কিছু শব্দকেই ত্ৰাবিড়-উৎসজাত বলে পণ্ডিতেৰা অহুমান কৰেছেন। অগ্নি, অৱণি, কপি, কলা, কাণ্ড কুণ্ড, ফল, বিল, নীল, নীহাৰ, পুৰুষ, পুষ্প, বাজি সায়ম্ প্ৰভৃতি শব্দ এই পৰ্যায়ভুক্ত।

ভ্ৰাম্ভণবৃগে প্ৰাপ্ত আড়বৰ, খঁড়, তণ্ডুল, ভিল, মৰ্কট, মল্লী, ত্ৰীহি ও প্ৰভৃতি শব্দ ও ত্ৰাবিড় উৎসজাত। বেদপৰবৰ্তী কাল থেকে পৌৰাণিক কাল পৰ্যন্ত, সংখ্যাহীন ত্ৰাবিড় শব্দ আৰ্হভাষাৰ পৰিগৃহীত হয়েছিল।

০ পৰবৰ্তীকালে আঞ্চলিক উপভাষাতে প্ৰচুৰ সাঁওতালী-মুণ্ডাৰী শব্দ গৃহীত হয়েছে, আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্হভাষাৰ গাংলাভাষাবৰ্ণেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰলে সহজেই তা বোঝা যায়।

১ এই বৰ্গেৰ চাৰটি প্ৰধান ভাষাৰ নাম তেলুগু, তামিল, মালায়লম্ এবং কন্নড়ী। এদেৰ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বৰ্তমান। তামিলে দু'হাজাৰ বছৰেৰ প্ৰাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়। এই বৰ্গেৰ অন্ত কথ্য ভাষাগুলি—টুল্, কুৰ্গ, টোড়া এবং কোটা। পৰাম্, গদবা, গোণ্ডী, কোণ্ডা, কুড়ুল, মালভো প্ৰভৃতি।

আকৰ গ্ৰন্থ :

- ১। The Sansrit Language (T. Burrow)
- ২। O. D. B L (Suniti Kumar Chatterjee)
- ৩। ভাষাৰ ইতিবৃত্ত (স্কুমাৰ সেন)
- ৪। সংস্কৃত ও প্ৰাকৃত ভাষাৰ ক্ৰমবিকাশ (পৰেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ)

কবিতা সম্পর্কিত

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা সম্বন্ধে পাঠক-সমাজের আগ্রহ কী বহু, এ বিষয়ে জেহুন্-বীভুস প্রণীত ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত ও ১৯৬৭ সালে পুনর্মুদ্রিত একটি বইয়ে দেখা যায় যে, একুশ থেকে সত্তর বছরের মধ্যে যাদের বয়স, এককর্ম কুড়িজন পাঠককে জিগোস করা হয়েছিল—‘আপনি কবিতা পড়েন কি?’ এবং এই সত্তর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক, কারখানাকর্মী, চিকিৎসক, পেশাদার গায়ক-বাদক, চাষবাসের সহায়ক ডিনজন, কেরাণী কয়েকজন, কয়েকজন দোকানকর্মচারী,— এঁদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, তাঁরা কখনোই কবিতা পড়েন না! বাকি ছ’জনের মধ্যে একজন বলেছিলেন, তিনি সবসময়েই কবিতা পড়ে থাকেন,— অন্ত্যস্ত বিনোদনের চেয়ে কবিতাই তাঁর নব্বাধিক প্রিয় বিনোদন। একজন বলেন যে, সমসাময়িক পত্রিকা ও সকল প্রভৃতি থেকেই তিনি মাঝে মাঝে কবিতা পড়েন; চারজন বলেন যে, বছরে হয়তো একখানা কবিতার বই তাঁরা ছুঁয়ে থাকেন। অধিকাংশই কবিতার প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তবে ছ’তিন জন বলেছিলেন কবিতা মানেই ভুবিমাল এবং তাঁদের সকলকেই কবিতার-খুবই বিরোধী বলে মনে হয়েছিল। অবশিষ্ট ঠাৱা, কবিতার বিরুদ্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো মন্তব্য ব্যক্ত হয়নি, তবে কবিতার ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহও ছিল না।

এই অভিজ্ঞতা থেকে লেখক সন্মাসয়ি বলেছিলেন যে, তাঁর ধারণা এই দাঁড়িয়েছিল যে, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জনই কবিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। বাকি শতকরা কুড়িজনের জীবনে কবিতা না হলেও চলে। অবশিষ্ট দশজনের মধ্যে মাত্র একজনই কবিতার রসিক; কবিতার কিছু যে দাম আছে, সে কথা ঐ একশ’র মধ্যে একজনই বিশ্বাস করেন।

আমাদের সমসাময়িক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক এতোটা শোচনীয় মনে করতে কষ্ট হয়, কিন্তু একুশ থেকে সত্তর,—পাঠক সমাজের এই বয়ঃসীমা মেনে, নমুনা-জরীপের কাজে নামলে অবস্থা আরও শোচনীয় মনে হবে বলে

আশঙ্ক্য হয়। এদেশে স্বাক্ষরের হার—অর্থাৎ বার্ষিক শুধু লিখতে পড়তে পারেন, তাঁরা একশ-তে পঁয়তাল্লিশের বেশি হবেন কি? যিনি স্বাক্ষর, তিনিই শিক্ষিত,—একথা কিছুতেই বলা চলে না। আমাদের বিরলসংখ্যক আত্মসাহিত্য-পাঠকদের মধ্যে কবিতার গুণগ্রাহী হয়তো দুশ'র মধ্যে একজন,—হয়তো আরও কম!

তবু ষ্টলে ষ্টলে কবিতা-পত্রিকা কলকাতাতে তো বটেই, মকঃমলেও বেশ কিছু দেখা দিচ্ছে। দেখা দিয়েই লুপ্ত হচ্ছে এরকম পত্রিকাও অনেক। এই প্রকাশোচ্ছ্বাস ও মৃত্যুহার যে কৈশোরের বৈসংগিক লক্ষণ, তাতে সন্দেহ কোথায়?

এবং এতদসত্ত্বেও আমরা যে কবিতাপ্রিয় জাতি, একথা অস্বীকার করার স্থান নেই।

যা সমসাময়িক, তা নিঃসন্দেহে, নির্বিচারে চিরস্থায়ী নয়। যা বর্তমান, সেটাই সর্বাধিক মনে করা আমাদের মানবিক দুর্বলতা মাত্র। ফসল বেশি ফলা খুব একটা প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস বটে, কিন্তু বেশি ফলনে ফলের গুণগত হ্রাস ঘটে থাকে কি না, সেটাও বিচার্য। গাছ বাঁচাতে হলে আগাছা হ্রাস করা দরকার। সেও স্বীকার্য। অন্তত গুণের দিকে নজর রেখে, লেখককে আত্মপ্রকাশের ভাগিদার মানতে হয়। পাঠক উদাসীন বা বিষ্মত হয়ে গেলে রচনা পড়বেন কে?

কবিতা নিজেই এ চিন্তা উপেক্ষা করছেন বলে কেউ কেউ অহুযোগ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা 'আধুনিক কবিতা' বুঝতে পারেন না। কবিদের মধ্যে যারা এসব অহুযোগে কান দিতে নারাজ, তাঁরা হয় নিকন্তর থাকেন, না হয় বলেন—পাঠক প্রস্তুত নন বড়ো বড়ো পত্রিকায় (বহুপ্রচার-ময়) যেসব কবি লেখা ছাপা হয় তাঁরা কখনো কখনো নিজেদের ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে মাঝারি বা তুচ্ছ রচনাও পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বড় বড় টাইপে ছাপা হবার সৌভাগ্য অর্জন করে যশস্বী হয়ে ওঠেন। শিক্ষিত দুশ' পাঠকের মধ্যে মাত্র একজন যে কালে যথার্থ কবিতা-রসিক, সেকালে, সেদেশে এরকম প্রচার ভাগ্য না ঘটাই অস্বাভাবিক। অতএব অপ্রকাশের যন্ত্রণার প্রতিদ্বন্দ্বী অল্প কবিতা নিজেদের ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গড়ে তুলে কণস্থাপন এবং বিরল ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা চালিয়ে থাকেন। কিন্তু পাঠককে যথার্থ

ভাল কবিতার গ্রাহিকা-শক্তিতে উদ্বোধিত করবার আয়োজন কেউ করেন না। যারা এ কাজ করতে পারেন, তাঁরা বিবেকী সম্পাদক বা অন্য কোনো সমর্থকের কাছে অগ্রমাত্র উৎসাহ পান না বলেই চূপ হয়ে যান।

বাংলা কবিতার আসর এখন যদিচ পরস্পর-বিজ্ঞিন্ন নানা দলে উপদলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবু তার গুণগোঁষ যে একেবারে কিছুই নেই, এরকম ধারণা ঠিক নয়। ‘একক’, ‘ঋণদী’, ‘লা-পোয়েজি’, ‘জীবনানন্দ’, ‘গদ্যজী’, ‘অনুদিন’, ‘শতভিষা’, ‘সমসাময়িক’ প্রভৃতি পত্রিকা প্রধানত কবিতা পত্রিকা। আরো কয়েকটি পত্রিকা আছে যেগুলির নাম ঠিক এই মুহূর্তে অনে আসছে না বলে এই সারিতে উল্লেখ করা গেল না। সত্যের দশকের গল্প লেখকদের মতো পৃথক কবিদলও আছেন। তাঁদেরও আলাদা পত্রিকা আছে—একাধিক। দশক-ওয়ারি বিভাগ চিন্তা চলছে। ভিন্ন ভিন্ন দশকের অনেক কবি আছেন যারা সকলেই ‘আধুনিক কবি’ নামে চিহ্নিত।

এই দশক বিভাগে কবিগোষ্ঠীর চিন্তা মোটেই সংগত নয়। এবং ‘আধুনিক কবিতা’ নামটিও বিকল্পিতকর। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, বিনোদ বেরা, কবিতা সিংহ, অরুণকুমার সরকার, শিবাজী গুপ্ত—এঁরা সকলেই তো সাম্প্রতিক কবি, এঁদের প্রত্যেককেই কি একই প্রকৃতির আধুনিক কবিতার লেখক বলতে পারি? ‘আধুনিকতা’ ঠিক সময়ের চিহ্ন শুধু? ‘আধুনিকতা’ যে মেজাজ বা মনোভাবের বিশেষ প্রকৃতি, সেও স্বীকার্য বটে, কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় শু সময়ের সেনগুপ্তের কবিত্বের পার্থক্য ধরতে হলে কোন্ কোন্ লক্ষণে প্রভেদ চিহ্নিত হবে? ‘আধুনিক’ কথাটা এ-অর্থে সত্যিকার ধর্তব্য কোনো প্রভেদবাচক শব্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ কি আজও ‘আধুনিক’ নন?

বোদলের, রিলকে প্রভৃতি বিদেশী কবিদের কথা তুলে নবীন কবিতা আজকাল ঐসব কবির অনুকরণ চেষ্টা করে থাকেন যাকে যাকে,—যেমন, তিরিশের দশকেই বাংলা-কবিতার আসরে টি এস এলিয়টের কথা উঠেছিল এবং পরে অনেকদিন তা চলছে। এলিয়ট আমাদের বিকৃত দে, স্বীকৃতি, জীবনানন্দের যথো কী পরিমাণে ধ্বনিত, সে বিষয়ে অনুসন্ধান হয়েছে কিছু কিছু, কিন্তু বাংলা-কবিতার এলিয়ট-ভরজ যখন আজকের মতো কী হয়ে যায়নি তখনো যেমন, এখনো তেরনি বাংলায় নবীন কবিত্বের পথ-সন্ধান চলছেই প্রবীণরাও সকলে নিঃশেষিত হবার। অমির চক্রবর্তী হঠাৎ ‘আহা পি’পড়ে

ছোটো পিঁপড়ে'-র মতো কিংবা 'সার্কাস'-এর মতো বিস্ময়কর কবিতা লিখবেন না বলা হঠকারী প্রসঙ্গ তরুণের পক্ষেই সম্ভব। বুদ্ধদেব কই এতটা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগ্রহভর আধুনিক কবি থাকবার চেষ্টা করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি তাঁর হিন্দুতান পার্কেও বাড়িতে বলে কথা হচ্ছিল। কথায়-কথায় বুদ্ধদেবের 'মহাত্মারত্নের কথা'র কথা উঠতে তিনি বললেন, 'এই বইয়ে তাঁর যথার্থ পরিণতির চিহ্ন আছে।' সেই মহাত্মারত্নের প্রসঙ্গই বুদ্ধদেবের কবি মনকে তাঁর পরিণত করলে নানাতাবে নাড়া দিয়েছিল যেমন ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা পড়ে এবং পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে ঋষাঙ্গ-কাহিনী পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। ফলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটক দেখা দেয়। কেউ কি বলবেন যেহেতু এই ঘটনার মূলে এলিয়ট বা বোদলেয়ার ছিলেন না, অতএব এতকাজে বুদ্ধদেব আধুনিক?

রোমনরুপণী, তুমি কেন কাঁদো? অশ্রু কেন পদ্ম হয়ে কোটে?

কেন তার হিরণ্ময় অভিযান দিগন্তেও হয় না বিলীন?

বুদ্ধদেবের 'রোমনরুপণী' কবিতার (১২৬৪) এই দু'ছন্দ কবিতার শব্দ, অর্থ, ছন্দ, উপমা ও রূপকচিন্তা কি তথাকথিত 'আধুনিক'দের মতে সেকেন্দ্রে ব্যাপার?

না, 'আধুনিক' কথাটাই বিভ্রান্তিকর। সম্প্রতি পি. ই এন্। কলকাতা শাখা)-এর এক কবি-সভায় আমি বলেছি, বাংলা কবিতার ধারার মধ্যে পূর্ব-পূর্বসূর চিহ্নিত করতে হলে বরং 'তরঙ্গ' শব্দটা ব্যবহার করা ভাল। যেমন বলতে পারি, রবীন্দ্র তরঙ্গের বিস্তারের মধ্যেই সত্যেন্দ্র-তরঙ্গ, নজরুল তরঙ্গ, জীবনানন্দ-তরঙ্গ ঘটে গেছে। অথবা, কবিতার ছবোচ্চা-তরঙ্গের পরে এসেছে মা-মুশি বাচালতার তরঙ্গ!

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

(শ্রেষ্ঠ কবিতা)

মুগ্ধহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে

মেনকা নদীর ঘাট গেরিয়ে

সৈয়দ মুক্তাঝা সিরাজ

মেনকা নদীর ওপর সবে সূর্য উঠেছে। শরৎকাল। ঘাটে সবুজ শস্তের পাতায় সাবান্নাতের শিশির ঝলমল করে উঠেছে। সেই সময় লোকটা এল। খেয়াঘাটে নৌকোর চেপে এপায়ে এসে একটা চায়ের দোকানে বসল। তার পরে হাফা নীল শার্ট আর খয়েরি পাতলুন, পায়ে ছেঁড়া চম্পল কাঁধে একটা বাগ। লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দেখে বোকা যায়, রাতে ঘুমোয় নি। চোখ দুটো টকটকে লাল। এক চিলতে গৌফ আছে চোঁটের ওপর, তাতে একটা ক্রুরতার আভাষ আছে। দাড়ি গত দু'দিনটে দিন সম্ভবত কামায় নি। সে ভারি গলায় চায়ের হুকুম দিল। তারপর একটা সিগ্রেট জ্বালল।

মেনকানদীর ঘাটে এই ছোট্ট বাজারটা সবে গড়ে উঠেছে। বাজার পিচ পড়ার পর লোকেরা অনেক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। হুবেলা একটা বাসও যাচ্ছে আসছে দুয়ের শহর থেকে। গ্রামের নাম হরিণমারা—বাজারের পিছনে কয়েক একর জমির ওধারে। মাঝারি গ্রাম কিছু ভয়লোক আছে। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিছু ছেলে ফুটবল ক্রিকেটও খেলে। তাদের খেলার মাঠ আছে। একটা পাঠাগারও সবে গড়ে উঠেছে। তবে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বড় জোর জনা বারো।

লোকটা চুপচাপ চা খাওয়ার পরই উঠে পড়ল। তারপর চলে গেল। তখন চাঙী খগেন বসল—কেউ চিনতে পারলে? মধুবাসুর সেই জামাই।

চায়ের দোকানে ভিড় সবে জমছে। কেউ গায়ের লোক, কেউ বাইরের ব্যাপারী বা মামলাবাজ। বাসের আশায় বসে আছে। খগেনের কথায় হু-একজন গা করল। বাকিরা অগ্র আলোচনায় মেতে বইল।

খগেন অমুট স্বরে স্বগত বলল—শালা খুনে আবার এদিকে কেন? কমা ভিকে করতে নাকি?

সহিম ব্যাপারী এতক্ষণে কান করল। —আরে তাই তো! মধুবাসুর জামাই বলেই মনে হল। এতক্ষণ খ্যাল কবি নি। আবার কেন এল ব্যাটা?

খগেন দাঁত বের করে অৰ্ধাং হেলে বলল—নিৰ্ৰাং আবার কার হুকে ছুঁই
বসাবে—তুমি দেখে নিও।

আদালত সেখ মাঠে যাবার পথে শিশির শুকোবার অপেক্ষায় এবং অভ্যাসে
চা খেতে বসেছে। সে বলল—মধুবাবুর মেরেকে খুন করেছিল কেন হে
খগেন দা ?

খগেন বিরক্ত হয়ে বলল—তাও শোননি ? তুমি বড়, শ্রাকা হে আদালত !

হলুদ দাঁতে হেলে আদালত বলল—মাইরি না খোদার কসর।

—তবে সাক্ষী দিয়েছিলে যে !

—মধুবাবু বলেছিল, তাই। আমি দাদা সাত পাঁচ কিছু জানতাম না।

রহিম ব্যাপারী তামাসা করে বলল—সেজন্তেই তো ওর সাজা হল না।
বিলকুল খালাস দিলে জজলায়েব। বাবা, ধর্মের কল বাতালে নড়ে !

আদালত বলল—কিন্তুক তাহলে খুনটা করল কে ?

খগেন রেগে বলল—অত হই হই কাণ্ডের পরও এখনও বলবে খুনটা
করল কে ? তুমি বড় শ্রাকামি করো হে আদালত। এখনও তো বছর
পেয়ার নি। রাগ করোনা। এজন্তেই বলে চাষা !

চারীকে চাষা বলে রেগে যাওয়ার ব্যাপার ঘটে। ‘চাষা’ কথাটা
গাল। ‘চারী’ই ভদ্রতা ও সৌজন্যমূলক শব্দ। দিল্লি থেকে কলকাতা—
সবখানে শিক্ষিত মানুষ চারীভাই বলে থাকেন। তাই বলার কারণ অবশ্য
হুজের। আদালত কিন্তু চাষা শুনেও রাগবার মানুষ নয়। সে তার বিশাল
হলুদ দাঁত আবার বের করে দিয়ে শুকনো অট্টহাসি হেলে বলল—তা যা
বলেছ দাদা !

এইসব কথাবার্তা যখন ঘাটে চলেছে, তখন লোকটা অৰ্ধাং মধুবাবুর
জামাই হরিণমারায় ঢুকছে। ছ’পাশে কয়েকপ্রকার শস্ত এবং মধ্যে কাঁচা
হাত্তা। কিছু কাদা আছে কোথাও। দুধারে ফগিমনসা আর নিশিন্দা ঝোপ।
সেখানে কিকে সবুজ বাশপাতার মতো পাখি বসে আছে। প্রজাপতিরা
ভানা থেকে শিশির শুকিয়ে নিচ্ছে। সারাবাতের শিশিরে মাকড়সাদের জাল
ভিজে চবচবে হয়ে উঠেছিল, তাতে অনেক পোকা আটকে রয়েছে এবং
মাকড়সারা জলজলে চোখে অপেক্ষা করছে, সূখার্ত। হাত্তার আর কোন লোক
নেই। নির্জন দেখাচ্ছে গ্রামটা। এখনও বাতের কুরাসার নিঃস্রুয় ঘোর
কাটেনি। উঁচু তালগাছের মাথায় ঘোষ পড়ে প্রাণিত একটি দিনকে প্রকাশ

করছে পৃথিবীতে। লোকটা গ্রামে ঢুকল। কোনদিকে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, পুকুরঘাট অথবা গোয়ালঘর থেকে গ্রামীণ বধু ও কস্তারী তার দিকে নিশ্চলক তাকিয়ে রয়েছে। কে কিসকিস করে বলতে উঠেছে—এই লোকটাই তো ? শৈফালিকে খুন করেছিল !

তখন মধুবাবু পণ্ডিতমশাই তাঁর আটচালার বসে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। একদফা ছেলেমেয়ে বেঁচামেঁচি করে পড়ছে। ছাত্রা জমে আছে রাস্তা ও আটচালার সামনে ঝাঁক জমিটার। কয়েকটা কাক একটা মরা নেংটি ইঁদুর নিয়ে বগড়া করছে। কাছাকাছি মুসলমান পাড়ার এক প্রকাণ্ড মোরগ কীভাবে চলে এসেছে এবং মাঝেমাঝে ডেকে উঠছে। একটা নেড়ি কুস্তা রাস্তার ঘুলোর বগে লেজের কাছে কামড়াচ্ছিল। হঠাৎ ঘেউঘেউ করে মোরগটাকে তাড়া করে নিজেদের পাড়ার পাড়িয়ে দিল। কিন্তু লোকটাকে দেখে সে লেজ নাড়তে থাকল। লোকটা দাঁড়িয়ে গেছে। আটচালার দিকে তাকিয়ে আছে।

মধুবাবুর চোখে পুকু লেজের চলমা। কিন্তু একটু দূরে কিছু দেখতে পান না। তিনি হাক রাজবংশীর যোগা ছেলেটাকে যোগ শেখাচ্ছেন। পাঁচ—পাঁচ আর সাত হ্যাঁ, আড়লের দ্বিগুণে গোন। পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ.....

এইসময় তাঁর ছোট মেয়ে অঞ্জলি দৌড়ে এসে বলল—বাবা, বাবা ! শোন।

মধুবাবু মুখ তুলে বললেন—এ্যা ?

অঞ্জলি চাপা গলায় বলল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু। ওই জ্বাখো, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন !

মধুবাবু আনমনে বললেন—তা আমি কী করব ? নাচব নাকি ? এসেছে এসেছে।

—আঃ ! কী মাথাবুঝে বলছ ! যাও, ডেকে নিয়ে এসো।

—তুই ডাক গে না। আমি পারব না। হ্যাঁ, ছয় - সাত—আট—নয়...

• অঞ্জলির বয়েল সন্তের-আঠারো। শ্রামবর্ণ, হাঙ্কা গড়ন। ভিমাণো মুখ। একমাথা বিশাল চুল। তার চুল ঘুলে পিঠে নামল। কোমর অঙ্গি চুলতে লাগল। সে হাঁফাতে হাঁফাতে ঝোঁড়ে গিয়ে বলল—জামাইবাবু ! এসেছেন ! আহুন—আহুন !

লোকটা ভুক কুঁচকে একটু হাসল। —অঞ্জলি, কেমন আছ ?

—কালো ! কাকি সান্নান না ! এখানে কিছিরে কেন ?

—হঁ। যাবো। চলো।

লোকটা অক্লির পিছনে এগোল। অক্লি ঘোঁড়ে কাকি তুলল। কঁচিরে বলল—মা, মা ! জাখ কে এসেছে ! জামাইবাবু এসেছেন, মা !

মধুবাবুর স্ত্রী হাঁসের দরমার সামনে খুঁকে ডিম খুঁজছিলেন। ককতকে উঠোনে সুর কিংক হলুধ হোদ পড়েছে। শিউলিতলা ফুলে সাদা ফুলে জ্বাছে। জবা গাছে টকটকে লাল ফুল ফুটেছে। কুরোর ধারে একবাশ বাসন হাড়িকুড়ি মাজতে বলেছে শৈল ঝি। কাক আর চুড়ই তাকে জালাচ্ছে। তার হাতের ঘামাজার শবটো খামল। তার চোখে পলক পড়ছিল না। আর মধুবাবুর স্ত্রী পিছন ঘুরে জামাইকে দেখেই ঘোমটা একটু টানলেন। তার কাঁচাপাকা চুলের একটা গোছা গালের ওপর দ্বিড়ে বুকে নামল। একব'র দেখেই মুখ কিরিয়ে নিলেন। কিছু বললেন না।

অক্লি লোকটাকে ব্যস্তভাব বলল আসুন। এ ঘরে আসুন।

বাড়ির পুবে বাশবন। ওপাশেই অক্লির ঘর। ওঘরেই ছ'মাস আগে এক রাতে বাসর সাজানো হয়েছিল। দিদি শেফালি আর এই লোকটাকে এক বিছানায় শোয়ানো হয়েছিল। এটাই পৃথিবীতে মাহুস যেনে নিয়েছে। এবং সেই রাতেই সকালে সবাই আবক র করেছিল, শেফালির গলাটা কাটা। রক্তে বাসর ভেসে গেছে। আর এই লোকটা ঘরে নেই। পুবেই দরজাটা হাট করে খোলা।

অক্লি ও ঘরে একা শুতে পারত না। কিন্তু আন্তে আন্তে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আর ভয় পায় না। তাছাড়া আর শোবেই বা কোথায়—আইবুড়ো সোমন্ত মেয়ে ! সে শহরের কলেজে পড়ে। আগের বছর শহরে আত্মীয় বাড়ি থেকে পড়াশুনা করত। রাস্তায় বাস আসার পর এখন বাড়ি থেকে রোজ যাতায়াত করে।

লোকটা নিশায়ে সেই ঘরে ঢুকল। সেই খাট ! খাটটার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর দেয়ালগুলো দেখল। শেফালি বেশি লেখাপড়া শেখার স্বযোগ পায়নি। দেয়ালে তার হাতের শিল্পকলা বাধানো রয়েছে অনেকগুলো। 'পতি পরম গুরু' ইত্যাদি বাক্যসম্বিত পুন্পিত ও বর্ণাঢ্য সেই শিল্প। একটা হলুধ হরিণ। একটা পদ্মফুল। তাজমহল। ঘেবী দুর্গার মুখ। এইসব।

—বলুন। অঞ্জলি প্রায় নিশ্বাস কয়ে বলল।

লোকটা কোণের একটা হাতলভাড়া চেয়ারে বসল। আবার ঘরের ভিতরটা দেখতে থাকল।

অঞ্জলি আঙে আঙে বলল—বাবা আপনাকে নিজেই চিঠি লিখতেন। কিন্তু বাবার মনে—এমন কি মায়েরও, হোনামনা ভাবটা যায়নি। আশা করি, তা টের পেলেন। হ্যাঁ। এখনও ঠাা বিশ্বাস করতে পারছেন না। দিদির নিজের হাতে লেখা চিঠি—তবু কেন জানিনা, ঠাের এত অবিশ্বাস। অথচ...

লোকটা তাকাল তার দিকে।

—অথচ, আমি তো আগাগোড়া জানতাম! দিদির একটা সাংঘাতিক বিপদ হবে, আমি ঠিক জানতাম। জানেন দিদির চিঠিটা ওই কলুজিতে চন্দনকাঠের বাকসোতে আমিই কিছুদিন আগে আবিষ্কার করলুম। তারপর সব জল হয়ে গেল। বুঝলাম—আপনাকে মিছিমিছি আমরা কষ্ট দিয়েছি।

অঞ্জলি একটু কাঁদে। তারপর সামলে নিয়ে আবার বলে—চিঠিটা আপনাকে দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কতগুলো ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। সে রাতে কীভাবে দিদিকে খুন করল ও? আপনি কি বেরিয়েছিলেন কোনসময়? কেন বেরিয়েছিলেন?

লোকটা একটু হাসে। এতক্ষণে মুখ খোলো। নদীর ধারে গিয়েছিলাম। ভীষণ গরম লাগছিল, তাই।

—মিথ্যা। বিশ্বাস করি না। দিদি নিশ্চয় আপনাকে অপমান করেছিল।

—ঐ?

—বলুন।

—হঁ। শেখালি আমাকে.....নাঃ, আমিই জানতে পেরেছিলাম, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। বোকা মেয়ে! রক্তনের সঙ্গে যে ওর রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে আছে—শেষ মুহুর্তেও বাড়িতে জানালে পাৱত। কী বোকা! দু-ছুবায় তো বিয়ে করা যায় না। অথচ কিছুতেই বলেনি কাকেও!

—দিদি বরাবর অমনি বোকা ছিল। ওর একটা স্তম্ভর দেহ ছাড়া আর কিছু তো ছিল না।

একটু চুপ থাকার পর অঞ্জলি আবার বলে—আসলে গ্রামের মেয়ে। বাইরে ততটা বেশিনি কারও সঙ্গে। রেজিস্ট্রি বিয়েটা ওর কাছে বিয়েই ছিল না। রক্তনা এ বাড়ি আসত। কিন্তু কবে যে এতদূর গড়িয়েছে, কেউ

টের পারনি। সেবার দ্বিহা হঠাৎ শহরে আমাদের আত্মীয়বাড়ি—হায়ে হায়েব
হুগলস্পর্কের বোনের স্বামী—আমি যে বাড়ি থেকে কলেজে পড়তাম—দ্বিহা
বেড়াতে গেল। আমি সব মূল ফাইনাল দিয়েছি। ওর সঙ্গে গেলাম।
তারপর কোন ঠিকানা দিদি উঠাও। পরে ফিরল। কিন্তু কেমন অল্প বেয়ে।
অত যোঝবার কয়টা তখন ছিল না। টের পাইনি যে ওদের রেজিস্ট্রেশন
হয়েছে।

লোকটা আস্তে বলে—এখনও সব অবিস্মৃত লাগে।

—আমারও। বিয়ের দিনও যদি আমাকে অন্তত জানাত যে তার
চুবার বিয়ে হতে যাচ্ছে!

—বিয়ের পর এবারে আমাকে জানাল। তীব্র কঁদছিল। পা ধরে
কমা চাইছিল। আর.....

—আর?

—আর বলেছিল আমাকে চলে যেতে—যেন না ফিরি। আমি তাই
চলে গিয়েছিলাম। মদীর ধারে গিয়ে হঠাৎ টের পেলুম—খালি পায়ে শুধু
গেজি গায়ে বেরিয়ে এসেছি। তাবতে অনেক সময় লাগল। নাঃ, জামা
জুতোটা নিয়ে আসা উচিত গেলাম। দরজা খোলাই ছিল কিন্তু ঘর
অন্ধকার। বাড়ির সবাই তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেশলাই জ্বাললাম!
দেখলাম বস্তু।

—কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কেন বস্তু দাওকে খুন করল?

—সে এখন কোথায়, অজ্ঞান?

—বাইরে কোথায় নাকি চাকরি করে। ওদের বাড়ির কেউ বলে না—
বলতে চায় না।

—তোমার বাবা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা খোজ নেন নি?

—নিয়েছেন। সব সত্যি। কিন্তু ওর বা হায়েব দোনাযনাটা কাটছে না
এখনও। হয়তো তাবছেন, ওই ব্যাপারটা টের পেয়েই তুমি দ্বিহাকে.....

সে থিক্‌থিক্‌ করে হাসল। —হ্যাঁ, তা তো অসম্ভব ছিল না।

—কিন্তু বস্তুদা দ্বিহাকে খুন করল কেন?

—আমি কেমন করে জানব? তোমার চিঠি পেয়ে তাবলাম—তুমি
তা বলতেই ডেকেছ।

—আমি ভেবেছিলাম, আশনিই বলতে পারবেন।

—আমি জানি না ।

—দ্বিধি এত বোকা ধরে ছিল ! ...অঞ্জলি আবার কঁাদে । চুপিচুপি ।

শরভের নূর্য উঠোনে মুঠোমুঠো উজ্জল বোধ ছড়াজে । শৈল কি ককককে তৈজসপত্র রাগাধরের বারান্দায় জল চৌরাতে উপুড় করে রেখেছে । মধুবাবু পড়ানো শেষ করে ঘরে ঢুকে বাটিভরা মুড়ি নিয়ে চুপচাপ জলযোগ করছেন । অঞ্জলির মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কিছু বলছেন হয়তো লোকটা সম্পর্কে । উঠোনের ধারে পাঁচিলে একটা দাঁড়কাক বসে আছে—বিষম । চড়ুইগুলো উঠোনে নেমেছে । দূবে কোথায় ঢিল ডেকে উঠল । প্রকৃতির ছন্দে কোথাও বাধা নেই । কোন তাল কাটছে না । নীল আকাশে হাঙ্কা সাদা মেঘও পথ ভোলে না । মেনকা নদীর ধারে বাসের ভেঁপু বাজল ।

এখানে এক পরিভ্রান্ত বাসরে দুজন তন্ময় হয়ে কথা বলছে—একদিন যে বেঁচে ছিল, তার কথা ।

—কিন্তু কেন বঙ্গনদা খুন করবে ? সে তো সোজা এসে বলতে পারত—শেফালি আমার স্ত্রী ! অঞ্জলি তীব্র কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে । ...অথচ সে এল না । সেদিন নাকি সে গ্রামেই ছিল না ।

লোকটা হাসে । —কায়স্থের ছেলে । বামুনের মেয়ে । এই অজ পাড়া-গায়ে তার অমন সাহস কোথায় ?

—কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে তার সাহস হল !

—সেটাই অবাক লাগছে !

—আপনি জানেন ? দ্বিধি অন্তস্বা ছিল ?

—হ্যাঁ, পোটমটের রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম ।

—আমার কেমন হৈয়ালি লাগে !

—অঃক্সা অঞ্জলি, সেবাতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

—বারান্দায় তক্তাপোষে । নিচে শৈল ছিল । তক্তাপোষে আমার পাশে ছিল পিসতুতো ভাইবোন স্বপন আর কাজল । বাবা ছিলেন বাইরে আটচালায় । গ্রীষ্মের রাত তখন । পিলিমা মা আর সবাই ঘরে ছিলেন । পিলেমশাইরা উঠোনে সভরকি বিছিয়ে গুয়েছিলেন ।অঞ্জলি সেই রাতটা যেন চোখের সামনে আনতে থাকে । ...আমার ঠিক যুঁষ নয়—তদ্রূপে এসেছিল । তারপর...

—তারপর ?

—তারপর মনে হল এবারে একটা ধসাত্মকতা চলেছে।^১ দ্বিবিব কেমন চাপা আওয়াজও পেলাম। মনে মনে হাসলাম। দুইটা কেটে গেল।

—তারপর ?

—আর হয় এল না। কিন্তু.....হঠাৎ চমকে উঠল অঞ্জলি।

—কী হল ?

—কিন্তু.....

—কী ?

—দ্বিবি বোবার ধরা গলায় শেনবার একটা কথা বলে উঠেছিল !

—কী কথা অঞ্জলি ?

—‘বাবা, বাবা !’

—বাবা ! আশ্চর্য !

—হ্যাঁ। মনে পড়ছে। স্পষ্ট মনে পড়ছে। আর.....

—আর ?

—আর যখন বাবা দৌড়ে এলেন সকালে—ঘরের দরজায় আমরা ধাক্কা দিচ্ছিলাম—কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না—তখন . . .

—বলো অঞ্জলি।

—তখন বাবার ধুতিতে কয়েক জারগায় রক্ত ছিল !

লোকটা হাসে। তারপর বলে—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়েছিল।

অঞ্জলি হু হু করে কাঁদতে থাকে।

মেনকানদীর ঘাটে সন্ধ্যা—সূর্য চলেছে পশ্চিমের দিগন্তে। নীলনীল কুয়াসা জমেছে নদীর জলে, সবুজ শস্তে ও গাছশালায়। মাকড়সারা জাল বুনেতে শুরু করেছে বিকেল থেকে। প্রজাপতিগুলো আড়াল খুঁজছে। পাখিরা বাস্তু, চকল—সবার বিশ্রামের সময়। ঘাটের ভিড় আবার জমেছে। খগেন চাওলা দেখল, লোকটা ফিরে এল। এসে বলল তার বেকে। বলল—একটা চা।

স্বস্তরবাড়ি ছিল নাকি এতকণ ? আবার কাকেও খুন করে এল না তো ? নদীতে চোখে ডাকার খগেন। তারপর বলে—মশায়ের আসা হচ্ছে কি হৃদয়মারা থেকে ?

লোকটা মাথা নাড়ে।

—বশাই বধুবাবু জামাই বটে তো ?

সে মাথা দোলায় ।

খগেন তার ভাবসাব দেখে আর ঘাঁটাতে সাহস পায় না । চা খেয়ে সে গুঠে । খেরানৌকোর চাপে । তারপর ওপায়ে চলে যায় । তখন খগেন বলে—চিনতে পারলে তো সব ? সেট খুনে জামাই । ভিড় চমকে গিয়ে তাকায় । দেখে লোকটা ধীরে অশ্রু ওপায়ে বঁচা ব্যস্ত চলেছে । সন্ধ্যার ধূসরতা তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে । এই দেখে মনে হয়, তার এ যাওয়ারই শেষ যাত্রা । আর কোনদিন আসবে না হরিণমায়ায় ।

মেনকানদীর ঘাটে বাতের আলো জলে গুঠে । প্রকৃতির বহুতা ধায়ার মতো মেনকা যত্নকারে ছলছল শব্দ তুলে দুয়ের সাগরে যায় । নির্বিকার সে ।



লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সুধীর কুমান নন্দী

ভারতবর্ষে উনিশ শতকী নবজাগরণের মূলমন্ত্র হ'ল পশ্চিমী মানবতাবাদ । শুধু ওয়া ভারতীয় ক্রিষ্টজের অচলায়তন যে সংস্কার সৃষ্টি করেছিল প্রায় দু'শতাব্দির বছর ধরে তার মূলে কৃষ্ণায়তন কল নবা ভারতের যোগসীল । এই নব অভ্যুত্থানের প্রাথমিক লক্ষণ হ'ল অ'ধীন ১৮৫৭, বহু মতবাদিতা । যাত্রাবের হুক্তি যাকে গ্রহণ করবে তাকেই সত্য মূল্য দিতে হ'বে । এ হল হিউ-মানিজমের গোড়ার কথা । ভারতীয় যোগসীলের চাতালে যখন হিউমানিজমের এই মন্ত্রটি বারবার খণ্ডিত হচ্ছিল যাত্রাবের ক্রিষ্টজ পরায়ণতার জন্ত, যখন হুক্তিবুদ্ধি বারবার লজ্জিত হচ্ছিল সংস্কার পূজার জন্ত তখন ঘটল বৈজ্ঞানিকের আ বর্তন । যে স্বাধীনচিন্তার বীজমন্ত্র রাজা রায়মোহন এবং ভিক্টোরিও নবা বাঙলার প্রাণে প্রাণে রেখে গেছেন তার যথাযোগ্য উত্তর ঘটল না উনিশ শতকের বাংলা দেশে । বারবার নানান মনীষীর জীবনে হয়

সংস্কার না হয় ধর্ম, না হয় চলিত নীতিকথা বড় হয়ে দেখা দিল। ধারা পশ্চিমী জ্ঞান সভ্যতার ধ্বংস ওড়ালেন তাঁরা পূর্ব ঘেরেই জুধু কুসংস্কার প্রত্যক্ষ করলেন আর ধারা প্রাচ্য দেশের প্রজা এবং মনীষার পোষকতা করলেন তাঁরা পশ্চিমী জীবনাবাদে শুধু স্বৈরাচার অবলোকন করলেন। কোথাও বুদ্ধি প্রাধিক্য পেলো না। বুদ্ধির নামে গৌড়ামির নিশান আচ্ছন্ন ক'রে দিল উনিশ শতকী বাংলার চিন্তালোক। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন উনিশ শতকের প্রত্যন্ত সীমায়। এ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিবাদী হিউম্যানিষ্ট। তাঁর চিন্তায় কোথায় সংস্কার-পূজার আভাস নেই। অতি-নব্যতার ব্যর্থ আফালনে তাঁর মানসিকতা ভারাক্রান্ত হয় নি। সংস্কার যেখানে বোকা হ'য়ে উঠেছে সেখানে সংস্কারকে তিনি ত্যাগ করেছেন। সে সংস্কার ধর্মেরই হোক কী জাতীয়তাবাদেরই হোক। ধর্ম যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বকে অসম্মান করেছে তিনি সেখানে ধর্মস্রোতী হয়েছেন। জাতীয়তাবাদ যেখানে মানুষের অন্তরঙ্গামী ভগবানকে যুগার বিষে জঞ্জরিত করেছে সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী নন। মধ্যযুগীয় সংস্কার নব মান-বিকৃতির আদর্শ উদ্ভূত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নি মধ্যযুগে পুরোহিতত্বের মানুষের অনিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আধুনিক যুগের চেতনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল। তাই'ত দার্শনিক বেকন বুদ্ধিবাদী মানুষকে নানান ধরণের বন্ধমূল ধারণা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিলেন। তবু নব্য দর্শনের জনক দেকার্ত এই সংস্কার-বিমুক্ত হতে পারেন নি তাঁকে বারবার পুরোহিতত্বের কাছে আত্মনিবেদন করতে দেখেছি। আপনার বুদ্ধি-বুদ্ধিকে তিনি বারবার চার্চের কাছে নিবেদন করেছেন, চার্চের অহুমোদন চেয়েছেন আপন স্বাধীন চিন্তনের। আমাদের দেশের মনীষীদের দেখোছ রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং সমাজপতিদের কাছে আত্মবিক্রয় করতে। পশ্চিমী হিউম্যানিজম আমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিল ভারতবর্ষের শাস্ত্র চিন্তায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহা'র উপরে নাই।' এ সত্য চণ্ডীদাসের উক্তি নয়, এ ভাষ্যতবর্ষের শাস্ত্র মর্মবাকী। এই মর্মবাকী রবীন্দ্রনাথ আপন মনে এবং কখনে সত্য ক'রে তুললেন। কোন প্রলোভন কোন নিন্দা তাঁকে তাঁর বিশ্বাসে বিচলিত করতে পারল না। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যেমন আপন বিশ্বাসের প্রেরণায় তিনি বিহ্বাহ করলেন ঠিক তেমনি আবার স্বজাতীয়ের নিগ্রহে এবং অপমানে তিনি বহুগুণী নির্ধোবে প্রতিবাদ জানালেন বিদেশীয় স্বৈরাচারের। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ বুদ্ধি তাঁকে

সভার পথে অবিলম্বে যেতেছে। বহু মননের অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিষ্ট।

হিউম্যানিষ্ট রবীন্দ্রনাথ এ যুগের অন্ততম শিক্ষা-অধিনায়ক। বিদেশী শাসক এদেশে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষার কল প্রতিষ্ঠা ক'রে মুখস্ত-বক্তাবিশারদ ভূরি ভূরি কেরানী কষ্টি করতেন। গাঙ্গী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, মার্সিয়ান প্রমুখ মনীষীদের দৃষ্টি এদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির অস্থঃসারশূন্যতা প্রত্যক্ষ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তাই দেখি পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশের মানুষের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা চলেছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক পণ্ডিত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ'প্রদেশীয় অনেকেই তার দ্বীপ প্রাচীন শাস্ত্রবিজ্ঞানকে সহজলভ্য করার জন্য বাংলা ভাষায় শাস্ত্র পুরাণাদির অনুবাদ করেছিলেন। এই ভাবে যখন দেশের মানুষকে দেশীবিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বহু ক'রে তোলার চেষ্টা চলেছে তখন হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ সমগ্রতার জীবনবাদ। ম'তুষ বৃত্তিকেন্দ্রিক নয়। ম'তুষের জীবন তার বৃত্তির সীমানায় নিঃশেষিত নয়। তার অশূন্যতা আছে, সৌন্দর্য পিপাসা আছে, তার আত্মদেব উন্মাদনা আছে। (যোলক্ষ্য ম'তুষের মানবীয় সত্যের সমগ্রতাকটিকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্বতন্ত্রতার পাতায় ভর করে সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন।) সে অস্বীকার শুধু কলনেত সীমাবদ্ধ রইল না। বালক রবীন্দ্রনাথ মনেতাবে সে শিক্ষাপদ্ধতিকে অস্বীকার করলেন। যে শিক্ষায় অশূন্যতা নিঃস'ভ হয়ে এলে বালক রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। দার্শনিক বলবেন মানবের সত্তা খণ্ডিত সত্তা নয়। তার চেতনায় সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত। (তাই ক'ব তাকেই যথার্থ শিক্ষা বললেন যা ম'তুষের মননধারায় পৃথল্য অনে, যা তার অশূন্যতাকে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে, যা তার আনন্দ বেদনাকে স্তম্ভ এবং সংযত করে।) তৎকালীন শিক্ষিত ম'তুষ যখন সজ্ঞীতের আনন্দধারার আত্মহারা হয় না, প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুলকিত হয় না, তখন তার জীবনে শিক্ষা-সার্বকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যে শিক্ষা মানবের মনোজগৎকে মাত্র একটি তন্ত্রীকে স্পর্শ করল, মুখস্থের খেঁচা পাবাপাবে ঘাড়ীকে পার ক'রে দিল তাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ব'লে স্বীকার করেন নি। জ্ঞানের সঙ্গে যদি বসের চর্চার সমাবেশ না হয় তবে মানুষের জ্ঞান বোকা হ'য়ে জ্ঞানার্থীর স্বর্কে ভর করবে। তাই তিনি বিশ্বভারতীতে জ্ঞানাত্মীলনের সঙ্গে কলাবিজ্ঞানচর্চার

স্বযোগকে হৃত্ত করলেন।) কবির সৃষ্টিত অভিযত তাঁর আপন ভাবাতেই ব্যক্ত করি: “ ক্ষয় বৃত্তির দ্বারা মাছুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকিবেই শ্রেয়। এই ক্ষয় বৃত্তির প্রকাশ কলাবিচার সাহায্যে ঘটে। সভ্যসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিচার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিজ্ঞানবান্ধব ব্যবস্থায় এই কলাবিচার কোনো স্থান নাই। কলাবিচার সত্বে ভ্রান্ত ধারণা সে দুগের শিক্ষিত সমাজের কাছে কলাবিচারকে অপা ক্রয় ক'রে রেখেছিল। কলাবিচার পৌকষ বিকাশের, ব্যক্তিত্ব প্রস্তুতনের পরিপন্থী বলে অনেকই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ জার্মান জাতির সঙ্গীতপ্রিয়তা ও জাপানীদের পুষ্কবিলাসি শব উল্লেখ ক'রে বললেন : আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পপগুলিকে মারিয়া দিলে জাতের জীবনী শক্তিকেই ক্ষয় করিয়া দেওয়া হয়। যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাল করিতেও ভোলে। আমাদের দেশেই আনন্দকে বডলোকে ভয় করে, সেদগভোগকে তাহার চাপল্য মনে করে এন কলাবিচারকে অপবিচার ও কাজের বিচ্যকর বলিয়া ধরেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকলের কথা অশোক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : “ব্যবহারী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলাশিক্ষা হার প্রদান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সকল হৃদয়।”

(হটকাঠে গড়া নীরস খাঁচায় মাছুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।) তাই ত প্রকৃত আনন্দমন্ডলে ব্রহ্মচর্যশ্রমের বিন প্রতীতি করলেন। শিশু বৃক্ষ যেমন আলোক-বাতাসের স্পর্শ চায় ঠিক তেন'ন ভাবেই মানবশক্তিতে সেই স্পর্শ কাশমেন'বাকো কামনা করে উদার আলোক, আবাস বাস, প্রদাস্ত আলোকের আলীবাঁদে শিশুমন সমৃদ্ধ হয়, পূর্ণ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মাছুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানবচেনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে। প্রচলিত 'লক্ষ্যপদ্ধতি' এই মত সত্যটিকে স্বীকার করেনি বলেই তার এমন নিন্দাকণ বিকলতা। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে।) উপানয়নের ভারপুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দুপল। তিনি চাইলেন তাঁর জাতির উজ্জ্বলস্বকদের সর্গক করে তুলতে তাদের ঐকান্তিক জীবনসাধনায়। সে সাফল্যের মূলে রয়েছে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাই মাহুকে ছাড়িয়েও তার

পরিবেশকে বিচার করেছে। শিশুল-সজিনার ঋণ কবি-জীবনে অস্বাভাবিক। বয়সের সান্নিধ্য কবিকে ধস্ত করেছে, কবি তার স্পর্শে পুনর্জন্ম হন, পবিত্র হন তার আত্মীয়তার। এই বোধ কবির শিক্ষাদর্শনেও অহুস্ধ্য। তিনি তাঁই তাঁর বিভাগে শিক্ষার্থীদের বৃক্ষতলে ভ্রামল শম্পাসনে বসবার বিধি প্রবর্তন করলেন। প্রাচীর নেই, বাধা নেই, নিষেধের অনর্থ নেই। তবে নিয়মের শৃঙ্খলকে কবি অস্বীকার করেন নি। শিক্ষার্থীদের জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের শিশু প্রাণের ছুঁবার প্রাণশক্তিকে প্রবাহিত করতে হবে সূক্ষ্মলভাবে। তাই শিক্ষার্থীদের দেহে মনে তিনি সংঘর্ষের প্রাতিষ্ঠা চেয়েছেন। শিক্ষার্থীরা আশ্রমে আবাসিক হ'য়ে থেকেছে। নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিজেগাই সম্পন্ন করেছে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন আত্মনির্ভর। নিজের কাজ তিনি নিজের হাতে করতে ভালোবাসতেন। দাসদাসীর সেবা নেওয়া তাঁর প্রকৃতপক্ষে ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার এ কথা আমাদের বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বার্ককাজনিত অশক্ততার বন্দী হবার আগে পর্যন্ত কখনও দাস দাসীর সেবা গ্রহণ করেননি। এই দুনিবার স্ব-তন্ত্রপ্রিয়তা কবির জীবনদর্শনের ভিত্তিস্থিতি তাঁর শিক্ষাদর্শনেও তাই তিনি শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতাকে বড় ক'রে দেখেছেন। শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর হ'বে। কর্তৃত্বজ্ঞা জাতির মুক্ত মেক-দণ্ডকে স্বজুতায় সন্নত করার জন্য কবির প্রয়াস সবজনবিদিত। তাই কবি চাইলেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনে স্বনির্ভরতা আনুক। সে স্বাভাবিক কুটুক তাদের চিন্তায়, ব্যবহারে কর্মে। সে স্বাচ্ছন্দ্যতা তাদের উত্তরকালের জীবনসাধনায় প্রযুক্ত হোক।

অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায় অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। কবির জীবনে এই অধ্যবসায়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ। শ্রম, অনলস কর্মসাধনা জ্ঞানার্থীর পুরম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে জ্ঞানসাধনার এই নিগূঢ় সত্যটিকে ঘূর্ত ক'রে তুলেছিলেন। শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ জীবনের সকল স্তরেই অপ্রাস্ত কর্মী। এ কথা রবীন্দ্র-জীবনীকার আমাদের বলেছেন যে প্রৌঢ় পীড়িত রবীন্দ্রনাথকে 'মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তিক বিশ্রাম গ্রহণ করানো যায় নি। 'জাতির জনক' গাঙ্কীজিকে শান্তিনিকেতনে আগমন করতে হয়েছিল তাঁর 'গুরুদেবকে' বিশ্রাম নিতে অহুয়োধ করার জন্য। এই অনলস কর্মী রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা যেন, শ্রমবিমুখ না হয়।) তাদের মনে জ্ঞানের স্পৃহা আগ্রত হোক, সেই আগ্রত স্মার নিরুত্তির জন্য তারা দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে

জ্ঞান আহরণ করুক। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছেলেসেয়েষের পড়িয়েছেন। সুযোগ্য পণ্ডিত এবং শিক্ষকদের তার দিয়েছেন এই ‘স্বল্পমাহরতি’ কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাবৃত্তির সম্যক বিকাশ সাধনের। বুদ্ধি যেমন শাণিত হয়েছে, তেমনি তাদের অহুত্বের ব্যাপ্তিও প্রসারিত হয়ে উঠেছে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষাবিদ, লোকগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আজ দেশের দিকে দিকে নৃত্য-গীতের উৎসব। এ যুগের শিক্ষিত সমাজ তথা শিক্ষাবিদেতা শিক্ষার কাককলার আবৃত্তিকতাকে সাগ্রহে স্বীকার করেছেন। বিংশশতকের প্রথম পাদেও এই বোধ লক্ষিত হয়নি শিক্ষিত সমাজে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নৃত্য-গীতাদি কাককলার যে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান রয়েছে তা আধুনিক কালে আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অল্প দেশ, মুচ সমাজ সেদিন কবির কথায় কর্ণপাত করেনি। কবির বিকল্প সমালোচনা করেছে পণ্ডিতমূৰ্খের দল। আজ আমরা কবিপ্রচারিত শিক্ষাদর্শনের যথার্থ উপলব্ধি করতে পারছি। এ যুগে চাককলার সাধনার কবি ছিলেন পঞ্চকুৎ। দেশের বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নব ভাবনার প্রবর্তক।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যখন মাধ্যমিক স্তরে ও ইংরাজী ভাবাকে আশ্রয় ক’রে রইল তখন তা ফলবান হ’ল না এ দেশের মানুষের জীবনে। যে কয়জন ভাগ্যবান স্মৃতির খেয়ার জ্ঞানের গন্ধমাদনকে বহন করতে সক্ষম হ’ল তাবাই সার্থক সকল হ’ল। আর অসংখ্য অগণিত মানুষ এই অসাধ্য সাধন করতে পারল না ব’লে অপাংক্তের হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাইটু উন্মোচিত করে দিলেন। তিনি চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। দ্বিত্ব দেশের দ্বিত্ব মানুষ। তাদের হাতে হুলতে যাতে সহজবোধ্য পথে দেশবিদেশের জ্ঞান আসে কবি সেই পথের নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন চায় নি যে দেশের মানুষ যথার্থই শিক্ষিত হ’য়ে উঠুক। তাই ফল ফলল না। কর্তৃপক্ষ পুরানো রীতি পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধ’বে রইল দেশের মানুষকে অভুক্ত, অভুপ্ত রেখে। একক যাত্রার আত্মবান নিত্য-রাজী কবি বিশ্ববিভাগ-এহ গ্রন্থশালায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। লোক-শিক্ষার জন্য তিনি নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করলেন। দেশের প্রাচীন জ্ঞান হুলভঙ্গবরণ গ্রন্থে প্রচাষিত হ’ল মাতৃভাষার মাধ্যমে। বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হ’ল এদেশের ইংরাজী অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে। দেশের মানুষের

উপযায়ী শিক্ষার চিন্তে জানের সীমাবদ্ধী ব্যায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। কবি বললেন বাত্বভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচাৰের কথা। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বললেন। তবে তাঁর মতে শিক্ষার-স্বাধীন হবে বাত্বভাষা। কবি-কবিতা নীতি স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বীকৃত এবং দৃষ্ট হইবে। ভবিষ্যৎ অতীতকে স্বীকার করেছে, তাকে পরিপূর্ণ স্বীকার দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমগ্রভাবাদী, এ কথা আগেই বলেছি। একদিকে তিনি যেমন ব্যক্তি মানুষের সমগ্র সত্তার শিক্ষা-পৃথলার সংঘ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন অতীতকে তিনি সার্বিক শিক্ষার (universal education) সমর্থক ছিলেন। সমগ্র মানুষের শিক্ষার জন্মগত অধিকার। কবির ঔপনিষদিক জীবনদর্শন তাঁকে সমদর্শী ক'রে তুলেছে। যে পরা সত্তা চেতনে অচেতনে পরিবর্তন মানুষে তো তাঁরই প্রতিষ্ঠা। তাই তো কবি সর্ব-আবিশিষ্টে আত্ম-আশ্রয় ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করলেন। তাইতো কবি এতো বিশ্ব-ঘনিষ্ঠ। সকলের আত্মীয়তার কবি সার্বিক, কবি ধর্ম। (তিনি চাইলেন সকলের জন্য শিক্ষার আলো। যাগ জীবনে লাহিত, স্বত্বাভেও অবহেলিত তাদের শিক্ষার জন্য কবির স্বয়ংসেবনা। তিনি চাইলেন অশিক্ষিত কুল-কায়াজ্ঞান অসংখ্য গ্রামের অগণিত নরনারীকে হুশিয়ার আলোকে চমুমান ক'রে তুলতে। দেশের সামগ্রিক রূপটুকুই কবির চোখে সত্য। খণ্ডিত রূপ, বিচ্ছিন্ন সত্তা কবি-ভাবনার অসিদ্ধ। আশ্রিততলের মতই রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমগ্রভাবাদী। এই সমগ্রতার ধারণাই কবিকে জাতীয়তাবাদের পথ থেকে আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে লীলায় হয়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছে। রবীন্দ্র-মানস বিচারে এই সমগ্রতার ধারণাটুকু কবিকে বোঝার পক্ষে আবশ্যিক। রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন এই সমগ্রতার ধারণার স্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত। উদাহরণ বিহী। বিদ্যালয়ের কাজ এবং বিদ্যালয়ের অবকাশ নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্ম রূপের সমগ্রতা। শুধু কাজ, সমবন্ধকরা অস্বাস্থ্য কর্মক্ষেত্রের আবর্তন কবির কাছে অগ্রাহ্য। কাজের বিরতি চাই, অবকাশ চাই। কাজের যেমন দরকার, কর্মবিরতিরও প্রয়োজন তার চেয়ে কম নয়। এই বিরতি না থাকলে কাজের রূপটুকু উপলব্ধি করা যায় না। কবি বললেন: "অবিশ্রাম কর্মের স্বাক্ষরানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন স্বাক্ষরার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এসে আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এইজন্য অত্যন্ত কর্মকে পুনরায় নতুন করে দেখবার সুযোগ লাভ

করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্রান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।” (ছবি ‘শর, শান্তিনিকেতন ক্রমবিকাশ’) রবীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন, যে কাজ এবং ছুটি—এ দুটোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখলে তবেই কাজের পূর্ণরূপটুকুর উপলব্ধি হয়। গতি যেমন বিচ্ছিন্নভাবে সত্য নয়, গতির সত্যতা স্থিতিকে ও নিয়ে ঠিক ভেদনি কাজের সঙ্গে বিরতি বৃদ্ধি থেকে কাজকে পূর্ণ করে। কাজ অকাজের গানি থেকে মুক্ত হয়। সমগ্রতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসমবায়ের কথা বললেন : “পৃথিবীর এখন রায় হইয়াছে, জাতিগত বিভা-স্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিজ্ঞানসমবায়ের যুগ আসিয়াছে, সেই সময়ে যে বিজ্ঞা যোগ দিবে না, যে বিজ্ঞা কো’লস্তের অভিমানে অনুভূত হইয়া থাকবে, সে নিশ্চল হইয়া মরিবে। অতএব আমাদের দেশে বিজ্ঞানসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্রে চাই, যেখানে বিজ্ঞার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, সেখানে ভারতীয় বিজ্ঞাকে মানবের সকল বিজ্ঞার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবেই।” বিশ্ব-বিজ্ঞার এই পূর্ণায়ত্ত্ব রূপের জন্ত কবির সাধনা। তিনি এই বিশ্ব বিজ্ঞাধারাকে দেশের শিক্ষার্থীর মনসতটে বহমান করবার জন্তা সচেষ্ট হলেন। এই দুর্জয় কর্ম সম্পাদন করতে হলে ভারতীয় জ্ঞানের পূর্ণ রূপটুকু ভারতীয়দের সামনে ধুলে ধরে একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় জ্ঞানের ধারা বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারটি শাখা-আশ্রয়ী। এর পরে আছে ইসলামের প্রভাব। মুসলমানদের সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সে স্বপ্নকে প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বীকার করলেন, জীবনব্যাপী সাধনার ইসলামের সাংস্কৃতিক জোড়াকে আত্মগত করবার জন্তা তাঁর দেশবাসীকে বললেন নব্য-ইরোহোপীয় ভাবগারা কবির শিক্ষা-বাবস্থায় স্বীকৃতি পেলো। পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা মুঢ়তা। কবি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ইংরাজীসাহিত্য পঠনপাঠনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তিনি স্বয়ং ব্রাউনিং-এর কাব্য-সাহিত্যের রাস নিতেন। ইংরাজদের অনাচারকে অপ্রজ্ঞা করলেও তাদের সাধনাকে ওঁ সিদ্ধিকে তিনি বরাবরই প্রজ্ঞার চোখে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ চিন্তায় ও কর্মে সমগ্রতাবাদী ছিলেন। [তিনি শৌখিন আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন না। তাই তাঁর শিক্ষাবর্ধন এতোখানি গভীর এবং ব্যাপক হতে পেরেছে, তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতীয়ের তপোবনের আদর্শ। কবি বললেন যে আমাদের

তপোবনে একদিন অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল। সেদিন ভারতবর্ষ আপনানে দিব্যধাম বলে জেনেছিল। সেদিন ভারতবাসী সমগ্রতার মধ্যে আত্ম স্থাপন করেছিল বলেই ভারতীয় প্রজা সেদিন যে মন্ত্রটির জন্ম নিল তা হচ্ছে :

‘যন্ত সৰ্বানি ভূতানি আশ্বস্তেবাহুপততি।

সৰ্বভূতেষু চান্ধানং ততো ন বিজ্ঞপ্ততে।’

যিনি সৰ্বভূতকেই পরমাস্থার মধ্যে এবং পরমাস্থাকে সৰ্বভূতের মধ্যে দেখে তিনি কাউকেই আর ভুণা করেন না। কবিগুরু এই মহামন্ত্রটিকে সাগ্রহে বহু করেছিলেন। তাই তিনি মহামানবের সাগরসন্ধ্যায় বিশ্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাইতো তাঁর শিক্ষাদর্শন বিশ্ববলীনতার প্রসাদচিহ্নিত।



বাংলা নাটকের সূচী ধারা

ডঃ শিশির কুমার সিংহ

বাংলাসাহিত্যের অত্যন্ত আধুনিক শাখার মত নাট্যশাখারও উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আমরা এখন নাটক বলতে যে শ্রেণীর সাহিত্যকে বুঝি ইংরেজদের আগমনের আগে আমাদের দেশে সে ধরনের রচনা ছিল না। বিলাতি মঞ্চে বিদেশী নাটক দেখেই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে নাটক লেখার প্রেরণা জাগে। তাই বাংলা নাটকের প্রধান আদর্শ ছিল বিদেশী নাটক।^১ অবশ্য আমাদের দেশের প্রাচীন রাজাগানের এবং কালিদাস ইত্যাদি সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকের প্রভাব যে বাংলা নাটকে প্রভাবিত করেনি তা' নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটকগুলির গঠন রীতি ও কলাকৌশল বিবেচন করলে দেখা যায় যে ঐ তালি মূলতঃ শেক্সপীরের নাটকের আদর্শ অনুসরণে রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে দু'টি নাটক প্রথম মৌলিক নাটক বলে চিহ্নিত হয়েছে সেই 'কীর্তিবিলাস' (জি. সি. গুপ্ত : ১৮৫২) এবং 'ভদ্রার্জুন' (ভারতচরণ শিকদার : ১৮৫২) নাটক দু'টি শেক্স-

দীর্ঘায়ী নাট্য আদর্শে রচিত। 'কীতিবিলাস' নাটকের দু'থবন্ধে নাট্যকার বিরোগাত্মক নাটক রচনার কৈকিরত দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন সে কথাগুলি উদ্ধার করলে আমার মন্তব্যের সভ্যতা উপলব্ধ হবে।

"অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে বিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যন্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণে শেক্সপীয়ার-নামা ইংলণ্ডীয় মহাকাবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত শোকপ্রয়াসী।....."

তবে এই নাটকেও সংস্কৃত নাট্যাঙ্গণ অমুখ্যায়ী পক্ষে প্রস্তাবনা আছে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকটিতেও ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাট্যাঙ্গণই বিস্তারিত।

এরপর নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-২৬) মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১২৩৬-৮০) আবির্ভাবের ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্য যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করলো। মধুসূদনের হাতে নাটকের গঠনকৌশলেরও উন্নতি হল। সার্বক ট্রাজেডি 'রুক্মসুহাগী' (১৮৩৫) যেমন রচনা করলেন তেমনি দু'টি প্রহসনও তিনি রচনা করলেন ('একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ষাড়ে ঘোঁ' : ১৮৬০)। এ দু'টি প্রহসনই পরবর্তী নাট্যকারদের প্রহসন রচনার আদর্শ হলো। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, মধুসূদনের নাটকে কালিদাসের নাটকের (বিশেষ করে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এষ্ট পূর্বের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে 'কুলীনকুল সর্কষ' (১৮৫৪) নাটকটি রচনা করে তিনি অর্থ এবং খ্যাতি দুইই লাভ করেন। তিনি সামাজিক, পৌরাণিক এবং প্রহসন (নক্সা) রচনা করেও নাটকের বিভিন্ন দিক গুলে দেন। মধুসূদনের অত্মসরণে দীনবন্ধুও প্রহসন জাতীয় নাটক রচনা করেন। তাছাড়া সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে 'দীলদর্পণ' (১৮৬০) নামক বিখ্যাত নাটকটিও রচনা করেন। দীনবন্ধুর নাটকগুলির মধ্যে সমাজের নিয়ন্ত্রণের জনসাধারণের চরিত্র খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। বহুক্ষেত্রে দীনবন্ধুর নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সাধারণ নাট্যশালার প্রধান নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু। মধুসূদন এবং দীনবন্ধু

নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নাটকগুলির হাত-কোঁড়কের মধ্যেও মানব-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে তাঁদের প্রহসন জাতীয় নাটকগুলিও সাধারণ প্রহসন নাটকের থেকে স্বতন্ত্র বর্ধাবাদ্য্যত করেছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পর্বের উপরিউক্ত ভিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের প্রচেষ্টার বাংলা নাট্যসাহিত্যে যাজ ক'বছরের মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমান তালে পাঁজা দিয়ে নাট্যশাখাও দিন দিন সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকে। পঞ্চাশ, একাশ ইত্যাদি বিভিন্ন রীতির নাটকও এই পর্বেই রচিত হয়। তাছাড়া এই পর্বের নাটকগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল বস্তুধর্মিতা, কল্পনা প্রবণতা নয়, কিন্তু এই সময়ের উপজ্ঞানসাহিত্য ছিল ঠিক এর বিপরীতধর্মী। ৭

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয়পর্বের বিশিষ্ট নাট্যকারগণ হলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২), জ্যোতিব্রজনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ ১৯১২), অমৃতলাল বসু (১৮৫০—১৯২৯) এবং রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)। জাতীয় চল্লিশা (১৮৭২) ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের সফলতা ও প্রভূত জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়গোপযোগী নাটকের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। বিশিষ্ট নাট্যকারগণ এক একটি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা রঙ্গমঞ্চের নিদেশে দর্শককণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করতে বাধ্য হয়। ফলে নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে বাস্তবগুণ লোপ পেয়ে গিয়ে কল্পনা-বিলাসিতা, রোমাঞ্চিকতা, অলৌকিক চমৎকারিত্ব ইত্যাদি প্রবেশ করতে থাকে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে নাটকের রূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করতে হওয়ায় এই পর্বের নাটকগুলির মধ্যে প্রকৃত নাট্যগুণ তথা সাহিত্যগুণের অত্যন্ত পরিমিত হয়। তাই বেশি গিরিশচন্দ্র-অনুদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হলেও দর্শকসমাগম হয় নি। তখন ব্যবসায়িক স্বার্থে দর্শকদের কণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রেখে পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করা হয় এবং আশাচ্যবায়ী দর্শক সমাগমও হয়। তাই এই যুগে নাট্যকারের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রেরণায় নাটক রচিত না হওয়ায় নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও নাট্যসাহিত্যের আশাহীনরূপ উদ্ভূত হয়নি। (৮৭১)

এই পর্বের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সে দুটি হল : ১) আদর্শবাদ—জাতীয়তাবোধের আদর্শ, প্রেমের আধ্যাত্মিক আদর্শ। ২) তত্ত্ববাদ।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা এ দুগুণের নাটকগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :

১) ইতিহাসমূলক—যে নাটকগুলির প্রধান লক্ষ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের আদর্শে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। অর্থাৎ এই সময়ের নাটকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২) পৌরাণিক-আধ্যাত্মিকমূলক—যে নাটকগুলির প্রধান হল তত্ত্ববস।

এই পর্বের নাটকগুলিতে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবন অপেক্ষা আদর্শ জীবনই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এবং তত্ত্ববাদের প্রাবল্যের ফলে অলৌকিকত্ব এত বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে যে নাটকের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর এর ফলে দৈন্যের “স্বাভাগানের” মত এই পর্বের নাটকে গানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাহাজিক নাটকগুলির মধ্যেও (‘প্রমুদ ইত্যাদি’) আদর্শবাদ অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করার ফলে বাস্তব বস দুটে না ওঠায় চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

মনোমোহন—জ্যোতির্বিজ্ঞান—গিরিশচন্দ্র—রাজকুমার আন্তরিক চেষ্টার ফলে যেমন গভীর ও গভীর নাটকের উন্নতি সাধিত হয়েছে ঠিক সেরূপভাবে অমৃতলালের আন্তরিক চেষ্টার ফলে প্রহসন ও বিজ্ঞাপাত্মক নাটকের (নকশা ?) উন্নতি সাধিত হয়েছে। নট্যসাহিত্যের এই দুগুণ অমৃতলালের নাটকগুলির মধ্যেই মানব জীবনের ক্রটি-বিচ্যুতি বুঝ স্বন্দরূপে চিত্রায়িত হয়েছে। এই দুগুণে কেবল তাঁর নাটকের মধ্যেই বাস্তব বস পাবেনিহিত হয়েছে। অর্থাৎ নট্যসাহিত্যে আদর্শবাদ-তত্ত্ববাদ-আধ্যাত্মিকতার তাবোচ্ছ্বাস থেকে আবার বাস্তবতার পথে কিয়তে শুক করেছে ;—আধুনিক নাটকের যা বিশিষ্ট গুণ।

বিজ্ঞানপ্রাণের (১৮৬৩—১৯১০) নাটকে পৃথিবীর অসুসরণই লক্ষ্য করি। (জাতীয় আন্দোলনের ফলে) দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে ও দেশপ্রেমিতামূলক নবীতের উদ্ভাবনার হস্তবাদের প্রোতে প্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন বিজ্ঞানপ্রাণ। তাঁর নাটকগুলিও মূলতঃ বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক নাটক। তত্ত্ববাদের ইতিহাসের (বিশেষ করে রাজপুত্র ইতিহাসের) ঐতিহাসিক বীরদের কাহিনী অবলম্বনে যে নাটকগুলি তিনি রচনা করেছেন সেগুলি রীতিমত

জনপ্রিয় হলেও নাটক হিসেবে খুব উচ্চশ্রেণীর হয়ে ওঠেনি। সামাজিক নাটকেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।^{১৩} কীর্ত্তীপ্রসাদও (১৮৬৩—১৯২৭) গভাষ্মগতিক পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি নাটক (বিশেষ করে, ‘আলিবাবা’ : ১৩০৪ সাল, — কাহিনীর চমৎ-কারিত্বের জন্ত এবং অমরেন্দ্র হস্তের অভিনয়ের জন্ত) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর হাতে নাট্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনিও গিরিশচন্দ্র-বালকৃষ্ণের পথেই চলেছেন, বিশেষ নতুনত্ব দেখাতে পারেননি।

এই পর্বে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে ঠিকই এবং প্রচুর এবং বিভিন্ন প্রকারের নাটকও রচিত হয়েছে এও ঠিক,—তবু একথা বলা বোধহয় খুব দোষের হবেনা যে এসব সম্বন্ধে নাট্যসাহিত্যের মান খুব একটা উন্নত হয়নি। যে সব প্রতিভাধর নাটকরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা যদি দর্শককণ্ঠের প্রতি অধিকমাত্রায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃত উন্নতমানের নাটক রচনা করতে সচেষ্ট হতেন তাহলে বাংলা নাট্য-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অস্বাভাবিক শাখার মতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘দর্শককণ্ঠ’রও পরিবর্তন ঘটতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাট্যকাররা জনপ্রিয় হতে গিয়ে এবং বঙ্গমঞ্চের লাভালাভের প্রতি অধিক-মাত্রায় দৃষ্টি দিতে গিয়ে ‘জনপ্রিয় নাটক’ (popular drama) রচনা করতে পারলেও প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করতে সক্ষম হননি।

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের শেষ এবং তৃতীয় পর্বের শুরুতে মাঝে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যে নাটকগুলি আমাদের চমক দেয় সেগুলি হল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের বিশিষ্ট নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একাকীই একটি যুগ। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর নাটকের যোগ যেমন দুর্বল্য (যদিও আগের যুগের অনেক নাট্যকারের ওপর, বিশেষ করে অমৃতলাল বসুর ওপর, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব চোখে পড়ে।) পরবর্তী নাট্যকাররাও তেমনি তাঁর দ্বারা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারেননি। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যরচনা কৌশলের যে রীতিগুলি প্রচলিত আছে তার মধ্যে শেক্সপীরীয় রীতিই (তখন বাঙ্গালী নাট্যকারদের কাছে) সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। বাংলা নাটকের উদ্ভব কাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রপূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক শেক্সপীরীয় নাট্যদর্শনে রচিত। এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দু’একটি নাটকেও (বিশেষ করে ‘বিসর্জন’ নাটকটি উল্লেখযোগ্য) উক্ত নাট্যরীতিই লক্ষ্য

কল্পা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই রীতি লক্ষ্যন করে নতুন রীতির নাটক রচনা করে বাংলা নাটকের আধুনিক পর্বের সূচনা করলেন। বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব পদ্ধতির নাটক রচিত হল, ফুটে উঠলো মানবজীবনের প্রকৃত ছবি। প্রচারিত হল মানবজীবনের মহত্বের জয়গান। এভাবেই বাংলা নাটক সৃষ্টির পথ পেলো। পৃথিবীর অসীম দেশেও তখন নাট্যকৌশলের পরিবর্তন ঘটেছে। মেটারলিক নতুন ধরণের নাটক—“প্রতীক নাটক” (symbolic play) রচনা করে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন (‘সু বার্ড — নোবেল পুরস্কার ১৯১১’)।^৪ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একের পর এক তাঁর বিখ্যাত সাক্ষাতিক বা ব্যক্তনাগ্রধান নাটকগুলি রচনা করেছেন (অবশ্য এর অনেক আগেই ১৯২১ বর্ষকেই তিনি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নামক অংশত প্রতীক নাটক রচনা করেছেন।) ‘রাজা’ (১৯১৭), ‘অচলায়তন’ (১৯১১), ‘ভাকঘর’ (১৯১২), ‘মুক্তধারা’ (১৯২২), ‘রক্তকবী’ (১৯২৭) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাটকেই দেখতে পাই প্রকৃতি ও মানবজীবন একই সূত্রে বাধা। সাধারণ মানুষের সজ্ঞা সর্বল জীবনের ‘ক্রিয়াকর্ম খেলা আনন্দ’ হয়েছে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। তিনি ‘ফান্টানো’ নাটকের বঙ্গমঞ্চবিতীন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের স্বাভাবিক যোগ ঘটিয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। তাই জনৈক সমালোচক বলেছেন :

“একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জেনেছিলেন বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ স্বকীয় নাট্য-বিভাগ, তার লোকজীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে এই ভকীহ স্পর্শ করে আছে প্রতীচোর আধুনিক পর্ব, এখনো পর্যন্ত তাঁকেই হয়তো বলা যায় আমাদের দেশের আধুনিকতম নাট্যকার।”^৫

রবীন্দ্রস্রুগের শেষ পর্বে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সব নাট্যকার নাটক রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্মথ নাথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বসু রায়, প্রমথনাথ বিশি, মনোজ বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাকান্ত বসু, জলধর চট্টোপাধ্যায়, ‘বনফুল’, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ডঃ বিজয় ভট্টাচার্য। এই সমস্ত নাট্যকারদের হাতে বাংলা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্যধারার বেশ উন্নতি ঘটেছিল, পৌরাণিক নাটক এবং একাক রচনার মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তবে দুঃখের বিষয় রীতিনীতির অর্থাৎ নাট্যকৌশলের কোন অভিনবত্ব তিনি দেখাতে পারেননি। মনোজ বসু ও তারাকান্তের সামাজিক নাটকগুলি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

‘বনফুলের’ জীবনীমূলক নাটক দু’টি রীতিমত নাটক হয়ে উঠেছে। ‘প্রিয়মুহুরন’ এবং ‘বিভাসাগর’ এই শ্রেণীর নাটকের অগ্রদূত। হান্তকৌতুকরসের মধ্যে দিয়ে নাট্যরসবিশ্লষণের কৃতিত্ব প্রথমদাশ বিশিষ্ট। আর এই কারণেই তাঁর নাটকগুলি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের সাধারন নাটক ঘটনাত্মকভাবে মনোবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত ভট্টাচার্য। সাধারণ বাঙালী পরিবারের জীবনযাপনের সমস্তাঙ্গলোকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর ‘মাটির ঘর’ নাটকটি এই শ্রেণীর একটি সহজ সফল নাটক। এই নাটকের মধ্যে সাধারণ বাঙালী পরিবারের স্বহৃৎ থেকে অতি নিপুণভাবে গভীর দরদের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

যুক্তোত্তর নাটক : দেশী ও বিদেশী :—এরপর শুরু হয়েছে নব নাট্য আন্দোলন। যুক্তোত্তর নাটকের রূপ গেছে পাণ্টে। আধুনিক জটিল মানব-জীবনের ছবি নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। কি দেশী কি বিদেশী আধুনিক নাট্যকাররা নাট্যমুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই দিন দিন নাট্যকৌশলের নতুন নতুন রীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। স্বকসজ্ঞা নিয়ে নানাধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। বা আদৌ মকের কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে নিয়েও গবেষণা চলছে। রাস্তায় রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ নাটক অভিনীত হচ্ছে। জনসাধারণও এই নাটকে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন। এই রকম নানা পরীক্ষানিরীক্ষার শেষে বর্তমানে আমরা পৌঁছেছি ‘আবসাউ ড্রামার’ বা উদ্ভট নাটকে। ইউরোপের বিস্তার দেশে—নিশেষ করে ফ্রান্সে—উদ্ভট নাটক নিয়ে রীতিমত মাতামাতি চলছে—তবুও সার্থক নাট্যমুক্তি ঘটেনি। আধুনিক বাংলা নাটক পশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে রীতিমত প্রভাবিত। বর্তমানের বেশির ভাগ বাংলা নাটক হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ,—নয়তো বিদেশী কলাকৌশলে রচিত। তাই প্রথমে কয়েকজন বিখ্যাত পশ্চাত্য নাট্যকারের সহজে দু’চার কথা বলা প্রয়োজন।

চিরচরিত নাট্যকৌশল ত্যাগ করে যে সব পশ্চাত্য নাট্যকার নাটক রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ইউজিন ও’নীল (Eugene O’Neill—‘Mourning Becomes Electra’), টি. এস. এলিট (T. S. Eliot : ‘The Cocktail Party’), আর্থার মিলার (Arthur Miller : ‘Death of a Salesman’), বার্টোল্ট ব্রেখট্ (Bertolt Brecht : ‘Mother courage’), জায়েল বেকেট্,

(Samuel Beckett : 'Waiting for Godot'), আয়োনেস্কো (Ionesco : 'The Chairs'), এডওয়ার্ড অ্যালবী (Edward Albee : 'Who's Afraid of Virginia Woolf')। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের হলেন ইবসেন ও শক। তাঁদের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর।

ও'নীলের সন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন : "Modern American drama, by common critical consent, begins with Eugene O'Neill"—এ কথা একান্ত সত্য। ও'নীলই চিরচরিত রীতি ত্যাগ করে নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন। এর জন্য তিনি বার বার পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি সমসাময়িক সমাজজীবনের ছবি নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে যেসব নতুন নতুন তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাস্তববাদ' ("Realism") এবং অভিব্যক্তিবাদী ("Expressionism")। নাট্যকোশলের নতুন রীতি (form) প্রবর্তনের দিক দিয়ে বিচার করলে ও'নীলের সঙ্গে এলিয়টের তুলনা করা যায়। তবে দু'জনের প্রয়োগকোশল বা উপস্থাপনার ভঙ্গিতে বেশ পার্থক্য আছে। ও'নীল সমসাময়িক ঘটনা ও মতবাদকে উপেক্ষা করেননি কিন্তু এলিয়ট পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নাটক সন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন "The surface of 'The Cocktail Party' is modern, but it has roots in the traditional literary heritage of western civilization"।

সমসাময়িক আমেরিকান নাট্যকারদের মধ্যে খ্যাতিও তুলে উঠেছেন আর্থার মিলার। মিলারের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার আমেরিকানত্ব। "Death of Salesman" নাটকের মধ্যে জনৈক আমেরিকান 'সেলসম্যান'-এর জীবনের সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এ সন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"The most salient quality of Arthur Miller's tragedy of the common man Death Of A Salesman is its Americanism." মিলার নাটকটির মধ্য দিয়ে নাটকের একটি নতুন আঙ্গিক (form) সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন : "I wished to create a form which, in itself as a form, would literally be the process of

Willy Loman's way of mind."১০ একটি বিশেষ জীবন মনের কথা—
তাদের দুঃখ-দুঃখ-আনন্দ-ব্যর্থতার কথা তিনি দুঃখরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

"What was wanted now was not a mounting line of tension, nor gradually narrowing cone of intensifying suspense, but a bloc, a single chord presented as such at the outset, within which all the strains and melodies would already be contained."১১ আবার আর এক জায়গায় তিনি তাঁর নাট্য-পরিকল্পনা সৰ্ব্বদে বলছেন :

"It was to forego the usual preparations for scenes and and to permit—and even seek—whatever in each character contradicted his position in the advocate-defense scheme of its jurisprudence."

ব্রেখ্ট্‌ সমস্ত চিত্রাচিত্রিত নাট্যকৌশলকে - নাট্যকল্পনাকে ত্যাগ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অভিনেতা ও দর্শক কেউই যেন ভাবাবেগে নাটকীয় ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে না পড়েন। সবসময়ে তাঁদেরকে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে হবে। ১২—অথচ চিত্রাচিত্রিত ধারণা হল নাটক দেখতে দেখতে যদি নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি,—তাহলেই নাটক ঘটনা সার্থক হয়।

ব্রেখ্ট্‌র নাটকের কলাকৌশল অপেক্ষা বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই সমসাময়িক নাট্যকারদেরকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল এবং বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৩— তাঁর নাটকে ব্যাখ্যাত মার্ক্সীয় দর্শন এক বিশেষ মূল্যলাভ করেছে—যা বাঙালী নাট্যকারদেরকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

বেকেট্‌ তাঁর নাটকে সমসাময়িক মানবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার, দুঃখস্বপ্নের ছবি খুব নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, ভাবোচ্ছ্বাসের কাছে। তিনি আশাবাদী—মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা হতাশা থেকে নতুন সুখ জীবনে উত্তরণে বিশ্বাসী।

বেকেট্‌ ও আরোনেস্কো দু'জনের ওপরেই ব্রেখ্ট্‌র প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে আরোনেস্কো বেশ কিছুটা সনাতনপন্থী। তিনি নাট্য-কাহিনীর তথা গল্পের উৎকর্ষের ওপরেই অধিক গুরুত্ব দান করেছেন।

অ্যান্‌রী আবার বেকেট্‌ ও আরোনেস্কোর মত ত্রাট্যায়িতই হলেও নাট্য

কৌশলের দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মের। তাঁর নাটক 'ভায়ালগ' বা সলাপপ্রধান এবং ভায়ালগগুলিও বিশেষ ধরনের। তাঁর "Who is Afraid of Virginia Woolf" এই ধরনের একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকটিতে বর্তমান আত্মধুনিক জগতের এক বিশেষ প্রেমীর নর-নারী (যারা স্বামী-স্ত্রী) 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের মানসিক (জৈবিক ?) অভ্যর্থনা অগূর্ব নাটকীয়তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানের নাট্যকারদের মধ্যে নাটক রচনার, প্রযোজনায়, পরিচালনায় ও অস্তিত্বভাবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—উৎপল দত্ত, শত্ৰু মিত্র, বাবুল সরকার, মনোজ মিত্র, রতনকুমার ঘোষ প্রমুখ। কলকাতার এবং মকমলে উপরোক্ত নাট্যকারদের নাটক নিয়ে নানাতাবে পরীক্ষা চলছে। এই সব নাট্যকারদের নাট্যরচনার প্রেরণার মূলে আছে "প্রগতিশীল ভাবাদর্শ, প্রচলিত মূল্যবোধের নিগড় ভেঙে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অভীশা।" ১৪ এই আদর্শকে সামনে রেখে শুধু হয় নাট্য আন্দোলনের যুগ। নবনাট্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন নামে দু'টো নাট্য আন্দোলন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই দুই নাট্য-গোষ্ঠীর ভাবাদর্শকে অনুসরণ করেই অধিকাংশ নাট্যকার নাটক রচনা করতে থাকেন। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের বেকনাময় ছবি, শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব ও মানসিক হতাশা, রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তে আবদ্ধ যুবক সম্প্রদায়, প্রচলিত আদর্শগুলির অসাড়তা, সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের কর্মমাক্ত জীবনচিত্র, সমসাময়িক ঘটনা—ভিয়েতনামযুদ্ধ, বাংলাদেশযুদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়গুলি অবলম্বন করে বিভিন্ন নাটক রচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিকতম নাটকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' শত্ৰু মিত্রের 'গডার', এবং 'টেরোড্যাকটিল', 'এবং ইন্ডিজিৎ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজবক্তা', মনোজ মিত্রের 'চাকতাত্ত্বিক যুগ', এবং রতনকুমার ঘোষের 'স্বহাকাবা', ইত্যাদি নাটকগুলির। উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' নাটকটিতে বর্তমান কালের রাজনীতির কদম্ব ও বীভৎসরূপটি বিদেশী পটভূমিকায় (নাসী শালন) যুব কলঙ্কভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের বর্তমান দশকের কদম্ব রাজনীতি যুবকসম্প্রদায়কে তথা সাধারণ জনজীবনকে কিতাবে বিভ্রান্ত ও বিপর্ভিত করে তুলেছে এই নাটকটিতে তারই সার্বক রূপদান করেছেন নাট্যকার। শত্ৰু মিত্রের 'গডার' 'টেরোড্যাকটিল' প্রভৃতির আধারে সামাজিক সত্যোন্মোচন। বাবুল সরকারের 'এবং ইন্ডিজিৎ' নাটকটিতে একটি সাধারণ যুবকের

(ইঙ্গিতের) জীবনের ছবি সজ্জা করলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । সাধারণ একটি সুবকের জীবন-কথা অসাধারণ নাট্যরূপ লাভ করার নাটকটি চরম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজবক্তা' নাটকটি প্রতীক নাটক । রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র সঙ্গে যেন নেন কিছুটা সাদৃশ্য হয়েছে । মায়ার বন্দী জীবন-যৌবন-শক্তি কিভাবে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তা প্রতীকের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । শোষিতের সঙ্গে শোষণের প্রতীকী সংগ্রাম । বহুসূত্রী রাজসাহেব চারটি শোষকের মায়াবী রূপ । নাটকটিকে মঞ্চ করতে হলে মঞ্চসজ্জা তথা দৃশ্য অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রয়োজন । মনোজ মিত্তের 'চাকতাত্তা মধু'র মতো তেমন নতুনত্ব না থাকলেও কাহিনীটি দর্শকদেরকে বেশ আকৃষ্ট করে । নাটকের প্রধান চরিত্রে 'মাতলা' নামের ওকা—সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের বাস । আরণ্যক আদিমতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও তাদেরও হৃদয় আছে । কিন্তু তারা মহাজন স্তব-খোরদের দ্বারা (অঘোর ঘোষ) অত্যাচারিত শোষিত । এই সমাজের প্রতিনিধি অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে । মাতলা এবং তার কাকা চায় অত্যাচারী অঘোরের মৃত্যু হোক । কিন্তু সুবতী কস্তার (বাদামী) অনুরোধে মাতলা অঘোরকে বাঁচিয়েছে । পরে অবশ্য বাদামীর হাতেই অঘোরের মৃত্যু হয়েছে । শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় । নাটকটিতে সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষাও (পাট-পাহাড়ীদের মুখে) ব্যবহার করা হয়েছে । লোভী এবং স্বার্থপর সমাজ নেতারা কিভাবে পরস্পর কলহ করে চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন তা সুন্দরভাবে এ নাটকটিতে দেখানো হয়েছে । যাজ্ঞকবর কণামত বরাস্তরদ্বাত্রী জগতের কল্যাণরূপী মা'কে বরণ করতে এসেছেন সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক । কিন্তু মা যখন আবহূ'ত হলেন তখন মা'কে বরণ করে নেওয়ার জন্য স্বার্থপর সমাজ নেতারা মোটেই উৎসুক নন, তাঁরা কেবল মায়ের কাছ থেকে ধন-সম্পদ হস্তগত করতে চান এবং সেট কল্‌ছেই তাঁরা লিপ হয়েছেন । তাই তাঁদের প্রতীক্ষা বিফল হয়ে গেছে, তাঁরা কিছুট পান'নি । মা'কে বরণ করে স্তব-শাস্তি লাভ করেছে সমাজের দীন দুঃখীরা । নাটকটির মঞ্চায়না অতুলনীয় । যাজ্ঞক চরিত্রটি লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি । নাটকটির নাট্যকীর্ত্তা দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে ।

এ ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকার রয়েছেন যাদের নাটক কীর্ত্তিমত মঞ্চ-সাক্ষ্য অর্জন করেছে । প্রতিদিন কত কত বাংলা নাটক প্রকাশিত

হচ্ছে। কলকাতার এবং মফস্বলে একাধ নটকের অভিনয় বীতিমত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় একাধ নটক প্রতিযোগিতার (যেমন : বাংলার বাইরে—পাটনা, লাক্কী, কানপুর, দিল্লী, জিপুরা) উৎসাহ ও উদ্বীপনা দেখে বোকা যাচ্ছে বাঙালী সাহিত্যিক সংস্কৃতির এই ধারাটি বর্তমানের কত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে মাঝে মধ্যে কিছু সার্থক নটক রচিত হ'তে দেখা গেলেও দেশের প্রয়োজন ও চাহিদার অহুপাতে তা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই, যদিও একজন নির্ভরযোগ্য কচিনীল (connoisseur—কনিস্তার) নাট্য-পর্যালোচক হিসেবে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো, তবু একজন সমাজ ও পরিবেশগচেতন নাট্যরসিক ব্যক্তি হিসেবে আমি অন্ততম করছি আমার বক্তব্য শেষ হয়েও হ'ল না। স্বতাবতঃই প্রশ্ন জাগে : নটক কি শুধুই বিনোদনের উপকরণ? যেনতেন প্রকারে দুঃখদীর্ণ কালহরণের জন্যেই এর প্রয়োজন? একটু চিন্তা করলেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হও রসোক্তীর্ণ নটক হ'তে হ'লে তার শুধু কালোক্তীর্ণ হলেই চলবে না। তাকে যুগোপযোগীও হতে হবে। যুগের আশাআকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা, সামাজিক ও মানসিক স্বন্দ, এমন কি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেও উপেক্ষা করতে পারেননি নাট্যকারকুলশ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়ার পর্যন্ত। এ যুগেও জনতার শিক্ষার অন্ততম বলিষ্ঠ ও সার্থক মাধ্যম নটক। তাই নাট্যকার তাঁর নটকে শুধু যুগেও ছবি এঁকেই ছুটি নিতে পারেন না। যুগের সমস্তকে ভুলে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ইচ্ছিত রাখবেন সেই সমস্ত সমাধানের অমোঘ পথ সম্পর্কে। যে কোনো শিল্পই কম বেশি প্রচার ধর্মী। সার্থক শিল্পীমাত্রেয়ই শিল্পকৃতির প্রেরণা তাঁর কোনো না কোনো স্থানিদিষ্ট বোধজাত বক্তব্য বা বাণী যা তিনি প্রকাশ তথা প্রচার না করে ভুলি পান না, শাস্তি পান না। প্রচারধর্মী শিল্পও যে কতো সার্থক হতে পারে তার মাত্র একটি চুড়ান্ত দিতে গিয়ে উল্লেখ করছি আমেরিকান উপন্যাস Uncle Tom's Cabin-এর যার লেখিকা মিসজ্ হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার টো কে স্বয়ং প্রোজেক্টে আব্রাহাম লিঙ্কন অভিনয়িত করেন 'একটা মহান (হাসপ্রবাহ বিরোধী) যুদ্ধের জয়দাত্রী'রূপে। আমাদের দেশেও আছে অনন্ত চুড়ান্ত—'নীলদর্পণ'।

এ যুগের বাংলা নটকগুলির আরও যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ সাহসের স্ববস্তুর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে তাদের।

কুরেকজন রাখা বিস্তৃত হুবক বা কিশোরের চিত্তবিকৃতিজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির বর্ধক-
 চিত্রপটে তেমন গভীর রেখাপাত করতে পারে না। সত্যের নাটক দেখতে আসে
 তবু চিত্তবিনোদনের জন্যই নয়, কোনো মহান আদর্শে উৎসাহ হতে, বিভিন্ন
 জাগরণে অহুপ্রাণিত হবার প্রস্তুতি নিয়েও আসে সে রংগালয়ে। বিচক্ষণ
 নাট্যকার সেকথা ভালোই জানেন এবং তার স্বেযোগও নেন। অন্যরতকে
 উপযুক্তভাবে জাগ্রত ও সংহত করতে তৎপর হন তিনি। তবে উদ্বেগমূলক
 নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা বিপদও আছে। অনেক নাট্যকার প্রচারপ্রদান
 নাটকরচনাকালে প্রচারকৌশলকে আবৃত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে
 মোটেই সচেতন না থাকায় নাটক রসোত্তীর্ণ হয় না। নাট্যকারের উদ্বেগও
 সিন্ধু হয় না। এই ধরনের বেশ কিছু অসাধক নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হচ্ছে
 আজকাল। তবে এটাও ঠিক, যথো যথো এঁদেরই হাত দিগে কিছু কিছু ভাল
 জিনিসও বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। তবু, সতর্কতার সঙ্গে আরও কিছুকাল
 অপেক্ষা ও অবৈক্ষণ না করে তাঁদের নাম নিদিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়তো
 সঙ্গত হবে না।

১) বা সা টি. (২য় খণ্ড)—সুস্মার সেন

২) বা নাট্য সা ই. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩) তবে বিশেষভাবে 'চন্দ্রশূন্য' এবং 'সাজাহান' যে বীতিমত সার্থক ও জন-
 প্রিয় নাটক সেকথা অনস্বীকার্য। এই নাটক দু'টিই চরিত্রগুলির
 অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরুদ্ধ অবস্থার দ্বারা সুবিস্ময়ভাবের মুটে উঠেছে।

৪) একথা বলা বাহুল্য যে এবীক্ষণাধের প্রতীক নাটক মেটার্লিনের অন্তর্গত
 রচিত হয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধের (১২২১)
 যথেষ্ট প্রতীক ব্যবহার করেছেন।

৫) কালের যাত্রা : শঙ্ক ঘোষ

৬) Myth and Modern American Drama

Thomas E Porter — P. 26

৭) ঐ

পৃ: ৪০

৮) ঐ

পৃ: ১২৭

৯) Introduction : Arthur Miller's collected plays.

১০) ঐ

১১) ঐ

১২) "The aim of stanislavsky to make audiences forget they were in a theatre. That of Brecht was to remind them every possible means, " *

Mid Century Drama Laurence Hitchin. P. 72

১৩) "Brecht's subject matter, more even than his technical influence, has an international appeal because it touches at so many points on the conflicts of divided world."

Ibid. P. 73

১৪) 'চতুর্কোণ' : মাঘ, ১৩৮০, সাহিত্যসমাদায় : নারায়ণ চৌধুরী

নকশা

একটি আবাস্তব বস্তু

ডাবলু মুখোপাধ্যায়

বাসে ফিরছিলাম।

আমার সহযাত্রীদের একজন অর্ধশিক্ষিত, কিছু হরসিক, এক গ্রামা মুকব্বি।
অন্তরুজন কোনো ব্রুনিয়াদী কলেজের এক অধ্যাপক। মুকব্বি তাঁকে 'অর্ধপক'
বলে সদোধন করছিলেন। কেন, তা পরে তিনি সভায়া ব্রুবিয়ে দিয়েছিলেন।

মুকব্বি বললেন : বুলো তো হে অর্ধপক, কুনু জাশকে পরাধীন বুলবো ?

অধ্যাপক বললেন : মহামতি বক্রিমস্ত্র বলেছেন। (বলে নিজের ফেলিয়ো বাগ থেকে 'চেতনিক'-এর একটি সংখ্যা বের করে 'তার এক জাংগা প'ড়ে), :
'যে দেশের রাজা অন্তঃদেশের সিংহাসনে আরুঢ় এবং অল্প দেশবাসী সেট দেশ পরতন্ত্র।'

মুকব্বি বললেন : তা হলে কও দেশে আমাদের জাশের রাজা কে ?

অধ্যাপক বললেন : আমাদের দেশে তো রাজা নেই। গণতন্ত্রে রাজা থাকতে নেই.....।

তার কথাটা লুকে নিয়ে মুকুন্দি বললেন : ‘ও, তাই মুকি ভাষে আমাদের হাণী ? তা বেশ, তা বেশ ! তা হাণী কুন্ ভাষের বেয়াহাছ বুলো তো অৰ্পক ।

অধ্যাপক : কেন, এই দেশেরই । ভায়তবর্ষ নামক বিশাল দেশের কোনো এক স্থলে তাঁর বসবাস—

—‘স্বলপনের মোতুন ।’ মুকুন্দি বললেন ।—‘তা দেখতে এ্যাই ভাষেরই হাছবের মোতুন তো ?’

অধ্যাপক বললেন : ই্যা, নাকমুখ সব একটা করেই, চোখকানও ছুটো করেই । কাজেই এই দেশের লোকের মতোই ।

‘ঠিক বুলছো তো হে অৰ্পক ?’ বললেন মুকুন্দি । একটু খতমত খেয়ে অধ্যাপক বললেন : না, আমাদের দেশের লোকদের নাকটা উত্তর দক্ষিণে কিকি ত চাপা, চোখছুটো ঠেং খোলাটে । কিকি হাণীর নাকটা ঠিকলো, চোখ-ছুটো টেজল । যেন বড়লুর পর্যন্ত কী দেখে নিতে চাইছে ।

মুকুন্দি বাধা দিয়ে বললেন : ই্যা, সব দেখে শুনে ‘নিতে’ চাইছে । পূব হাণিয়ার বেটি আমাদের, ‘কিকি’ দিৎ চাইছে না হে । তা কী খায় গো তিনি ?

—কাঁচা দলীপ সন্দোপান্য দেব ভাস্য ‘মুগী’র পেটে মুগী ল’গারে’ শোষেন ।

—কিসে চটেন ?

—মানে ?

—মানে, মাঠে কি ঘাটে তা জামতে চাচ্ছি না । বুলছি এ্যাই কামুন-জামুন গাট মুড়ায় চটেন, এ্যাই আর কি ।

—তা এক শীতের তো আর ব্যাপার নয় । চটেন টাকসিতেই । না, ঠিক হ’ল না নিজের হাণ্ডায় গাড়িতে । তবে পেটোল তুম্পা হলে সেবার লোকলিঙ্গার টেঙ্গেজি তিনি একদিন অসমানে সংসদভবন প্রধান করেছিলেন ।

—কী পটেন গো মিনি জাহে ?

—রেশমি, টেরিলিন এইসব ।

—এ্যাই ভাষের লোকের সাথে ত্যানার সম্পর্কটা কামুন ?

—পূব মধুর সম্পর্ক । যখন তিনি বলেন এই দেশের লোককে তিনি হুপায় একদিলো চাল খাওয়াবেন, হাল লিটার কেবোসিন জোগাবেন । লিঙ্কত বেকারের সখা কমাবেন । কমাবেনই । কারণ যে জামিন্তিক গতে কাগজের দর বাড়িয়ে চলতে পারতেন মহাজনদের টেঙ্গে দিয়ে তাতে বইপাতার দুখুলাতা ও তুম্পাতার দক্ষণ শিক্তের সঙ্গে সঙ্গে ‘লিঙ্কত বেকারের সখাও অনেক

নীচে নেমে যাবে। মোকা কথা হলো, সাধা পৃথিবীতে কুসংস্কার বুদ্ধিসম্পন্ন এমন নেতা বা নেত্রী আর ছুটি নেই। আমরা তাঁর জন্ম গর্বিত।

—তাই বুদ্ধির কব দিয়ে দাঁড়ি কামিয়েই বুদ্ধি গাল ছুঁচার এঁাই হাড়ির হাল।

তাকিয়ে দেখি অধ্যাপকের গালে ছুঁজায়গায় রেডের সূক্ষ্ম কতচিহ্ন।

—তাইপে আমি বুলি হে, তুমতা যাঁরা পঢ়া লিখা ক'র্যা পণ্ডিত মোলভি হও ত্যোনাঁদের মোস্তফিকের ভিয়েনটা ঠিক পুরা হয় না। তাইপেই তুমতা দেখাও জাখো না শুভাও জেনো না। তুমাদের মোস্তফিকের প্যাটের ভিতর খালি কুট ভাট, ফুটফুট। তাইপে তুমকে বুলি হে অর্থপক : খালি প্যাটে কুটের ফুট্যানিতে তুমাদের নেশা জমে ভালো, কিস্কক আমাদের মোতুন চাষা-তুমাদের প্যাটে খালি মুচোড় মাংস, খাল মুচোড় মাংস হে।

এতোকণ যন্ত্রযুদ্ধের মতো কাছাকাছি ক'জন আমরা শুনিছিলাম এই 'বাট' আর 'খজীর গন'-এর কলজে ভেদী কথোপকথন। গলগল এসে পড়ায় অনিচ্ছা-সম্বোধ বাস থেকে নামল'ম। বাড়মুখো হাটেতে হাটেতে ভাবাচলাম : স্বচ্ছ বুদ্ধি নামক বস্তুটা বিশ্ববিজ্ঞানগের চোহন্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বহুং তার বাইরেই গুটা খেলে এবং খোলে ভালো। এলিয়ট সাহেব বলেছেন : 'Much learning deadens or perverts poetic sensibility' আমরা গান হয় শুধু কাবানুভূতিই নয়, কাগ্রান্ত চিত্তকেও নিবল বা বিবর্ত করে দেয় সমাজ-চেতনাতীন অবিদ্যা।

মা ও শিশুকে সুস্থ জবল করে গাড় তুলুন

- ডিপথিরিয়া, হ'প'ক'ফ'ন পক্ষপাতের রোগের প্রতিরোধক হিসাবে শিশুদের ট্রিপল এন্টিজেন দিয়ে দিন।
 - মা ও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষপাতের রোগ প্রতিরোধের জন্য টিটেনাস টক্সয়েড দিন।
 - মাংসের রক্তক্ষার প্রতিরোধের জন্য ফলিফ'স ট্যাবলেট খেতে দিন।
 - অন্ধ ও রাতকাণা শিশুদের ভিটামিন 'এ' অয়েল প্রতিরোধক হিসাবে খাওয়ান।
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নিন।

Advt No. 237/74 75 (পঃ বঃ পঃ সংস্কার)



ঢো র

পন্নব সেনগুপ্ত

চেডমিষ্ট্রেস্‌ স্থির চোখে তাকিয়ে বইলেন দুজনের দিকেই। ওরা কোনো জবাব দিলনা এবারও, ঠাঁড়িয়েই বইল মুখ নিচু করে। পর্দার ওপাশ থেকে উকিঝুঁকি মারছে কয়েকটি যুগ, বড়দিক্‌শিনির চোখে চোখ পড়লেই সবে যাক্‌ছে আবার। অঙ্কের টিচার অঙ্কলিঙ্গির যুগ অঙ্কদিনের থেকেও বেশি গভীর, আর ক্লাস ইলেক্টেন বি'র সেই চারটি মেয়ে—যাদের বাগে খাতাগুলো টিকিনের দটা পড়ার আগে অবধি ছিল, তারা বিব্রত মুখে তাকিয়ে থাকল স্বর্ণা আর দীপালি নামে তাদেরই সহপাঠিনী ঐ দুই আসামীর দিকে। বুদ্ধ হেডক্লার্ক অনিলবাবু একবার পটা ঠেলে বাটবে গিয়ে উকিঝুঁকি মারা-মেয়েগুলোকে ধমকে এলেন সন্তুষ্ট এই ধমকমে অসহ চুপচাপ ভাবটাকে কাটাবার জন্তেই

"তা হলে বলুন অঙ্কলিঙ্গি কি করবেন এদের নিয়ে?" চেডমিষ্ট্রেসের প্রশ্ন, "কি সাজেস্ট করছেন আপনি আজ ক্লাস-টিচার?"

"কি বলব।" অঙ্কলিঙ্গির গলায় নৈরাজ্যিক স্বর, "যা করাব আপনিই ডিসাইড্‌ করুন। এটা ও ক্লাস ডিসিপ্রিনের কোনো ব্যাপার না, গোটা স্কুলের সুনাম-দুর্নামের বিষয়—"

সুনাম দুর্নাম। হ্যাঁ, তা আছে বৈকি সুনাম এ স্কুলের। দুচারটে কলার্বাশপ, ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশটা ফার্ট ডিভিশন, আর মাঝে মধ্যে এক আধটা প্রেস এই স্কুলের পক্ষে প্রায় নিয়মিত ব্যাপারই বলা চলে। ডিসিপ্রিনের খ্যাতিও আছে, কলে গোটা শহরজুড়েই কি সকাল-বিকেল এ স্কুলের নাম লেখা বাস-গুলোকে বুরতে দেখা যায়। সুতরাং এই স্কুলের ইলেক্টেন-বি'র ছাত্রী স্বর্ণা বৃত্ত আর দীপালি গাছা টিকিনের সময় ক্লাসে ঢুকে খাতা চুরি করে পালাবার সময়ে ধরা পড়বে এবং এতবড় গুরুতর ব্যাপারটা নীহারকণা দত্তের মতো যশভারী হেডমিষ্ট্রেস ক্ষমা করে দেবেন—এ ত ভাবাই যায় না।

"তাহলে তোমরা স্বীকার করছ যে তোমরা ওদের খাতা চুরি করেছ?" কঠিন মুখে প্রশ্ন করেন নীহারদি। ওরা মুখ নিচু করেই ঠাঁড়িয়ে থাকে

চূপচূপ। উল্লেখ্য করে অন্তরেতে গুলি : তাপসী, হস্তা, মল্লিকা আর বিমিশা।
ওদের কেমন নিজেদেরকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

“জবাব দাও। চূপ করে থাকলে রেহাই পাবে ভেঁকছে ? জবাব দাও,
চুরি করেছ কি-না ?”

দীপালি মুখ তুলে এতক্ষণে। শীর্ণ দু’গাল বেয়ে জল সেমে আসছে
নিঃশব্দে উপচে উপচে। স্বর্ণার মুখখানা দেখা যাচ্ছেনা, কিন্তু সেও যে
কাঁদছে, সেটা তার অপুষ্ট পিঠ কাঁধের মূড় কাঁপুনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

“হ্যাঁ।” প্রায় অক্ষুট গলায় উত্তর দিল দীপালি এতক্ষণ পরে “আর
তুমি ?” আরেক আসামীও ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে অপরাধ। বড়দিমিমাণির
মুখ লাল হয়ে উঠছে আন্তে আন্তে, অঙ্গুলিদির চোয়াল আরও শক্ত। অনিল
বাহু দম বন্ধ করে ওপরে তাকিয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে কিঁইচ-কিঁইচ শব্দ
করে ঘুরতে থাকা পাখাটার চেয়ে মনোযোগ দেবার যোগ্য জিনিষ যেন আর
কিছু নেই বলে মনে হতে থাকে। তাপসী, মল্লিকাও যেন ছুটে বেরিয়ে
যেতে পারলে বাঁচত দম ফেলে।

“কেন ?” প্রাণপণে চেঁচা করেছেন নীহারদি গাঙ্গারী বজায় রাখতে।
“ওদের খাতা চুরি করেছিলে কেন ?”

কেন। জলে বন্ধ থাকা সযেও দীপালির দুই চোখের সামনে স্পষ্ট
চক্ৰমান হল ওদের বস্ত্রশেখর দুই তুর্গা পিতৃরী লেনের একতলায় প্রায়-অন্ধকার
সীাতসঁতে আরশোলা-সকল ঘর দু’খানা। স্বর্ণার মনে পড়ল ওর মায়ের
কঠোর ওপরে বসানো শীর্ণ মুখখানা যা মাত্র আটদিন বড়বেট মৃদু মৃদু সব
বলিরেখায় কীর্ণ। দীপালিদের রেডিও নেই, ইন্টেলেকের মনীষাদের বাড়িতে
গিগে ও রেডিওর নাটক শোনে। এক্ষণে এই রুমাল সর্বকার উচ্চ মাধ্যমিক
বালিকা বিদ্যালয়ের দোস্তলাষ বড়দিমিমাণির ঘরে ফ্যানের তলার দাঁড়িয়ে ঘামতে
ঘামতেও ওর মনে হল মনীষাদের রেডিওটাই তীব্র স্বরে বেজে চলেছে। স্বর্ণা
ওর খিটখিটে, ক্রয়, ক্রান্ত মায়ের অন্তিহুটাই খুঁজতে চেঁচা করল যেন পিচ্চনের
পদার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। এতক্ষণের মধ্যে ওর এই প্রথম মুখ তোলো।

রাষ্ট্রিকেশন-অর্ডার লেখবার স্প্রেট সজ্জিত নীহারদি প্যাড টেনে নিয়ে
ফাউন্টেন পেনের কাপটা স্থললেন। স্থলের এত বড়রের অজিত স্তন্যম
তছনছ হয়ে যাবে এরকম বড়মাইল মেয়েরা কমা কিংবা প্রজন্ম পেলে।

এইসব মেয়ে ! একদিন এরাও মা হবে। কি দেখাবে ছেলে মেয়েদের !

হ' ! জোরে ছেলে-মেয়েরা জোরেই হবে । সুপার, বিড়লাদ নীহারকণার সুখ
বিকৃত হয়ে ওঠে । কেটে পড়েন এইবার বৈধব্যবাসী হয়ে :

“উত্তর দাঁও ! বদমাইল মেয়ে ! কেন চুরি করেছ খাতা ?” কলমের
হাতটা সজবত প্রচণ্ড বাগের চাপেই একটু একটু কাঁপতে থাকে । কলমের
নিবটার দিকে তাকিয়ে নীপালির মনে হল ওটা যেন একটা বর্ষার ফলা, আর
ও নিজে যেন একটা বুনো খরগোশ, কিংবা হরিণ কিংবা ঐ বকম একটা কিছু ।
নীহারনিকে ওর মনে হতে লাগল প্রাগৈতিহাসিক এক ব্যাধ নারী বলে ।
মনীষাদের রেডিওতে কি কড়ের শব্দ হচ্ছে ? টেলিফোনের টেলিফোনটা কি তীব্র-
স্বরে কনকন করে উঠল ? পর্দার ওপাশের মেয়েদের মুহূর্ত্তন এরকম হকারের
মতো শোনাচ্ছে কেন ? অর্থাৎ কি দৌড়ে পাগিয়ে যাচ্ছে ওকে একা শিকারীর
বল্লভের মুখে কলে ?

“বল জবার দাঁও, বল বড়দ্বিধিমিকে ।” অনিলবাবুর কর্ণধরে কি একটু
সহ্যস্তভূতি মেশানো আছে ? আর একটু মমতা ? যার চোখের মেয়েটা এত
কণ চূপচাপ থেকেও, এবারে হাউমাউ করে টেঁচিয়ে কঁদে উঠল ?

“নীহারদি” পর্দা ঠেলে ইংলিশের টিচার মূলগাতি ঘরে ঢুকেছেন । “বল ?”
বড়দ্বিধিমি “তাকান ওর দিকে : “কিছু বলবে ?”

* * * *

সুপর্ণাদি “যা বললেন তা হল এই : গত দু'সপ্তাহ ধরে নীপালী আর
অর্ণা চোমটার আনছেন ওর ক্রাসে । গোডারদিকে দুয়েকদিন কিছু না বলেও
মাকে একদিন উনি প্রচণ্ড বাগাবাদি করেন, বাড়িতে চিঠি দেবার ভয় দেখান ।
গতকাল আবার ওর ক্রাস ছিল—কালস সেট একটু ব্যাপার । দুজনকেই ক্রাস
থেকে বার করে দিয়েছিলেন উনি টাক না করে আনার জন্তে, সঙ্গে সঙ্গে
বলেছিলেন সামনের দিন খাতা না আনলে ক্রাসে ঢুকতে দেবেন না সামনের
দিন অর্থাৎ আসছে কাল । ইতিমধ্যে এট ঘটনা ।

অকলিমির চোখাল এর মধ্যে নরম হয়ে গেছে । বড়দ্বিধিমি চমকা গুলে
বেধে চোখ বুঁজে শুনছেন । তাপসী মজিকাথা অস্তিত্ব হয়ে অনিলবাবুকেই
কিস্ কিস্ করে জিজ্ঞাসা করে ওরা চলে যেতে পারে কি না নীপালি:খাল
ফেলে অনিলবাবু নিজেই ঘরের বাইরে যান । পিছন পিছন ওরা চাফজন ।
টাকিয়ে থাকে শুধু দুই আসামী । একটু আগের ডুববে ওটা কাগাটা এখন
বন্ধ ।

হুপর্ণাদি হরত আরও কিছু কথা বলবেন ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীহারকণা মুখ তুললেন :

“খাতা ছিলনা তোমাদের ?” নিঃশব্দে বাড়ি বাড়ি দুজনেই পুতুলের মতো ।” বাড়িতে বলনি কেন খাতা লাগবে ?” কথাটা বলেই হেডমিস্ট্রেস বুঝতে পারলেন ঠিক হলনা প্রশ্নটা । এতক্ষণ বাগের মাঝার খেয়াল হরনি, ওদের দিকে ভাল করে তাকাতোই নজরে পড়ে যে, এটমাত্র যে চারজন মেয়ে ঘরের বাইরে গেল তাদের সঙ্গে এদের দুজনের স্বাস্থ্য, চেহারা, পোষাক সব কিছুই তফাৎ আছে । গাঢ় সবুজ পাড় সাধা শাড়ি রত্নমালা ইত্যুনের বড় মেয়েদের ইউনিকর্ম , এদের দুজনের বাঁ-কাখে ইত্যুনের নামলেখা ব্রোচ দুটো আছে বটে, কিন্তু শাড়ির পাড়গুলোকে এখন কই করেই সবুজ বলে বুঝতে হয় । তাপসী, বিদিশাদের মতো পাটভাড়া ত নয়ই, বরং বোঝাই যায় অস্বস্ত পাঁচ-ছদ্দিন ধরেই পরা হচ্ছে । নীর্ণ, শুষ্ক, কয় কালো মেয়েদুটোর তরাত্ত করণ মুখ দুটোর ঠিক পাশেই লাল-সোনালি শিঙের ছাপা শাড়ি পড়া হুপর্ণাদির ফর্সা মুখখানাকে অসম্ভব বেমানান লাগছে ।

“হুপর্ণা তুমি বোলছ না কেন ? বোস ।” হেডমিস্ট্রেস আগ্রাণ চেষ্টা করেন সহজ হবার জস্তে । কি ভেবে ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, “তোমরাও বোস ।”

হৃচ্চকিয়ে পরস্পরের দিকে চায় দীপালি আর বর্ণা । এ কি সেই নীহারদি যিনি সেদিনও স্রোৎ ধমকে চূপ করিয়ে দিয়েছিলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত সান্তান কাবুল গাঙ্গুলীকে, আর সোজা আঙুল উচিয়ে গেটের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার ‘হুগ হুগ জিও’ জিগির তোলা সাক্ষোপাষদের । কাবুল কেন, নীহারকণার ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন কোনো সাক্ষরের কথা এ ইত্যুনের সঙ্গে হুক কেউই মনে করতে পারেন না । উচু ক্লাসের ফাজিল মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, উনি নাকি স্বামীস সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মাঝে মাঝে “লাইলেন্স, ভাট আই ওয়াট” বলে ধমকে ওঠেন ! এটা খুব সম্ভব ফাজিলগুলোর বানানো, তবে খোদ সেক্রেটারীও যে ঠকে লমকে চলেন, তার পরিচয় বহবাওই পাওয়া গেছে ।

সেই নীহারকণা । ওরা ঠিক নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না । ভীতু চোখে হুপর্ণাদি অভলিদির দিকে তাকায় , অভলিদির ইঙ্গিতে ওরা খুব আন্তে আন্তে বসে । যেন চেয়ারের আগুয়াজ হওয়াটা খুব বড়পোড়ের একটা

অপরাধ হয়ে থাকে ।

“তোমার মৌল নাকার কত ?” কর্ণার উদ্বেগে কলর তুলে তুমোন বড়হিদিদি ।

“বাইশ ।”

“আর তোমার ?”

“সাত ।”

খন্ খন্ করে কি সব লেখেন উনি । বেশ বাজাতে অপ্ৰসাদ এসে ঢোকে । সিঁপটা হাতে দিয়ে বলেন “রবিবাবু ।”

ক্যানিয়ার রবিবাবু খাতাপত্র দেখে যা বলে গেলেন তার মূল বক্তব্য হল : কর্ণার মার্চ থেকে মাইনে বাকী, আর হীপালীর আত্মরাত্রী থেকেই । ওর সেতন চার্জও দেওয়া নেই । খাতারও নাম নেই মালদ্বয়ের ধরে । সেটা ক্যানিটার অফিসিয়ারও মনে পড়ল এখন ।

বোধহয় এই প্রথমবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন জীবনে নীহারকণা হস্ত এম এম. সি, বি. টি, ডিপ. ইন এড. (এডিন.) । কি করবেন এখন উনি নিজেই স্থির করতে পারছেন না । বিবেকের সঙ্গে আপোষ ? না-কি ডিসিগ্নি-ইনভিসিগ্নিনের প্রায় তুলে মানবিক দিক দিয়ে বিবরণীর করালা ?

নিজেই ভাবলেন, চিন্তাটা খুব কেতাবী হয়ে যাচ্ছে অফিসিয়ার অনেকদিনের চিঠার, নীহারকণার রিটার্নসমেন্টের পর উনি হেডমিস্ট্রেন হস্তও পারেন—ওঁকে বলা যায় কথাটা । কিন্তু এই মেয়ে ছোটোর সামনেই ? নাঃ, সেটা হয় না ।

“তোমরা দুজনে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও ।” কান ধাঁ-ধাঁ করে উঠল ওদের । এতক্ষণ যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—আবার ঘরের বাইরে যাওয়া মানেই লাভশো মেয়ের চৌকশো চোখের সামনে... । টিকিনের ঘণ্টা এখনো ফুরার নি..... মুখে মুখে ইকুলার নিচ্চর চাউর হয়ে গেছে । জোড়া জোড়া চোখে সবাই ওদের দেখবে..... । দুর্গা পিতৃরী পেনের কত মেয়ে পড়ে এখানে । হীপালি ভাবল । কর্ণার ঠিক পাড়ার মেয়ে এখানে কেউ না পড়লেও, ওর মামার বাড়ির পাড়ার বেশ কিছু মেয়ে এই ইকুলের ছাত্রী । অনেকেরই চেনে ভাল করে ।

কিন্তু বেরোতেই হবে । বড়হিদিদির কথা কলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কাজে

পরিণত হওয়াই এই ইচ্ছার নিয়ম। পূর্ণার ওপায়ে ওয়া বিয়ে হইবার
বীজ-বীজ।

আনিষ্টাণ্ট হেডমিস্ট্রিস বীরাঙ্গি এবং আর সব মিসিসের টিচাররা চমকে
উঠলেন স্বপ্নাঙ্গির মুখে বড়দিকিমণির সিদ্ধান্ত শুনে। নীহারি কি পাগল
হয়ে গেলেন? সরকারী গ্রাণ্টের ওপর নির্ভর করে যে ইচ্ছাকে সারা বছর
চলতে হয়, সেই ইচ্ছাে এমন কাণ্ড ঘটবে? আর ঘটাবেন বরং নীহারকণা
দত্ত, যিনি আটচল্লিশ ঘণ্টা বাংলা-বন্ধ হয়েছিল বেয়ার, সেবারে দায়োয়ান
পাজিরা আর বেয়ারা জগৎপ্রসাদকে নিয়ে একা এত বড় ইচ্ছল বাড়িতে দুটো
দিন কাটাতে চেয়েছিলেন, পাবেননি নেহাৎ সমস্ত টিচারের সমবেত বাধা
কিংবা অস্বস্তি কিংবা উত্তরওই ফলে। সেই বড়দিকি-না বলেছেন, সস্তা-
দত্তে পাড়া-কাগজ-বই কেবোলিনের দাবীতে ছেলেরা সামনের হস্তায় যে টাইক
কেকেছে তিনি তাতে বাধা দেবেন না, বরং টাইকের পরদিনও ইচ্ছল খোলা
না রেখে সমস্ত মেয়েদের নিয়ে রাইটার্সে যাবেন শিক্ষারত্নীর সঙ্গে দেখা করতে!

লেখক টিকিনের ঘণ্টা ঘুরেলে দেখা গেল আরও একটা অভাবনীয় দৃশ্য।
মোড়লার সিঁড়ির মুখে সর্ণা আর দীপালী নামে ইলেক্ট্রন-বি'র খাতা-চোর
সেই মেয়েদুটোকে বৃকে জড়িয়ে ধরে অগোচরে এবং নিঃশব্দে কেঁদে চলেছেন
একজন। তাঁর নাম নীহারকণা দত্ত। শেছেন জড়িয়ে আরও চারটি মেয়ে :
তাপসী, কড়া, মঞ্জিকা, বিদিশা। তাদের চারজোড়া চোখও ত টাপু-টাপুর
বানভালি বলে মনে হল যেন সিঁড়ি-দিয়ে-উঠতে-থাকা মেয়েগুলোও সবায়েরই।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকার

মণি বাগচি প্রণীত

যদুনাথ সরকার : জীবন ও সাধনা

৪

বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্র বোস

বইদুটিতে আছে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের অন্তরঙ্গ
পরিচয়।

প্রত্যেক বাঙালীসন্তানের অবশ্য পাঠ্য



বিকৃতিকূষণ প্রসঙ্গ

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিংশ শতকের তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে সব কথাসিঙ্গীর আবির্ভাব বিকৃতিকূষণ বলসংসারার্থ্য জীবের অন্ততম। কালহুয়ে তিনি কল্লোলী কিত্ত মানসধর্ম্যে তিনি তিন্ন গোত্রের। বায়রণ বলেছিলেন, 'I awoke one morning and found myself famous.' পথের পাঁচালী প্রকাশের পর বিকৃতিকূষণও অল্পরূপ উক্তি করতে পারতেন।

পথের পাঁচালী বাঙালী উপস্থাপনাঠিকদের অপার সত্য্যব দিয়েছে। শব্দচন্দ্র অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, বিধাগ্রস্ত মানসিকতা নিয়েও পূর্বনো ভিত্তির মূল্যবোধের জগতে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়েছিলেন। তাঁর পুঁকেই এচলিত স্তায়-অস্তায়, শিব স্তম্ভের ধারণার ভিত্তে সংশয়ের ফাটল ধরা পড়ছিল। বিশ-জিশের দশকের জিশক মধ্যবিত্তের বিধা—একটিকে শব্দের শিক্ষার আদর্শ, দেশাত্মবোধ, সভ্যাগ্রহ, সন্তানবাহ, সমাজভঙ্গ, অন্তর্দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপস্থানের পিছুটান শব্দসাহিত্যে লক্ষ্যীয়। সেজন্যই বোধহয় কল্লোল-গোষ্ঠী মোহিতলালকে অল্পক দুগুণিতক কবি রূপে এবং শব্দচন্দ্রকে কথাসিঙ্গী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

অন্য শিল্পচেতনার কল্লোল-লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে শব্দচন্দ্রের কি হৃদয়ীয় পার্থক্য। আবার একথাও সত্য, শব্দচন্দ্রের উদ্ভাবনিকার থেকেই কল্লোলী-দের যাত্রা শুরু। অচিন্ত্য প্রেমেই শৈলজানক মানিকের মত বিকৃতিকূষণের কথা সাহিত্যেও ভাবনায়ীয়ে শব্দচন্দ্র উপস্থিত। তারাপ্রবন্ধও এর ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু কোন শিল্পীই হব্ব আর-একজনের মত হন না। হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি এবং পর্যবেক্ষণের ভঙ্গি একই বেশ-কালচিহ্নিত দুই শিল্পীর রচনার ভিন্ন স্বাদের হতে বাধ্য। বিকৃতিকূষণ বাংলা সাহিত্যে কোন তাঁর উদ্ভাবক উদ্দীপক ভাবধারা, কোন কালাপাহাড়ী বিরোধ আনেন নি। অত্যন্ত শান্ত মূহু কোমল স্বাদের এমন এক প্রসঙ্গতা নিয়ে এসেন যা বাংলা সাহিত্যে অতাবিতপূর্ব অন্যতম আনন্দের রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই শ্রেয়ঙ্কিত :

‘আজ খুসরু সন্ধ্যার একবার শিহন করে ডাকাতের ; দেখলুম, এই পথটি
বহুবিস্তৃত পথচিহ্নের পদাকলী, ভৈরবীর হয়ে বাধা ।’

যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সঁহাটি কথাকেই এই পথ
আপনার একসিঁদা ধূলিয়েথায় সংকিশ্ল করে এঁকেছে, সেই একটি যেথা
চলেছে স্বর্ধোদয়ের দিক থেকে স্বর্ধান্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে
আর-এক সোনার সিংহদ্বারে ।’

(আশ্বিন ১৩২৬ : পারে চলা পথ) স্মৃতিতেই যেন পড়ে পথের পাঁচালীও
উপসংহার ।

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে হাস বঁধ, মনস্তর, মহানুগ পার
হয়ে চলে যায়...তোমাদের মর্মের জীবনমগ্ন-শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে,
পথ আমার তখনও ফুরার না... চলে . চলে . চলে এগিয়ে চলে .

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ ..

এমন কি ‘অনির্বাণ’ বিশেষণটিও রবীন্দ্রানুসরণ । একটি কাব্য-স্মৃতি
কৃত্রিমত্বচর্চনার যে-বহাশিল্পের ইঙ্গিত ছিল, পথের পাঁচালী অপরাধিত (সাধারণ
অর্থে বিদূতিভূষণের রচনাসমগ্র) উপস্থানে তারই পূর্ণায়ত প্রকাশ ঘটেছে ।
সৈনিক থেকে সন্ন্যাসী কথাসিঁদার মধ্যে একসিঁদা বিদূতিভূষণ বন্দো-
পাধ্যায়ই বিশেষ অর্থে নিঃসঙ্গ বীজপথিক । শত্ৰু নিজে বলেছেন, নটনীড়-
চোখের বালি তাঁর প্রেরণার উৎস, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের
গল্পোক্তানে শত্ৰুচরিত্র ছক পরিমুট, শৈলজানক্য গল্প-গল্পের প্রদর্শিত পথেই
পল্লী ও শহরভঙ্গীর সমাজকে দেখেছেন । কিন্তু কারো মানসিকতার কবি
রবীন্দ্রনাথের আত্মকরণ ঘটেনি । একসিঁদা কথাসিঁদা বিদূতিভূষণই রবীন্দ্রনাথের
নির্গতাত্মকতা, নির্গতাত্মিক আধ্যাত্মিকতার সার্বক উত্তরসাধক । কবির
মধ্যে অনেকেরই রবীন্দ্রনির্গতাত্মকতার শব্দিক হয়েছেন, কিন্তু গল্প-উপস্থানে একা
তিনিই স্বাভাবিক অর্থে নির্গত রসিক । এ ক্ষেত্রে কথাসিঁদা রবীন্দ্রনাথও তাঁর
সঙ্গে তুলনীয় নন ।

কিন্তু তাতে কি কথাসিঁদার বিদূতিভূষণের উপস্থানের দ্বারা বেড়েছে ?
এ প্রেরণার জবাব দেওয়া কঠিন । সেই প্রথম প্রকাশের সময় থেকে আজও
যার অনপ্রিয়তা অক্ষুর, সেই পথের পাঁচালীর অমরতার সন্দেহ করবে কে ?
আপন সত্যের জোরেই কালপরিবর্তনের মহাধিরে পাঠকের কচিবদলের পরও
তার সমাদার সমান হয়েছে । এর কারণ যদি শুধু লেখকের নির্গতচৈতন্য

ধূঁজে পাওয়া যেত, তাহলে সোনার ভরী চিত্রা-বনবানী সুখবীরও অল্পরূপ জনচিত্তহারিতা স্বীকৃতি পেত।

যে আগ্রহ নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক ছোটবেলায় রূপকথা বলেন, তার সবটাই বাৎসল্যানিষিত নয়, সন্দেহই মনে মনে হারানো শৈশবের অন্তর বেধনা আছে, অজান্তেসারে সেই জীবনসংগ্রামহীন শৈশবে ফিরে যাবার অবকাশ করে দেয় রূপকথা। পথের পাঁচালী যদি মহাকাব্য হয়, তবে তা অল্পরূপ Nostalgia-র মহাকাব্য। এদেশে শিল্পবিম্বব এখনো সমাধা হয়নি, তাই আমরা কেউ পান্ডিত্য অর্থে খাঁটি নাগরিক নই। আধুনিক 'City-Novel' তাই আমাদের উপভাসের বৈশিষ্ট্য নয়। গ্রাম ছেড়ে-শহরে-আসা মাহুযবের কাছে গ্রাম সবণেয়েছির দেশ, সেখানে আছে স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকৃতির অরূপ দাক্ষিণ্য, মাহুযগুলি অত্যন্ত সরল, এ এক অগ্নের গ্রাম, বাস্তব নয়। রোমান্টিক মায়-কাজলের চোখে বলা সহজ—'বড় ভাল লাগে আমার পাড়ারগায়ে বাস।' বিভূতিভূষণের অপূর্ব স্রষ্টার কাছ থেকে সেই স্বপ্নাকান চোখে নিরেই আবির্ভূত। তাই হরিচরণের কটোর সংসার, মার নিলিগু গাইন্যত্রত, ইন্দির ঠাকুরপের শোচনীয় মৃত্যু, দাক্ষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্গা, হরিচরণ, লীলা, সর্বজয়া ও অপর্ণার মৃত্যু—সবই পর্যবেক্ষকের মত অপূ বেখে গেছে, কখনো পুলকে উদ্ভাসিত বা বেধনার অভিভূত হয়নি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মৃত্যু আছে, মৃত্যুশোক নেই। তাঁর মতই নায়ক অপূ 'আবাদনপত্নী,' বিরহবর্ণনপত্নী নয়।

নিষ্কলিপূরের অপূ কান্ধিতে একটু বদলেছে। তারপর মনসাপোতা, কলকাতা, চাঁপদানী আবার নিষ্কলিপূর। অপূ যে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্তমনস্ব হতে পারলনা এতে উপভাসের চ'রিত্ররূপেই তার মহিমা খব হল। কাজলকে নিয়ে নিষ্কলিপূরের প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য—(১) বাটের পৃথিবীর সংঘাতে সে আহত, তার যুথোযুগ্মী হতে একান্ত অনাগ্রহ, ২) ছেলে কাজলকে অপূ নিজের শৈশববয়সেই প্রতিষ্ঠা দিতে চায়, বাটের পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে নারাজ। অর্থাৎ এক প্রযত্নে দুই অর্থে অপূর শৈশবে প্রত্যাবর্তন। নিজে সে ফিরে এসে জীবনের সঙ্গে পৌছল, কাজলকে সেই শৈশবতীর্থে পৌছে দিয়ে নতুন করে নিজেকেই সে প্রতিষ্ঠিত করল।

ত্রিকান্ত ভিনপরের (চতুর্থ পর্ব এক্ষেত্রে তুলনায়োগ্য নয়) কাহিনীতে পর্যটক ত্রিকান্ত, অন্নদাহিদি, নিকদিদি, ইন্দ্রনাথ, নটনদা, বাজলদ্বী, অতয়া, কবললতার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যেহেতু ত্রিকান্ত-কাহিনী স্মৃতিচারণাত্মক,

তাই পূৰ্বাপৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশদ বৰ্ণনা নহৈ। কিন্তু কিশোর ও বৃদ্ধক শ্ৰীকান্ত যে অভিজ্ঞতাৰ ধৰণে অনেক বৰ্ণনা কৰিছে, তাৰ ইঙ্গিত আছে। শ্ৰীকান্তকেও জীৱনসংগ্ৰামে পলাতক বলা যায়। কিন্তু তাৰ সত্যৰ সন্ধানখনা এক বিশ্লেষণ-প্ৰৱণ ভাবুকতা তাকে উপস্থাসেৱ চৰিত্ৰৰূপে বিশিষ্টতা দান কৰিছে। শুভদা অৱদা এক ধাতুতে গড়া, অভয়া ভিন্ন ধাতুৰ। এই বিচিত্ৰ জীৱন-ধাৰণাৰ শ্ৰীকান্তেৰ ব্যক্তিৰ উজ্জলত্ব হৈছে, তাৰ জীৱনোপলব্ধি অভিজ্ঞতাৰ ও মননে প্ৰৌঢ় অৰ্জন কৰিছে। বিতুতিভূষণেৰ অণু কাৰুণ্য জিতু কুশল পাহাড়ী কাৰও সম্পৰ্কেই তা বলা যায় না। তাৰা সকলোই নিগৰ্গতক, পৰা প্ৰকৃতিৰ বচনময় টানে দিনযাপনেৰ প্ৰাণধাৰণেৰ মানি ভুলে যায়, সবদা অস্তঃকৰ্ণে শোনে 'শি যেন মহান গীতি বাজিছেছে সমন্বয়ে।

আদৰ্শ হিন্দু হোটেল উপস্থাসেৰ প্ৰট ও পৰিবেশ কুখ্যৱস্থা জীৰ্ণ সমাৰ এবং বিচিত্ৰ মানবচৰিত্ৰাংকন দাবি কৰে। কিন্তু এও যেন এক বাস্তবতাৰ বোম্বাৰ। হাজাৰীঠাকুৰ যেন বোম্বাৰেৰ সেই পৰমহংস, সংসাৰেৰ মানিময় সৰোবৰেৰ বিচৰণ কৰিলেও তাৰ অনায়াসে কোলাও কদম্পৰ্শ ঘটে না, স্বপ্নেৰ কৈলাসে হাজাৰী ঠাকুৰেৰ মন মুক্তি পায়। 'বনে-প'হাড়ে ধেকে 'দেবযান' প্ৰকৃতিৰ হাত ধৰে পৰা প্ৰকৃত লোকে উত্তৰণ। দুৰ্গাৰ হাত ধৰে অণু যখন শৈশবে বেৰিয়ে পড়েছিল প্ৰকৃতিৰে জানতে, তখনই এই নিসৰ্গযাত্ৰাৰ সূচনা।

সেজন্তেই বিতুতিভূষণেৰ প্ৰথম ৰচনাই তাঁৰ প্ৰেৰ ৰচনা। কৰাটা স্তনতে ভালো, আশতৱষ্টিতে প্ৰশ সাস্থ্যক। কিন্তু সাত্য কি এটা Compliment / প্ৰথম ৰচনাৰ থাকে লেখকেৰ অভীপ্সা, জীৱন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁৰ বৌলিক পৰ্যবেক্ষণ। কিন্তু সে অভীপ্সাৰ সঙ্গে অভিজ্ঞতাৰ পাক হয় ধীৰে ধীৰে, পৰ্যবেক্ষণও পায়ণতি লাভ কৰে। তাঁৰ জীৱন-অধেষা জীৱনজিজ্ঞাসাকে ভেঙে ভেঙে গড়ে, নতুন পৰিধি দান কৰে, পুৰনো ধাৰণাৰ ৰূপ-বড় বদলায়। তবেই তো একটি সাহিত্যকীৰ্ত্তিৰ প্ৰশংসাৰ পৰেও আবার ৰচনাৰ আন্তৰ তাগিদ আসে। এ জীৱন লইয়া আমি কি কৰিব ?—এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰসন্ধান জীৱনে ও শিল্পে নতুন সম্ভাবনাৰ জন্ম দেয়। এই মহতী অতৃপ্তি বিতুতিভূষণে ছিন্ননা। ছিল না বলেই বিতুতিভূষণেৰ শিল্পীমানসেৰ বিকাশ কিৰ্ত্তন নহৈ। হাতি ও ওয়াৰ্ডওয়াৰ ছুজনেৰই নিসৰ্গভাবুকতা একদেখদৰ্শী, তবু হাতিৰ পৰ্যবেক্ষণ বাস্তবতা সম্বন্ধে, তাই তিনি উপস্থাস না লিখিলেও বলা যেত, ঐ নিসৰ্গজী উপস্থাসৰচনাৰ

অহঙ্ক। কেননা উপভাস প্রেমমত্ত এবং শেখরঃ বাস্তবজীব নিম্নঃ । কিন্তু
 গুণার্ভবাধের যে অধ্যাত্মমর্মে উদ্ভব দেখানে কথিকল্পনাও বিশর্ভক, উপভাসের
 তো প্রবেশাধিকারই নেই । বিকৃতিভূষণের মানসিক গঠনের যদি কোন
 পক্ষিপতি লক্ষণীয় হয়, তা হল গুণার্ভবাত্মীয় স্নিহিসিদ্ধির আত্মগীর্নতা—অর্থাৎ
 উপভাস শিল্পের অঙ্গবর্জন । চাপমানি-পর্বের উপভাসনার বিকৃতিভূষণের আশ্চর্য
 উদাসীনতা, অসুখ মানসিক জড়তা এবং পটেশ্বরীকে দিগে আবার নিজের হকে
 পট-পরিবর্তন ভাংপর্বপূর্ণ ।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নিশ্চিন্তপুর অণুকে বাল্যজীবনে কবি
 করতাহিল—গ্রোট বহুসে তাহাকে দার্শনিকের ও বোম্বীর ধ্যানরূটি উপহার
 দিয়। তাহায় দিগ্‌বিজয় জাহায পাথের সফর করিয়া দিল । এই উচ্চতম
 দার্শনিক ভয়েট এই মহাকাব্যের স্তাব বিরাট উপভাসের (পদের পাঁচালী-
 অপভ্রাজিত বৃজভাবে) পরিচয়ালি । ' বিকৃতিভূষণের বৈশিষ্ট্য স্তম্ভর বিরোধিত
 হয়েচে, এবং তাঁর যে জীবন-বিস্তার পেকে চারতন্ত্রগুলির উদ্ভব তার স্বরূপ বাখ্যাও
 যবার । কিন্তু বিকৃতিভূষণ মহাকাব্যের ব্যাপি, গভীরতা ও বহুপাখ্যায়িত বিস্তার
 কোথায় ? মহাকাব্যের ত্তকি অবজেকটিভ, বিকৃতিভূষণের পক্ষে যা অসম্ভব,
 তাঁর সাবজেকটিভিটি বা আত্মপ্রক্ষেপণ অতিস্বাত্তিক বলেই লেখকের অতিজ্ঞতা
 ভারেরিগুলি আর নায়কদের মানসিকতা হবৎ এক । সব উপভাসই কমবেশী
 autobiographical, কিন্তু বিকৃতিভূষণে শিল্পের আত্মপটুকুও বড় অল্প । সত্যি-
 কথা বলতে কি, বেদান্তের 'সবঃ কভিঃ ব্রহ্ম' ভক্তের ঘোর পুজবারুক্ষে আমাদের
 চোখে এমন ভ্রমোচ্চাভাবে লেগেছে যে, এই স্তম্ভ ছুঃখ আশা নৈরাশ্রের বাস্তব
 স্ফার থেকে রেহাই পেলেই আমরা খুই । তাই বলরুটির চেয়ে আমাদের
 কাছে ধ্যানরুটি বড় । আসলে রসরুটি 'ভাগ করে, অর্থাৎ উপভাসের জগৎ
 ছেড়ে দিগেই ধ্যানলোকে প্রস্থান করতে হয় । বিকৃতিভূষণ তাই করেছে ।
 'আছে ছুঃখ, আছে মৃদু, বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি তবু অনন্ত তবু আনন্দ
 জাগে'—এই বোধ নিয়েই সব সমস্তকে মেখেছেন । তাই কোন সমস্তার
 অস্তিত্বই দৃঢ়মূল নয় ।

অথচ বিকৃতিভূষণ জীবন-পলাতক শিল্পী নয় । ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ
 চরিত্রই অনতিজাত । অতাব অনটনের কথা সবগুলিতে আছে । বিরহদলে
 পল্লী-পরিবেশ শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজেরই অংশ একটি প্রাণোচ্ছল কলকাতার
 মেয়ে বধু হয়ে এল গ্রামে । সব পরচর্চা পরনিন্দা সে হেলায় জয় করলে ।

উপসংহারের করণরস স্বপ্নশর্পী, কিন্তু বিকৃতিভরণের সাহিত্যে করণ রস দুর্লভ । 'পুইমাচা' তার প্রমাণ । সহায়হরি ও অরুণা আসুকে হরিহর ও সর্বজগদ্বাসী অন্ত সৎস্বয় । দ্বিবিদ্র জ্ঞান পরিভারের তেতরেক ছবিটি অনবদ্য । সাহিত্য খেজুর রস পুইমাচা, পিঠে ইত্যাদিকে নিয়ে শুধু দুধের ছোট ছোট বুদ্বুদ । যে ক্ষেত্রে বাবার অত অল্পপত, বাবা-মায়ের নৈকটা বুনা কচু সংগ্রহকে ছাড়িয়ে যেখানে একটা কল্লম্বর্গ রচনা করেছিল, সেখানে বাবার মুখে ক্ষেত্রিক মৃত্যুর নিরাবেগ নিলিপ্ত বর্ণনা এবং মাছধরার সাথী বিষ্ণু সরকারের সঙ্গে মাছের চাব নিয়ে আলোচনা ('পিঁপড়ের চোপে বুড়ির চাব তো স্থবিরের হবে না') অদ্বুত মনে হয় । কিন্তু বিকৃতিভরণের জীবন-বিস্তারের চক্রে চরিত্রের এই ধরণই প্রত্যাশিত ।

শিল্পীর জীবনবিস্তার বলতে কি বুঝি ? ই এম কষ্টের উপস্থাপন প্রসঙ্গ আলোচনার 'প্যাটার্ন' বলতে উপস্থানের শিল্পরীতিকেই নির্দেশ করেছেন ।

কষ্টের কথা : 'It (pattern) draws most of its nourishment from plot.' তিনি এই 'প্যাটার্ন' অভিধায় স্পষ্টতঃ উপস্থানের formal pattern বা আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ্য করেছেন । সেজন্যই প্রচেষ্টা সঙ্গে তার অভিন্নতা , এবং বিশেষ নান্দনিক বোধ স্ফার কবাই একমাত্র লক্ষ্য । প্যাটার্ন সাধারণতঃ ক্ষুদ্রশ্রেণীর—'Hour-glass' এবং 'Grand chaine' । প্রথমটিতে আছে শিল্পের দাবি অস্থায়ী জীবনের 'Castrating' হেনরি জেমস এই পদ্ধতির ঔপন্যাসিক । তিনি মানবচরিত্রের সম্পূর্ণ আলোখ্য অঙ্কন করেন না করে একটি চিত্তাঙ্গীল, অল্পভূতি-সমরিত মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সারসংকলন মাত্র উপস্থানে স্থান পেয়েছে ।

কিন্তু 'প্যাটার্ন' কথাটি সম্প্রতি নতুন তাৎপর্যে গৃহীত হয় । আরনল্ড কেটল 'প্যাটার্ন' অর্থে বুঝিয়েছেন 'জীবন বিস্তার' । জীবনের খণ্ডীকরণ বা Castrating নয়, ঔপন্যাসিকের কাজ সমগ্র জীবনকে দেখা এবং তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে চরিত্রশালায় রূপান্তরিত করা । এই হ'ল কেটলের মত । বর্তমান আলোচকও এই মত সম্মত মনে করেন । জীবন সম্বন্ধে লেখকের যে ধারণা তার থেকেই উপস্থানের বিশেষ Journal pattern-এর উদ্ভব । 'Pattern is the way life evolves.' সেই প্যাটার্নকেই আমি 'জীবন-বিস্তার' বলতে চাই । তার ব্যাধাই উপস্থানের বক্তব্য, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাগ্রহণ, এমনকি 'nature and profundity of the pattern of a book'

নিয়মিত কৰ্ম :

বহি কেট্‌লের 'প্যাটার্ন' অর্থে 'জীবন-বিস্তার' যেনে নিই, তাহলেই বিশেষ বিশেষ ঔপন্যাসিকের চরিত্রাঙ্কনে একই ছকের পুনরাবৃত্তির কারণ বুঝতে পারিব। যেমন হেনরি জেমসের চরিত্রকে পাবনা ডিকেন্সের উপন্যাসে, তেমনি জেমস জয়েন্সের চরিত্রও কোথাও নেই, হরত বা মার্শেল প্রভৃতি তাদের অন্তর বেশে দেখা যেতে পারে। লেখকের এক জীবন-বিস্তার থেকে এক প্রেমীরই চরিত্র 'চিন্তা স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের বিক্রমে একদা অভিযোগ উঠেছিল, তাঁর সব নবনারী মূলত একই আঙ্গলে গড়া, পুরুষ যেন সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নারী যেন প্রকৃতি, সব শাক্তির আধার। কিন্তু এ অভিযোগ কোন ঔপন্যাসিক পক্ষকে প্রযোজ্য নয় ? বস্তুত বিশেষ লেখকের জীবনবিস্তারের আলোকেই তাঁর উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি বহিমৌ জীবনবিস্তারের নিরিখেই বুঝতে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনবিস্তার অনুযায়ী তাঁর সৃষ্ট নবনারীর আঙ্গলও বস্তুত।

বিত্তিত্বভরণের জীবনবিস্মাশ শাস্ত জীবনচন্দ্রে বিশ্বাসী। চোখের সামনে
পরিবর্তমান বিশ্বের আবাবচিত্ত বেদনা তাঁর চিত্তের গভীরে দাগ কাটেনা।
'ভূমানন্দময় হবে, এট আবারণ ক্ষয় হবে'—এট চল তাঁর জীবনবর্ণন। তাই
তাঁর চারদিক্তলি হয়েচে ভাবক স্বপ্নচারী অধ্যাত্মপথিক।

তত্ত্বা, চরিত্র কল্পনার দৈন্ত বা উপস্থাপনার অসঙ্গতি থেকে উপস্থানে যে-সব দোষ বর্তায়, বিড়তিভূষণে তাঁর চিহ্ন নেই। তাঁর যেখানে সীমাবদ্ধতা, সেখানে তাঁর শিল্পচেতনার অভাব নয়, জীবনবিস্তারের বৈশিষ্ট্য দায়ী। বরং শারঙ্গীকরন ভবে, সব রকম পরিবেশে তিনি অক্ষর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন ‘পশু দেবশু কাব্যঃ’। যত সেই কাব্যের রূপ রস বর্ণ গন্ধ দেখেছেন, মাধুর্য আবাদন করেছেন, তত মুগ্ধ হয়েছেন। নিবন্ধর মুগ্ধতার অভিভব বিবল শারঙ্গত শক্তির পরিচয়বহ।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব আশা করা যায় না।

গম্ভীর বহুর গরে

ডঃ অমলেন্দু মিত্র

[একটি স্বল্পালোকিত কক্ষ। এক স্ববির বৃক্ষ মৃদুরে টুবি হয়ে বসে।
বৃক্ষের নাতি একটি তৈলপাত্র হাতে নিয়ে বাইরে থেকে ভেতরে এল]

দাহু # কি-বে তেল পেলি ?

নাতি # হ্যাঁ দাহু।

দা # এখন দর কত রে ?

না # পঞ্চাশ টাকা।

দা # (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) ওঃ তাহা যায় না পঞ্চাশ টাকা বে-জা। আমদের
আমলে বাষো টাকা কে-জি তেল খেয়েছি—বড় জোর শনেরে টাকা।

না # তাহলে স্বর্গস্বর্গে ছিলেন বন্দু- গভনমেণ্ট বলছে অ-পনারের চেয়ে
আমাদের পারচেজি ক্যাপাসিটি বেড়েছে।

দা # হ্যাঁ আর বলতে। 'ডিম আশি পয়সা বড় জোর একটাক জোড়া কত
খেয়েছি। আর তোরা এক একটা 'ডিম আশি টাকায় কিনেছল।
তখন হাঁস মুরগীরই বা দাম কত ছিল। ৪/৭ টাকায় মুরগী পাশ
যেত। এখন ৬০/৭০ টাকা একটা মুরগীর দাম। আমরা মুরগীর
কাছে শুনেছি, তার পাচ পয়সা সব চর্নি, পাচ পয়সা সবধের তেল,
টাকায় ১০০টা 'ডিম খেয়েছেন। খাটি গাওয়া 'ঘ টাকায় দু'সের
ছিল। এখন 'ঘ কত করে চলছে রে।

না # আড়াইশো- 'তনশো টাকা কেজি। সে তে পাঁচশট যায় না। মন্ত্রী
টহীদের জগত সব চলে যায়।

দা # হায়, কি যে হল রে। তোরা ডোখে দেখতে পাচ্ছিস না শাকসব্জী,
তরিতরকারী—আমরা কত যে খেয়েছি। তোরা চাল খেতে পাসনে
বাজার থেকে কিসের ভাঁড়ো কিনে এনে থাকিস। আমরা দেড় টাকা
ছুটাকা, বড় জোর চার টাকা কে-জি অটেল চাল খেয়েছি। বামরাজ্য
ছিল রে, বামরাজ্য।

ন। : চাল পাওয়া যায় হাট, তবে ৩০/৪০ টাকা কে-জি। তাও যদি দু' দেওয়া যায়।

দ। : চাল কি হয় রে ? পাওয়া যায় না কেন ?

ন। : সব নাকি মদ তৈরী হয়। বাকী বিদেশ চাল যায়, কবেন একচেতন দরকার। বশগ্রাম সোনা ছ'হাজার টাকার মেলো না। দেশে যেহে মাতুষ আর পেটুলের বড় অভাব, তাই কেনা হয়।

দ। : পেটুল নিয়ে কি হয় ? ভোরা ভো গোকর গাড়ী চড়িল। দেশ থেকে পাম্প মেশিনগুলো ভো আমাদের কালেই উঠে গেছে। মোটর গাড়ীও পুস্পক বনের মর্যাদা পেয়েছে। ঐ মোটরের হর্ণ যে কতকাল শুনিনি।

ন। : মোটর আছে দাদ, তবে তাদের কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। বাড়ী বাড়ী ঘুরে যেহেদের তুলে নিয়ে যায় মন্ত্রী টহীদের জন্ত।

দ। : (শিউবে উঠে) বলিল কি ? আগে আমাদের কালে কোনে মন্ত্রী টহী মেয়েছেলে নিয়ে সামাজ্য কিছু করলেই 'বিনোদিনী', 'কলকবী' বলে কাগজে কাগজে হৈ হৈ পড়ে যেত। তারপর ? তারপর ? মন্ত্রীরা আর কি করে যে ? তারা কি তাদের ভোট পায় না ?

ন। : ভোট পায় দাদু। তবে লাঠির জে রে ভোটার দিন পাইক পেয়াদা এসে দাঁড়াতে পিসমোড়া করে বাঁধে—ভোটের কাগজ নিয়ে তার চোখের সম্মুখে দাগ দিয়ে বাঁধে ফেলতে হয়।

দ। : ইস, বিরোধী পাটি নই।

ন। : আছে। প্রারম্ভ ডাকাতি। যে গদগেত আসে সেট-হ ডাকাতি করে

দ। : আমাদের কালে কত বধা বধ 'বিরোধী' পাটি 'চল' প্রারম্ভ ডাকাতি করছে না ক।

ন। : তারা কেউ নেই। হয় মগজ খেলাই হয়ে গেছে, নয় কান্নে পুড়ে লার হয়ে গেছে জমির।

দ। : (মেকদণ্ড খ'ড়া করে বলে) আর কাগজগুলা'র।

ন। : তারা সরকারের প্রচারযন্ত্র। কারও 'বককে' লিখবার বা লম্বাঙ্গে চলা'র অধিকার নেই। লিখলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হয়। আগে মগজ খেলাট-এর স্যাটি ফিকেট জে গাঢ় না করলে সম্পাদক চলে পাবে না।

দ। : আমাদের কালে বিখ্যাত একটা বাংলা কাগজ ছিল। তারাই ছিল মহাবোক। বাংলায় জেঠামশাই ছিল তারা। সাহিত্য, চর্চন, রাজনীতি,

খেলাধুলা, সঙ্গীত, সিনেমা, হেন খবর ছিল না, যা না ভাবা বুঝত।
বড় বড় সাহিত্যিকদের চাকরী দিয়ে পোষা বেড়ালের মত বসিয়ে
রাখত অফিসে।

না ॥ সেলব আর নেই দাছ। ঐ সব প্রান্তঃস্বর্গীয় সাহিত্যিকরাই তো নয়-
বাস্তব কাচিনী লিখে লিখে দেশের লোকদের মাতুষ করে গিয়েছেন।
ঊঁরা আমাদের নম্র জাতীয় মহাপুরুষ। ঊঁদের ছবি জাতীয় মহাক্ষে-
পানার টাকানো আছে। ব্রেনগুলিকে মিউজিয়াম-জারে জিইয়ে রাখা
হয়েছে। দরকার মত তাদের ব্রেনের ভাটব্রেশন বিশেষ যন্ত্র দিয়ে
'পিচ্ আপ্' করে আজকালকার সাহিত্যশ্রাবী মগজে পুরে দেওয়া
হয়।

না ॥ ভারী আশ্চর্য ব্যবস্থা তো! আচ্ছা কোন্ ভাষার বই লেখা হয় রে
আজকাল? রাষ্ট্রভাষা মানে হিন্দীতে?

না ॥ না দাছ! সব কটা ভাষা মিলিয়ে একুটা মিশ্র ভাষা করা হয়েছে।
সেটাষ্ট রাষ্ট্রভাষা।

না ॥ সে আবার কি?

না ॥ শুন "তুমি কোণার যাচ্ছ?" রাষ্ট্রভাষার বলতে হবে, "তুমি where
যাওক্সিস্ট হ্যায়।" বাংলা ইংরাজী, ওড়িয়া, হিন্দী, মিলিয়ে বললাম।

না ॥ ওঃ অপূর্ব! বল বল আর নতুন কি কি সব হয়েছে।

না ॥ প্রত্যেক জায়গায়গায় যন্ত্র বসানো আছে। খেলার মাঠে কুলেকলেজে,
লাইব্রেরীতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সব অঃস্বাচ্ছন্দ্য, সব ছাঁব কণ্টোল-
কমে রেকর্ড হচ্ছে টেলিভিশনে। কোনো গোলমাল দেখলেই স্বেচ্ছা-
সেবকের দল ছুটে গিয়ে সাবডে দিয়ে আসে। এই যে তোমার সঙ্গে
কথা বলছি, বলা যায় না, হয়ত এমন যন্ত্র আছে, সব কথাই সেখানে
পৌঁছে যাচ্ছে।

না ॥ ওহো, আমাদের সময়ে জর্জ ওয়্যারেল এইরকম ধারণার যন্ত্রের কথা
একটা উপস্থাপনা লিখেছিলেন বটে। যাক্, তাহলে বিজ্ঞানের এত উন্নতি
হয়েছে এদেশে আর জিনিসপত্র সেই '৭৪ সালের মত সস্তা করতে
পারছে না! তাদের ভাঁড়ো গুলে খেতে হচ্ছে।

না ॥ ইচ্ছে করেই করে না দাছ! ফসল বা সঙ্গী ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঠ থেকে
সোজা গভর্ণমেণ্টের ঘরে চলে যায়। বাজারে আসে শুধু চীন ভর্তি
ভাঁড়ো! ১

দা : তুমি চমৎকার বাবু! আর তুল কয়েকজনো ?

না : আছে। সেখানে খড়ানো হয় বৌদতর—গ্র্যাকটিক্যালও হয়। দেশ
বিদেশের কৌশল রত্নী টেলিভিশনে দেখানো হয়। ছেলেমেয়েরা
দাক্ষ উত্তেজনা ভোগ করে। মেয়েরা এমনিতেই বৌবনে পা দেবার
সঙ্গে সঙ্গেই লবি মফল তুলে নিয়ে যায়। পাকপোক্ত করে ছেড়ে দেয়।
জগা বুঝ সমাজে মিশে লবাইকে মাড়িয়ে রাখে। অজান্তে ছবির
আবর্ণে টপ্পলে আর মিলিমিটার মাপের অধোবাস পড়ে পথে বেকনো
কম্পালমরি। আপনাদের আরলের মত চরিত্র নিয়ে কেউ মাথা
ঘামায় না।

দা : কিন্তু ছেলেগুলো হয় না ?

না : ক্যামিলি গ্র্যানিং-এর গবেষণার ও ল্যাঠা বুচে গেছে দাদু ! এমনই কল
বের করেছে—বুড়ন কোনো গ্রন্থের বালাই নেই। হাসপাতাল থেকে
মোটরনিটি বিভাগ উঠে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হোস পাইপ
আর যন্ত্র নিয়ে লোক দরজার দরজার দূরে বেড়ায়। মেয়েদের গায়ে
এমন একটা “বে” দেয় যাতে গর্ত হবার ভয় থাকে না।

দা : তাহলে দেশের লোকসংখ্যা বেশ কমেছে বল ?

না : হ হ করে কহছে। তাছাড়া কি-বছর কয়েকলক্ষ লোক এনিই মেয়ে
ফেলা হয়। আপনাদের সময় আইন-আদালত এসব ছিল তো ?
আজকাল নেই।

দা : সেকালে বিচারের নামে অবিচার কিছু হলেও জেলকে লবাই ভয় করত।
চোর ডাকাডাকাও সামলে চলত।

না : ওসবের বালাই আজকাল নেই। পুলিশে ধরেই কার্নেসে পুরে দেয়।
সে পোড়া ছাই দিয়ে লাগ হয় জমির।

দা : (আতকে উঠে) কি জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলে ? তাকব ! পরলোকের ভয়
নেই ? ঠাকুরদেবতা, পূজাঅর্চনা ওসব আছে, না ভেঁটিয়ে বিকোর
করেছে ?

না : ওসব নেই। অর্চনা হয় নানী হুড়ির। বছরে দু'বার দেশের প্রোটা
রূপনীদের নর হুড়ি গড়ে বাজার মোড়ে মোড়ে বদানো হয়। সেখানে
আট কবিরি ধরে নরনারীর হজোড়ের মেলা বলে।

দা : বটে। আজ্ঞা দেশে বেকার নেই ? ভায়া চাকরি চায় না ?

না । চাকরির অভাব নেই এখন । বেচ্ছানেকের চাকরি চাইলেই পাওয়া যায় । বেকার বলে আর কিছু নেই । শুধু বম্বাই দাওয়া অলস তারা বগরগে সেজের বই, পত্র, পত্রিকা লেখে ছাপায় ।

দা । ই্যা ভাল কথা, সাহিত্যের হাল কি ?

না । সাহিত্য এখন প্রকৃত বাস্তব । কল্পনার' লেশ থাকলে চলবে না । যে যত ভাল রচনাশিল্পের বই লিখতে পারে তাকেই এ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয় ।

দা । এ্যাকাডেমি মানে সাহিত্য এ্যাকাডেমি ? ওঃ আমাদের সময় সাহিত্য এ্যাকাডেমির কত নাম !

না । সাহিত্য এ্যাকাডেমি কিনা জানিনে দাদু—এ্যাকাডেমি মেটাসেন্সুয়াল ক্যাকালুটি ।

দা । মেটা-সেন্সুয়াল কি-রে ? তুনেই যে মাথা বুঝে যাচ্ছে ! আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডিরো, কমিশনার, আই-জি, ইনস্পেক্টর এসব আছে তো ? কি করে তারা ?

না । তারা খালি সেটলমেন্ট করে—কার ঘরে মেয়ে বড় হল, কে বাড়ির উঠানে একখালি জারগার তরিতরকারি লাগিয়েছে । রেডিওগ্রাম টেলিভিশনের ব্যাপার তো ! নিজে থেকেই এসে হেলিকপ্টারে মাতুষ পোড়ানো ছাই মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে গাছটাতে “রে” ছিটিয়ে দেবে তাৎপর্য বাড়ীর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাবে । আপনার নাতনীকে কবে নিয়ে গেছে ।

দা । (মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) হার, হার, হার ! ইয়ারে বলি আমার বয়সী বুড়োরা কেউ বেঁচে আছে ? আমার সেই বন্ধু ছিল, রহমৎ, স্থনীতি, রামলোচন ?

না । না দাদু—তাদের কবে পোড়ানো হয়ে গেছে ।

দা । (অত্যন্ত উত্তেজিত) সে-কি ? অপরাধ ?

না । অপরাধ রাজস্রোহ ! কটি লোক জড় করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । অবশ্য না দিলেও ওরা মারত । বুড়োদের ওরা বাথতে চায় না । পকাশ পেলোই মেয়ে কেলার নিয়ম ।

দা । (সত্যের) তাহলে আমাকেও মেয়ে কেলবে ? ...কি-রে উত্তর দিচ্ছিল না যে...আমাকেও মারবে নাকি ?

ট-বিউনিসিয়ালিটির স্থান করায় প্রবেশ। একজনের হাতে বহু
সাব্যবহার্য নল ইত্যাদি) কে ? কে ডোরকা ?

১ম কর্মী । এই বুড়োটার আওয়াজ ট্রেন করে আসতে এতক্ষণ লাগল (হুইচ
বপ্...বপ্...বপ্..., একটা বেগুনী আলো যন্ত্রটার পিছনে জলতে থাকে।
যন্ত্রের সুখ থেকে কুন্দের গায়ে অস্ত্র আলো পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে বৃত্ত
গোঁড়াতে গোঁড়াতে ঘাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ("ক্যামেরা এ্যাণ্ড ম্যানিওর
ডিপার্টমেন্ট" লেখা একটা গাড়ীতে টেনে তুলল বুড়োকে করেকজন
লোক।) (নাতির দিকে ফিরে) আপনি এতকাল বুড়োকে বাঁচিয়ে
রেখেছেন কেন ?

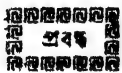
নাতি । এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য ।

২য় কর্মী । কিসের এক্সপেরিমেন্ট ? কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে, বুড়ো
বাঁচিয়ে দেশের খাত্তের অপচয় ঘটাতো ।

নাতি । বুড়ো আজ ত্রিশ বছর ডিপ্ ফ্রিজে অজ্ঞান হয়েছিল কিছু খেতে দিইনি ।
কদিন হল বাঁচিয়ে তুলেছি ।

১ম কর্মী । এ রাজস্রোতীভার কমা নেই । এক্ষণি ফার্মেল এ্যাণ্ড ম্যানিওর
ডিপার্টমেন্টের ১৮ক একজিকিউটিভের কাছে আসুন ।

[নাটকে ১ঘরে ধরে টানতে টানতে যবার প্রস্থান]



লোকসংগীতের সামাজিক তাৎপর্য

পুলকেন্দ্র সিংহ

গ্রামের সাধারণ অসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসেবা পুঙ্খবিস্তারিত বিভিন্নরকম পাল-
নার্ণণ, ব্রত প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে গানগুলি রচনা করেন ও নিজস্ব বিশেষ
অভিতে ও সুবে লোক শিল্পীবৃন্দ যে গানগুলি সাধারণ রাষ্ট্রসেবা কাজে পরিবেশন
করেন সাধারণভাবে সেগুলিকে লোক-সংগীত বলা চলতে পারে। বলা
বাহুল্য হয় সংগীতট অল্প সংজ্ঞা অসুস্থারী লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়েনা,
বিশেষ করে যেগুলি কেবলমাত্র অধ্যাত্ম চেতনার নিষিদ্ধ। ধর্মীয় পালপারবে

ধর্মীর উপলক্ষ্যে, যেমন গাজনে, ধর্মস্বামীজের দুজোড়, যে গানগুলি রচিত ও পরিবেশিত হয় প্রতি বছরে, সেই গানগুলির মধ্যে অনেক কেহে হয়তো একটি ধর্মীর আকরণ থাকে (যেমন বোলান নামে, জাঁদি পান)। কিন্তু ধর্মীর আবরণটি তেজ করে এক অসলিন মানবিক আবেদনের বস্তুমাধ্যমে লোকমানসে যে দাগ কাটে, ফলস্বরূপ স্পর্শ করে তা লোকসংস্কৃতির নিজস্ব প্রাপশক্তিগুণই অন্ততম বিশিষ্ট লক্ষণরূপে পরিগণিত হয়। কলা বাহ্যে এই মানবিক চেতনা বা বোধই লোক-সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ।

কোন গান অধ্যাত্ম চেতনার গভীর মধ্যে থেকে জীবনের পারমাণবিক চৈতন্তের যতই নির্দেশ দিক না কেন—যদি তার মধ্যে থেকে মানুষের প্রেম, ভালবাসা, অহুসাগ, অভিমান, দুঃখ ও আনন্দের ঐকিত্য না থাকে তবে তা লোক-সংস্কৃতির মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বলা বাহুল্য লোক-সংস্কৃতির প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ ও আনন্দ শুধু মাত্র ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত বোই নয়, ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, সমষ্টি থেকে সমাজ চৈতন্তের ঐশ্বর্য লোক-সংস্কৃতিকে প্রাপবন্ত এক সতেজ ও সবল মাধ্যম দান করে। মানবিক বোধই লোক-সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপ্তি।

চৈতন্তের গাজন উপলক্ষ্যে মুশিকাবাদ, বীরভূম, বর্গমান প্রভৃতি স্থানে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে লোক-কাবগন ছোট ছোট পালাগান রচনা করেন, লোক শিল্পীগণ বিশেষ সুর ও তন্ত্রিতে নৃত্য ও বাজ্য সহকারে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি পরিবেশন করেন। গামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ থেকে মূল কাহিনী গৃহীত হলেও সেগুলি লোককাবগণের দ্বারা রচিত ও লোকশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে মূল কাহিনীর অনেক মৌলিকত্ব হারায়। হারিয়ে কিছুটা লৌকিক চরিত্র ওই সকল পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে আবোপিত হয়, চরিত্রের বর্ণনায়, পোষাকে, আচায়ে। বোলানের ‘সীতা’ আর বামায়ণের সীতা থাকেন না। তিনি যেন স্বামীপরিভাষ্যে দুঃখিনী গ্রাম্য বধূ হয়ে দেখা দেন। তার পরনে থাকে প্রোবেদই আর পাঁচটি গরিব ঘরের বধূর মত লাল পেড়ে মোটা শাড়ি, হাতে নোজা, মিঁখিতে এরোতিব চিহ্ন লাল টকটকে সিন্দুর। তার দুঃখ ও বেদনায় যেন গ্রাম্য রমণীর দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ পায়। তাই ‘স্বায়ংগণের’ মত বোলান গান আর ধর্ম সঙ্গীত থাকে না লোক-সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠাত হয়। সুশলিন সম্প্রদায়ের মহতম উপলক্ষ্যে যে জাগরমান পরিবেশিত হয় সেই গানে কাহিনী প্রাকৃতিক ধর্মীয় কাহিনী বিবৃত

হলেও—লোককবিত্বের রচনা ও লোক-শিল্পীদের পরিবেষণের স্পর্শে তা লোক-সংগীতের রূপান্তরিত হয়। ধর্মীয় গীতী অভিক্রম করে এক মানবিক বোধে লৌকিক সমাজচেতনার স্পর্শে এই গানগুলি সজীবিত হয়।

তত্বে: যে কোন লোক-সংগীতেই অনিবার্হ ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজচেতনা এসে পড়ে। লোক-সংগীতের এই সমাজচেতনার মধ্যেই সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে।

কিন্তু অস্পষ্ট ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক গানগুলি লোক-সংগীতে রূপান্তরিত হয়নি। যেমন কীর্তন ও রামায়ণ গান। এর প্রধান কারণ কীর্তন ও রামায়ণ গান রচনা করেছেন এক মননশীল মন। রীতিমত অধ্যবসায় ও অল্পশীলনের মাধ্যমে মূল রচনার ভাব ও ভাষা গায়কেরা অক্ষুন্ন রাখতে ব্রতী হন। এই গানগুলির সুরে ও পরিবেষণায় একটি নির্দিষ্ট পাংশীলিত উচ্চাঙ্গের সুর ও আঙ্গিক বক্ষা করা হয়। চরিত্রগুলি ও অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। এই গানগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার প্রবেশ করার সুযোগ থাকে না—যেহেতু পরিবেষণার কঠোর নিয়ম ও রীতি মানা হয়। কঠোর নিয়ম রীতিগুলি সাধারণ মানুষের করায়ত্ত থাকেনা। ‘বোলান’ বা ‘জারিগান-এ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে লোক-জীবনের স্পর্শ পেয়ে লৌকিক রূপ পাবার যে সুযোগ থাকে রামায়ণ গানের ‘সীতা’র বা ‘কীর্তন’ গানের শ্রীবাধিকার সেই সুযোগ থাকেনা বলেই—ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক রচনা হয়েও ‘বোলান’-এর ‘সীতা’ ‘লৌকিক সীতা’ আর রামায়ণের গানের ‘সীতা’ ধর্মীয় কাহিনীর ‘সীতা’ হিসেবে চিহ্নিত হল। বোলান-এর সীতার রূপকল্পনার গ্রাম্য কবিগণ তাদের দেখা ও জানা গ্রাম্য-বস্তু ধ্যান ধারণা আচার-অনুষ্ঠান আধোপিত করেন। তাই বোলান-এর সীতা ‘লৌকিক সীতা’ সাধারণ মানবীর অতি সাধারণ দুঃখ-দৈন্ত আশা-নিরাশার আনন্দ বেদনার বোলানের ‘সীতার’ ক্ষয় উজ্জলিত। সেই সহজ মানবিক বোধ এখানে হাজির। মানবিক বোধ আবার সমাজ চেতনার বিস্তার লাভ করে।

লোক সংগীত লোক-সমাজের জনৈক লোক-কবি কোন এক সময় কোন উপলক্ষ্যে রচনা করেন। সেই রচিত গান কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত হয় লোকশিল্পীদের দ্বারা বোধভাবে। তখন আর সে গান কোন একক কবির রচনা হিসেবে পরিগণিত হয় না। পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একক থেকে বহুকে রূপান্তরিত হয়। সে গান তখন গোষ্ঠীজীবনের গান।

সমষ্টির গান। সমষ্টির গানে সমষ্টির ব্যথা-বেদনা আশা-আকাংক্ষা প্রকাশ পায়। সমষ্টিকে নিয়েই সমাজ। সমাজচেতনাই লোকসংগীতের সামাজিক ভাংপর্ঘ বহন করে।

এই গান ব্যক্তিবোধ থেকে সমষ্টির বোধ-এ রূপান্তরিত হয়ে লোক শিক্ষা ও লোকরক্তনের বিশিষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। লোক-সংগীত লোক-সমাজের উপযোগী করে কবিতা রচনা করেন। লোক-শিল্পীরা সেই গান লৌকিক ভঙ্গিতে ও স্বরে লোক-সমাজে পরিবেশন করেন লোক শিক্ষা ও লোক-রক্তনের জন্ত।

সহজবোধ্য এই গানে যে আনন্দস্বাদ ও শিক্ষা থাকে তা সাধারণ মানুষও সহজ ধর্মবোধ, জ্ঞানঅজ্ঞানবোধের সহজাত ক্ষমতা গুণে উপলব্ধি করেন। আনন্দ আনন্দ করেন। শিক্ষা গ্রহণ করেন। সমাজশিক্ষার তাই লোক-সংগীতের বিরাট অবদান থাকে।

কয়েকটি পাঁচালী, হাবু ও গম্ভীরা গানের মত লোক প্রিয় লোক সংগীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ থেকে এই গানগুলিতে সমাজচেতনা যে কতোভাবে থাকে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

সমসাময়িক লোক-জীবনের অনেক চিত্র ও চরিত্র এইসব সংগীতে লুকিয়ে থাকে কখনো বা সহজপ্রাণ্য 'রূপক' ও 'প্রতীক'র মোড়কে কখনো বা বাজ শ্লেষ ও কৌতুকের জারকরসে জারিত হয়ে। বসগ্রাহী গ্রাম্য শ্রোতা তার সহজ অহুসন্ধিস্য থেকেই এই সকল পরিচিত রূপকের মর্মভেদ করে ঘটনার গুঢ় রহস্য উন্মোচন করেন। সমাজ-ইতিহাসের অসংখ্য উপকরণ ছড়ান ছিটান থাকে এই সকল লোক সংগীতের সমাজচিত্রে।

মুশিদাবাদের 'প্রহেলী পাঁচালী' থেকে সমাজজীবনের গুঢ় রহস্য পাওয়া যেতে পারে।

“আগে ছিলাম ফাঁকাতে, ঢুকে গেলাম ঢাকাতে
সেখানে ছারপোকাতে, আমাকে রাখেনি সুখে
দিবা মাহুব আছে তথা, করে দিলায় কত কথা
এখন সে গেল কোথা, পাইনা তাকে ডেকে ডেকে।
এক মান্নী হাতা ধরে হাতিরে ভিতরে ভরে
হাতি লাগিয়ে তায়ে জল ছিটে ছেয় চোখে সুখে
কাতরে কর কার্তিক চন্দ্র আমাকে লেগেছে ধন

হরি বটল আনন্দ কর নদীর ধাঁকে ।”

পাখন উপলক্ষ্যে পরিবেশিত একটি সাম্প্রতিক পাঁচালী গানে হুশিয়ারি জেলার খাদ ও কৃষি ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় :—

“বানে ত কিছু হল না গর লাগলাম জোর দিয়ে
চবে, কুড়ে বুট মুহুরি দিলাম কিছু ছিটিয়ে
গমে ফলন হল ভাল বুট মুহুরি কিছু হল
জল পেলে তাই হত ভাল বলিছে পরম্পরে ।
কটি ছাত্তু খেয়ে যলাম, ভাত বুড়ি ত মেলে না,
হুন দিয়ে তাই কটি ছাত্তু খাওয়া কড় চলে না ।
খেতে হচ্ছে পেটের দায়ে থাকা যায় কি এসব খেয়ে
কোনদিন যায় অচল হয়ে, যদি শুধু বাগড়ে
কালিম্পাং, আই আর এট লাপালাম খরচ করে ।
পুকুরের জল মরে গেল গিয়েছে বে দে পুড়ে
বেচেতে চল ঘটিবাটি বেচেতে চল গরনাগাটি
সোনার সংসার চল মাটি গেল যে ছাওয়ায়ে ।
কান্তিক চন্দ্র বগড়ে হেলে, এসে অসার সংসারে
কোন কর্ম করলাম নাক দিন চলে যায় পলায়ে ।”

পাঁচালী গান একটি সুপরিচিত লোক সংগীত । এট সংগীতে সমাজচৈতন্যে নিবিষ্ট সমাজচিত্র কত স্পষ্ট ও সূচন্বিত তা সচেতনই লক্ষ্য করা যায় ।

মালদহের পাখন একটি বিশিষ্ট লোক-উৎসব । উৎসব উপলক্ষ্যে গভীরা গান বাঁচত ও গীত হয় প্রতি বৎসর । গভীরা গানের বিভিন্ন পদ্যে তুচ্ছাণি, তুচ্ছ গ্রামা ঘটনাবলী, সমস্যা, প্রঃখ, দৈন্ত, আশা-নিরাশা থেকে শুরু করে, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও স্থান লাভ করে শিবকে উপলক্ষ্য করে এইসব গান গীত হয় । গভীরার শিব আর দেবাকিদের কৈলাসবাসী শিব নন । ইনি কখনো বা কৃষির কর্তা, কখনো বা ব’ইনায়ক । যদিও তার পরনে নিম্নমাত্রিক বাঘছাল, গায়ে ছাট্টশয্য, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল থাকে ।

গভীরা গানের বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্য ব্যক্তি, গ্রাম, দেশ, সমাজ থেকে বিষয়বস্তু এক মানবিক চেতনার উন্নীত হয় । সাধারণ মানুষের চিন্তাও যে কত গভীর, ব্যাপক ও বিষয়বস্তু হতে পারে গ্রামা কবিদের রচিত গভীরা

গানের অসংখ্য উদাহরণ থেকে তার নিজস্ব তুলে ধরা সম্ভব। যারা এই গান-গুলি রচনা করেন, যারা পরিবেশন করেন, যারা এগুলির মূল গ্রহণ করেন তাঁরা সকলেই গ্রামের সাধারণ মানুষ। এঁরা কেউই সমাজবহির্ভূত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন। সুতরাং এঁদের রচিত ও পরিবেশিত গানে সামাজিক সমস্যা ত স্থান পাবেই। সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলে তবেই সমাধানের সূত্র পাওয়া যায়। এই গানগুলির মধ্যে শুধু সমস্যাই থাকে না, সমাধানেরও ইঙ্গিত থাকে। অন্ততঃ এই গানের আনন্দ রস, বাজ ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমাজকে সত্যিকার সচেতন করে দেওয়া হয়। অস্ত্রায় ও শোষণের বিরুদ্ধে অবিচার আর অনিয়মের বিরুদ্ধে গভীরা শিল্পীরা অত্যন্ত আদর্শমিষ্ট ও সংগ্রামী। কোন রক্তচক্ষুর ভয়, কোন মোহ, কোন লোভ এঁদের সামাজিক কর্তব্য থেকে আজো বিচ্যুত করতে পারেনি। সমাজাশঙ্কার ও সমাজের অগ্রগতিতে এই শিল্পীর অবদান অসংখ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে যোগ্য। এটোভাবেই এঁরা এঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্গানের শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই একটি কথা বলা চলে। সঙ্গানেও নানাবিধ বাজ কৌতুক ও রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের অস্ত্রায় কার্যাবলীকে কঠোর সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সঙ্গানের শিল্পীরাও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আনন্দ রসের ভিয়েন দিয়ে ত্রিক্ত কথায় রস পরিবেষণ করেন।

গ্রামের সাধারণ অজ্ঞানশক্তি গরীব কৃষকদের প্রতি উপেক্ষা ও অবিচার হলে তারা প্রতিবাদ করতে সাহস পায়না। তারা দুর্বল, তারা নিপীড়িত, তারা আশঙ্কিত ও দরিদ্র। এরা সাধারণভাবে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। ভাষায় ফুলায় না, নানাবিধ বাধানিষেধ আর রক্তচক্ষুর ভয়ে এরা ভীত ও সঙ্কল্প। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে এরা অজ্ঞান। কিন্তু তবুও এরা মানুষ, এদেরও বোধ আছে, জ্ঞান আছে, প্রতিভা আছে। এই সকল লোকসংগীত মাধ্যমে তাই তারা তাদের গুপ্ত ক্ষোভ ও বেদনা উজ্জ্বল করে দেয়। এই গানের ভাষা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা। এখানে এরা নিষ্ঠুর, যুক্তকণ্ঠ যুক্তহৃদয়। এই গানগুলির মধ্য দিয়েই গ্রাম সমাজের অসুস্থ বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও অসুখাগ ধরা পড়ে। এই গানগুলি সমাজ ধর্ষণ তথা সমাজ-ইতিহাসের অমূল্য দলিলবিশেষ। যেমন গভীরা গানের শিববন্দনা :

“চাঁদী ধলের ছুখে সাবা দিলে হে ধরনী—তাই

লোনে বীজে দারে বন্ধা চাষী জাতি হে

জমল কাইটা করহ আবার

বুচাইতে হায় খন্ডের অভাব

তাতে জুটতে ভরকারী ডিপার্টমেন্ট-বয়েছে কিসারী

ফলাইছ ফসল কত কাগজ কলমে

ভবু প্যাটের আঙুন নিভেনা কেনে ?

দেশ বাচাইছ আমেরিকার দানে

চবে উঠান আঙিনা—হে নানা

গিলবে দেশটা কোটি কোটির দেনা ।

আর যোগদানে বসে কেনে ওহে মহাযোগী

দিনে দিনে হলে তুমি ক্যানসাথ রোগের যোগী হে —

মিল মালিক আর মজুতদারে কালোবাজারী সাথে করে

চোর জুরাচোর আর জালিয়াৎ দুৰখোররা লুটছে দিনরাত

জাশের ছশ্মন সব একসাথে মিলি দিয়া স্বার্থের ঠাড়িকাঠে

মানবতার বলি

চাহ তুমি চোখ খুলি নইলে হামরা বাচব না তে নানা”

নানা’ এখানে শিব তথা রাষ্ট্রের কর্ণধার । তাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের
সামারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গভীরার কবি বলেছেন গ্রামের রসকের
কথা সরকারী বিভাগের কার্যাবলীর কথা, জননীতির কথা, কালোবাজারীর কথা,
আমোদকা থেকে ধারকর্জের কথা, রাজনীতির স্বার্থের কথা, সর্বোপরি গ্রামের
সামারণ মানুষের কথা ও দেশের কথা স্থান পেয়েছে ।

একটি পাচালী গান :—

“ভাইরে বুঝি যেতে হল দেশ ছেড়ে

বারু মশার কামড়ে ।

বারু মশার কামড়ে

‘মশাতে’ কাকি দিয়ে পেট-ভরায়

কে যে মাহুষ কে যে মশা

আর কাজের দফা দেয় সেয়ে

চেনা দার এ সংসারে ।

এরা শোষণ করে রক্ত

গুণগুণ করে গান শোনার
আর সাজে পরম ভক্ত
উড়ে এসে আশে পাশে
কামড়ে দেয় চুপিসারে ।”

এঁদের কাজের বাংলাই নাই
পরের দেহের হল ফুটিয়ে পেটটি ভরে দেয়
এদের কাজ কেবল হয় কাজ না করা
কাকি দিয়ে কাজ সারা ।”

আমাদের সমাজে ‘পরজন্মভোগী’ একশ্রেণীর শোষক মাত্রই যে ‘মশা’র নামে
আলোচ্য পাচালীতে আলোচিত হয়েছেন সেকথা বাংলাই বাহুলা । পাচালী গানে
জীবন যন্ত্রণার ছবি : —

স্ত্রী—গলার হারটা বেচে দিলে, টাকাগুলো পেটে খেলে
কাপড়ের দাম নাই ফলে চাইলে মেলে না

পু—ধনি হে, বলি তোমার সবিতো এই পেটের তরে
পেটে খেতে লক্ষী ছাড়ে তাও কি জান না ।

স্ত্রী—ঋণ দিয়ে হে দেশের সরকার, নিরে নাও হে যত
খরবাতি আর ঘর তোলাব ঋণ দিয়ে খোজ রাখ না

পু—গ্রুপ লোন পেলাম না মোটে সংসার চালাই খেটে খুটে
টাকা কড়ি নাইকো মোটে হোল খোরাক টানা ।

স্ত্রী—আমি ভেবেছিলাম মনে, সুখ হবে স্বদেশী শাসনে
দুঃখ বাড়ে দিনে দিনে শাস্তি পেলাম না ।”

আর এক পাচালী :—

স্ত্রী—আমি স্বদেশী নারী বাংলাদেশে মিলবে নাকো এমন স্বন্দরী
কেন চোখের মাথা খেয়ে পাড়াগাঁয়ে করলাম বিয়ে
সুখ পেলাম না খেয়ে শুয়ে উপায় কি করি ।

পু—কি হয়েছে চাঁদবদনী বল মনের কথা তুমি
ধনি তুমি বাপের খনি নরনে ছেরি

স্ত্রী—এই কি পাড়াগাঁয়ের রীতি লজ্জাতে বরি ।

পু—এবার দেশে ধান হল না, সাবাবছর চাল ডাল কেনা

কোঁর মনে করি পছন্দা মিটে না পাখি ।

শ্রী—কাজ নাই আমার তোমার পছন্দায়

অমন পছন্দা পাব বেলাই

চলে যাব কলকাতার হুখ আছে ভারি ।

ত্রীলোকের বায়না ভালিস করিতে পারছে না বেচারী নেহাতই আধিক
কারণে—যদিও আত্মবিকৃত্যর অভাব নাই । সাধের সঙ্গে সঙ্গতির গরমিল,
কিন্তু আত্মস্বাধীতা ত্রী লোকটির কাছে বড়, তাই সে হুখ ভোগের জন্য মজা
লুটতে সহরে যাবে—যাবে কলকাতায় । গ্রাম-সমাজের অবক্ষয়ের যথার্থ
চিত্র আর কি হতে পারে ?

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে ‘গভীর’র কবি আক্ষেপ করে বলেছেন :

“পাইনা ভাবা বলতে খাসা অভিধান চষে ।

বাঙালী আর বাংলায় দশা বুঝাব কিসে ।

হায় বাঙালী সব খোয়ালি করমের দোষে ।

... ..

বকিমচন্দ্র আর রবি বিশ্বকবি রাজা রামমোহন আশু মুখার্জী

... ..

ভাব বাঙালী অতীতের কথা লক্ষ্য কর নত হয় যে মাথা

তোদের বাইরে চটক, ভেতরে ঝাঁক চালানী গ্যাসে

ঈলভদ্র, অতীশ দীপকর গেল কোথা ভেসে ।”

ভারতের দুঃখহুঁকসা সম্পর্কে ‘গভীর’র কবি বলেছেন :—

“যেথা যাটির তলে সোনা মিলে সাগরতলে হীর।

সোনার ভারত নামটা বাহার আছে জগৎ জোড়া হে

সেবার লোকে মরছে ভুখা খাবার জোগার আমেরিকা

অরুণা যাদের ঘরে তাদের কোলা কেন বাড়ু

সাজিয়ে বোকা আমেরিকা তোমার বুদ্ধির গোড়ায় ঢালছে ছাই !

দেখটা জুড়ে হেট উপড়ে চলছে দলাদলি

সত্য মাতৃব আজ মানবতার বলি হে

আনতে শান্তি বাঁচাতে দেশ জাগো একবার তোলা মহেশ ।

যেমন হয়ে সতীহারী দশের যজ্ঞ করলে সাধা

কর হুটের হমন শিষ্টের পালন কাম উপেন আজ ভেবে কর ।”

গ্রাম্য কবিতা গ্রামের কথা, দেশের কথা ছাড়াও ছানির কথা নিয়েও
যাথা যায় :—

“টনট” (এখানে নিকুন ও চৌ-এন-লাইকে) গভীর গানের একটি
রসগ্রাসী অংশ :—

“খেয়ে ঠেকা, সেজে বোকা, জোড়া ভারি তাই
রাগে রোষে ভারিছে কসে নিকুন চৌ এন-লাই ।
ওদের কুটনীতির বলি হ'ল খান চাল এখন কি উপায়

মাটয়ার লাগে আধার দেখে
এখন জাড়া ঠাটায় ॥

ভিয়েতনাম হৃদে এদের দো মুখো গতি
ভারতদ্বীপে এলো জমায়ে দোসতি
পাকিস্তানে এরা জেলে লালবাতি
জোরা বাদর নাচায়
ভুট্টো, ইয়াহিয়া বেহারা এদের মাগের তাই ॥
..

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি
পূর্ব-বাঙলায় আনলে মুক্তি
কথাবে কেবা এদের শাস্ত দেখিয়ে জুজুর ভয় ।”

আমাদের লোকসংগীত আজ ব্যক্তিচৈতন্য থেকে বিশ্বজনীনতায় উন্নীত ।
ভাণ্ডারীয়া, ভাঙ্ক, বিবাহ সঙ্গীত, বিভিন্ন ছড়া, টুঙ্গ আদিবাসীদের গানেও আছে
সংসারের পুথি দুঃখ, দেশ, কাল, প্রকৃতির অসংখ্য অন্তরঙ্গ চিত্র ।

লোকসমাজের যথার্থ ইতিহাসরচনার জন্য এই সব অজ্ঞাত রত্নভাণ্ডার
আহরণ করে সাজাতে হবে । তবেই দেশের ইতিহাসে গ্রাম-সমাজের লোক-
মানসের অজ্ঞাত দিক উন্মোচিত হবে । লোক-সংগীতের এটাই হয়তো সবচেয়ে
প্রধান সামাজিক তাৎপর্য ।

★ ‘চেতনিক’-এর ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে বেরবে ।

★ বিজ্ঞাপন দাতাদের অনুরোধ : ডিসেম্বরের ২য় সংখ্যার মধ্যে
মেট্রিয়াল পাঠান ।

★ ২০% কমিশনে এজেন্সির জন্তে লিখুন ।

অকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক । চেতনিক । পোঃ ও জেলা : মুন্সিবাড়

নগর সংকীর্ণন

রতন চট্টোপাধ্যায়

ডাসটোবীন বললেই কৌস ক'রে বেগে ওঠে ফেলট। তোবড়ানো সান্‌কিটা বগলদ্বারার চেপে ধ'রে লাঠিটা উচিয়ে দ্বারতে যায় কেলটকে। বলে, এঁয়া ডাসটোবীন,—খালো, লবাবপুতুব—আসিস কেনে তবে? কেলটু আচমকা ভয় পেয়ে শুককে যায়। ব্যাপারটা তবল করার চেটার গালের বজ্রিলাটা চাংলাপড়া দাঁত লাগ ক'রে হেঁ হেঁ ক'রে হাসে। বলে, মাটরি, এট নাক কান মললাম, আর কদি (যদি) কখনও ডাসটোবীন বলেছি তো আমাকে মেরে লোপাট করে দিবি। তা শুনে তৎক্ষণাৎ ফেলটর বাগ জল হ'য়ে যায়। কেলটু যে বীতিমত তাকে ভয় করে সেটা একটা গবের ব্যাপার। তবু সে এখন বুক চেতিয়ে, লাঠি নাচিয়ে বলে, খান্‌লে (তা'হলে) বল এটা এসটোরেট (বেষ্টুরেট)। কেলটু ঘাড় কাৎ ক'রে সার দেয়, এসটোরেট। তারপরই হুজনে ভাব হয়ে যায়। আসলে ফেলটর কথার সার দিলেই কেলটু তখন গলায় গলায় বন্ধ।

পেট ভোগরা দশ বার বছরের ছুটো হিলছিলে ছেলে ঘাড় গলায় হাত জড়িয়ে সেই কাকফর্সা দিতেই এসে সরকারী ফ্যাট বাড়ীর চৌহদ্দির ভাটবীন-গুলোর আনাচে কানাচে চরকির মত ঘুর ঘুর করে। হুজনের বগলে ছুটো গ্রেবড়ানো সান্‌কি। আর হাতে একটি করে লাঠি। ফেলট বলে, আত্মক সেই লেডীকৃতার দল। এমন ঝাড়বো না। কেলটু বলে তোর কতো মস্তানী গুট লেডীকৃত্তা-গুলোর ওপর। ধর, কদি ভেড়ে আসে বাবুব বাড়ীর ওই গেমওয়ারা ককুরগুলো? ব্যাকোন (তখন)—ব্যাকোন কী করবি? ফেলট লহসা ঠোট উন্টে চোখের তারা কোটেবে চালান করে দিয়ে যুখে একটা কপট নিচিপ অবজার ভাব ফুটিয়ে তোলে, তা দেখে খিন্‌ খিন্‌ ক'রে হেসে কেলটু মাটিতে লুটোপুটি খায়। বলে, ঝা, দেখালি মাটরি,—কিন্তুক ধর কদি এসেই পড়ে শেকল কেটে। অরনি কেলটুর মুখখানা ভয়ে নিবর্ণ চাই হয়ে যায়। ভয়ে চোখের তারা ছুটো কাঁপতে থাকে। বুকের ভিতরটা কীরকম

হু হু করে। তবুও সাহস নকর করে ফেল্ট। ফেল্টকে চূপচাপ থাকতে দেখে ফেল্ট বলে, থানলে কী হবে গুরু? ফেল্টের আচমকা গুরু সন্তোষ। ফেল্টের বৃকের ভিতর শলাট্টরে ফুলকির মত জলে ওঠে। ফেল্ট বলে, শালো মওকা পেলে পটকা ফেড়ে দেবো একদিন কানা করে। ফেল্ট উগমগ হাসে, বলে, তোকে কি গুরু মেনেছি সাধ ক'রে। তা শুনে ফেল্টের বৃকের দিকে তাকিয়ে গভীর হয়ে যায় ফেল্ট। হাতের লাঠিটা হুরিয়ে শপাশপ ছুঝো হাসের উপর মাঝে।

ওদের বিক্রম দেখে অহুরে উবু হয়ে বসে নেড়ীকুস্তার দল আকাশের দিকে চেয়ে মড়া কান্না জোড়ে। পাতিকাকগুলো থা থা ক'রে ডেকে গেরব্বদের বেলা এগারোটার বুর ভাঙায়, এ বাড়ী ও বাড়ীর কাগিলে ডানা কাপ্টে বলে। বোধকরি প্রতিবাদ জানায়। এদিকে হাতের লাঠি শক্ত মুঠোর ধ'রে ফেল্ট চিংকার পাড়ে, বজ্রাত, মানবের খাবারের ওপর ভাগ বসাতে আসবি তো বদন বিগড়ে দেবো। ফেল্ট হাতের লাঠিটা সানকির উপর মেরে তা পৈ নুতা করে। মাইরি গুরু, তোর বীরত্ব আছে কাই বলিস। দেখে শুনে অবাক মানছি। ব্যাস্, ফেল্ট যেন অস্ত্রের মত শক্তি পেয়ে যায় কোথা থেকে চকিতে ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবারের কথা ভুলে পাতি কাক আর নেড়ীকুস্তাদের পেছনে তাড়া করে ছোট্টে। আর সেই মওকার ফেল্ট অস্ত্রহিত হয়ে যায়, এতক্ষণ ধরে চূপিসাড়ে লুক করে যাওয়া ডাষ্টবিনের পেটের মধ্যে।

আট আট বোলটা ক্র্যাটের মাঝখানের বড় ডাষ্টবিনটার সামনে এসে লাড়িয়ে ফালুক ফুলুক তাকায়। পুঙ্কিত হয় মনে মনে। ফেল্ট এতক্ষণে কাক আর কুকুরের পেছন পেছন অনেকটুর এগিয়ে গেছে। কিছু করে এক চিলতে হাসলো ফেল্ট। শালো মস্তান, তাপর গব গব ক'রে টিক বাক্সের মত ছাইপাশের গাদা ঘেঁটে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো গিলতে লাগলো। শাল আর কলা পাতা চাটতে চাটতে জিতে টাগরায় চটাস্ ক'রে শব্দ করলো। ইস খাটি ঘিয়ের গন্ধ আসছে। একেবারে খাটি ঘি। আরও কীসব মসলায় গন্ধ। তার নামই জানেনা ফেল্ট। ফেল্ট তো ছায়, তার বাপ ঠাকুরাও জানেনা। গতকালই এই ডাষ্টবিনটার সামনে এসে লাড়তেই শুনেতে পেরেছিল হাতে বেশ ধুমধাম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হ'য়েছে কোন ক্র্যাটে। সেই আশায় বুক বেধে সাধাটা দিন ধরে এমন কি হাত বারোটা অবধি এ পাড়ার

কুকুরগুলোও সঙ্গে হৌক হৌক ক'রে বেড়িয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাড়ীর চাকরবাকরগুলোও পর্যন্ত ডাইবীনের ধারেকাছে আসেনি। কারণ, ধূমধাম বাপার হলেও বিয়ে পৈতে কিংবা অন্নপ্রাশনের বা জ্ঞান্দের কোন ব্যাপার ছিল না। এমনি বন্ধু বান্ধব নিয়ে খাওয়া দাওয়া। প্রাইভেট গাড়ী এসেছিল অনেক। হানি ঠাট্টার শব্দ কানে আসছিল বার বার। ছেলে আর মেয়েদের একসঙ্গে নানারকম গান। কিন্তু উজ্জিষ্ঠ নিয়ে কেউ ডাইবীনের ধারেকাছে আসেনি। তাই কাঁচা খিচি কাড়তে কাড়তে শেষে ডেয়ার ফিরে গিয়েছিল কেলটু। ঝাকা সানকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রাগে। কিন্তু আজ কাক কঙ্গা দিতেই সেই সানকি হাতেই এসে সরকারী বাড়ির গেটের মুখে দাঁড়াতোই চমকে উঠেছিল ফেলটুকে দেখে। ইস্ বাবুর বাড়ির এতসব রঙ বেরঙের খাবাবের উজ্জিষ্টের উপর ভাগীদার। সে আবার, যে সে কেউ নয়, কেলটু। বৃকের ভিতরটা ধুকধুক ক'রে উঠেছিল। এখন সেই ফেলটুকে কাক আর কুকুরের পেছনে ভিড়িয়ে দিতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একথানা চিবোন মাসের হাড় মুখে পুরে চুষতে চুষতে উবু হয়ে কেলটুকে দেখতে গিয়ে, বাবুর বাড়ির গ্রীলে ঘেঁরা বাবাঝার বড় বোমওয়ালা কুকুরটাকে দেখতে পেল। কুকুরটা বোধকরি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিল তাকে। কেলটু মাথা জাগাতেই গর গর শব্দ হুলে কুকুরটা ভেঁচি কাটলো। বোধকরি বিজ্ঞপ করলো। সহসা কেলটুর মনে হলো তলে কি তার গালের মাংসের অসমাপ্ত চিবোন চাড়খানা শুই কুকুরটার খা আর দে'র না ক'রে বাকি মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদি দিয়ে সানকি ভর্তি ক'রে ফেললো কেলটু। তারপর পায়ে পায়ে হেঁা কাটো হয়ে যেতে যেতে ভ্রনতে পেলো ফেলটুর হাক কুকুর-গুলোকে যে এক লহম'র চৌহদ্দির বাটেরে বার ক'রে দায়েছে সেই বীরত্বটুকু প্রমাণ করার জন্যে কেলটুও নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এসে দাঁড়ালো ফেলটু। কিন্তু কোন সাড়ালক নেই কেলটুর। ইতি উতি চোখ ফেঁদাতেই দেখতে পেলো, বাবুদের বাড়ীর গ্রীল দেওয়া একতলার একটা ফ্রাটের বাবাঝার দাঁড়ানো বো কি রেয়া এমন কি বাড়ির স্থানী কুকুরটা উল্লক তাকে দেখে টিপে টিপে হাসছে। এমন সময় দেখতে পেল, কোন ফ্রাটি থেকে একটা কি লাল চকচকে পলিধিনের বালতি করে, এক বালতি নোংরা এনে ফেললো ভাট বীনটার। আর অহনি হারলে গিয়ে পড়লো কেলটু শুধু ভাই, আর নোংরা ছেড়া তাকড়া ছাড়া খাবার কিছুই পড়েনি। কেলটুর স্তন গেটেপুটে শেষ করা

কলা আর শালপাতার দিকে চেয়ে টস্ টস্ করে কয়েক কোঁটা জল নেয়ে এলো চোখ থেকে । মনে পড়লো, ছোট বোন পাঁচির আঁখায়ু । - হাঁহা, আজ আঁখার জন্তে এসটোরেটের ভাল ভাল খাবার যা পাবি, নে আঁসবি । আহা ! গত সাতদিন ধ'রে হাসপাতালের চাতালে যবে বাহুবে চানচানি হয়েচে পাঁচিক নিয়ে । সাত রাত চোখের পাতা এক ক'রতে পারে নি ফেল্টু । জবে ভুগে পাঁচির চললে মুখখানা শুকনো আমসির মত হ'য়ে গেছে । সেই মুখের চোয়াল নাড়িয়ে চিঁ চিঁ ক'রে দাদার কাছে আঁখার জানিয়েছিল পাঁচি । তাই সাতদিন পর হাসপাতাল থেকে ফিরেই আজ কাকফর্সা না দিতেই এসে হাসির হয়েচে ফেল্টু ।... .. আর যেন ভাবতে পারছে না সে । সহসা ফেল্টুর মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের উপর ।

হারামজাদ স্ত্রীর কা বাচ্চা । শালো, তুমি কাক আর কুকুরের বেহন্দ । আপন মনে কথাটা বলতে বলতে দাঁতে দাঁত চাপলো ফেল্টু, তারপর ছুটলো ফেল্টুর খোঁজে—শালাকে শেলে কপ্পোরেশানে জল দে আন্ত গিলে ফেলবো... ভাবতে ভাবতে গলায় ঠিক কুকুরের মত গরগর শব্দ তুলে ডেরার দিকে ছুটে গেল ।



শ্রেষ্ঠ ইণ্ডিয়ান সার্কাজ

দিব্যাশচন্দ্র লাহিড়ী

শ্রীভেদ অতিথি পাখির মত এবারেও হাওড়া ময়দানে জাঁকজমকের সঙ্গে সার্কাসের বিরাট তাঁবু পড়েছে । আর তাঁবু খাটানো মাঝেই চারপাশে যেন উৎসবেরও আনন্দ লেগে গেছে । বিরাট তাঁবুর চারপাশে ছোট ছোট তাঁবু । এক পাশে পশুশালা । হাতী ঘোড়া উট বাঘ সিংহ বানর বাক্যে বাক্যে গর্জন । উঁচু বেড়ার ওপাশে কোতুলী ছেলে বুড়ো বাহুবীর দল । নানাধরনের সন্তব্য ।

কখনও কখনও এক আখটা ভিল হোঁড়াছড়ি। সার্কাসের সদর প্রবেশ পথের
এদিক ওদিকের বাঁতাগাতি গজিরে উঠেছে চা-পান বিড়ি-ভেলেভাজাৰ গ্রুৱ
চোকান। কঁলে ময়দানের আসে-পাশের এবং ফুটপাথের দ্বাৰী গুপসী-গুপসী
ধরের অস্বাভাবিক বাসিন্দাদের হয়েছে বেশ বুদ্ধিল। বেআক্ৰ ভিখিৰী লোকগুলোর
আক্ৰ বলতে আৰ কিছু নেই যেন।

তবু তাৰই মাঝে শুক হয় ওদের দৈনন্দিন জীবন। জাটা কালো হাড়-
সকল ছেলে-মেয়ের দল খাবার সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। পথ-
চাৰীদের কলে দেওয়া খাবারের ঠোঁড় কাড়াকাড়ি করে চেটেচুটে দাঁত বের
করে ধাবমান বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে হি-হি হাসে। আৰ মাঝে মাঝেই
সার্কাসের বেড়ায় উকি মাঝে। এক চোখ কানা বুদ্ধী হাবলের মা প্রাতঃদিনের
মত ভাঙ্গা চায়ের বাজের ওপর আভিকালের ছাতাপড়া বিস্কুট, লাল-নীল
পেপ্স আৰ কয়েকটা পান নিয়ে বসে। কিন্তু তার চেচাওয়া দেখে কোন
বন্ধেই আসে না। পাশেই তিনটি ইঁট দিয়ে সাজানো উত্থনে নিখোজ চটকল
মজ্ব হাৰাণের বিধবা বউ বৃথায় ভিজে কাঠ-কুটে আঙন ধরানোর চেষ্টা করে
আৰ গাল দেয়—মর মর। মুখপোড়াদের মরণ হয় না।

—মরণ কি অত সস্তা বে। —চাবলের মা বলে।

ওপাশ থেকে ছায়ায় খোলা বউ চিংকার করে ওঠে —একুণি শানুকিতে
গেঁড়োগুলো পোবার জন্তে রাখলাম, কে নিল ?

গুপসীর ভেতর থেকে ছায়া গর্জে ওঠে,—মাগী তুই নিজের জন্তে গেঁড়ো-
গুলো সরিয়েছিস। শালা—কচুর গেঁড়ো সিদ্ধ করে খাব তাও—শালা তোর—

ওদিকে রাস্তার আবজ্ঞনার স্তূপে ফেলে দেওয়া ভাবের ভেতরে শাসের
সন্ধান পেয়ে তার মালিকানার জন্তে ছোঁড়াবের মধ্যে মাঝামাঝি বাধে আৰ
'খস্তির তুবড়ি ছোটে।

ফুটপাথের এক পাশে বসে ঠোঁটে বিড়ি নিয়ে ভাল ফাঁটতে ফাঁটতে ভিগু
বধু বাবুর দল হজা করে বলে—লাগা শাল্লা চিহ্ন চিহ্ন—ধমেকের পক্ষধন—
'চিহ্ন চিহ্ন।

জজালের মধ্যেই ছোঁড়াগুলো মাঝামাঝি করে।

ভিগুর বাপ পায়ের দ্বাৰে পটি বাধতে বাধতে মাঝে মাঝেই অভ্যাসবশত
পথচাৰীদের বলে ওঠে—গরীব খোঁড়াকে ভিক্ষে দেন বাবু।

ছায়া তার বউয়ের চুলের মুঠি ধরে ছ'ছা করে দিয়ে চিংকার করে,—বল শালা,

কোথায় রেখেছিস পেঁড়ো। তিন দিন পেটে কিছু নাই, তার ওপরে—
 রংচটা রাতজাগা স্থামণি বুপসীর ছেঁড়া কানি পয়সার বিরক্তিতে একবার
 তাকায়, তারপরে চোখ বুঁজেই আড়মুড়ি ভাঙে আর বলে,—বত ছোটগোকের
 কাণ্ড।

দূর থেকে স্থামণির ছেঁড়া-রাউজে আড়চোখে এক চুম্বক নজর বুলিয়েই ঘুটে
 ফুঁহুলাল গুণগুণ করে গান ধরে,—সুন্দরী—হার হার সুন্দরী—
 স্থামণি ভুক কুঁচকে বলে—মর মিন্‌সে।

এদিকে চাউস পেট নিয়ে ফুটপাথের ওপর পা ছড়িয়ে বসে বিস্তী সমানে
 কৌকার—আর পারি না। একটু ফান দে—ফান দে।

তাই শুনে হাবলের মা গজগজ করে—সোরাযীর সাথে সম্পক নাই এদিকে
 বছর বছর—

বিস্তী নাকে কাঁদে,—বড় যন্ত্রণা গো—বড় যন্ত্রণা

সার্কাসের মাইকে বাজে—ধন ধান্তে পুষ্পে ভরা।

গান শুনে সকলেই ক্ষণিকের জন্ত থমকে যায়।

তুখু বিস্তী কৌকার—কচুর শাক কটা সেদ্ধ করে দে। একটু খেতে দে

গান বামলে সার্কাসের মাইকে শোনা যায়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস, গ্রেট ইণ্ডিয়ান
 সার্কাস। আজই শুভ উদ্বোধন। আপনারা দলে দলে আসুন। টিকিটের
 হার দশ টাকা পাঁচ টাকা দু'টাকা আজ থেকে শুরু। উদ্বোধন করবেন
 মাননীয় মন্ত্রী শ্রী—আর প্রধান অতিথি থাকবেন মাননীয় মেম্বর শ্রী—গ্রেট
 ইণ্ডিয়ান সার্কাস—

বিস্তীর কোল ধেঁবে দু'টো হাড় জিরজিরে পেটসর্বস্ব বাচ্চা কাগা জুড়ে দেয়।

বিস্তী একটার পিঠে থাণ্ডার লাগিয়ে মুখ কামটা দেয়—আমাকে খা তোরা,
 খেয়ে ফেল আমাকে।

বাচ্চা দুটো চোখ বুঁজে প্রকাণ্ড হা করে কাঁদে।

হাবলের মা বিরক্ত হয়ে একটা বিড়ি ধরায়। আর ভাবে কি হয়ে গেল
 সব। চাল ডাল ডেল শুন না জুটলে খাবে কি সবাই? বাঁচবেই বা কি করে?
 যমের অকচি সেই ভোঁটের বাবুগুলোই বা গেল কোথায়? ও নজ্জারদের করে
 কি হাড়ি চড়াতে হয় না?

—আরে ব্লট বোলে কোয়া কাটে, কালে কোয়েলে ডরিও.....

সার্কাসের মাইকে গমগম করে গান বাজতে থাকে।

হাতা দিয়ে অজস্র হাহুঁব হেঁটে যায়। বাস ট্যান্ডি কার লড়ীর মোড় হয়ে চলে। চারপাশের দোকানে হাতার ফুটপাথে বাজারে শুক হর কেনা-বেচা। ঘোদ বাড়ার সাথে সাথে সার্কাসের তাঁবুর সামনে বেড়ার চারদিকে ভীড় জমতে শুরু করে। চতুর্দিকের এই অজস্র হাহুঁবের মুখ দেখে মোটেই মনে হয় না যে কারও কোন দুঃখ দুর্দশা অভাব আছে। কিংবা কোথাও কোন গলদ রয়েছে। সবই যেন ঠিক-ঠাক ঘটে যাচ্ছে।

তবুও হঠাৎ ভিণ্ডু বহু রাসুর তাস খেলা বন্ধ হয়। ওয়া উঠে পালায়। বিস্ময় কান্না যেন কণিকের জন্তু ধমকে যায়। ফুটপাথ যুগরী যুগরী বাসিন্দারা সচকিত স্তব্ধ হয়। চাপা হজ্জা শোনা যায়—হাজ্জা গাড়ি—হাজ্জা গাড়ি—পুলিশ।

মুহূর্তমধ্যে সবাই যেন ভয়ে শিঁটিলে ওঠে। কালো ভ্যান থেকে ফুটপাথে পুলিশ নেমে গর্জন করে,—হঠাৎ, ফুটপাথ সাফা করে, মিনিষ্টার আরেগা—মিনিষ্টার আরেগা।

স্বধামাণ আপন মনে মুখ ঝামটায়, আ ময়ণ, ভোর মিনিষ্টারের কি আমি রাখনি? যা না হাডকাটায়।

—এই লড়কী বকো মাং।

—আ ম লো, মিন্সের চোপা দেখ। বলি ও সেপাইজী চাঁচি পান খায়েগা? সেপাইজীর শকুন চোখ স্বধামাণির চোঁড়া ব্রাউজ থেকে আর সরতে নড়তে চায় না। সে একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকে।

এদিক ওদিক থেকে দু-চারজন ধূমনিওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, চা পান বিড়ি-ওয়ালাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। —যাওয়ার আগে এখানে ওখানে দু চার খা বসিয়েও দেয়।—

কিছুক্ষণের জন্তু চারপাশের চাকলা যেন একটু বিত্তিয়ে আসে। এটু পরেই তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

‘বস্তী কোঁকার—মরে গেলাম, মরে গেলাম।

ছানু বিড়বিড় করে,—কত দিন তাত খাই নি। এটু ফান।

হারলের মা পুলিশের বুটে উল্টানো চায়ের বাজের তলায় ভাজা বিস্কুটগুলো খুঁজতে থাকে আর ভাবে ওবেলা থেকে তাকেও উপোস করতে হবে।

ওদিকে ফুদুলাল নতুন আশায় গান ধরে,—ভাল হোটি খাও, প্রকৃৎক সীত পাও। সার্কাসের হাইকে শোনা যায়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।

আজই শুভ উদ্বোধন। টিকিটের হার দশ টাকা পাঁচ টাকা হুঁটাকা। মাননীয়
মন্ত্রী—বিশেষ আকর্ষণ—অসাধারণ খেলা। হিংস্র সিংহের শিক্তপ্রীতি। ভয়ঙ্কর
ভয়াবহ নরখাদক হিংস্র সিংহের অভূতজনীয় শিক্তপ্রীতি। “বিবেক” ইতিহাসে এই
খেলা এই প্রথম।

সার্কাসের প্রবেশ দরজার ক্রমে ভীড় বাড়তে থাকে। বেড়ার চারপাশেও
কৌতুহলী ছেলে-মেয়ে-মাহুঘের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু কুটীপাথের জীবন
একই ভাবে বয়ে চলে। কখনও চিংকার, কখনও বা জঙ্কতা। ‘তবুও এরই’
মাকে সার্কাসের উদ্বোধন যেন প্রত্যেকের কাছেই একটু নতুনত্বের একটু বৈচিত্র্যের
ছোঁয়া এনে দিয়েছে। সকলেই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—কখন
শুক হবে খেলা!

এক সময়ে তাঁবুর ভেতরে কনসার্ট বেজে ওঠে। তাঁবুর দীর্ঘ খাখালোর
মাথায় রঙীন বেলুন উড়তে থাকে। আর গেটের বাইরে ভীড় সামলাতে
পুলিশেরা হিমশিম খায়।

—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। আমাদের খেলা একটু
পরেই শুরু হবে। টিকিটের চার—। মারাত্মক টালিভের খেলা—ডেথ
জাম্প হাতী মেরা লাখী—উটের নৃত্য—আর বিশেষ আকর্ষণ, বিশেষ এই
প্রথম—ভয়ঙ্কর বস্ত্র সিংহের অসাধারণ শিক্তপ্রীতি—মানব-শিক্তর সঙ্গে নরখাদক
সিংহের মিতালী গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস—

রাজনার মাইকে ভীড়ে গোটা চত্বরটাই গম্গম্ করতে থাকে। মিনিষ্টারের
গাড়ী আসা মাত্রই ভীড় যেন আরও উপচে পড়ে। যান-বাহনের চলাচল বন্ধ
হয়ে যায়। পুলিশ লাক্সেন্টরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। বেড়ার চারপাশে
মাহুঘ ক্রমেই বাড়তে থাকে। কনসার্ট আরও জোরে শুরু হয়।

‘মিনিষ্টার ও মেয়রের ছোট বক্তৃতার পর হাততালিতে যেন ক্ষেটে পড়ে
তাঁবু। কনসার্টে ঘন ধাক্কা পুষ্প ভরা। মাইকে ঢল্‌ ঘোষণা—আমাদের
প্রথম খেলা—বানরের প্যারেড, শিম্পানজীকে গার্ড অফ অনার—

বাইরে ভীড় ও চিংকার ক্রমেই বাড়তে থাকে। সে ভীড় সামলাতে পুলিশ
এক সময়ে মুছ লাঠি চালায়। জনতা ও পথচারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে এদিক
ওদিক ছুটে পালায়। ড্রাইভারেরা মাক বাস্তার পাড়ী ফেলে পৌঁ চাকা দেয়।
চারপাশের হোকানের দরজা কপাকপ বন্ধ হয়ে যায়। আর লোকেরা হতবুদ্ধি
হয়ে পরস্পরকে ধাক্কা দেবে কে আগে পালাতে পাবে সেই চেষ্টা করে।

কিছুকণ পরেই সবকিছু আবার আঁকে আঁকে স্বাভাবিক হয়ে আসে কিন্তু—
কিন্তু সার্কাসের সদর বরজার ভীড়টা যেন হঠাৎই স্থপরী স্থপরী বরজালোব
স মনে কুটপাথের ওপরে জ্বালায়ত ছর ।

২৫র লোকে ভীড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ।

গোলাকৃতি সে ভীড়টাও ক্রমেই বাড়তে থাকে । কেবলই বাড়তে থাকে ।
যাঃ হুয়ের বাহুবের দুটি আকর্ষণ করে । তারা ভাবে ম্যাক্সিক কিংবা দাঁড়ের
ম জন কিংবা অন্ধ-শিল্পীর অপূর্ব ছবি বোধহয় ওখানে আছে । ভীড়ের ভীড় তারাও
ভীড়ের দিকে এগিয়ে আসে । আর ভীড় ঠেলে উকি মেরে দেখে—

বিক থিকে রক্তের মাঝে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চিং হয়ে পড়ে আছে বিকী ।
১৭ ছুটি আকাশের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে মরা মাছের চোখের মত ।
ঠাটের ওপরে কয়েকটা কালো মাছি সঁটে আছে । আর কয়েকটা ভুলভুল
করে উড়ছে । রক্তহীন ব্যা'কাশে মুখটার এখন আর কোন বস্তুপার ছাপ নেই
যন । কিন্তু দুই উকির মাঝে রক্ত মাখানো ওটা কি ? একটু আধটু নড়ছে
বামদয় । পা দুটো তো এখনও ভেতরেই রয়েছে ॥

ভীড়ের মাঝ থেকে কে যেন বলে ওঠে—শিগুগরি হাসপাতালে নিয়ে
১৮ন । কাছেই হাসপাতাল ।

—হুয় মশাই, মরা মানুষকে হাসপাতালে নেবেই না ।

—ছেলেটা বাঁচবে তো ?

—যা মরে কাঠ আর ছেলে জ্যান্ত, ডাক্তারে খিনী দেবে ।

—একটা ডাক্তার ডাকুন না । অনেক কটা ডাক্তার আছে আ'শে-

১৯ন । ঐ তো—

—মদ'না, কি দেবে কে ? চালের কে, জি, ছ'টাকা, ডেল আঠাঝো টাকা ।

—সবাই কিছু কিছু পরসা দিন না ।

—মদ'না, পরসা দিই আর ওদিকে ছেলেটা যদি বাপ বলে কেঁদে ওঠে ?

—এম্বুলেন্স, এম্বুলেন্স ডাকুন না ।

—সোজা মর্গে পাঠিয়ে দিলেই তো লাঠা চুকে যায় ।

—হুয় মশাই, পুলিশের হাঙ্গামা সামলাবে কে ?

—অনেক দিন খেতে পায় নি বোধহয় ।

—কিন্তু কত বক্ত মাইরী ।

—শালা—টীক মিনিটাবকে কান ধরে নিয়ে এসে দেখা ।

—লে লে আর বাতেলা মাঝি না, সিনেমাৰ লাইনে কাঁড়াত্তে হ'ব
খেয়াল আছে ?

—আজ্ঞা বলুন তো ভাৱতে প্ৰতিদিন ফুটপাথে কত শিশু মায়া যায় ?

—আমি এ বিষয়ে বিসৰ্চ কৰছি। এয়া যদি মৰবেই তৰে জন্মায় কেন ?

—ফুকুৰ ফুকুৰ কৰে বলেই জন্মায়। শা-লা বেজয়া।

—খবৰেৰ কাগজে এ চুপ্ত স্ফাণ কৰা উচিত।

—আগে চেলৰ মিনিষ্টাৰকে ধৰে আশুন।

—সেদিন মশাই হেঁদোৰ সামনে দেখি একটা ভিখিৰী—মানে মেয়ে
বেশ ডাগৰ ভোগৰ

তাঁহুৰ ভেতৰে হাততালি পড়ে। মাইকে কনসার্ট ফুততৰ হয়।

আৰ এদিকে বিদ্যুতৰ দৈত ঘিৰে ভীড় আৰও বাঢ়তে থাকে। নানাবন্ধ
মহুৰা—পৰামৰ্শ—উত্তেজনা আলোচনা সমানেই চলে।

এক ফিন্‌ফিনে সিহেৰ প'জাৰী বেল-বটমকে বলল,—বাৰিশ, এ দেশে মিলিটাৰ
কুপ হ'ব দেখিবেন

বেল-বটম বুল শাটকে,—এপেৰ সেজি হিৰোইন কে বলুন তো ?

বুল শাট পাজামা-জুৰু পাজাবীকে, ইনফেশ্বন আৰ হোৰ্ভিং বন্ধ না কৰে
পাৰলে।

জুৰু-পাজাবী, এবাৰশন লগালাইজত্ মানলুম কিন্তু ডিউ স্লিপে বাৰ্ষকে কণ্টোল
কৰতে না পাৰলে সায়েন্সেৰ

মুক্তি শাট,—কথাটা গৰী ব হট্টা, না গৰী ব হট্টাও ? বড বাজাৰেৰ চাৰজন
ভাড়াটে বাবলাদাৰেৰ কোমৰে দাড় দিহে আৰ গোটা কলকাত্তাৰ পঁয়ত্ৰিশ লক্ষ
কালো টাকা ধৰে মুৰ্খগা—আজ্ঞা আমি চলি—বকেলে জুৰুজীৰ নামগান আছে।

—ছেলেটা বোধহয় বেঁচে আছে।

—ধুকপুকু কৰছে। কিন্তু কেঁদে না কেন ?

—হুৰ—পুৰো ডেলিভাৰি না হলে,—শা দুটো এখনও তো ভেতৰেই আটকে
আছে।

—‘গুপ্তজান’ ফিল্ম-এ এসব শিক্কাৰ ভিত্তিত।

সাকাসেৰ মাইকে জবৰদস্ত কনসার্ট আৰও ফুততৰ হয়। তাৰই কাঁকে
শোনা যায়—গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান সাকাস। এবাৰে আজকেৰ সেৱা খেলা—ভৱতৰ
সিংহেৰ শিশুপ্ৰীতি। নৱখাদক সিংহেৰ লগে তিন বছৰেৰ শিশুৰ—

হঠাৎ ভীড় সরিয়ে কোথা থেকে হাবলের মা এসে দাঁড়ায়। আর এককলক দেখে নিয়েই হ-হ করে কেঁদে ওঠে—বিস্ময়ে। তারপরেই ভীড়কে লক্ষ্য করে—হারমাজাদা আবাসীর বেটা,, খানকীর বাচ্চারা তোরা মাজব! তোদের মরণ হয় না? অ বুহুরা, অ সুখমণি শিগমিবি গরম জল আর স্নাকড়া আন। ব্রেক আন। মিন্‌শের বল হা করে দেখছিল কি?

ভীড় পাভলা হয়। হারু আর ফুহু'লাল একটা নোংরা শাড়ীর ছ'প্রান্ত ধরে জারগাটাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

লিংহের গর্জন ছাপিয়ে মাইকে অতি ক্ষুদ্র কনসার্ট বাজতে থাকে।

আর একটু পরেই যেন লোকজন ভীড় গাড়ী মাইকের বাজনা, সব কিছু শব্দ, কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা শিউ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, - ওয়া ওয়া ওয়া।

মৃত্যু

অনিমেস রায়

সফরের শুরুতে লবেমাত্র গাড়ি ছাড়ার সময় উল্টেদেখে রোগানের মতই ভেসে এল একটা আত্ননাদ!

বিশেষ যার অবস্থা ছোট, জাত ছোট, জগৎ ছোট, ছেলেটা আরও ছোট। থাকত পাড়ার কোণের বাড়িটার এক কোণে। এসেছিল নিঃশব্দে, থাকত নিঃশব্দে। সুনলার বোবা লাংড়া ছেলেটা মরেছে।

মায়ের কাঁদার সময় নেই! ছোটলোক ওরা, ওদের কাঁদাও ছোট। শোকের সময় কৈ? শোকযাত্রার চাঁদা কুড়োতেই শুভ্রা পুলেছে।

যাওয়া আসা সবটাই সত্যি। শব্দময় জীবনের আশার মাঝের যে পাঁচ লাংটা বছর কাটিয়ে গেল বিশেষ, ওটাই ছিল ওর মৃত্যু। এখন শু মৃত্যু।

মৃত্যু দুঃখ আনে কিন্তু এ ছেলেটা যেন দুঃখটা লম্বে নিয়ে গেল। অনেকেই বলল—মুক্তি পেল, খালাস পেল।

খালাস কে পেল? সত্যিই কি পেল? না দিল?—জানিনা।

অ জা হে

ঐশ্বর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের উত্তর পশ্চিমকোণে মেঘ জমতে শুরু হয়েছে। সামনের পুকুর পাড় পেরিয়ে যেঠো রাস্তা। গরুর গাড়ির ঢাকার ঢাকার ধুলো উড়ছে। ঘনঘমে গাছপালা বাতাল নেই একটুও। ঐ পথ দিয়ে মাত্ৰ চলছে, পাড়ি চলছে। কেউ কেউ ঘাড়ে আবার কেউবা ফিরছে। কেউ ঘাড়ে কেনা কাটা করতে আবার কেউ বা ফিরছে কেনা কাটা সেয়ে। কেউ সাহায্যাত ধয়ে যাত্রা দেখছে, সিনেমা দেখবে। আলকাপ সুরুরের দল এসেছে। সাধন ঠাকুরের দাওয়ারা অতীরে পুকুরের পাড় দিয়ে মাত্ৰের মিছিল চলছে। এ গাঁয়ের জিন গাঁয়ের মাত্ৰের দল। বেলুন উড়ছে নানারঙের। গ্যাস পোরা। সুরি ঠাকুরের দিকে মুখ করে উড়ে যাচ্ছে তারা। কেউ গান করছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলছে। ভারী স্বন্দর। এক উৎসবের জোয়ার নেমেছে যেন গ্রামের বুকে। পুরাণো দিনের লোকেরা বলে, আগের দিনের মত মেলায় সেই জোর নেই সেই আনন্দ নেই। আগে নাকি আরও লোক আরও আনন্দ আর হাসিখুশির ভাব ছিল মেলায়। এখন বাস চলে দিনরাত। বাটরের মাত্ৰ বাসে চলে আসে আবার মেলা যেখে কেনাকাটা সেয়ে চলে যায়। সেই জমিটি আসব কেমন যেন খাপছাড়া। কেমন যেন প্রাণের চেহারাটা কেমন করে যেন পাগটে গেছে।

অগত সাধন ঠাকুরের ছেলে লক্ষীকান্ত এসব কিছুই বিশ্বাস করেনা। সে নিজের ঘরের দাওয়ারা বলে বলে এই সব যাত্রী দেখছে আর বাপের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। আগের দিনের সবকিছুই ভাল, সবকিছুই আনন্দের—বাপের যেমন কথা। — হুগুই বা বাপ, তারও কী শখ, আল্লাহ থাকতে নেই? পিতৃ কল্যাণে? থাকল তোর জমি জায়গা বসত বাড়ি, আবার কী? গভর আছে খেটে খাব।

পুস্তকাল সে মেলায় গিয়েছিল। এক তাজব ব্যাপার। কত মাত্ৰ আর আজব সব কাজকর্ম তাদের। বাকীস পাটি, ব্যাজিক, বাগরকোলা,

চরকরকরের ঘোঁকান, সিনেমা, পুতুলনাচ, বাজা, কুহু—বাধা বুঝে যায়। লক্ষী অবাক হয়ে এক পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সার্কাস পার্টির বড় বড় মেয়েদের ক্রক পরে বুঝতে কিয়তে দেখেছে। সে আরও দেখেছে বাব, সিংহ, ভল্লুক কত মজাদার সব জিনিস। বিছাভের আলোর কলহল করছিল তাঁবুর ভিতর সে মেলাতে রাত কাটাবে ভেবেছিল। অবাক চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় সে মনে করল অনেক লোকের মধ্যে সে ইচ্ছে করেই হারিয়ে যাবে। লক্ষী জানত না, ইচ্ছে করলে হারিয়ে যাওয়া যায় না। তবুও সে একসময় গগন মণ্ডলের চোখের আড়ালে সোজা হাঁটতে হাঁটতে বড় বিলটা বুঝে ওপারে গিয়েছিল। দেখল এক তাঁবুর পাশে সুমুগদলের খেলোমেয়েরা হাসা-হাসি করছে নিজেদের মধ্যে। গুহের হাসির মধ্যে কেমন একধরনের নেশা। ধুম ধুম ভাব। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এই তাঁবুর পাশেই বড় বড় লম্বা বেলুনকে বাতাস ভরে দিয়ে নানারকমের আকর্ষণে বিক্রি করছে দোকানী। কালবড়া পাঁপড় ভাজার তেলপোড়া গন্ধ বাতাসে। গরুর গাড়ির ভিড় ঠেলে মাজিক দেখানোর তাঁবু, বাইরে ককালের চেতারা আঁকা পর্দা। পাশে মাটি কোপানো খোলা জায়গায় কুস্তি হচ্ছে। পনেরো পরসার টিকিট। সে টিকিট কেটে পালোয়ানদের দেখেছিল। আর সেখানেই সে একসময় ভিড়ের চাপে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটি অজ্ঞানমনী তিনগ্রামের মেয়ের গায়ে। মেয়েটি তাকে কিছুই বলেনি কিন্তু অদ্ভুত আবেশে মেয়েটি সারাক্ষণ তার দেহ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুস্তি দেখেছিল। তারপর গরু হাতটা ধরেছিল। লক্ষীর সারাদেহ কঁপে উঠেছিল। সামনে কুস্তি চলেছে অবচ তার মনে কড। মেঘ নেই, বাতাসে নেই অবচ কী এক অবাক যন্ত্রণার তার হাঁট থেকে পা অবধি কাঁপতে থাকল তারপর লম্বা হাততালি লক্ষী হাত ছেড়ে হাততালি দিয়েছিল।

লক্ষী দেখেছিল, কোপানো মাটির ওপরে একজন আর একজনের বুকের ওপরে বসে বিজয়ের হাসি হাসছে। চিংকার করে কে যেন বলে উঠল : বাজিয়াং তাইয়া, ছোড্ দ্বিজয়ে।'

ভিড় পাতলা হয়ে এলে লক্ষী কুস্তির আখড়া ছেড়ে বাইরে এসে সেই মেয়েটিকে আর দেখতে পারনি। কিছুক্ষণ আগের সেই প্রাণকাঁপানো নেশা কীভাবে যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে আর অপেক্ষা করেনি আবার হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে যেতে থাকে। বুঝে বাস আর টাক দাঁড়িয়ে। শহরের

মাহুৰ এসেছে, পোষাক আশাকে সে মাহুৰ করতে পেরেছিল।

টিক এমনি সময়েই ফটিক হাড়ি লম্বীকে দেখতে পেরেছিল। একেবারে থপ্ করে তার হাতছুটো চেপে ধরে বলেছিল : ঠাকুঁয়েল বেটা, তুমি কেন ছেলে গা ? ওদিকে পগনতাই তোমাকে খুঁজে খুঁজে হরহাণ আর এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কিনা মজা দেখছ ? দাঁড়াও তোমার বাপকে গিয়ে সব বলব।

বাপকে সে আর ভয় করেনা ভবুও মেলার এত লোকের সামনে ফটিকের অপমান সে নীরবে সহ্য করেছিল। একান্ত নিকপায় হয়ে সে ফটিকের পিছু পিছু মিলে এসেছিল। একটু আগে সে নিজের হাতের গছটা তাকে দেখেছিল, এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ হরতো। ফুলের গছই হবে, সেই অচেনা মেয়েটার গন্ধ, যে মেয়েটা একান্ত আপনজনের মতো ভিড়ের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে হাত ধরেছিল সেই কুস্তীর আখড়ার।

গতকাল রাতে সে হাতের কাছে নাক রেখে বুঝিয়েছিল। এক অদ্ভুত শিহরণে সে কঁপে কঁপে উঠেছিল। বাপে বুঝতে পারিনি। একান্ত ছুশ্চিন্তা নিয়েই সাধন ঠাকুর ছেলের গারে হাত দিয়ে দেখেছিল জর কিনা। বাপের আদিত্যোতা লম্বীর পছন্দ হয় না। বাপে ছেলের গারে কাঁথাটা টেনে দিলেও সে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাপ বুঝেছিল, ছেলের অভিমান হরতো।

লম্বী জানেনা ফটিক সব কথা বাপের কানে তুলেছে কিনা। কিন্তু আজ আর লম্বীর মেলার যাওয়া হল না। সাধন ঠাকুর মেলার আজ হালের এক জোড়া কলদ কিনতে যাবে। লম্বী মেলার যাবার কথা বলতেই সাধন ঠাকুর একেবারে অস্বস্তি হয়ে বললেন : অবিরোধক হসনে লম্বী, বয়স হয়েছে, নিজের সংসার এবার বুঝে নে। আমি আর ক'দিন ? মাঠের ধান পড়ে আছে, আর তুই কি না মেলার গিয়ে ফুটি করবি ? বুড়ো বাপের ওপর তোরা একটুও মারাত্মক হয় না ?

লম্বী সবে যোয়ান হয়েছে। বাপের এই খেদ সে ভাল মনে নিতে পারল না। একটু রাগ করেই বলল : তোরা জমি জায়গা তোরাই থাক বাপ, আমার লোভ নেই। আমি মেলার যাব।

সাধন ঠাকুর ছেলের কথার দস্তব মতো ধমকে বলল : কেন মেলার কি আছে ? ফুটি ? পেটে দানা পড়লে অমন ফুটি সারাজীবনই থাকবে। হালের বলব না কিনলে সবসময় চলবে কি করে তুমি ? গেল সন কী রকম থরা গেল দেখলি না ? আমি তো বাজা মাহুৰ নই যে..

লক্ষী মাথা বিল : ভোর সংসার তুই বুঝবে বাপ । আমার সঙ্গে ভোর কোনদিনই ঘনিকনা হবে না । থাকল ভোর সংসার...

বাগে-আর গছ করতে পারল না । হাঁকোটা দাঁড়ায় হেলান দিয়ে বেখে সোজা ছেলের দ্বায়ে ঠান করে এক চড় মারল সে । আর যার কোথায় ? বাপকে এক ঝটকায় বেলে দিয়ে লক্ষী লোজা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল । ভায়পয় সে এখন কী করবে ভাবতে লাগল । সে পাগিয়ে যাবে—আর কোনদিনই সে কিরে আসবে না, ভায়পয় বুঝবে ! লক্ষীকে মাঝা ? বাপ হরয়েছে বলে নিশ্চয়ই মাথা কিনে নেয়নি একবারে । শেষ পর্যন্ত বাগে ছুঁখে অভিমানে লক্ষীর চোখে জল এল । সে পুকুরের পাড়ে চুপ করে বসে বসে নিজের মনে কুপতে লাগল ।

ছেলেকে হঠাৎ বাগের বেগে চড় মারাতে সাধন ঠাকুর মনে মনে কিছুটা অসুস্থ হতেছিল । ছেলে অকুণ্ঠ বড় । অকুণ্ঠকে সে বোকাবোই বা কি করে ? ছেলের এতটা বয়স হল শুধু জেদ গেল না । আর ছেলেবোই বা দোষ কোথায় ?

মা মরা ছেলে । কত ছোট থেকে আমার দিয়ে দিয়ে সেই তো ছেলেকে জেদী আর অভিমানী করে তুলেছে । ছেলের বয়স হরয়েছে অথচ বাপের মন বুকতে চায় না কিছুতেই । পোড়া চোখ দুটো এখন জ্বালা করে শুধু কিস্ত জল নেই । ভীষণ খরা । ধু ধু করে চাষিষিক । নিজের অচটকে দামী করে সাধনা খুঁজতে চেষ্টা করে শুধু । দিনের হালচাল পাপটে গেছে । কীসব কথা লোকের মুখে । মাঝা বাবু ছিলেন তারাত ডুখী হয়ে গেলেন । সেট গ্রাম আর নেই, সেই ভালবাসা নেই প্রেম আর নেই । কেমন সব খাপছাড়া । ঝটিক হাড়ি এখন গ্রামের নেতা । তার কথাতে এখন গ্রামের শ' শ'য়ে ম'ত্ব চলছে । অথচ কী দিন ছিল একসময়ে । লক্ষীর না জাতক সে তো জানে । তাই আজও বাবুদের বাড়ির কাউকে দেখলে সে প্রণাম করে, সমীচ করে কথা বলে । গাঁয়ের কারোয় মনে আর জ্বালা নেই সবাইকে অবজা । সাধন ঠাকুরের এসব ভাল লাগে না । এসব দেখে শুনে সে বোঝা হয়ে গেছে ।

সাধন ঠাকুর আর কেরি করল না । সে একসময়ে ছেলের লজ্জানে পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়ালো । সে দেখল লক্ষী বসে আছে , বয়সের করছে সাধা মুখ । মাঝা হল, ছেলেটার মুখ দেখলে তার জীব কথায় মনে পড়ে যায় । অসুস্থ মিল শুধু বুকের সঙ্গে । সেই চোখ সেই নাক সেই বড় । প্রাপটা

কঁপে ওঠে। ওর মনে পড়ে যায় ত্রীর সেই বৃত্তা শয্যার পাশে ছেলেটার হাতটা ধরে সে দাঁড়িয়ে কঁদেছিল। ত্রী কিছুই বলতে পারে নি। শুধু ছল ছল করা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল চোখের জল। বাঁশিণ ভিজে গিয়েছিল, তারপর এক ঝড়ের রাতে সব শেষ। তার সংসারের শ্রুততাকে ভয়িয়ে দিতেই চনতো লক্ষী এসেছিল, নইলে সংসারে তার আর আসক্তি কোথায়। দিন পেল মাস গেল বছর গেল, এভাবে সময় চলে গেল এক টানা। ত্রীর দেনা চুকিয়ে সেও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে, এখন শুধু ডাক আসার অপেক্ষা। এসব কথা ভাবতে ভাবতেও সে বুঝতে পারে তার মায়ী এখনও যায় নি! এক অদৃষ্ট মায়ীর বন্ধনে সে এখনও জড়িয়ে আছে। লক্ষী এখনও মাতৃস্ব চল না।

সে একসময় ছেলের দেহ স্পর্শ করল পরে দীর্ঘ গলার সে বলল : তুই আমার ওপর রাগ করিসনে বাপ, বুড়ো হয়েছি বুড়ো হয়েছি বুঝতেই পারচিস, সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।

সামন ঠাকুরের গলায় রীতিমত মিনতির স্বর, তবুও লক্ষী বাপের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দিয়ে বলল : আদিখ্যাতা বাখতো।

অসভ্য মুখটা তুলে পরে সামন ঠাকুর পরে বলল : বাপের সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না লক্ষী। আমার যা কিছু সবটো তো তোরা জ্ঞাত। আমার আর কে আছে বলতে পারিস? সামনের মাসেই তো তোরা জন্ম মেয়ে দেখছি। তোরা বিয়েও দেব, আমার সব ঠিক করা আছে।

লক্ষী একবার কোন উত্তর দিল না। সামন ঠাকুর পূর্ব কথার জের টেনে বলল : আজ আর তোকে মাঠে যেতে হবে না। বাড়ীর পিছনের বাঁশ ঝাড় থেকে চারটে খুঁটি কবার মত বাঁশ কেটে রাখিস, দড়ি তো ঘরেই আছে, কাল বরং বাপ বেটার মিলে ঘরটা মেঝেমত করে নেব। বলা যায় না যে রকম ঝড় উঠছে আজকাল।

পিছন থেকে গগন মণ্ডল এসে ডাকল : কী ঠাকুর! তুমি এখনও তৈরী হও নি?

সামন ঠাকুর সত্যিই লজ্জায় পড়ল। আজ গগন মণ্ডলের সঙ্গে সে বলদ কিনতে মেলায় যাবে এই কথা ছিল। হুতরাং সে আর দেরি করল না। ঘরে গিয়ে গামছার খুঁটে ঢাকাগুলি বেধে নিল সে। তারপর ছাতা আর লাঠি নিয়ে সোজা এসে নাহল সেই মেঠো পথে। খুলো উড়ছে, মাতৃস্বের মিছিল চলছে যেন। হুহু থেকে সে একবার চেয়ে দেখল, লক্ষী তখনও

পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে ।

গগনের সঙ্গেই তার সুখ ছুঁখের কথা হয় । সে তাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পথ হাটতে হাটতে বলল : আমার কপাল ভাল নয় তাই । একেই সময় আমার মনে হয় কি জান ? মনে হয় এই জমি জায়গা হাল গর বেচে দিয়ে কোথাও চলে যাই । কী হবে সংসার গুছিয়ে ? আমার একটা ছেলে, সেও মাঝব হল না ।

গগন মগল পূর্বেই এমন কিছু একটা অনুমান করেছিল । ছেলের সঙ্গে আজকাল অনেকেরই বিনিবনা হয় না । গগনের অবস্থা সে ভাবনা নেই । সংসারের কামেলার ভয়ে সে আজীবন সংসারই করল না । তবু বহুব্রাহ্মণের সংসারে নিতাকার অশান্তির সে খবর রাখে । তাই কিছুটা মহাহুড়ুতির স্তরেই বলল : চাবীর ছেলেদের চোখে এখন শহরের নেশা লেগেছে তাই । জমি চাব কি আর ভাল লাগবে ওদের ? এসব দিনকালের দোষ ! তোমার আমার নয় ।

গগনের কথাগুলি সাগন ঠাকুরের বেশ লাগে । তবু তার মনে হয় কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল থেকে যাচ্ছে । এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত একদিন সকলকেই করতে হবে ।

লক্ষী হুগ থেকে দেখছিল ওদের দুজনের মিলিয়ে যাওয়া । এই পুকুরে পাড় থেকে বহুদূর দেখা যায় । তারপর একটা বড় বাকের আড়ালে গুয়া চলে গেলে সে আবার তাবতে লাগল : আজ না হক এর মধ্যে সে একদিন এখান থেকে পালিয়ে যাবে । বাপ হয়ে ছেলের মন বুঝতে পারে না কেউই । যে সংসারে মন লাগে না সে সংসারে সে নাই বা থাকল । সে শহরে যাবে । শহরে কত হাল কেশান, কত মজা । গতর আছে যখন তখন সেখানেই সে খেটে যাবে ।

হুপুণের ছায়া নামতে থাকে । শালিক পাখীদের কিচিমিচি শব্দ । ঐ পাশে দুটো কাঠবিড়ালী এক নাগাড়ে সাহনের কাঁঠাল গাছে গুণানামা করেছে । কোঠা ঘরে গত রাতে ইছুরদের দৌরাখ্যা গিয়েছে । পুকুরের জলে মাছ লাকানোর শব্দ । সবকিছু মিলিয়ে লক্ষী দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে ।

আমড়া গাছের ডালে বসে দাঁড়কাক ডাকছিল । কাকের ডাক তার একটুও ভাল লাগে না । যা যেদিন বাবা গিয়েছিল সে তখন বছর দশেকের ছেলে । ওর মনে আছে গোলাই বাড়ীর মাধব বাবাজী এই কাকের বিপ্তি

ভাক শুনে এই বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে লক্ষীর বাপকে ডেকে বলেছিল : 'লক্ষী তো তুমি ঠাকুর, এখন আর কি ? এখন লক্ষীকে ঘরের মাঝি কাছে বসে ছয়িনায় কর ।

ভারপর সে কী কড় উঠল যাতে ; যা আর ঝাটল না । সব কেমন হয়ে গেল ।

দাঁড়াকাকের ভাকটা ভীষণ বিস্ত্রী লাগছে কানে । একটা ঢিল তুলে লক্ষী ভাক করে ছুঁড়ল । কাকটা উড়ে গেল বটে কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে আবার ভাকতে লাগল । লক্ষীর প্রাণটা ছাৎ করে উঠল ।

এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়েছিল তার । গত সপ্তাহেই তো সে বাপের সঙ্গে বগড়া করেছিল জমি নিয়ে । বাপ বলছিল : গ্রাম ছাড়বি নে লক্ষী ! জমির মতন আর জিনিস নেই রে । তোর যা বেখে গেলাম তোর অভাব হবে না । একটু নজর রাখবি তাহলেই চলেবে ।

সে বলে ছিল : চাখবাম আমার ছায়া পোষাবে না, আমি শহরে বাসনা করব ।

বাপে হেসেছিল তখন : চাখীর ছেলের আবার বাসনা ? বাবসার আমরা কি বুঝি ? সব লোক ঠকিয়ে খেয়ে নেবে । অবুঝ হসনে । আমি যখন তোর বাপ তখন নিশ্চয়ই তোর অমঙ্গল চাইতে পারি নে । তুই পরের কথায় আর নাচাবি না ।

দাঁড়াকাকটা তখনও ভাকছে বিস্ত্রীভাবে । কেমন কাঁপা কাঁপা গলার আওয়াজটা । ভিতরটা কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে । লক্ষী আবার উঠে দাঁড়াল । কাকটাকে ঢিল মেরে উড়িয়ে দিতে হবে ।

আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে সেই জঘাট মেঘটা ক্রমেই ছেয়ে ফেলাছে । লক্ষীর মনে কেমন আশঙ্কার ছায়া নেমে এল যেন । ঘরের অবস্থা তার অজানা নয় । যদি গত সপ্তাহের মতো আবার ঝড় ওঠে । বাপ বাবার আগে বাপের খুঁটি করার কথা বলে গেছে । কী জানি ঝড় উঠলে ঘরের অবস্থা কী হবে বলা যায় না ।

সে আর ঘেরি করল না একটুও । বাপঝাড় থেকে সে মনোমত বাপ কেটে আনল । তারপর ধীরে ধীরে মাপ করে কেটে নিল । ধম ধমে আশ্রয় প্রকৃতির মিস্ত্রকৃত্য লক্ষী একটানা শব্দ করে কাটতে লাগল খুঁটি । বড়ের আগেই সে যেন সব কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে ।

পড় ঝুপায়েও বড় উঠেছিল। ভীষণ বড়। সবসময় বসে। কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। লক্ষী হুহাতে লজোরে অথবা চালটা ধরে ছিল একা। বসে। ভেঙে পড়ে যদি। বাপ বাঠ থেকে একককর ছুটেতে ছুটেতে চলে এসেছিল।

আজ আবার যদি বড় গুঠে! লক্ষী তর পেরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। দাঁড়কাকটা একটু আগে তরতর বিস্তী হয়ে তাকছিল। ওর ভাল লাগছে না।

টিক এমন সময় বিজ্ঞাতের চোখ ধাঁধানো আলোয় সঙ্গে সঙ্গেই বাজ পড়ার বিরাট শব্দ। লক্ষী কান ঢেকে হাওয়ার উঠে বলল। তারপরই গুলোর বড়। সবকিছু ঢেকে ফেলল যেন নিমেষের মধ্যে। লক্ষী জানে একটু পরেই সেই তাওব শুক হবে।

দূর থেকে তার চিনতে কষ্ট হয়নি। একককর দোড়োতে দোড়োতেট সাধন ঠাকুর মেলা থেকে ফিরে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত আকাশের অন্ধা দেখে তার আর সাহস হয়নি। বাপকে অসময়ে ফিরে আসতে দেখে একটু আগের নিঃশব্দতার স্বাক্ষানে সে অল্পভব করল, এতবড় আপনাব লোক তার আর কেউ নেই।

সাধন ঠাকুর প্রায় হাঁকতে হাঁকতে বলল : তুই একা বাড়িতে আছিল ভেবে আমার কেমন যেন তর লাগল লক্ষী। আমি তাই গগনকে বেখে চলে এলাম যে। জানিস তো তুই বাপ করলে আমার আর কিছু ভাল লাগে না। বিশ্বাস কর, আসছে কাল আমি তোকে নিয়েই মেলায় যাব। তোর পছন্দমত বলদ কিনব, কি বল ?

বাপের সককণ ক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষী কাঁদতে চাইল, কিন্তু পারল না। বাইরে তখন বড়ের সঙ্গে ঝুটি শুক হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

●● 'চেতনিক'-এর সঙ্গীয় লেখকবর্গের প্রতি সাহসীয় অভ্যর্থনা :

● পত্রিকাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্র দিয়ে নিশ্চিত করবেন।

● আধুনিক বানাননীতি অনুসরণ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ : বাড়ি, গাড়ি (দেশী শব্দ), বিশ্লেষণ, ষ্টক (বিদেশী শব্দ), মর্য, কাঁধ (রক্ষণাত্মক ব্যক্তির দ্বিত্ব পরিহার), পুজো, কাজ, হাজি (ভক্ত শব্দ), টাডাদি।

● অপ্রবীণ লেখকরা উক্ত পত্র পেতে চাইলে পত্রের সঙ্গে উপযুক্ত তাক টিকিট পাঠালে ভাল হয়।

আগা যাওয়ার পথের ধারে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আগা যাওয়ার পথের ধারে ঠোট উলটিয়ে বসে থাকে
কাপুকবের মজি ,
দিনের হাওয়া ঝটকা ঝাঝিয়ে যায় নতুনতর সর্কানেশের,
রাতের হাওয়ার নিভন্ত গ্রামের জঠরের সূখা হা হা করে ১
কাপুকব তবু কেহালা ঝাঝিয়ে যায়,
প্রভু ঘে-রকমটি চায় সে-রকম ছড়া তৈরী ক'রে...
দাসকাকসারে পোতা প্রভু গালে চাত দিয়ে আছে ১

আগুন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে,
কয়েকটি ক্রীতদাস তবু হিজিবিজি গেথে ,
প্রভু না বললে ওরা দিন বদলে
বিশ্বাস করবে না ১

সারারাত সারাদিন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সারারাত সে ঘুমের ভেতর জেগে ওঠে
কেখেছে পুলিশ তার ডেহো কছরের
হাকাকে মারতে মারতে
কান্দো কাঁড়িতে চড়িয়ে, তারপর আবার
মারতে মারতে---

ভোর হ'তে না হ'তে

হাফেজ করে সে মায়ের গলা জড়িয়ে

‘দাদা কোথায় ?’ বলে কারায় ভেঙে পড়েছে ।

দাদা ঘরেই আছে । কিন্তু মা জানান,

ঘরগুলি ভাঙছেই, কেউ বাধ যাবে না,

তাই সারা হুপুর

কোলের ছেলে ভরকে ভাড়িয়ে

বাঘবন্দী খেললেও

তিনি বুঝলেন না, এবং সারারাতও

তিনি বুঝাননি ।

সে কখন

শঃকবানন্দ মুখোপাধ্যায়

একলা একলা গাছ কি'বা পাখির মতন কেউ কাটকে মানে না

জলাশয়ে যে ঘ চারা ফেলে চলে যায়

কেউ বলে খুলিরড কেউ বলে সাদা হাসি কার,

আমরা সর্বনাশা আগুনের কাড়াকাড়ি বসে

যে আগুন দেবতা

যে-আগুন প্রথম মাতুষ জেনেছিল অগ্নীশ্বর বলে

সে ত নদীর মতনই সিন্ধু নকসেব আলো,

বেহিসেবী টুলে পড়লে

সে আমাকে পোড়াতোও পারে...

প্রত্যেকে এখন একলা, কেউ কারো কথাটি শোনে না

স্বাধীন নৈরাজ্যে আমরা ভাবছি, শুধু ভাবছি

কখন করভাল দিয়ে বেজে উঠবে সৃষ্টি মন্দির

আগুনের চারপাশে

বেজে উঠবে আনন্দলহরী ।

ভেরোশো একাদশি

চেতনিক/একশো নয়

কুমকুমি

বান্ধুদেব দেব

খোলা কবিতার বইয়ের ওপর পড়ে
তুমার ডিম্বের প্রকৃতির অবহেলা
পর্দা সরিয়ে হঠাৎ কে সেন ডাকে
'বাই' বলে উঠে দেখে। করে যার বেলা

গ্রামের লোকেরা কির যাবে এই পথে
আমি তো ওদের কেউ নই কেউ নই
ভাড়া কুমকুমি দেব কোন বালিকাকে
লঙ্কার ঝাঁকে চলে রত্নসমরী

শব্দের বড়বড়ের থেকে হুবে
সে যখন করে একলা নিলাজ স্নান
মহা গাছের ওপরে পূর্বে চাঁদ
যেন তুমার নয়ন অনিবার্য

খোলা কবিতার বইয়ের ওপর নামে
জালাখ্যাপা মেঘ মরণশীলতা ঢাকে
উলের কাঁটার বড়ি ফুটে ওঠে ফুলে
ঝড় কুমকুমি দেবে কোন বালিকাকে

রওলাক মজমের ছুটি কবিতা

মূল উদ্ধৃতি থেকে অনুবাদ :

কবিরুল ইসলাম

পঞ্জীয়ন

জ্বনের দানী রোজ থেকে
ভিসেবরের লাঙ্ক সকাববেলায়
ঝড়। ঠোঁটের প্রথম হাসিটুকু
আমি দেখতে চাই ।

একশো দশ/চেতনিক

শাহরীফ

অৰ্থাৎ শিঠি বাতাস বেধে
এৰই স্মৃতি হুৱে অধিগত প্রভাতি।

পুকুৰ

এই পুকুৰ আমাকে পুৰ ভালো কৰে চেনে :
জিহ্বা যখন ঢুকিয়ে আসে
আমি তাৰ কাছে ঘাই
আকর্ষণ মান কৰি
তাৰ পূৰ্ণ আশে পাই পৰম ভূমি
এটা অবস্ৰ ঠিক যে আমি একটাও চিল ছুঁড়িনি
আমায় এই পুকুৰে
কিন্তু কখনও সখনও, মিথো বলে লাভ নেই,
অন্ত পুকুৰে কাঁপ দিতে ইচ্ছে কৰেছে।

সোনার বাংলা চাই

ফজল-এ-খোদা

লাংগলৰ কলা হোক অস্ত্ৰৰ স্মৃতিৰ বেয়োনেট
মাটিৰ শৰীৰ পুঁড়ে কালা কালা কৰে নিই
তপ্ত বক্তব্য বৃনি বাংলাৰ অনাবাদি সকল অংগনে
শিল্পৰ হাসিৰ মত হাসক ফল গ্ৰামে গতে ও পহৰে।

বিস্তৃত বাংলা কেব আশেৰ বাংলা হোক
উঠোনে ধানের পালা পুকুৰে মাছেৰ কাঁক
বাগানে ফুলে ফুল গোৱালে ফুলে গাই
নবান্নৰ উৎসব হোক প্রতিদিন কতুতে কতুতে।

বহুৰ কলস বাটে থাক না জলকে যেতে সকাল বিকেল
লাল পেড়ে শাড়ি হোক হাটেৰ সওয়া প্রতি চাকিৰ ভিতৰ।

ভেয়োনো একাশি

চেতনিক/একশো এগায়ো

[এক পয়ে বর্ধমান কবির বিবরণ :

“আপনার ‘ভিখরের মোরগ’ বিশেষ জ্ঞাপন । কবিতাটি ভাল হয়েছে ।”
—বীরেন চট্টোপাধ্যায়]

ভিখরের মোরগ

(একটি একক সংলাপ)

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গরজা— !

গরজা— !

গরজা— !

ভিখরের মো— রগ্‌টো ওঁ—সায় গরজা !

আমার ঠুঁটুটো শুখায় গেইছে ঢে

আমার টাকরাটো শুখায় গেইছে

এটুটু মদঠদ লিরা আসো না মাইরি

ঠুঁটুটো ভিজায় লি

টাকরাটো ছাড়ায় লি

জিব্‌তা থেককা

কন্ঠো দিরা চালায় দি

এক-চুমুকথে সবুটু—হু—নি

বরাব্‌বর পাক্‌থ— লিতে মাইরি ।

বুলবো কি তুনিয়ায়

কিচ্‌ছু নাই 'ঢে বসখল আর

ছিলো যা স—ব শুব্‌তা লিলেক

কর ন—হু—নে

জমিনে বুক ঠাঁকায়ে ।

শালোরা সংসা—রটোকে

হিলায় লিলেক হাথের উফরে হে

অরের উফর সবুটু—হু বি আর ব্যান্‌নোন্

আর পদ্বারে জনে জনে

আতা—জা মিঠাই গিল্‌লা

শালোরা হুঁদ হৈরা বইছে হে মাইরি !

একশো বাঘো 'চেতনিক

শাব্দীয়

ছনিয়াব সবুট—কুঁচল

তুমি মিলেক যানো আ—গোসুতো বিনি হে

আর ঈধায়ে আনার প্যাটে হাতোর-পাতোর লাগাইছে

আট্‌টা আনুতো বক

আর আট্‌টা বক বৈছে আনার কন্ঠে

আট্‌টা টাক্‌বায় আট্‌টা জিব্‌ভায়

আর আট্‌টা বক আনার ঠুঁটে ।

তুমি ক'কোঁটা মধের লেগ্যা হে মাইরি

এই পাঁচ বকতে মাথা কুটে

শালোদের নীকা—ক বজ্জায় ।

গব্‌জা— ।

গব্‌জা— !

গব্‌জা— ।

ভিখরের মো—বগ্‌টো গুঁসা—র গব্‌জা— ।।

কবিতা : সম্ভব দশক

সাগর চক্রবর্তী

পাখর যেন সময় বাতাস জল

ব্রকের বস্ত্রে জড়িয়ে কালসাপ

নাতির পয়ে লাজের মাথা খেয়ে

বাড় বাড়ন্ত পাপ ।

আমি গাধা, হুলিয়ে খাই জল

জল না নিজের রক্ত , মনজাপ

কণকণিয়ে মাচার সর্বনাশের

ছুঁয়েছে শেব ধাপ ।

জল হাওয়া কি সইবে এতো চাপ ?

ডেবোশো একশি

চেতনিক/একশো তেরো

পৃথিবীতে বুকি ক্ষত্র-ধর্ম শেষ

বলরাম রায়চৌধুরী

নপুংসকের ঢাক কাঁধে নাচে বেহায়া বৃহন্নলা,
গাণ্ডীবে তোলে টংকার অর্জুন,
বীকের দ্বন্দ্বয়ে বাসাবাধা আজ নটিনীর ছলাকলা,
যেকদণ্ডের গভীরে ধরেছে হুণ ।

গাণ্ডীব ধরো বীর অর্জুন কুরুক্ষেত্র রণে,
অপগত হোক কাপুরুষতার ভয়,
বাদশা বধ উদযাপিত কি প্রতিশ্রুতির বনে,
এখন হুক্‌ সম্মুখে দুর্জয় ।

অর্জুন হাতে গাণ্ডীব নাও, সাজো তুণে অক্ষয়,
ক্ষুধার কাতর কণ্ঠ বৈশ্বানর
খাওবননে চিতার আগুনে লিখো নবীনের জয়
পৃথিবীতে আজ ভীকৃত্য বাধছে ঘর ।

গাণ্ডীব ধরো সম্মুখরণে হে বীর সবাসাচি,
ছুড়ে ফেলে দাঁও বৃহন্নলার বেশ,
পচা নদমা তুঁকে তুঁকে ওড়ে জীবনের কানামাছি,
পৃথিবীতে বুকি ক্ষত্র-ধর্ম শেষ ।

কাদের কি অপরাধ ?

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাদের কি অপরাধ ?

?

খাঙে ভেজাল দিলে ;

ওহুধে ভেজাল দিলে ;

তেলে সাপের চবি দিলে ;

কালো ঢাকা ঘাটাঘাটি করলে ;

একশো চৌক/চেতনিক

শায়খীর

যাহুকরী কাটগড়ার 'সদা সত্য কথা বলিব'
 বাক্যটি উচ্চারণে, দেশে বিদেশে আদালতে
 একতর বেলে খালাস হয়ে যায় ॥
 তারপর চৌরাজার রাজার মত বপুটি হুলিয়ে
 কখন ক্যাডিলাকে পা নাচিয়ে গিলে কথা পানজাবির যোতার দোলায় ॥

কাদের কি অপরাধ ?

?

অথচ বহরমপুর জেলে কিংবা সেনট্রাল জেলে
 আমাদের অগ্নিস্থ যৌবন
 উজ্জল তারকা খোসে যায়
 ধোনলা অ'ধাতে ধরে স্বদেশ আমাব
 মাটি তুই এ রক্তে পবিত্র হবি কি ?
 নাকি তুই এটভাবে স্বদেশ বাঁচাবি ?

কাদের কি অপরাধ ?

?

দলীলে লিখবেন কে ?
 তয়োরাণী নাকি স্ময়োরাণী
 নাকি কে ? কে ? কোন সে সকাল ?...

সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটান

ব্রজগোপাল রায়

যাব যা-কিছু-সব পুরে নাও আশ্রয়-কাত্ত জে ।
 ঘোড়াটা সতর্ক চাতে ধরো ভক্তনীতে , মাছিটাকে
 .ললিয়ে দিয়ে সূর্যের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটান ।
 বলয়ের নিপট অস্তিত্বলো ছিটান-ছাটি হ'য়ে গিয়ে ।
 পৃথিবীর চৌহদ্দি বহলে গেলে কুৎসিত রাতও শেষ হবে ।
 সময়—ভী—বণ ক্ষত পান্টাচ্ছে । সৈনিক,—য়েভী ?
 ও—রা—ন..... ।
 ট—উ—উ—উ..... ॥

বি...!!!.....আঃ, সব দুঃস্বপ্ন-অন্ধকার জলে গেলো...
 হৃষিত রক্ত করিত হচ্ছে...গলগল ক'রে—
 শূন্যে বিক্ষোভ ঘট—ছে.....!!!
 আকাশের আগুন!...আলো...উত্তাল...উত্তাল...
 বাঃ, কী টকটকে লাল বিজয় লকাল !!
 জেবর! ওরা জানে না, ওরা কি অপরাধ করেছে...

নিখোঁজ কবিতা/আফ্রিকা

স্বাগত প্রেম

ক্রিস্টোফার ওকিবো

অনুবাদক : মল্লিকার দাপ্তর

আমাদের দু'জনের মধ্যে চাঁদ উঠেছে
 উঠেছে বুগল পাইনের মাঝখানে
 ওরা স্বাগত জানাচ্ছে পরস্পরকে

চাঁদের উত্তরণে প্রেম জেগে উঠছে ক্রমে
 নিঃশব্দ ধমনীতে তার আশ্চর্য প্রবাহ

এবং এই মুহূর্তে আমরা ছায়া
 জড়িয়ে আছি পরস্পর
 চুম্বন করছি হাওয়ায়কে শুধু!

মদীর জন্তে

বিনোদ বেরা

গায়ের প্রান্তে ছোট্ট টালির বাড়ি
 কবেই বুঝেছে নদীর গহীন খাঁড়ি
 ওইখানে এক করেত বেলের গাছ
 ধু...ধু চরে খেলে ঘোঁরে স্মৃতির মাছ।

একশো বোল/চেতনিক

শারদীয়

পুকুর ঘাটে বৌ কি বাসন রাখে
 ছোট পাড়টি বাজ এখন কাছে
 আমি বুঝি একা কুয়ানো দিনের ঘোরে—
 দূরে বহুদূরে নদীটি গিয়েছে সরে ।

ওরা কিরে গেল সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

উলুবনে মুক্তো ছড়াতে এসে
 ওরা কিরে গেল ।
 জনল না জানল না
 চারিদিকে নৈঃশব্দ, ছিমছাম, চপচাপ
 কেমন কোথ ও যন্ত্রণায়
 একে একে ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে ।
 গভীর মুখে, আমার মুখ দেখে
 ওরা কিরে গেল ।

O MY SWEET WARRIOR FOE

হে বীর আমার শত্রু

এল হঠাৎ করি ক্রাশে কোণে কোণে ।

[১ : অঙ্ক ১৩০৭—১৩৭৪]

অনুবাদ : মঞ্জুভাষ মিত্র

তোমার স্তন্যের চোখে শাস্তি পাব বলে এককথা
 সেরেছি হাজার বার বীরাংগনা হে নারী আমার শত্রু
 বলোও স্তন্য নাও, তবু কিস্ত অহকারী তোমার ভাবনা
 ভুলেও মাটির দিকে সমতলে নামায় নি ভুল
 কিস্ত যদি আরো পারে এই বুক বেধে রাখত সুখের শিকলে
 সে রমণী থাকতো কিছু বার্ষ আশা মিছে স্বপ্ন নিয়ে
 তুমি থাকে স্থণা করো আমি তাকে বর্জন করে গেছি বলে

তোমার ভিতরত : আমি বলো কি করব ওই বস্তু দিয়ে ?
 ভাঙনা করলেও তাকে খুঁজে নিতে সে কিন্তু কখনো পায়নি।
 তোমার ভিতরে নীড় : চকল পথেরকা ভ্রমণ-বিধুর
 একাকী থাকার দুঃখ সহেনাকো তবু অস্ত্র কোথাও যাবেনা
 পথের ফোয়ারা থেকে সরে যেতে হয় বকবুধ ।
 আমাদের দুজনের আত্মার মধ্যে যাবে এইসব পাপ
 তোমার কিছুটা বেশি যেতে হু এ ক্ষণস্থায়ী তুমিই আপাত !

কাঁদ

মনীষীমোহন রায়

বৈচিত্র্যেই কুঁচের সঙ্গে দেথা
 সংগ্রহ শেষে ফিরছিলে ডাম একা
 দাঁড়িয়েছিলাম দাকন অগ্ন্যমনে
 স্বপ্নেরা শুধু বাধাছিলো বাসা মনে
 তুমি ভেঙ্গে দিলে অগ্ন্যমনের বাধ
 হয় মেঘলোকে উঠেছিলো ফুটে
 গেরোফালির ফাঁদ

কৈদেই যাও

পীযুষ ভট্টাচার্য

জয়ালো যে-মুহুর্তে শিশুটি
 জানলো না কোথায় এসে পড়লো ও ।
 তখন থেকেই কাঁদছে
 বড়ো হয়েও কাঁদবে / বড়ো হয়েও কাঁদবে ।
 কৈদেই যাও, কৈদেই যাও / তোমাকে কাঁদতেই হবে
 তোমার মা 'ডোল' পাবে
 ভাবনা কি, তুমিও পাবে চোল একটা
 ইনিরে বিনিরে কাঁদবার / জনে জনে সাধবার জন্তে ।

একশো আঠার/চেতনিক

বাংলা

মুখ হয়ে থাকে।

মাকে মাকে করো তাকে / সুযোগ পেলে ছবি
আর যদি ভাগ্যবলে তেরন সুযোগ মিলে যায়
বেল বটম্‌ প্যাণ্ট বানাও / সৌন্দর্য্য ছলপি শানাও
চোখে আঁটো গগ্‌লস্‌ / বেশ বেশ
জুতো জোড়া আয়না করে নাও
দেখো, সিগারেটটা জ্বলছে তো ? গোট্টা কর য়িং বানাও
এবার সামনে যে-রকটা দেখছো / সোজা চলে যাও ওখানে
ওখানে তোমার মতো আরো অনেককে পাবে
যারা মেয়ে দেখলেই গেরে উঠছে হিঙ্গি গান
করছে কণ্ঠি নট্টি কারো সংগে বা
তুমিও ভিড়ে যাও ওদের দলে
দ্বিধা কেন, আনাড়ি বন্ধু ?
ওরা যাকে গুরু বলবে / তোমারও গুরু হোক সে
ওদের সংগে মাকে মাকে যাবে সোজার বোতল হাতে
এবং গুরুর আজ্ঞার করবে চার্জ্
চাকরি পাবে । বউয়ের কানে মাকড়ি পাবে
নইলে পিঠে লাকড়ি খাবে ।

অতএব কেঁদেই যাও, কেঁদেই যাও ।

মায়ের দু'চোখ

অমিতাভ দাস

ট্রেনের ধাক্কা বেজে উঠলে চকলতা যাই

সবর আমার সবুজ নিশান উড়বে বলে দাঁড়িয়ে আছে

আমার এখন মনে পড়ে যায় তুলসীভল্লার শঙ্খধ্বনি

পূঁজে বেড়ানো মায়ের দু'চোখ

হারিয়ে যাওয়া বেলার ভীড়ে বালকবেলার অধেষণে

ভেরোসো একাশি

চেতনিক/একশো উনিশ

চোখের জলে নৌকোখানি হাত বাড়িয়ে ভলিয়ে যায়
 সূর্যালোকে চেয়েছিলাম দেখতে শুধু স্বপ্ন আকাশ
 নইয়াকে কেঁদে বেড়ায় পথ হা হানো উজাড়িলো
 বৃকের ভিতরে মা ডাকছে মায়ের আঁচল মেহের ভাবায়
 সামনে পিছে চাড়িয়ে থাকি কাঁটার মতো চরণধ্বনি
 ভয় দেখানো প্রেতের ছায়া
 কোন্ ভয়সায় শেকল টেনে প্রাপ্তিস্থানে দাঁড়িয়ে যাবো ?
 আমিত আর নিষ্ঠাসহ অস্বপ্নে সোনার সিঁড়ি খুঁজে পাইনি
 সম্মোহনের পেছন নিয়ে নিশির ডাকে ভেসে যাইনি
 নিঃশব্দ ছবির নিয়ত দুঃখ জড়িয়ে তবু দাঁড়িয়ে থাকি
 ঘুঠোর কাঁপে কতকালের বিশ্বাসী বুক নৈশ হাওয়া
 দুঃস্বপ্নের জীবনটাকে পথের ধুলোয় কে বা কারা
 লুটিয়ে ছিলো যাওয়ার বেলায় সরে দাঁড়ায় ভিজে বেড়াল
 ভোর হয়না

পরিণামের শেষ ঘোড়াটি খুঁজছে সোজা বধ্যভূমি
 এইত সময় দাঁড়িয়ে হাসে
 সব ভাসানো তরাকোটাল শাসন খেয়ে সরে যাক্কে
 বধ্যভূমির পাঁচিল টিপে হেঁটে আসে শোকধ্বনি শেকল বাজে
 যুগান্তে নয় সহাস্ত্রে এই বিদায় বলে অকৃতোভয়
 চরণ বাড়াই ফেরার তাড়া
 এখন আমার মা ডাকছে মায়ের ছ'চোখ খুঁজে বেড়াই

এখন

শাস্তি রায়

বৃকের ভিতর বহুদূর ধারালো নখ মন্থন ছুঁয় বসে গেলে
 কিছু টাটকা হাওয়া ঢুকে পড়ে ফুলফুলের ভিতর :
 কেননা একদিন ফুরের কাছে চিংকার করে বলেছিলাম : ভালোবাসায়
 ফুল দাও পাখি দাও চিরহরিৎ অক্লিষ্ট গৌরব

একশো কুড়ি/চেতনিক

শাবকীয়

বুকের ভিতর হারনিক কান পেতে শোনো : এই নিদাক্ষ দীর্ঘশ্বাস
ভরাবহ ছুঃখের পাঁচালি
কোথা যেন ছুঁি হয়ে যায় জীবনের শব / শিল্প ও পাখি বাগান...বাগান...

এখন যেকোনও টান করে রাখা মায়ায়াক গভীরে জকরী

‘কেউ কি আছে কেউ কি আছে’ এখন আমাদের স্বপ্নের ভিতর সৃষ্টির ভিতর
আমরা তো আর বেশিদিন বাচবো না হে

সময়ের এইসব চোরাবালি অসহায় আমাদের হুনিপূর্ণ গ্রাম করে প্রকৃত কৌতুক
ইলিত হুঃখ নেই / পাভাওয়াও একসময় হুঃখ হয়ে যবে যায় বড়ো জড়...

কার বিস্তৃত চিংকারে সভ্যতার ভিত কীপে, পায়ের তলার মাটি
হঠাৎই খসে খসে যায়...

তখন কি বিপর্য আর্ত চেতনার অকৃত্রিম হুঃখ হয়ে যায়...

বুকের ভিতর বহুদূর ধারালো নখ চকচকে ছুঁি বসে গেলে

কিছুটা টাটকা হাওয়া চুকে পড়ে ফুলফুলের ভিতর

বসন্ত: এখন যেকোনও টান করে রাখা মায়ায়াক গভীরে জকরী... ।

ওরা এখন গভীর ঘুমে

মদনগোপাল রায়

আহা রে,

ওদের এখন আগাতে যাওয়া বুঝা !

ভার চেয়ে

যাওয়া ভেগে আছে

ভাঙের নিরে

চলো আমরা পথে পথে বেরিয়ে পড়ি

নতুন দিনের স্বপ্ন বুকে আগলে ।

পথে যেতে যেতে

অনেক লাগি পাওয়া যাবে ।

হাজার পায়ের চপ্ত হুঃখ-মায়ে

ওরা আগতে বাধা হবে তখন ।

আহা রে !

ওরা এখন গভীর ঘুমে ।

ছুটি কালো চোখ

সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়

এক আকাশে অসংখ্য তারার মতোই চোখ ;
লাল, নীল, ফিরোজা ।
সাহারার তপ্ত আবহাওয়া,
মেকব তুহিন স্পর্শ,
সমুদ্রের গভীর নিস্তরতা,
আর ভরা গভীর জোয়ার—
আমন্ত্রণ জানিয়েছে বারবার
আত্মসমর্পণ করতে ।
মগন করতে বিনা বিধায়
স্বধা বাধিধি, নিঃসংকোচে,
সবশক্তি প্রয়োগে ।
‘আউট অফ বাউণ্ডস’
ও জানিয়েছে সোচ্চারে অস্ত্রোত্তর ।
মংস-শিকারীর ঐশ্বর্যকাণ্ড
দেখেছি কোথাও
নিৰ্বাককে সত্যক করেছি
আপন পোকষের দস্তে ।
অনিচ্ছাকে ইচ্ছায়—সবই আজ বিশ্বরণের সীমার ।
তুমি ছুটি কণিকের দেখা অছুত কালো চোখ
আমায় স্মৃতিতে আজও অমলিন ।
তাই নির্জন রাতের অন্ধকারে জীবনসংগ্রাহে
বার বার প্রেরণ করি নিজেকে :
আমি কি হারিয়েছি হেলায়
যা ছিল একান্তভাবে আমারই ?
অমর্যাদা করেছি কুমারীর
চিরস্তনী না-বলা চোখের ভাবকে ?



অনেক রাত্রি যায় হ'লে আনন্দের নিবৃত্তিতে কোরা...
 অঙ্গব বোমার টাঁপার রঙ...
 শিরশিরিতে ওঠে হাওয়া। শিশিরে নিউনিতে আনন্দ...
 কয়ে আসার আনন্দটার
 বুকের বাঁশির টানে চকমক মিল...

দুয় হোক নিকট, নিকট হোক বিবিক
 নবমক্কিমা। শুভ হোক, বিবির হোক



শ্রী রোমনাথ

‘চেতনিক’ শারদীয় ১৩৮০ ও অস্তিত্ব সংখ্যাগুলির সম্বন্ধে

মূল্যবান অভিমত :

[‘... ১৩৮১ সনের ১২ বর্ষ ২য় সংখ্যা’] সম্পাদকীয়তে নতুন চিত্রা, নতুন
 স্বর ও নতুন প্রকাশ ভাবী দেখে মনে মনে আপনাকে জানিয়েছে সাধুবাদ।
 অনেক কথা লেখার আছে। পরে লিখছি।...

অধ্যাপক যদি বাগচি ১২/২/৭৪]

‘চাপত্ত চেতনিক’

একশো বছর আগে বাংলার যে নবাবী শহর থেকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র
 ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা বের করে সাময়িক সাহিত্যে যুগান্তর ঘনিয়েছেন, একশো
 বছর পরে সেট একই স্থান থেকে ‘চেতনিক’ নামেই নতুন দৈনন্দিক পত্রিকাটির
 আবির্ভাব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এর আবর্তন
 ঘটেছে, একথা যুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি। বঙ্গদর্শনের ক্ষুণ্ণ বহিঃপ্রকাশ
 বন্ধাব্যয় মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় এই উক্তিটি : ‘এই পত্র আমরা প্রত্যেক
 সম্প্রদায়ের হস্তে, এট কামনার সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনা-
 দিগের বার্তারূপে ব্যবহার করুন। বাংলায় সমাজে ইহা ঐতিহাসিকের বিজ্ঞা,
 কল্পনা, লিপিকোশল, এবং চিন্তাচক্রেণের পরিচয় দিক।’

‘চেতনিক’ সম্পাদক শ্রী অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ কতকটা নতুন আদর্শকে
 আমনে রেখেই পত্র-পত্রিকার আদরে আবৃত্ত হইয়াছেন, তা এই পত্রিকার
 প্রাথমিক তিনটি সংখ্যা পাঠ করে উপলব্ধি করলাম বঙালির সর্বত্র কথ্য
 সেদিন বেলেচিল বঙ্গদর্শন তার স্বপ্নায় জীবনে এবং তা বেলেচিল বাস্তবতাবটে।
 আজ বিশ শতাব্দীর অস্তিম লয়ে উন্নয়নগামী সাংস্কৃতিক ও কর্মিকের স্বার্থে
 ও স্বচেতনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই ‘চেতনিক’।
 সম্পাদকের এই সং প্রেরণ, তার নিজের কথায়, ‘অপসংস্কৃতিক হিংসাকশিপের
 দাপটালির বিরুদ্ধে একটা কিছু করা’—সার্থক হোক এই কামনাই করি।
 সাম্প্রতিক কালের যথার্থ সাহিত্যবোধহীন ও কিছুকালের তথাকথিত লেখকের
 নতুন চেতনার উদ্ভব করে এই নতুন পত্রিকাটি সার্থকনামা হয়ে উঠুক—এই-ই
 আমার অন্তরের একান্ত অভিলষি।

যদি বাগচি : কলকাতা-২৮ : ২৩/২/৭৪

‘চেতনিক ১ম সংখ্যা পড়ে খুশি হলাম। বেশ ভাল কাগজ হয়েছে।.....
 সম্পাদকীয়টি সুলিখিত... দুইই সন্নিবেশিত হয়েছে।.....অস্তিত্ব রচনাগুলিও
 সুনির্বাচিত।... ..শ্রীনারায়ণ চৌধুরী’

‘অবশ্যই প্রশংসার।.....’ দেশ :

‘সম্মত করেছেন আপনাদের পত্রিকাটি (শারদীয় ১৩৮০)’

—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

‘বন্ধুত্বের বন্ধে এখবরের পত্রিকা বের করা সামান্য কথা নয়।’

—ডঃ হুমায়ুন কামরুজ্জামান

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

চেতনিক



চেষ্টনিক

- | | |
|---|---|
| ● প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যাপক অরুণেন্দ্রনাথ সাত্তাল
স্বরেন্দ্রনাথ কলেন্দ (মহিলা)
ক'লকাতা-৯ | ● আহ্বায়ক
ডঃ শিশিরকুমার সিংহ
অধ্যাপক, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ
আগরতলা, ত্রিপুরা |
| ● সভাপতি
পুলকেশ্বর সিংহ
পাঁচতুলী, মুর্শিদাবাদ | ● সভাপতি
বীণক চট্টোপাধ্যায়
পি পি সি ডি
ডুর্গাপুর ইন্সটিটিউট কাম্বান্না |
| ● সভাপতি
জনক বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৭ সি. মঙ্গলিকবাড়ি ট্রাষ্ট
ক'লকাতা-৬ | ● প্রকল্পনির্ধারী
পঞ্চানন চক্রবর্তী |

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

বিরূপ ভারতের বিপুল কর্মস্বত্বের তুলনায় আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা
অত্যন্ত লক্ষণ্য। কিন্তু কর্ম-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধ্যমত স্বেচ্ছা
করতে পারি সেইকৃষ্ণ নির্ভর সঙ্গেই করবার চেষ্টা করি।

চন্দ্রকান্ত ললিতামোহন রেশম খাদি সমিতি

(খাদি ও প্রায়োজোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

বহরমপুর । পোঃ বাগড়া । মুর্শিদাবাদ

কোন : বি-এটস-বি ২০৮

সম্পাদক : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লালবাগান মুম্বাই/মাদ্রাস পল্লি

মুচি

কষ্টে দেবার (সম্পাদকীয়)

সত্যেন নাথ (প্রবন্ধ) | বার্নিক রায় (গল্প) | চিত্রকর রায় (প্রবন্ধ) | পুলকেশ
লিংহ (প্রবন্ধ) | মনীষমোহন রায় (অল্প বিবরণ কিতাব)

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অলোকবর্তন দাশগুপ্ত |
সুধীর নন্দী | কবিতুল টসলায় | শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | অমলকর গুপ্ত |
সত্যেন্দ্র মিত্র ' অজগোপাল রায় ' অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কষ্টে দেবার

সম্পাদকীয়

জানেন নীয়েন বাবু, আমি কিছু এখনো ভাল ছাড়াইনি। আপনার প্রতি-
শ্রুতির কথা এখনো ভুলিনি। আর তাই এখনো প্রতীক্ষা করে আছি একটি
পরিষ্কার খাম কিংবা ইন্সল্যাণ্ডের মাতে থাকবে আপনার সত্যরসের চকুলসারী
নিবন্ধন। রাত্রেও ওপর আমি সহজে বিশ্বাস চাড়াইনে, সার্বিকভাবে বিরক্ত
'লেগে' পড়ি যাইও। তাই যিনি আমাকে বিশেষ কথা বলে নিজের কাজ
করিচ্ছেন, যিনি নব্বই টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা দিয়ে বলেন সব ধার শোধ
ক'লো তো আর আমি চকুলসারসত্ত্ব: প্রতিবাদ করতে পারিনি, যিনি দুলাবান
ঐতিহাসিক পাতুলিপি ধার নিয়ে নিজের প্রাণে ব্যবহার করে সত্যতার সঙ্গে তা

কেন্দ্র হেবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না, যিনি আমার লক্ষ থেকে আমার কথা
টাকাগুলি আমাকে পাঠাতে বা সেকথা আমাকে জানাতে ^{দীর্ঘকাল} ভুলে থাকেন
এবং এই রকম আরো বহু ব্যক্তির ওপরই নিম্নাস কাণ্ডটিনে আমি। কারণ
আমার ভাবতে ভালো লাগে এই ব্যক্তিগুলি যেসব অপরাধ করেছেন সেগুলো
আমার সামনে বা গোচরে করলেও আসলে আমার কাছে করেননি, করেছেন
নিজের নিজের বিবেকের কাছে। এবং একদিন না একদিন তাঁরা আমার কাছে
ফিরে আসবেনই ব'লেবন, 'আমরা ভুল করেছিলাম, তাই লজ্জিত' এসব
ভাবতে আমার ভালো লাগে। কারণ আমি জানি ঠগা যে-আচরণই করুন-না
আমার সঙ্গে, যে-বটনাই করুন-না আমার বিরুদ্ধে, ঠগা নিজেরা তো জানেন,
এইসব অসংগত আপত্তিকর কাজ আমার স্বাধা সম্মত নয়। তাই একদিন ঠগা
ফিরে আসবেনই। আমার এই নিম্নাসের সবটাই যে ভিত্তিহীন নয় তার কিছু
কিছু প্রমাণ কিছু বিভিন্ন সময়ে আমি পেয়েছি।

তাই আজও আমি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিনি। সেই যে গত
বৎসর ৩রা জুলাই আপনি লিখেছিলেন না 'প্রবন্ধ লিখতে আমার উৎসাহ
হয় না, কবিতাই পাঠাবো।..... লেখা হ'লেই যে পাঠাব তাও ঠিক। কিন্তু
নির্দিষ্ট কোনও তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।'—সেই থেকে আমি প্রতীক্ষা ক'রে
আছি কবে সেই অনির্দিষ্ট তারিখটি ক'রে উঠবে, কবে আপনি প্রতি-
শ্রুতি বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্তে 'ওৎসব হ'য়ে উঠবেন।

কারণ 'চেতনিক' উন্মুখ হ'য়ে আছে আপনার কর্ম থেকে সৃষ্টিয়ে নিয়ে
সাগা বাংলার ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য যৌত্তর অসম্মানের কথা, অস্বার্থোন্মাদ
কথা, নিগ্রহের কথা, বঞ্চনার কথা, ক্ষুণ্ণিপাসার কথা অত্যন্ত সত্যতার সঙ্গে
সম্পন্ন পাঠকসমাজে পৌঁছে দেবার সুযোগ পাবার আশার।

নীচের দাবু, আপনি নিশ্চয় ভুতু গাড়োয়ানকে চেনেন। সব গাড়োয়ানকে
জড়ো ক'রে যে বলেছিলেন : 'তবু ৭ ইয়ে জার স্বরা ডকা লচ ট। চমু তুনা
স্বরাজ তোনেশে চামরা তকলিফ্ যিট্ যাবেগা।' ভুতুর এই কথাগুলি আসলে
একদিন আমিই ব'লে বেড়াতেম ষ্টেশনে-ষ্টেশনে অশিক্ষিত যাত্রীদের, চাটে-
বাজারে নিরীহ রাহীদেব আগিলে তোলবার জন্তে। তবু তের মধ্যে তবু 'চমু
তুনা' না ব'লে বলতেম আমি বিশ্বাস করি, তোমরাও কর।' এসব ১৯৫৪
শালের কথা। কিন্তু তারপরই আমি কেমন যুঝে পড়ছিলাম।

একদিন বহরমপুর থেকে আমার এক সহপাঠী বন্ধু সিংহচাঁদ কোটেচা

(পূর্বে স্বাধীনতা) স্বাধীনতা হ'লে এলো উপস্থিত । হাতে এককোষের কাগজ ।
 কলক, কলকের মধ্যেই অসুস্থ গোপীচন্দ্র লিঙ্গনেটায়িত জোড়াক ক'রে হাত
 পার্শ্ববর্তনের দাবিতে । আমি রাজি হ'তে পারিনি । এর কয়েক মাস পর কাঁড়িত
 স্বাধীনতা শেষে স্বাধীন জীবিত হলে এসে ডি. ৭-র সভাপতিত্বে যে বিজয়োৎসব
 হয়, সেখানে জাতীয় সংগীত শ্রুতি হ'তে থাকলে জাতীয় নেতাদের নির্দেশ পর-
 লোমুখতার তিক্তবিরক্ত হ'য়ে, ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমার এক বন্ধু আর আমি উঠে দাঁড়াতে
 উৎসাহিত হইনি । উপস্থিত বহু ব্যক্তি এতে কষ্ট পান । ক্রুদ্ধ এল, ডি ও
 কট, মট, ক'রে তাকান দুই মৃত্যুমান কালাপাতাডের দিকে । অবশ্য আশে পর-
 নতী কালে বহুতঃ অসুস্থ চিকিৎসা আমার অসুস্থত বহু ছেলেমেয়ের সামনে
 বহুবার বক্তৃতা দেওয়ার সময় পবিত্র জাতীয় সংগীতের মর্যাদার কথা ব্যাখ্যা
 ক'রেছি, গল্প ক'রেছি একজন অসুস্থ স্বচ্ছ দেশপ্রেমিকের জাতীয় সংগীতের প্রতি
 অসাধারণ প্রাণীলতার । এমন কি সংস্কারবশতঃ এখনো উঠে দাঁড়াই জাতীয়
 সংগীত কানে আসিমাচ্ছ । কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারি '৪৭ সালে আমি জাতীয়
 সংগীতের সামনে সেদিন যে-আচরণ ক'রেছিলেম তার জন্তে আজ আর লজ্জিত
 হওয়ার কারণ নেই । আমার গলায় যথেষ্ট শক্তি থাকলে আমি চিংকার ক'রে
 ডেকে চেকে বাংলা উঠেতাম : 'টয়ে আজাদি মুটা ছায়া, ভুলো মাং ভুলো মাং ।
 আর জাতীয় সংগীত তোমার আমার জন্তে নয় । আত্মপন্থাবিলাসী মুষ্টিমেয়
 কিছু ব্যক্তির চিত্তবিনোদনের উপকরণমাত্র ।' না-না, আমি পি-পি-এমের কেউ
 নই । যেমন পি-এমেরও কেউ নই । আমার পরিচয় : দেশময় যে অসংখ্য গুরু-
 উক হত্যাশক্তিই ভূত গাড়োয়ান অতীত দীর্ঘকাল ছাড়ে আর বিভ্রাট ক'রে
 বলছে 'টয়ে আজাদি তুমি কভি নেতি স্বাধীনতা' আমি তাহেই একজন । আমি
 চিনতেই এই মানবিক দুর্ভাগ্যবশত সেট বিরাট পুরুষ গাঙ্কিজকে, তাঁর
 অহিংসা নীতির প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব সীমাকে, তাঁর নষ্ট তালিমকে, তাঁর সর্বো-
 পরের আন্তরিক বর্ষণ ও পরিকল্পনাকে । আমি চিনতে পারিনি আজকের বাগ-
 ৮'রষ্ট রুকলাস নেতাদের, চিনতে পারিনি সুপরিচিত ভারত-আন্দোলনের দুর্গম
 দুর্ভিতাকে যিনি অনেক আশা জাগিয়ে হত্যাশার আত্মকৃত্তে নিক্ষেপ করেছেন
 আমার মতো অসংখ্য দেশভাষা দেশবাসীকে, চিনতে পারিনি এট বহুব্রহ্ম যেনে
 অষ্টালিকবন্দী উদ্বেগহীন অর্থহীন ঘনঘন শাফিপাটোনে লিঙ্গাবাসনাকে,
 চিনতে পারিনি সত্য-বট-সিখা-নাবলা চাক্ষুর্দর্শন মস্তীমশাটোনের মারা নাকি বহু
 ব্যক্তির মঙ্গলবিধানের জন্তেই বিদ্রোহ ওপর টাঙ্গা বসান, যাঁরা কোটি কোটি

অৰ্থব্যায়ে ‘পাণ্ডিনগৰ’ স্থাপন ক’ৰে দ্বিবিজ বৃদ্ধি দেশবাসীৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰতে এনে কয়েক ৰাজি বাস ক’ৰে যান দেখানে, আৰাধেৰ নিগলিত কৃতজ্ঞতাৰ মুকো কুড়িয়ে ।

নীয়েন বাবু আপনি সৎ, স্নীল, তত্ববুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ কৰ্মী । আপনাকে নিশ্চয়ই ‘পরিচিতি’ৰ বৃত্তেৰ অন্তৰ্ভূত ব’লে মনে ক’বতে বাগা নেই । ‘স্বস্ত্যেব ওপৰ বিশ্বাস হাবানো পাপ’ ব’লে গেছেন কবিকবি । তাই আপনাৰ ওপৰও বিশ্বাস হাবাইনি আমি । আজ না হ’লেও কোনো একদিন সেই খামটি নিশ্চয় আসবে যাৰ মথো সেই সবল শিঙটি ব’লে উঠবে ‘হাজাটা নাতুটো । কাৰণ ইয়ে আজাদি খুটা ছাৰ, টুটা ছাৰ, ফুটা ছাৰ ।’ হাজাৰ একাডেমি পুৰস্কাৰও আপনাৰ মুখ ভোঁতা ক’ৰে দিতে পাৰবে না । আৰ সত্যভাষণেৰ জন্তে নাকি ভিন্নক্ষেপিতে উদাৰ আশ্রয় জানানো আছে । ৰাজ্যৰ কুটুমবা তো তা-ই ব’লে বেড়ান । তাছাড়া এৰেশে ‘ভাৰত-বস্ত্ৰ’ হওৱা পুৰ সোজা । জহৰিতে জহৰ চিনতে নাই বা পাৰলো । উদাৰ লোকশাস্ত্ৰকাৰেৰা বিকল্প বাবুদাও দিয়ে বেখে-ছেন... । আপনাৰ যদি পিতাৰ কোনো পরমাৰ্থীয়েৰ জোৰ থাকে তা’হলে আপনি চৌৰ্যবৃত্তিই ককন আৰ দাগাবাজিই ককন, যথাসময়ে বেতিঙতে আপনাৰ নাম ঘোষিত হবই । আপনাৰ কাছে উড়ে আসবেই খবৰচকু বাৰসেৰ ঝাঁক । ঈশ্বৰেৰ কাছে প্রাৰ্থনা জানাই এমন সতজলতা ভোজো অকচি জাপক আপনাৰ । আপনাৰ জহতা কেটে যাক । সপ্রতিভ কিপ্রভাৰ নেমে আহুন নিচে সংগ্ৰহে অপেক্ষমান ভুতু গাড়োয়ানেৰ দলেৰ মথো । আঠাল বছৰেৰ পংক্ত আজাদিকে সবল সার্থক ক’ৰে তুলুন । পকায় কোটি অসহায় মুখে বুকে দেহে তুলে দ্বীন তাকে । আসলে কবি-সাহিত্যিকেৰাই পাবেন নতুন হুগ নতুন সমাজ গ’ড়ে তুলতে । ইতিহাসেৰ পাতা টোটেলে অনেক নাজৰ পাবেন হুঁজে । ৰাজনৈতিক নাৰকেৰা তো কবিৰেই ভাবসম্ভান । আজকেৰ নেতাৰা নিৰ্বাৰ্য, শঠ, বৃহৎ জগৎ ত’তে বিয়ুগ । কাৰণ আজকেৰ কবিৰা দেউলে । তাই নেমে আহুন আত্মপ্রবন্ধনাৰ, কপটতাৰ কোট গা থেকে টেনে থুলে । আৰ পাবেন ত্ৰো সংগে টেনে নিয়ে আহুন আপনাৰ সহকৰ্মী বহুটিকেও । তাঁৰ মথো যে হাবি: দেখেছি তা আগমার্কা বস্ত্র নয় । মহত্ত্বৰ স্মৃতিতে তাৰ প্রয়োগ বাহনীয় । তাঁকে নতুন ক’ৰে দ্বিৰ ক’বতে হবে : কঠৈ দেবায়..... ? তাঁৰ নাম শ্ৰী ক’ৰে উচ্চারণ করলেম না এবাৰেৰ মতো । নয়দ্বায় ।

Phone No BHB 142

—ঃ বহুস্তর :—

স্কুল ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্য গ্ৰন্থক ও কাগজ

মূল্যে ও সময়ের সরবরাহ করি

। একবার যাচাই করতে অনুরোধ করি ॥

ভুজঙ্গভূষণ কুণ্ড এণ্ড সন্স



খানকা ১১ মুম্বাই

With Best Compliments from :

M/S DURGAPUR COAL & COKE SYNDICATE

G. T. ROAD, MILE POST 124 $\frac{1}{2}$

P. O. BAKTANAGAR

**(DEALERS IN MIXED COKE, MIDDLEINGS,
COAL WASHERY REJECTS & ITS SOFT COKE)**

জয়প্রকাশজীর সৰ্বাত্মক বিপ্লব/সভোন সাহা

উভোগ পৰ্ব

ভাৰতবৰ্ষৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিতে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ নেতৃত্বে পৰিচালিত গণ-আন্দোলন হ'ল সবচেয়ে বেশি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। আন্দোলন ফুক হয়েছিল বিহাৰ ৰাজ্যে। আজ তা প্ৰায় দেশব্যাপী হয়ে উঠেছে। উত্তৰ ভাৰত তো চকল। দক্ষিণভূমি হয়ত সাগ্ৰেহে লক্ষ্য কৰছে উত্তৰ ভূখণ্ডৰ ৰাজ্যগুলিতে আন্দোলনের গতি প্ৰকৃতির দিকে। নিঃসংশয়ে বলা যায় অনেক আশা পূৰ্ণ হৈছে উঠেছে জয়প্ৰকাশজীৰ আন্দোলনের প্ৰেক্ষাপটে।

সাম্প্ৰতিক বিহাৰভূমিৰ গণ-অভ্যুত্থানকে জয়প্ৰকাশজী দেখেছেন সৰ্বাত্মক এক বিপ্লবৰ পদক্ষেপ হিচাবে। অস্বীকাৰ কৰবার উপায় নেই যে জয়প্ৰকাশজী ও তাঁর সৰ্বাত্মক বিপ্লবৰ দৰ্শন শাসক দলের নিশ্চয় হৰণ কৰেছে। দিল্লীৰ মসনদে আসীন নেতৃবৃন্দ আজ খুবই চিন্তিত ও উদ্ভয়। আর উদ্ভয় হ'ল ভাৰতের মকোপদ্বী কমুনিষ্ট পাৰ্টি। কমুনিষ্ট পাৰ্টি ও শাসক কংগ্ৰেস আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। হুতবং জয়প্ৰকাশজী যে গণ-আন্দোলনের উল্লাসে তাঁর ভয়ে ভীত একদিকে যেমন শাসক কংগ্ৰেস, তেমনি শঙ্কিত হ'ল কমুনিষ্ট পাৰ্টি। বিহাৰ আন্দোলনের মোকাবিলা কৰবার জন্য কংগ্ৰেস শিবিৰে যেমন সাজ সাজ বব পড়েছে, তেমনি কোমর বেঁধে আসবে অবতীৰ্ণ হয়েছে কমুনিষ্ট দল তাঁর সাজপাৰ্জদের নিয়ে।

জয়প্ৰকাশজীৰ অস্তিত্ব আন্দোলন ও তাঁর সৰ্বাত্মক বিপ্লবৰ দাৰ্শনিক তত্ত্বভূমি ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম কৰবার আগে জয়প্ৰকাশজীৰ ৰাজনৈতিক সত্ত্বাৰ ক্ৰমোন্নয় একটু পৰ্যালোচনা কৰতে হয়। আধুনিক কালৰ ৰাজনীতি-সচেতন যাত্ৰণ এইটুকু জানেন যে, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ হলেন আচাৰ্য বিনোবা ভাৰতৰ 'সৰ্বোদয়' আন্দোলনের একজন প্ৰথমশ্ৰেণীৰ প্ৰবক্তা। প্ৰত্যক্ষভাবে ৰাজনৈতিক জীৱনে তিনি অক্লপশ্ৰিত। অতীত সম্পৰ্কে আর একটু ওয়াকিবখাল যিনি তিনি জানেন যে ৰাজনৈতিক জীৱন থেকে জয়প্ৰকাশজী অবসৰ গ্ৰহণ কৰে গান্ধী-শিষ্য ভাবেজীৰ সৰ্বোদয় আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু ঈতিহাসের এই পৰ্যায় সম্পৰ্কে সামান্য বা ভাসাভাসা পৰিচয়ের দৌলতে জয় প্ৰকাশজীৰ

সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে চেনা যাবে না। শর্তব্য যে ভারতবর্ষের সমাজবাদী আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ। বিহারে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। পড়াশুনার জন্তই তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়। সেখানে কাজ করতেন এক খনিতে এবং অজিত অর্থ দিয়ে তিনি পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করতেন। বিশ বা তিরিশের দশকে একজন মননশীল তরুণের পক্ষে সমাজবাদী আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা প্রায় একরকম অসম্ভব ছিল। জয়প্রকাশজী অনিবৃত্তিত উন্নত পুঁজিবাদের চিত্র দেখেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। ব্যবসায়ের ডেজী মন্ডা ছুটই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অতি-উন্নত পরিপক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার। সুতরাং তিনি সমাজবাদী মত গ্রহণ করলেন প্রাণমন দিয়ে। ভারতবর্ষে জয়প্রকাশজী এলেন একজন সমাজবাদী হিসেবে মার্কসবাদী প্রভাব নিয়ে। ভারতবর্ষের মাটিও তখন সমাজবাদী ভাবনা চিন্তার অহুতুল। তরুণ সমাজ সমাজবাদ গ্রহণের জন্ত উন্মুখ। পেলেন তিনি অনেক মেধাবী, মননশীল কৃতি সহকর্মী। ডাঃ বামমনোহর লোহিয়া, শ্রীঅচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীঅশোক মেহতা শ্রীমিহ্র বাসানী যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে। যোগ দিলেন উত্তরপ্রদেশের জনপ্রিয় জননেতা আচার্য নরেন্দ্র দেও। এমন কি এই হল গড়ে তুলবার পেছনে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকাও কিছু ছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ও দর্শন প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। স্তালিনবাদী কমুনিষ্টরাও এল এর ছত্রছায়ায়। অবশ্য এই দলের মধ্যে তাদের অগ্রবেশের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতাত্ত্বিক আদর্শে উদ্ভূত তরুণ সমাজকে মঞ্চের অগুণামী কোরে তোলা। শ্রীনাথুসিঙ্গান কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন এককালে। জয়প্রকাশজী স্তালিনবাদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজবাদী ঐক্য। স্তালিনবাদীদের উদ্দেশ্য তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু সর্বাঙ্গিক ঐক্যের জন্ত তিনি তাঁর দলের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিরিশের দশকে তিনি রচনা করেন 'Why Socialism'। উক্ত দশকে ভারতবর্ষের সমাজ-তাত্ত্বিক আন্দোলনের একটা দিক নিশানা বলে এই রচনা সম্যকৃত হয়। শ্রেণী সংগ্রামকেই তিনি ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু বিশ্ব কমুনিষ্ট আন্দোলনকে রাশিয়ার শরবাষ্ট্রানীতির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করবার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেন স্তালিনকে এবং অতঃ স্তালিন শ্রীতির জন্ত ভারতের কমুনিষ্টদের ভীত ভাবায় তিনি সমালোচনা করেন।

মনে রাখতে হবে জয়প্রকাশজী আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের সমালোচক ছিলেন। বিশেষ করে তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন হিটলারের অভ্যুত্থানকালে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নিষ্ক্রিয়তার। জয়প্রকাশজী অস্ত্রান্ত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ভারতীয় দলগুলোর মত বিশ্বাস করতেন যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পূর্বে চাই দেশে ইংরাজ শাসকের বিলোপ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির হিসেবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা সব সমাজবাদীদের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের ধোঁহুলামানতার বা তার আপোষকারিতার বিরুদ্ধতা করেও নেতৃত্বের উপর সর্বাঙ্গিক আঘাত হানবার কথা তিনি কোনদিন চিন্তা করেন নি। এই কৌশলের হয়ত কোন তত্ত্বগত আবরণ থাকতে পারে। দক্ষিণপন্থী গান্ধী নেতৃত্বের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের নীতি থেকে বিরত থাকবার কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে হয়ত কিছু ব্যক্তিগত কারণ আছে। জয়প্রকাশজী পণ্ডিত নেহেরুর প্রত্যাবের বাইরে যাননি বা যেতে পারেন নি। গান্ধীজীকেও তিনি কোনদিন অস্বীকার করতে পারেন নি। জয়প্রকাশজীর ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রে গান্ধী নেহরু অফ একটা মৌলিক উপাদান। অণুচ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জয়প্রকাশজী গান্ধীজী প্রবর্তিত অর্থনৈতিক দর্শনের কোনদিনই অচুগামী ছিলেন না। শ্রেণী সমন্বয় বা আদি ব্যবহার অল্পকূলে তাঁকে একটা কথাও বলতে শুনি নি। কিন্তু গান্ধীজীর এক অল্প প্রভাব তাঁকে চিরকালই টেনেছে। খাসানী লিখলেন “Socialism Reconsidered”। খাসানী ত্যাগ করলেন তাঁর মার্ক্সবাদী প্রভাব। তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন অনিরস্ত্রিত পুঁজিবাদ বা অস্বাধ অর্থব্যবহার একজন উগ্র সমর্থক। মৌল দার্শনিক প্রভায়ে তখনও সংশয়ের কোন ছায়া পড়ে নি। জয়প্রকাশজী তখনও মার্ক্সবাদী। তখনও তাঁর বিশ্বাস শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি।

পরের অধ্যায় '৪২-এর আন্দোলন। দেশের জীবনে সে এক যুগ-সম্বন্ধকণ'। ইংরাজ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয় এমন যে কোন বকসের কর্মপ্রচেষ্টার তখন প্রবল বিরোধী হল কম্যুনিষ্ট পার্টি। ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মান বাহিনী কলকাতাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধ নতুন এক পর্বে এসে দাঁড়ালো। গড়ে উঠল ঈর্ষ মার্কিন শক্তির

সঙ্গে বাণিজ্যের ঐক্য। হুত্বাং হুত্ব আর সাম্রাজ্যবাদী হইল না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের কাছে তখন হুত্ব হয়ে উঠেছে জর্নহুত্ব। ভারতভূমিতে এই চরিত্রাঙ্গের ফলশ্রুতি হল ইংরাজ সরকারের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দলের নতুন এক বোঝাপড়া।

দেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঘিবাগ্রস্ত। আন্দোলনের সর্বপ্রকারের সুঁকি নিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। ইংরাজ সরকার কারাকন্ড করল কংগ্রেস নেতাদের। দেশ ফেটে পড়ল বিকোভে। হুত্ব হল এক প্রবল গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা হলেন জয়প্রকাশজী। আন্দোলনের আঘাতে কোন কোন অকলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। তার স্থানে এসেছিল গণ সরকার সাতারা বালিয়া, বিহার, তমলুক স্বাধীনতার আন্দোলনে এক একটি অবিস্মরণীয় নাম। ইংরাজ সরকারের চোখে খুলো দিয়ে জয়প্রকাশজী আত্মগোপন করে আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন বেশ কিছুকাল। আত্মগোপনকালে স্বাধীনতার ঘোষণার কাছে লিখেছিলেন তিনি ছ'খানা চিঠি। ঐ চিঠি ছ'খানা আগষ্ট আন্দোলনের পরিচয় বহন করবে ভাবিকালের ইতিহাসবিদদের কাছে।

নেতারা কারাযুক্ত হলেন। কিছু পরে জয়প্রকাশজীও ছাড়া পেলেন। দেশবাসীর কাছে পেলেন তিনি অদ্বুতপূর্ব অভিনন্দন। তিনি হয়ে উঠলেন একজন জাতীয় নেতা। কিন্তু দলের মুখপাশও তিনি। ইংরাজ সাম্রাজ্য তখন মুয়ুর্হ। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান যে আসন্ন তা অস্বাভাবিক ভাৱেও পক্ষে প্রব কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু আর একটা আঘাত হানতে হবে। জয়প্রকাশজী সেই কথাটী শোনালেন দেশবাসীকে। কিন্তু নেতারা আন্দোলনের পথে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক। দেশে বিদেশে ঘটেছে নতুন নতুন ঘটনা যার তাৎপর্য ছিল হুত্বপ্রাপ্ত। সুকোস্তব বুটেনের প্রথম নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত হল, আর জয়ী হল শ্রমিক দল। বিশ্বাসে সমাজবাদী। একজন সমাজবাদী হিসেবে জয়প্রকাশজী নিশ্চয়ই এটালিকে বিশ্বাস করতে পারতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল বুটেনের সমাজবাদী শ্রমিক সরকারের সঙ্গে আপোষে ভাংতে স্বাধীনতা আসবে এমন চিন্তা জয়প্রকাশের মনে একেবারেই আসে নি।

অথচ আপোষকারী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সামগ্রিক বিদ্রোহের কথাও তিনি বলতে পারলেন না। জেল থেকে বেড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণার কাছে

।ওনি লিখেছিলেন তাঁর তৃতীয় চিঠিখানা। সেই চিঠিতে তিনি আহ্বান করেছিলেন স্বাধীনতাকামীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত এক আঘাত হানবার জন্য এই আহ্বানকে কার্যকরী করতে হলে নেতৃক নেতৃত্বের সামান্য-সামান্য হতে হবে। সুতরাং আবার সেই নেতৃক-গান্ধী প্রভাব তাঁকে নিরস্ত করল এক সফটমের বৃহত্তে। জয়প্রকাশজীর রাজনৈতিক সত্তাব্দের এক ব্যত্যাবরণের সন্ধান আমিও পাই তাঁর পরবর্তী ছ'টি রচনার মধ্যে। তিনি লিপ-লেন "My Picture of Socialism"। সমাজবাদের মূল কথা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং সম্পত্তির সমাজীকরণ। মার্কসবাদীরা সামাজিক সম্পত্তিকে দেখেছেন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে। সিণ্ডিক্যালিষ্টরা সামাজিক সম্পত্তি বলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বোঝেন নি। তাঁরা চেয়েছেন উৎপাদন শ্রমিকদের কর্তৃত্বা-ধীনে পরিচালিত এক একটা শিল্প সংঘ এবং তাঁদের পরিকল্পিত ব্যবস্থার রাষ্ট্র অঙ্গপন্থিত। কারণ রাষ্ট্রকে তাঁরা দেখেছেন এক দানবীয় পরতাপহারী ব্যবস্থাক্রমে। তাঁরা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেছেন। মার্কস চেয়েছেন রাষ্ট্রের নামবিলোপ। এক আঘাতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত তিনি করতে চান নি। কারণ তাঁর মতে এই পরিকল্পনা অবাস্তব। সিণ্ডিক্যালিষ্টরা উৎপাদক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানায় বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত মালিকানা তাতে বিন্দুপু ছয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা তাতে বিন্দুপু হবে। তাঁদের কর্মসূচীতে বা সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা কার্যকরী হলে সম্পত্তির মালিকানা যাবে উৎপাদক সংস্থাস্থলের হাতে। ফলে সংস্থানীন সম্পদ ব্যবহারের উপর কর্তৃত্ব থাকবে ঐ সব সংস্থা পরিচালকদের। সংস্থার শ্রমিকরাই যেহেতু পরিচালক, সেই হেতু উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে শ্রমিকদের হাতে। হার ডুরিং-এর সমালোচক মজের সহকর্মী এঙ্গেলস্‌ এট ব্যবস্থার উপর সন্তোষ করতে গিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংস্থার মধ্যে অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত চলে আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা বাণিজ্য। পরিণামে আবার দেখা দেবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সব বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চাড়া সমাজ-তন্ত্রবাদ অচিস্তনীয়। ডুরিং সমালোচনার এঙ্গেলসের বক্তব্য মজের চিন্তা-সম্মত। ক্যাপিটেলের প্রথম খণ্ডে মার্কস্‌ ভাবী সমাজের যে রূপ রেখা এঁকেছেন তাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কোন স্থান নেই। পুঁজিবাদী কারখানার শ্রমবিভাগের যে রূপ আমরা লক্ষ্য করি সমগ্র সমাজের পটভূমিতে

বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থা সেই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে এক কেন্দ্রীয় পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্বে। আলোচ্য প্রবন্ধে জয়প্রকাশজী গান্ধী এই রূপরেখা সংশোধন করার প্রস্তাব করেন। স্বাধীন কৃষাকৃত শিল্প সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করতে চেয়েছেন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের হাতে। সমবায়মূলক সংগঠনকে সমাজবাদী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তিনি ঘোষণা করেন। অর্থাৎ তাঁর সমাজবাদী চিন্তা সিণ্ডিক্যালিষ্ট আদলের অঙ্গরূপ।

তাঁর পরবর্তী রচনা হল ‘Transition to Socialism’ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি নিয়ে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলছিল। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্ববিশ্বাসী ছিল। এই পথে যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না সেই প্রত্যয়ের পক্ষে লেনিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন সারাজীবন। সমাজতন্ত্রের পথ হল শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথ। এবং এই পথে অনিবার্য ভাবে আসবে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য। আলোচ্য প্রবন্ধে জয়প্রকাশজী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সম্ভাবনার দিকটাই কেবল উল্লেখ করেন নি। এষ্ট পথের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রস্নে তিনি মার্ক্সবাদী কাঠামোর বাইরে যান নি।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টা নিশ্চয়ই অমার্কসীয় নয়। কিন্তু এর একটা নৈতিক দিক আছে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হল লম্বা গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের পথ। গান্ধীজীর অহিংসনীতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ তন্ত্রে উত্তরণের মার্ক্সবাদী ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জয়প্রকাশজী গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদকে মেলাবার একটা ভূমি পেয়েছিলেন। তবুও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কার্যকারিতা যে নিঃশঙ্ক নয় সে কথা নতুন ভাবে জয়প্রকাশজী জানালেন ১৯৪৭ সালে দলের কানপুর সম্মেলনের রাজনৈতিক বক্তব্যে। নির্দিষ্ট শর্তের অবর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর যে সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ঘটবে এ কথাও তিনি শোনােলেন উক্ত বক্তব্যে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে দলীয় একনায়কত্ব হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন নি। একদলীয় প্রথা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য। রাজনীতিতে যে একটা নৈতিক প্রশ্ন আছে সেই বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন তিনি “Transition to Socialism”এ। কিন্তু প্রশ্নটার গুরুত্ব বহুাংশে বেড়ে গিয়েছিল দলের

নাসিক সন্মেলনে। তিনি চাইলেন এক সাধারণ নৈতিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের স্বেচ্ছা দেবার আত্মন জানালেন রাজনীতি বহির্ভূত মানবমুখী চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা তিনি অকপটে স্বীকার করে নিলেন। উক্ত স্বীকৃতি তাঁর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের একটা অবপরিণামের সূচনা।

পরবর্তী কয়েকটা বছরে তাঁকে আমরা দেখলাম দলীয় সংগঠক হিসেবে প্রচণ্ড কর্মবাক্ত জীবনে। এল নতুন সংবিধান অগ্রসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবে তিনি দলকে প্রস্তুত করতে চাইলেন কিন্তু ফলাফল আদৌ আশাহীন হল না। তাঁর দল কয়েকটা রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলেও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এত প্রবল যাতে তিনি নিশ্চয়ই খুব নিরাশ হয়ে পড়োছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর কর্ম হল নিজ দলের সঙ্গে আচার্য রূপালীন্দ্রের নেতৃত্বাধীন কৃষক মজদুর প্রজা পাটির মিলন সাধন। এই মিলনকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন মার্কসবাদ-গান্ধীবাদের মিলন সেতু হিসেবে। এষ্ট মিলনের পশ্চাতে তাঁর ছুটো উদ্বেগ ছিল। লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে পূর্বণো নৈতিক প্রশ্নের একটা রাজনৈতিক মীমাংসা বলে তিনি এই মিলন প্রচেষ্টাতে উত্তোষী হয়েছিলেন। সমাজবাদ বন্দ্যুজ এক শাস্ত্র সমাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চায়। কিন্তু হিসাবাক ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পথে এমন সমাজ কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং চাই শান্তিপূর্ণ পথ। রূপালীন্দ্রী পূর্বণো গান্ধীবাদী নেতা। তাঁর ও তাঁর অগ্রগামীদের যোগদানে সম্ভবতঃ নৈতিক প্রশ্নটার সমাধান হল বলে তিনি অনুমান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শাসক কংগ্রেস ও উগ্রপন্থী জালাবিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধ হিসেবে শক্তিশালী দলীয় সংগঠনের প্রয়োজনে উক্ত মিলন তাঁর কাছে খুবই কাম্য ছিল।

এর পরেই আমরা দেখলাম জয়প্রকাশজীকে আচার্য তানের সর্বোদয় আন্দোলনের একজন প্ররোচিত হিসেবে। সর্বোদয় একটা নৈতিক আন্দোলন—মাতৃষের রুদ্র পরিবর্তনের গান্ধীবাদী প্রত্যয় যার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে প্রচার করলেন সর্বোদয়ের আদর্শ। আত্মন জানালেন ভূস্বামীবর্গের কাছে ভূমিদানে অগ্রণী হতে। এ আন্দোলনে তিনি কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন বা তাঁর এই নতুন নিরীক্ষার মূল্য কতখানি তা তিনি এখনও দেশবাসীকে জানান নি। দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করে তিনি সর্বোদয়ে

যোগ দিয়েছিলেন। রাজনীতির চৌহদ্দীর মধ্যে না থাকলেও তার আশে
 পাশেই তিনি ছিলেন। কারণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন
 রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে তিনি নির্বাক থাকতে পারেন নি। প্রায় অপ্রত্যাশিত
 ভাবে তাঁকে আমরা দেখলাম পণ্ডিত নেহরুর প্রতিপক্ষ হিসেবে পাটনার
 ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিরূপে। বিস্ময় পাটনার ছাত্র সমাজ জাতীয় পতাকা
 ছিঁড়ে ফেলেছিল। পণ্ডিত নেহরু তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। জয়প্রকাশজী
 দাঁড়ালেন ছাত্রদের পক্ষে। সম্ভবতঃ নেহরুর বিরুদ্ধে সেই ছিল তাঁর প্রথম
 বিদ্রোহ। অনেকটাই বিন্মিত হয়েছিলেন পার্শ্বস্থানের আয়ুস্মতী সামরিক
 শাসনের প্রতি জয়প্রকাশজীর নবম মনোভাব প্রদর্শনে। সম্ভবতঃ তিনি পাক-
 ভারত বিরোধ একেবারেই পছন্দ করেন নি। অথবা তাঁর হয়ত ভয় ছিল
 যে উগ্র পাক বিশেষের মধ্য দিয়ে আবার সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে
 উঠবে। সাম্প্রদায়িক বিষয় যে কতখানি ভয়ঙ্কর তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন
 তাঁর বিদ্রোহেই। এই দুটো অনুমান ছাড়া আয়ুস্মতীর প্রতি তাঁর নবম
 মনোভাবের অন্ত কোন ব্যাখ্যা বুঝে পাওয়া যায় না।

রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে গেলেও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে
 তিনি কোনদিনই উদাসীন থাকতে পারেন নি। রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই
 তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।
 নীতি-বর্জিত রাজনীতিও তিনি তীব্র সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। জয়প্রকাশজী
 জনজীবন থেকে বিদায় নেন নি। বরঞ্চ তিনি ভেবেছিলেন যে সর্বোদয়ের
 মাধ্যমে এক নয়া সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি রাজনৈতিক
 বহুমুখকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরে আসেন নি, বা ফিরে আসবার কথা ভাবছেনও
 না। সম্ভবতঃ ও পথ এখন রুদ্ধ তাঁর কাছে। সর্বোদয়ের কার্যকারিতা
 সম্পর্কে তাঁর মনে নতুন কোন সংশয় নিশ্চয়ই জেগেছে। সর্বোদয়ের পুন-
 মূল্যায়ণে তিনি ব্রতী হবেন কিনা তা আমরা জানি নে। তবে প্রশ্ন নেই :
 এ ব্যাপারে যে দলীয় রাজনীতি বা সর্বোদয়ের কোনটিতেই তিনি ফিরে যেতে
 পারবেন না অথচ ছুটির কোনটিকেই তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করতেও পারবেন না
 দলহীন গণভঙ্গের ধারণা অস্পষ্ট হলেও হয়ত এই পথে তিনি কোন নতুন
 দিক নিশানা দিতে পারবেন। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে
 বিচার করতে হবে জয়প্রকাশজীর সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের সাম্প্রতিক বণ-ফল।

আমি স্থানী লোকের সম্পর্কে খুব কম এসেছি, স্থানী লোক দেখলেই কেমন অচেনা মনে হয়, কেননা অস্থিৎ সারা পৃথিবী ভরে গেছে, প্রকৃত স্থানীর চেহারা মনে পড়ে না, যারা স্থানী বলে ভাবছে, মনে করছে, তারা মনে স্থানী হয়ে আছে, চুপি করে টাকার মদে, রাজনীতির অনাচারের মদে, এবং পরকে ধান্না দিয়ে মদ গিলে স্থানের চেহারা সর্বত্র : চৈতন্তের শক্তি কারো চোখে মুখে দেখি না। হঠাৎ দেখতে পেলে ভয় হয়, মনে হয় ছলনা করবার জন্তে সে এসেছে বুলি, নতুবা আমি বুঝতে পারছি না।

আমার এক বন্ধু, স্থানীয়, তার একটি পরিচিত বিজ্ঞাপনের কার্যে নিয়ে গেল, বন্ধুটি কিছুটা খ্যাতি, প্রেস হাতে নেই, পত্রিকা গুর লেখা ছাপার না, কোনোদিন গুর নামে কোনো প্রকাশক বিজ্ঞাপন করে না, অর্থাৎ গুর নাম কেউ তেমন জানে না, কারণ স্থযোগ পার্থক্য, তবু বই লিখতে চায়, গোটা কয়েক বই লিখেছে, নিজের পরসার ছাপিয়েছে, বিক্রির চেয়ে বিলিয়েছে বেশি যারা পেয়েছে তারা, পৃষ্ঠা উন্টেও দেখে নি, এবং অনেক কবিকেও দিয়েছে, যারা বই দিয়েছে আগ্রহে, যেখানে নিয়েছে, সেখানেই ফেলে গেছে। স্থানীয় পরে পড়ে থাকতে দেখে বাবা পেয়েছে মনে, এ ছেন স্থানীয় একটি টাংগেজীতে বই লিখেছে, ধরে পড়ে অনেককে দিয়ে সংশোধন করে নিয়েছে লেখা, কিন্তু ভালো প্রচার দরকার সেট চেষ্টা কলেজ স্ট্রীট পাড়ার একটি কার্যে প্রচার, বিজ্ঞাপনের জন্তে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলো। ভ্রমলোক প্রস্তুত ছিলেন না দেখতে সোঁমা, ব্যবহারে অসামান্যতা, চুকতে দেখেই চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়ালেন আপ্যায়নের জন্তে, পরে বলে বললেন, বহু, বহু। আমবা হেসে চেয়ারে বসলাম দুজনে। বললেন ভ্রমলোক, বলুন কি ব্যাপার। স্থানীয় বললো, আমার একটি বই ছাপিয়েছি, আপনারা যদি প্রচারের ভার নেন এবং পরিবেশনের।

—কি বই?

—কতকগুলি কবিতার অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় বললো।

—কবিতা! আঁতকে উঠলেন, কবিতার অন্তর্ভুক্ত! ও ভাই চলবে না।

আর আপনি তো টাংগেজী সাহিত্যে খ্যাত নন।

স্বশাস্ত বললো, খ্যাত হবো কি করে, আমি লিখি বাংলা । আর বাজারে সাহিত্যে লিখি না । স্বত্ত্বাং এখানেও নাম কম ।

— কিন্তু আমরা তো ব্যবসা করি, যাদের চলে তাদের নিয়ে আমরা ভাবি । যদিও আমরা নতুন লেখকদের চালাবার চেষ্টা করেছি, বিতরণশীল তৈরী করবার চেষ্টা করেছি । বাংলা দেশে কোনো প্রকাশক যা করে নি ।

বাইরে থাকিয়ে দেখলুম, একটি ট্রাম চলে গেল তারে শব্দ তুলে, শব্দের ভেজা পরিষ্কার আলোর রাস্তা পরিচ্ছন্ন, ফুটপাথের একটি গাছ থেকে বকুল ঝরে পড়লো, পরেই একটা ঠেলা পিষে গেল, ইলেকট্রিক তারের ওপরে একজোড়া কাক বসেছিল, হঠাৎ চিংকার করে কোণার উড়ে গেল দূরে ।

ভক্তলোক পরিচ্ছন্ন, শাদা টেরিলিনের ব্রশসাঁট পরনে, চুলগুলি কঁচকানো, সামনে একটু পাক ধরেছে, টিকলো নাক, উন্নত কপাল, কশা, দাঁতগুলি কণা বলবার সময় ঝকঝক করে ওঠে, গাল স্পন্দন মন্থণ করে কামানো, দেহটা একটু ভারী হয়ে পড়েছে, হয়তো ভুঁড়ি একটু বেশি, কিন্তু চেঁচায়ে বসে আছেন বলে বোঝা যায় না । পাশে দুটো টেলিফোন, মাথার ওপর স্পন্দন, হামী শেলফে মূল্যবান এই ঝাক ঝাক করে ভালোভাবে সাজানো, নরম গদিওয়ালা সোফা পাশে । এরই মধ্যে লোকজন কথা বলতে আসছে, কথা বলে চলে যাচ্ছে, ব্যবহারের মধ্যেও পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত প্রকাশ পাচ্ছে, হুমুস করছে, কিন্তু এমন ভাবে করছে বোঝা যাচ্ছে না, কথা বলেই হালছে, কর্মচারীরা এসে চলে যাচ্ছে, কেউ ক্ষুব্ধ নয় ।

স্বশাস্ত বললো, আপনাদের কি আশঙ্কি আছে নেবার ?

হেসে বললেন ; না, আশঙ্কি নেই । আপনি বই ছাপিয়েছেন আমাদের আশঙ্কি থাকবে কেন ? তবে যদি ছাপানো না হয়ে থাকে একটা অনুরোধ করবো, লেখাগুলো লওনের কোনো নামকরণ করিকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নিতে । ওদের ওখানে এরকম সংস্থা আছে, ওরা কাজ করে দেয়, এবং ভূমিকাও লিখে দেয় ।

স্বশাস্ত বললো, আমি তো জানি না ।

ভক্তলোক সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠিকানা বার করলেন বই থেকে এবং নিজেই টুকে দিলেন স্বশাস্ত্রের হাতে । স্বশাস্ত্র বললো, যদি থকন এবার সম্ভব না হয়, তাহলে কি আপনি নেবেন না ।

ভক্তলোক হেসে বললেন, নেবো, তবে বিক্রির কোনো গ্যারান্টি দেবো না,

আমাদের লোক চেষ্টা করবে, দেখাবে । শর্ত দুটো ; আমরা নিলে কি-কি পার্শেট দিতে হবে, অন্য কাউকে পরিবেশক করা চলবে না ।

এই সময় এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, মাঝার চুলগুলি পেকে গেছে, চেহারা ভারী, কর্ণা। হুশাস্তকে দেখতে পেয়েই বললেন, আরে হুশাস্তবাবু কি খবর অনেকদিন দেখা নেই । ওদিকে আসেন চাঁসেন না তো ।

হুশাস্ত বললো, সময় পাই না, আর আপনাদের ওখানে গিয়ে ছালে পানি পাই না । আপনার পত্রিকা আমাদের জন্তে নয় ।

হেসে ভারি চালে বললেন, কি যে বলেন, আসবেন । আপনারাই তো এখন চালাবেন । আমরা তো শেষ হয়ে এসেছি ।

হুশাস্ত বললো, শেষ হলেও টগবগিয়ে চলছে রজ্জ্বক সাহেব । আমরা জন্মেই পলু ।

রজ্জ্বব বললো, তা এখানে কি দরকার ?

হুশাস্ত বললো, এই ব্যক্তিগত, একটা বইয়ের ব্যাপারে ।

কথা জমে উঠলো, কোনো কোনো কবির প্রসঙ্গ উঠলো, উঠতেই রজ্জ্বব অনেক গালাগালি দিতে থাকলো, বিখ্যাত এক কবির নাম বলতেই ফার্মের লোকটি মুখ ঘুরিয়ে এমন এক ভঙ্গ করলেন ও বললেন, মনে হলো অস্বাভাবিকতার ভেতরে গর্ব ও দহন লুকিয়ে আছে ; বললেন, কবি হবে আনন্দময়, মরোস্ হয়ে থাকে । শুকে দিয়ে কিছু হবে না । ইংরেজী প্রসঙ্গে কথা উঠতেই ভদ্রলোক বললেন, ওর কথা বাংলাদেশেই মানে, বাংলার বাইরে কেউ মানে না । রজ্জ্বব বলে উঠলেন, তুলনামূলক, বোধহয় আপনারা বাড়ী নিয়েছেন, হেসে বললেন, হ্যাঁ নিই নি, গুনাবলি নিয়েছি, তিন লাখ টাকা দিয়ে । আমি যাই নি । তবে তিনেছি ভালো, বাড়ি নয়, একটা ফ্লোর কিনেছি । ভাল জায়গা । রজ্জ্বব বললেন, দিল্লিতে এখন কেমন চলছে ? ভালো !

ভদ্রলোক বললেন, ভালো, খারাপ চলবে কেন ? আমি সব সময়ই অনন্দে থাকি, কি বই পড়ছেন নতুন ?

রজ্জ্বব বললেন, পড়ছি, তবে চোখটা কষ্ট দিচ্ছে । মেয়েটা তো বলছে, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি । বলে, তুমি তো বুড়ো । হেসে বললেন, কি যে বলে ?

ভদ্রলোক বললেন, আপনার বয়স কতো চলে,

—চুপায়ে ।

ভ্রলোক হুশাস্ত্রব দিকে ডাকিয়ে বললেন, বলুন তো আমার বয়স কতো, হুশাস্ত্র বললো, ষাট হবে ।

ভ্রলোক হেসে বললেন, আমার চৌবটি, আমি এখনও কার্যকর, সব কাজ নিজে করি, না আমি বুড়ো হই নি, ক্লাস্তিবোধ আমার নেই, আমি সর্বদাই আনন্দে থাকি । আমার বন্ধুরাও ভালো তাই আমি ভালো থাকি, আমার যা খরচ, তার থেকে আমি অনেক বেশি উপার করি, কিন্তু কাউকে কীকি দিই না । আর আমার সিনেট আমি কিছু, বিদেশ থেকে অনেকে আসে, তারা বেশা করতে চায়, বলি আমি যেতে পারবো না তাই, এখানে এলে দেখা হবে । আমি ভালো আছি, আনন্দেই আছি । আমার কোনো আক্ষেপ নেই, অভিযোগ নেই, আমি ভালো, কারণ আমার বন্ধুরা ভালো ।

হুশাস্ত্র বললো ; আপনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কবে ।

ভ্রলোক বললেন, আমার বাবা এসেছিলেন এখানে, আমার জন্ম পড়াশুনো সব এখানে । বাড়ি আমারেই পাঞ্জাবে । তবে যাট নি কখনো । এলাহাবাদে আমারেই একটা বাড়ি আছে, আর এখানে । আমি বাঙালিই ।

হুশাস্ত্র বললো, আপনি সুখী বাঙালি, যা আমারেই দেশে নেই ।

ভ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, রক্তব এর মধ্যে চুপ করে গেছেন, মাঝে কাকে নিয়ে কথা উঠেছিল, হুশাস্ত্রব সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে গেল এককক্ষ । রক্তব যাকে ভালো বলে, তারে ভালো না বললেই বিশদ, এবং তারি ভালো বলার মধ্যে নিজের স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় আছে । সে দেশে গণ-বিল্লবের কথা বলতে চায় । ভ্রলোক বললেন, আমি দেখেছি যারা রাষ্ট্র তারি বট পড়ে না । তাই বলি ইক্ ইউ আর রাইট, টার্ন লেফ্ট । বলে তাসি । আমি বসে বসে এই সুখী ভ্রলোককেই দেখছিলাম, সুখের স্বাক্ষরাকীর্ষনের মাধুর্য নিয়ে এসেছে । আমার কানের মধ্যে বাজছিল, আমার যা খরচ, তার অনেক বেশি আমি উপার্জন করি । আমি অসুখে থাকবো কেন ? আমার বন্ধুরা ভালো তাই আমিও ভালো থাকি, সদা আনন্দে থাকি । ভ্রলোক এক সময় কবিরের সম্বন্ধে এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, কবিরা সদা আনন্দময় হবে, একালের কবিরা যে কী সব সময় সুখ গোমড়া থাকে । তাই হুশাস্ত্রব আপনাকে দেখে মনে হয় না, বড্ডো সিরিয়াস । চোরকা নিশানা চোতি, কবিরা নিশানা নাকী । বলেই হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন ভ্রলোক । রক্তব দায় ছিলেন মুচকি হেসে ।

হুশান্ত বইয়ের ব্যাপারে আরো ছোটো কাজের কথা বলে উঠে পড়লো, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম, বন্ধব আমাদের গ্রাহ্যই করলেন না । সেদিন আর আমার আশিস যাওয়া হলো না, হুশান্ত জোর করে বললো, চল, আজ আমরা সিনেমা দেখি ।

তখন তিনটে বাজে বাজে । সিঁড়ি দিয়ে নামছি, পান বিড়ি সিগারেটের দোকান হুশান্ত ছোটো সিগারেট কিনলো, বললো পান খাবি ? না করলাম ।

সঙ্গে সঙ্গে সানকি হাতে চার পাঁচটি ভিথির এসে দাঁড়ালো, কান্নার কাতর কর্তে ভিক্ষা চাইলো, পান বিড়ি সিগারেটওয়ালা হেকে উঠলো ওদের সামনে, ওরা প্রায় গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে কিছুতেই যেতে চায় না । ওদের বৃহৎ ভেদ করে কোনো বকমে আমরা বাসে উঠলাম, আগেকার ইংরেজ পাড়ায় সিনেমা হাউসে যুয়ে বেড়ালুম কিছুক্ষণ টিকিট না পেয়ে ; শেষে একটা স্পাই বইর ছবি পেলুম দেখতে । জাপানি ছবি : একটা বিবাস্ত্র সাপ কি ভাবে দাঁড়িতে বাধা নরনারীকে চোবল মাঝে আসছে, আর বার বার একটি পুরুষ পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, শেষ পর্যন্ত একটা চুলের কাটা দিয়ে ইলেকট্রিক চার্জ করে সাপটাকে মেঝে ফেললো তর্পাস্ত্র পুরুষ । কাপড়ের মধ্যে চূষন ও আলিঙ্গন করতে করতে গোপনে সংবাদ পাঠাচ্ছে অ্যাংলারদের সঙ্গে মেয়েরা ময় তরে স্তরে সংবাদ নিচ্ছে, শেষে অ্যাংলারদের গুলি করে মেঝে আনন্দে দুটি মেয়েকে নিয়ে প্লেনে চলে গেল সকলে, নয় নারীর সঙ্গে পর্দাটা ঝলমলিয়ে উঠলো । বেশ কাটলো কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরের আবাসস্থ স্থপ্নে ।

হুশান্ত আজ দিল দরিয়া, সিনেমা শেষ হতেই বললো চ, কিছু খাট । বললাম, আমার টাকাকে কিছু নেই ।

হেসে বললো, তোমার টাকাকে কোনো কালেই কিছু থাকে না । চ, আমিই পাওয়াবো । সারিয়ে এসে দৌড়লাম হেটে, মুলমান বাজার পাড়া, বিভিন্ন বকম কল বিক্রি হচ্ছে, লাগ খয়েরি শাদা আপেল, বেদানা, মোশাম্বি, আথকট, বয়মে ভক্তি হামি খাবার, ফলের বাজার পাড়ায় ভক্তি বাপা, কিছুটা পেরতেই মাংসের দোকান, বাস্তাব ওপরই বড়ো চাটু করে ডালডার সাদা পুরটা ভাজছে, শিক কাবার পোড়ছে, কাঁচা মাংসের গন্ধে জায়গাটা ভক্তি ভিথির গুলি পাশে দাঁড়িয়ে, ভয়ে এখানে আসতে সাহস পায় না, হয়তো গরম শিক পুড়িয়েই বিধিয়ে দেবে । একসঙ্গে পাঁচ গাতিটি ভিথির ছেলেমেয়ে ভিড় করে থাকে, সানকি হাতে ভিক্ষা করে, বাসি চোঁড়া কটি পায় কখনো কখনো

ভাটবিনে ফেলা মাংসের হাড় ও ভাঁড়ের খোল চেটে খায়, নষ্ট কমলালেবুর একটা অংশ বাদ দিয়ে অল্প অংশটা চেটে খায়, হুঁহু, এসে যেউ যেউ করে দাঁত বার করে খিঁচিয়ে ওঠে, লাজ সোজা করে, তারপর কুকুর ও ভিথিরি একই সঙ্গে ভাটবিন থেকে খাবার খুঁটে খায়। তেলচেটা স্নাকডার ভিথিরি মেয়ের কোমর বাধা, বৃকের কাপড় আছে কি নেই, ফুটপাথে থাকে, ফুটপাথেই হাগে মোতে, রাস্তা দিয়ে এগোনো যায় না। এই পাড়ার মাংসের দোকানের আনাচে কানাচে যেন এদের ভিড়। এদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে শাদা বাড়িগুলি, শাদা জলের নীচে কালো মাটির মতো দেখতে। এদের দেখে আর খেতে ইচ্ছে হয় না। আবার দেশের চেহারাটা এই ভিথিরি মেয়েদের মতোই, গায়ে চিটচিটে ময়লা দুর্গন্ধ, ছেঁড়া স্ফাতা পরনে, বৃকের কাপড় নেই মাথায় ময়লা ও মোংরা কাঁকড়া চুল, উকুনে কিলবিল করছে, কোলে রিক্বেটি তিনটি ছেলেমেয়ে, চোঁচাবার শক্তিও নেই, কিন্তু ওরাই ওর ক্যাপিটাল বা মূলধন, করুণা বা সমবেদনা আগিয়ে তিকা করে খায়, তৃপ্তিতে আছে, শোয়, আরও বাচ্চা হয়, ফুটপাথ ছেয়ে ফেলে, মাছুষের হাঁটবার জো থাকে না, তবু হাঁটতে হয়, বঁচে থাকতে হয়। বাড়ি ওঠে। হুশাস্ত আমার অবস্থা দেখে হেসে বললো, নাক সিটকোচ্চিস কেন ?

বললুম, দেখতে পাচ্চিস না ?

হুশাস্ত নিবিকারভাবে হেসে বললো, সারা দেশেই এই চেহারা।

—হ্যাঁ, কিন্তু পার্থক্য নেই, একই নরকে আছি, তবে নরক বলে মনে করছি না।

—মনে না করলে আর আপত্তি বা বাধা কোথায় ?

ভিথিরিদের একরকম ঠেলে ঠেলেই আমরা সাবিরের দোকতলায় উঠলুম, উঠতেই অল্প চেহারা, পরিকার পরিচ্ছন্ন, বকবকে, তকতকে, শাদা উদ্দিপরা খানসামা এলো অর্ডার নিতে। চাপ ও তন্দুরার অর্ডার দিলো হুশাস্ত।

হুশাস্ত বললো, রাস্তাঘাট আর চলাই যায় না। যাদের গাড়ি আছে, তারা একরকম এড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। তারপর একটু থেমে বললো, এই অপমাত্রবদের বাঁচিয়ে রেখে কি দরকার, গ্রীসের মতো যদি মারতে পারা যেতো, আমি হেসে বললুম, দেশটা গ্রীস নয়, আর্থ্রা আমাদের পরাজিত করেছে। আর এখানে ওরা নিজেকে উন্নতি করেছে। এই সব ভিথিরি, হকার, চোর, জোচ্চোর না থাকলে দেশে গণতন্ত্র থাকে না।

দেখে খাত্ত লকট, খরা, বস্তা, বেকারী-ছাঁটাই আছে বলেই তো। বাম্পহীরা মিছিল বার করতে পারে। গণভবনের ভেতরেই ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বংশ বৃদ্ধি করতে হবে, তাহলেই ভোটাধিক্য হবে। বাইরের দিকে নীচে তাকিয়ে দেখলুম, সাবিরের চারপাশে ভিথিরি গিজগিজ করছে, সকলের হাতেই সানকি, ছেঁড়া স্কাফডা, তেল চিট্‌চিটে ময়লা গা, কাঁকড়া মাথা উলঙ্গ চেহারা বাড়িটা ঘিরে ঘরেছে মাথায় করে। হুখী মাহুকের কথায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল মনে, আমি যা খরচ করি, তার চেয়ে বেশিই আমি উপার্জন করি, আমার কোনো অভিযোগ নেই, আমি ভালো আছি, কারণ আমার বন্ধুরা ভালো আমি এই বয়সেও কেমন কাজ করে যাচ্ছি। মনে হলো ভুল্ললোক পাঞ্জাব থেকে এসে এগোন লাঙালি হয়েছেন। খাবার দিয়ে গেল খানসামা। হুশাস্ত প্লেট টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলো, আমিও খেতে আরম্ভ করলুম ওর দেখা দেখি। খিদে পেয়েছিল, ভালোই লাগলো। বিল উঠলো সাত টাকার মতো, হুশাস্তই দিয়ে দিলো। কারণ ওর ইংরেজি কবিতার বই বেরবে। আনন্দে টগবগ। নীচে নামতেই আবাব ভিথিরি, চার পাঁচটা ভিথিরি প্রায় ঘিরে ফেললো, হুশাস্ত একটাও পরশা দিলো না, পরশা দিলেই শ'খানেক ভিথিরি এসে জুটবে। কিন্তু নীচে নামতেই কাদায় নর্দমায় ভিথিরিদের চাপে গা গুলোতে লাগলো।

সামনে একটা দৃশ্য দেখে ৫মকে দাঁড়াতে হলো। কতগুলি দর্জির দোকান, শাটার টেনে দিয়েছে; নীচের দিকে শাটারের এক টুকি জায়গা খোলা, ছ'তিনটে দোকানের শাটারের নীচে ছ'তিনটে করে বাজা সানকি নিয়ে দাঁড়িয়ে শাটারের ভেতর দিয়ে সানকি গলিয়ে দিচ্ছে, আর কর্ণে কান্ডর আকৃতি তুলে বলছে, বাবু, খাই নি, খাবো। ওরা ভয়তো জানে, এই সময় দোকানের লোকেরা খাবার খায়, ফুটপাথের লোকেরাও এই দৃশ্যে অভ্যস্ত, ভেতরের লোকেরাও কিছু রাখছে না, ওদের এই ব্যবহারে, শাটারের ভেতর থেকে লোকেরা সানকির মধ্যে মাঝে মাঝে শশার টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, শশার টুকরো পেয়েই পরম আনন্দে বাইরে সানকি এনে গোয়ালে গিলছে, এমনভাবে একটার পর একটা দোকানের শাটারের নীচে ভিথিরির বাজাগুলি হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর খাচ্ছে, এর মধ্যে সাত আট বছরের একটা বাজা একটা শশার টুকরো পেয়েছে সে তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে, ওর বোনই হবে, ওর থেকে বড়ো, একটু চাইলো হাত বাড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে

বললো বাচ্চাটা, উঁ, আর তার পরেই পুরোটা মুখের ভেতরে দিয়ে চিবোতে লাগলো, দাঁত বাঘ করে। পরক্ষণে আবার অস্ত্রদাঁতালনের শাটারের নীচে হাত গলিয়ে কাতর স্বরে খাবার চাইলো, মুখ চিবোচ্ছে অনবরত।

আমি আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারলুম না, ঘেমা হলো, বাইরের এই নরক আমার মনের ভেতরে ঢুকে গেছে সেখানে কুমিকীটের সঙ্গে সাপ পেঁচা বাছড় ঈদুর ছুঁচো একটু সঙ্গে খেলছে, সঙ্গম করছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মাচ্ছে এবং মরছে, ওদের মরা দেহ ফুলে উঠছে আমার চারিদিকে, আর এক অদ্ভুত অশরীরী ছায়া। যে ছায়া মাতৃবের গলে-যাওয়া শবে তৈরী সমস্ত দিক ছেয়ে নেমে আসছে, আমি আঁতকে উঠলুম, আমার মনের মধ্যে ভয়ের আতঙ্ক হুলিয়ে উঠলো, মনে হলো, আমি জেগে নেই, ধীরে ধীরে ওদের সঙ্গে আমার দেহের কণা মিশে যাচ্ছে, মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না। ভেতর থেকে বমি উগরে উঠলো, ওথেনেই বসে ফুটপাথের নর্দমায় বমি করলুম গলগল করে যা খেয়েছিলুম, একসঙ্গে বেরিয়ে এলো, বুক চিরে, মনে হলো রক্তবমি হবে গলা চিরে, হৃশাস্ত আমাকে ওঠাবার চেষ্টা করলো, পারলো না, রাস্তায় দু' একজন লোক জুটে গেলো, কেউ হাসলো মনে করলো, মদ গিলেছি সজ্ঞ করতে পারি নি, তাই উগরে বেরিয়ে আসছে। ওগরানো বমি ভিথিরিদের মধ্যেই পড়লো। সব নিঃশেষ হয়ে বেরবার পর নিজেকে কিছুটা হাঙ্কা বোধ হলো, উঠে দাঁড়ালুম, হৃশাস্ত বললো, কি গাড়ি করবো? বললুম, না, হেঁটে যেতে পারবো চল। দুজনে আমরা আন্তে আন্তে হাঁটতে লাগলুম, কাঁচা মাংস পোড়ার গন্ধ, আঁবি হালিমের গন্ধ, লুজি, সঙ্গে শাদা দাড়ির দোলা, গাঁদ-ওঠা টিন, চীনে মেয়ের কাটপরা শাদা পা, খাবড়া নাকের মুখ, বোরখা পরা মুসলমানী..... এইসব দৃশ্য আমাদের ঢেকে ফেললো। সেন্ট্রাল এন্ডেনিউতে এসে দাঁড়ালুম। রাস্তাটা অনেকটা ফাঁকা একটু জল তেঠা হলো ভয় হলো, অঙ্কার জম্বাট হয়ে উঠলো আবার আমার বৃকে, বাইরের যা কিছু থাকবে। প্রকৃতি যা দেবে মাতৃবের হাত দিয়ে, সব বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে। প্রকৃতি চায় না আমরা কিছু খাই। এক অদ্ভুত অশরীরী ছায়া আমার চারপাশে, মাথার ওপরে আবার ভিড় করে দাঁড়াতে লাগলো, মনে হলো, আমার যন্ত্রণা আমার একাকিত্ব, আমার স্বাধীনতা, আমার স্বাভাব্য সব শেষ হয়ে গেছে, ছায়ার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে যাচ্ছি, গাড়ি ঘোঁড়া লোকলস্কর যানবাহন কোথায় ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল?

রাস্তা দ্বিগুণে বিশ্বকর্মা পুজোও ভাসানের বাজনা বাজছে, বুন্দো পুড়ছে। ঘণ্টা বাজছে, হুন্ডোড় হচ্ছে। ভুল্ললোকের কণ্ঠ ভেসে এলো : আমি ভালো আছি।

মুন্সিরাবাদ জেলায় সাঁওতাল, ওরাওঁ মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসী বাস করে এর মধ্যে সংখ্যায় দিক থেকে সাঁওতালই প্রধান তারপরে বোধহয় ওরাওঁ ।

মুন্সিরাবাদে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, মেধর জেলে ওঁচাই সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা গান আছে । হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবার স্বতন্ত্র গান । শুধু গানই নয় গান, নাচ, ছড়া, রঙ্গ, কোতুক, বাজ, অভিনয় সবকিছুই বিয়েকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে ।

আদিবাসী সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে জয়, মৃত্যু, বিয়েতে গানের প্রচলন আছে । নৃত্য-গীত আদিবাসী সমাজে জীবনচর্চার অঙ্গ বিশেষ । সুতরাং বিয়ের মত একটি জীবনের পরমপয়ে আনন্দোৎসাহন যে প্রধান স্থান অধিকার করবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে ! বিশেষতঃ যখন নৃত্য গীত ও সমবেত পান ভোজনই আদিবাসী সমাজের গোষ্ঠীজীবনের আনন্দ অচুষ্ঠানের প্রধান বা একমাত্র মাধ্যম ।

এই জেলায় সাঁওতাল ও ওরাওঁ ছাড়াও কোঁড়া, লোখা, ভূমিজ, মাহালি, মালপাহাড়ী, মুণ্ডা, ইত্যাদিরাও আছে তবে তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য । সুতরাং সাঁওতাল ও ওরাওঁদের নিয়েই আলোচনা করা যাক ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে উচ্চ সমাজ - যাকে বলি সেই উচ্চ সমাজে প্রচলিত বহুবিধ আচার অচুষ্ঠান আমরা আর্থিক আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি । বিয়ের বহুবিধ নিয়মরীতিও অনাৰ্য সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করে আমরা এখন আশ্রয় করে নিয়েছি । উদাহরণের শেষ নাই ।

হিন্দুসমাজে এঘোড়ির লক্ষণ সিঁথির সিঁতুর । সিঁতুর দান বিয়ের প্রধান অঙ্গ । সিঁতুরদানের কথাটি ধরা যাক । সর্ববাদের সিন্দুর ধারণের প্রথা বাজালি হিন্দুদের মধ্যে বহু প্রচলিত । সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ এরাও বিয়েতে বধুর কপালে সিন্দুর দানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয় । এদের মধ্যে সিঁতুর দানই বিয়ের মুখ্য আচার । বাজালি হিন্দুদের অপেক্ষা এঁদের সমাজে সিন্দুরের মর্যাদা অধিক । নৃত্যবিদ পণ্ডিতদের মতে বাংলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সমূহের হিন্দুগণ প্রতিবেশী কোনও অনাৰ্য বা আদিবাসী সমাজ এর কাছ থেকে বর কর্তৃক বধুকে সিন্দুর দান প্রথাটি গ্রহণ করেছে ।

ওরাওঁদের বিয়ের গান :—হুশিয়ারাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা, বহরবপুর মহকুমাত্তে বেশ কিছু সংখ্যক ওরাওঁ বাস করেন। এরা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু ও অন্ত্যস্ত সম্প্রদায়ের বনিষ্ট সাহচর্যে এসে তাদের অনেক কিছু যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি আবার অনেক আচার অচুঠান তারা অন্তদের কাছ থেকেও গ্রহণ করেছে। সুতরাং নির্ভেজাল ওরাওঁ সংস্কৃতি এখন হয়ত তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরাওঁরা সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। তাদের অনেকে 'খাজড়' বলে।

নতুন জীবনের চিন্তা উন্নত সমাজের সংস্কৃতির সাম্প্রতিক ধারা এদের জীবনে স্পর্শ করেছে। তবু এরা তাদের পুরাতন সংস্কার সংস্কৃতি ও সংগীতের আনন্দময় দিকটি এরা বর্জন করেনি বরং বুক দিয়ে স্বেচ্ছালিকে বাচিয়ে রাখার আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তার ফলে নিজেদের মধ্যে কখনো বা সংঘাত আসে—নতুন পুরাতনের সংঘাত। যেমন এদের বিয়েতে সাধারণতঃ দশ'বার মন মদ লাগে। স্বীকৃত্যর সঙ্গে সমবেত নৃত্য ঝাড়া শিকার আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে—তারা ভাল চোখে দেখে না। এটাকে কুসংস্কার হিসেবে ভাবতে শিখেছে।

এদের বিয়ে সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ ঠিক করে দেয়। মেয়ের বয়স যখন ১০ | ১২ বছর ছেলের ১২ | ২০ তখনই বিয়ের উপযুক্ত সময় হয়েছে মনে করা হয়। পণপ্রথা আছে। মাথায় সিন্দুর দেয়। এদের সামাজিক জীবনে অনেক হিন্দু আচার অচুঠান অহুপ্রবেশ করেছে।

বিয়ে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মধুর সময়। ওরাওঁদের জীবনেও বিবাহ উৎসব গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। নৃত্য, গীত, সমবেত পান ভোজন বিয়ের আবাস্তিক অঙ্গ। এদের নিজের রচিত ও নিজেদের মধ্যে প্রচলিত নিজস্ব সুরে সমবেতভাবে বিয়ের গান করে থাকে।

ছেলে মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে (বেহাই বা বেহানদের সোধোদন করে কখনো) নেচে নেচে গায়। চাক বা চড়বাড়ি বাজে।

“বারাই কোই বারাই কোই সামজ আম মালা আয়ন”

এদের নিজস্ব কোন লিপি নাই। এরা সাত্তী ভাষায় কথাবার্তা বলে। সতীতও সাত্তী ভাষায় রচিত।

বিয়ে উপলক্ষ্যে ভাঁড়ের মধ্যে ধানের শিবকে গুছিয়ে রাখা হয়। তার ওপরে একটা গোল আড়াই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি মত চাকতি বসিয়ে তার

ওপর কাঁচা কলাই-এর ভাল ও লবণ বসিয়ে তার মধ্যে লবণের ডেল দিয়ে
সেটি পলতে দিয়ে জ্বালান হয়। গুদেব নিজেদের পুয়োহিত থাকে। পরে
ওটি ওঠাবার সময় ঢাক বাজবে। পাত্রটি বয়-এর বৌদি ওঠাবে। তখনকার
গান :—

“গান্দের ঘেনা চুচু মালকা

সামাদান হেনা চাপচা”

বসে বসে মাদল বাজিয়ে বা ঢাক বাজিয়ে নিচের গানটি গাওয়া হয় :—

আখুয়া আখুয়া হেস্তে—হা—হা—হা—হা—

চিবা হরিবোল

আহা কাম্ কাম্ বালকাম্

আনটা ডানডি পরিকান।

বাবাই ফই বারাই সামাদা

আনটা ডাণ্ডি পারকান।

আরো কয়েকটি বিবাহ সঙ্গীত (বেজা ডাণ্ডি)

১। “আনার বানার বালটি চেহাই ডাণ্ডি গো পাটি

বণবাই কই বাবাই

চেহাই ডাণ্ডি গো পাটি।”

২। “আনার বানার হালদি চুতা হান্দারা বানাদি

বারাই কই বারাই মামদ চুতা হান্দারা বানাদি।”

৩। “ইন্নতা চেংরার মাতে আলমান সঘনার

মাতে মরা ফালকান সঘনার।”

৪। চেহাই সামাদ চিন্তা পিটিরিন আটাই চেহাই

অন বিলমা তামুক ববাই বিয়াই

এংহান মুখান মেনাই এংহান দুঃখান সেনাই।

“মুশিদাবাদ জেলা উদয়চাঁদপুর আস্তা শিব পাচগিস ডাণ্ডী পরদাস।
কালিয়া বিদ্ধিয়ার কি, পাহি নানা কানার সময়স্তা ডাণ্ডা।”

অর্থাৎ এবার মুশিদাবাদ জেলার উদয়চাঁদপুর গ্রামের (বড়গ্রাম থানা)
শিব নামে এক বৃদ্ধো গান গাইছে। সে গান হলো কনে খোঁজ করে কুটুং
করতে যাবার সময়কার গান :—

“হাটাব হাটাব হাটাব দশো ভায়া বাজি হাটাব গে।

বেদনা মাথা কানিয়া বেদার বে ।*

অর্থ—হেঁটে হেঁটে হেঁটে চল দশজন মিলে অনেকদূর দেশে যেতে হবে
কনের খোঁজে । যে কনের খোঁজে আমরা বেরিয়েছি ।

“দশো ভায়র বালে গেন্দাফুল গেন্দাফুল বাগায় ।

যা তোর দশো ভায়া তরায়ান দে

দশো ভায়া লাগেন গায়বার ।”

অর্থ—যে বাড়ী কনে খোঁজ করে শেষেছে সেই বাড়ীতে দশজন যে আনন্দ
করছে সেই আনন্দ গাছা ও অস্ত্রাশ্র ফুলের সঙ্গে তুলনীয় ।

“আশ কসা গজা বিশো কসা যমুনা

হুমনাকে পার কারণে ধার দে

আমার বিশো ভায়াবে ।”

অর্থ বয়ের বাবা বলছে এই ৮০ আশি ক্রোশ ও কুড়ি ক্রোশ যমুনা
পার হয়ে এসে তেমনি আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে পার হতে পারি তার
জন্ত দশ বিশ জনকে অশ্রুগোধ করা হচ্ছে ।

সাঁওতাল বিয়ের গান :—মুন্সিদাবাদ জেলার আদিবাসীদের মধ্যে
সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । মুন্সিদাবাদ জেলাতে প্রায় পঁচিশ রাজারের মত
সাঁওতাল আছে । (১২৭ :) । এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে নিজেদের গ্রামে বা পল্লীতে
বসবাস করে । জীবিকার প্রয়োজনে স্থানান্তরে গেলে সংঘবদ্ধ ভাবেই যায় ।

এরা মূলত কৃষিজীবী তথা কৃষি শ্রমিকের কাজ করে । মাটি কাটা,
শিকার ও অস্ত্রাশ্র শারিরীক পরিশ্রমের কাজ এরা করে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ।
এদের বর্ণমালা নাই । এরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত । নিজেদের সাংস্কৃতিকে বেজার
ভালবাসে । তবে এদের জীবন থেকেও নির্ভেজাল নিজস্ব সংস্কৃতি লোপ পেতে
বসেছে । সময়ের এর হাওয়া লেগেছে । তবুও আদিম সংস্কৃতির প্রতি
অন্তরের আকর্ষণ এখনো অল্পান । গোষ্ঠীজীবনে নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে
রাখতে এরাও সচেষ্ট । জন্ম-মৃত্যু বিয়ে তিনটি ক্ষেত্রেই সাঁওতাল সমাজে
নৃত্য, গীত, বাস্তব প্রধান অবলম্বন । সমবেত নৃত্য-গীত ও পান ভোজন এদের
সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাট অংশ অধিকার করে আছে ।

সাঁওতাল সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের সম্মান বেশী । যদিও নারী
অবজ্ঞাই প্রচেষ্টা—এরা নারীকে অসম্মান করে না । প্রত্যেক বয়সেই ছেলে-মেয়ের
বিয়ে হয়ে যায় । ছেলেদের ‘পণ’ লাগে । পণের জন্ত ১২ (বার) টাকা,

২ (দুই) বিশ ধান একটি গক ইত্যাদি । খাওয়াতে হয় । কাপড় চোপড় লাগে । পরনাপাতি দেবার সাধারণতঃ বেওয়াজ নাই । নিজেদের পুরোহিতই বিয়ে পরিচালনা করেন । নতুন সম্পর্ক (ন'সম্বন্ধ) র সময় ১৪ । ১৫ জন পর্যন্ত মেয়ের বাড়ি আসে । সে সময়ে ছ'বেলা ভাত, মাছ, মাংস দিতে হয় । যার বাড়িতে ন'সম্পর্কের জন্ত লোকেরা আসে তাকেই খরচ চালাতে হয় । অপারগ হলে পাড়ার বা গ্রামের লোকেরা অনেকসময় যৌথভাবে খরচ বহন করেন । কারণ এটি তাদের পল্লীর বা গ্রামের সম্মান রক্ষারও অন্ততম অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয় । ন' সম্বন্ধের পর বিয়ের যতদিন অবশিষ্ট থাকে কাপড়ে ততটা গিঁট দিয়ে রাখা হয় । এক এক'দিন গেলে এক একটি গিঁট গোলা হয় । বিয়ের দিন বরযাত্রীর নিজেদের খাবার নিজেরা নিয়ে আসবে । না জানিয়ে যদি তারা হঠাৎ মেয়ের বাড়ী ঢোকে তাহলে পনের টাকা পর্যন্ত জরিমানা হয় । বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে জল আর একগানি শালপাতা দিয়ে পাত্রপক্ষকে আহ্বান করা হয় । বিয়ের আগে পর্যন্ত পাত্রপক্ষ মেয়ের বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করবে সঙ্গলবলে । যতক্ষণ না বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কস্তার বা পাত্রের বাপ-মা না গেয়ে থাকবে । কস্তা ঘরের ভেতর থাকবে । গ্রামে এসে উভয়পক্ষ (কস্তা ও পাত্রপক্ষ উভয়েই) মিলে নৃত্য গীতে অংশগ্রহণ করবে । মদের জন্ত পাত্র পক্ষ ৬ সের চাল দেবে । বিবাহ অনুষ্ঠানে পারম্পরিক পরিচয় পর্বের শেষে কস্তাপক্ষ বরযাত্রীদের খাওয়াতে পারবে । তারপর কস্তাপক্ষ তাদের নতুন জামাইকে গ্রামের সব পাড়ার প্রতি ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসবে । এর পর পাত্রের বড় ভাই স্থানীয় কয়েকজনের সাহায্যে কস্তাকে ঘর থেকে বাব করে আনবে । তিনজনে মেয়েকে উঠু করে ধরবে । আর পাত্রকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসবে । ঘটির জলে আমের লাগা চুবিয়ে পাত্রকস্তা পরস্পরকে জলের ছিটে দেবে তিন পেকে পাঁচবার । তারপর শালপাতার রাখা সিন্দুর'পাত্র তিনবার মাটিতে ফেলবে । সেই সিন্দুর তিনবার কড়ে আজুল দিয়ে তুলে কস্তার সিঁথিতে তিনবার মাটিতে ফেলবে । সেই সিন্দুর তিনবার কড়ে আজুল দিয়ে তুলে কস্তার সিঁথিতে তিনবার দিয়ে দেবে । শেষে ঐ সিন্দুর কস্তার দাদা বা মামাকে দিতে হবে । বিয়ের পর পাত্র-কস্তা এক ঘরে থাকবে ।

বিয়ের বাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠানের পর কস্তাপক্ষ বরের বাড়ীতে যায় । অভিভাবকেরা ছেলে মেয়ের বয়স হলে ছেলেমেয়েদের জন্য পাত্র কন্যা নির্বাচন

করেন। বলাবাহুল্য সাঁওতাল তরুণ তরুণীরা অভিজাতদের নির্বাচিত পাঞ্জ-পাঞ্জী গ্রহণ করেন। বাড়িরও আছে। অনেকসময় তরুণ নিজেই কোন মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে। তার নির্বাচিত পাঞ্জীর সঙ্গে অহুষ্ঠান মাধ্যমে বিয়ে হয়। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক সামাজিক ভাবে অস্বীকার্য নয়। তবে বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্ম নিতে দেখা যায় এবং অহুষ্ঠান না করলেও অনেকসময় একসঙ্গে বাস করতে দেখা যায়। সময় সুযোগ মত হয়তো একদিন সামাজিক ভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ সামাজিক অনাচার বিবেচিত হয় এবং পাঁচজনের কাছে বিষয়টির বিচার হয়।

বহরমপুর থানার 'সংসার' গ্রামে জৈনকা সাঁওতালকে দেখা যায় যে বাটরে থেকে একটি সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে আসে। একসঙ্গে থাকে। জনলাম মেয়ের মা শিল্পী ছেলের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য আসবে এবং কন্যার জন্য তাদের প্রাণা দাবী করবে। তাদের 'পাওনা' মিটিয়ে তবে ছেলেটি ঐ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে সামাজিক বিচারে গ্রহণ করতে পারে। ঐ গ্রামে জৈনক সাঁওতাল নিজের স্ত্রী থাকাসঙ্গেও অন্য সাঁওতাল বয়সীকে বিয়ে করে। তার এই কাজটি সাঁওতাল সমাজে নিন্দিত হয় ও সামাজিক ভাবে তাকে শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের একাধিক বিয়ে হয়ে থাকে সাধারণতঃ পূর্ব স্বামী ত্যাগ করলে অথবা মারা গেলে এরকম হয়।

নিম্নের গান :—এরা বিয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক দ্রব পান করে। সমবেত ভাবে। সাধারণত জেগে পান ভোজন করে। বানাম (একতারা বিশেষ) টামাক (লাকরা) তুংগা (মাদোল) ঝাঁঝ (পিতলের বড় ঝাঁঝ) ইত্যাদি বাস্তব্য ব্যবহৃত হয়। বাস্তব্যগুলি এরা নিজেরাষ্ট করতে পারে। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরভাবে কাপড় পরে। মাথায় পরিচ্ছন্ন চুল বেধে ফুল গোঁজে। কোমরে হাত দিয়ে পরস্পর গোল হয়ে বা অর্ধবৃত্তাকারে সুসংবদ্ধভাবে পা ফেলে বাঁড়ের তালে তালে বিয়ের গান করে নৃত্য করে। বাঁশীও বাজে। বাঁশের বাঁশী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই সমবেত নৃত্যে অংশ নেয়।

কয়েকটি বিবাহ সঙ্গীত :—

১। হি তি বি জি হি য়ি

তোকারে জনমলেন

হিহিরি হংক শিপিহি হ—

হিপিহি হিপিহি হংক শেপিহি হং

* * *
২। আকোই রহয়া নিমদ

হিহিরি নিমদ নিনিহি নিম্

আকইরে যতনা নিমদ

হিহিরি নিমদ শিপিহি নিম

বাবারে রহয়া নিমদ

গোগয়ে যতনা নিমদ নিম দারে দ।

* * *
৩। ফেটি চালান গদয়ে

নেপকান বালারা বাবুর পদ

উতুয়ক দাকরিক বলায়াক

বেহই—বাবু রপর বলায়াক

হে ও বুয়েবু জমবু

বেমকে বেবু ভাটাই না।

বড়গাণা থানার কুণ্ডল গ্রামের মুণ্ডই হেমব্রম এর নিকট থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৯৭৩ নভেম্বরে নতুন দিল্লীর সজীত নাটক একাডেমী মুম্বাইবাদ জেলা আসেন। এটি জেলার গ্রামীণ সংগীতগুলির রেকর্ড ও ফিল্ম গৃহীত হয়। Field officer Sri Govind Vidyarthi মহাশয় দলের নেতৃত্ব করেন। আমরা এই জেলার আদিবাসী নৃত্য গীতকেও প্রাধান্য দিই। সাগরদিঘী থানার মুনিগ্রাম, নয়াপাড়া ও চাঁদপাড়ার সাঁওতালী নৃত্য-গীত গৃহীত হয়। ফিল্ম ও রেকর্ডভুক্ত করা হয়। জেলা-শাসক মহাশয় ও বর্তমান জজীপুর মহকুমা শাসক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ দে আই-এ-এস এবং শ্রী এন, ভি, জগন্নাথন, আই-এ এস মহাশয়র উপস্থিতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের অকুষ্ঠানে [২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৪] সাঁওতালী নৃত্য-গীত অকুষ্ঠিত হয় বহরমপুর-এর স্কোয়ার ফিল্ডের পতাকা অভিনয়দলের সময়। গত ১৩শে জুন ১৯৭৩ আমার পরিচালনার ও মাননীয় জেলা-শাসক মহাশয়-এর উদ্যোগে জেলার যাবতীয় গ্রামীণ গীতির অকুষ্ঠান হয় সেখানে উদয়চাঁদপুরের ওয়াওঁদের সমবেত নৃত্যগীত বিশেষত তাদের বিয়ের গান

পরিবেশিত হয়েছিল। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিক বৃন্দ সেই নৃত্যা-
স্থান দেখে মুগ্ধ হন।

আমাদের জেলার সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি, বিজ্ঞাপ্তিষ্ঠানগুলিও আদিবাসী
নৃত্যগীতের যদি বাণীসা করেন তাহলে উভয়পক্ষই উপকৃত হবেন।

নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমি কর্তৃক গৃহীত নয়। পাড়া গ্রামের
সাঁওতাল রমণীদের পরিবেশিত বিয়ের গান : -

বান্ধত বাগ্গয় - বাশী বানাম, তুংগা, লাকরা, কাঁক ইত্যাদি এরা সাগর-
দিঘী বানার নয়। গ্রামের একটি মাঠে (চাঁদপাড়া) পরস্পর পরস্পর করে মাদনের
ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ফেলে বাশীর সুরে নৃত্যসহ এই গান পরিবেশন করেন।
পেছনে নালাকাল, সারি সারি তালগাছ আর দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ উচ্চনীচ
প্রান্তর। উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা বিয়ের গান গেয়ে ওঠেন অপূর্ব ছন্দে
মাধুর্যময় কণ্ঠে—

“ওফাতে মাইকু-ইদিমিয়া এতি মোজন দাদা গাতা পাওয়

চিকাতে মাইলে বাড়ায় মিয়া হানে নেল কান তাল বাড়ি

বাংলা। আনা আততেকু ইদিইয়া।”

অর্থ—তোমাকে কোথা নিয়ে যাব। অনেকদূর। নদীপারে কি করে
তোমাকে আনব কতদূরে নিয়ে যাবে। ঐ যে তালবারি বাংলা ঐখানে
নিয়ে যাবে।

উপরোক্ত গানটি সাগরদিঘী বানার চাঁদপাড়া গ্রামের সোনা হেমব্রম ও
তার সহশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

বহরমপুর বানার চাতরা গ্রামের যোগেশ শোহেন এর কাছ থেকে
সোনা বিয়ে উপলক্ষে অল্প দু-একটি গান : -

১। সাম্ভাল দি সোন মস্তাল হর সাম্ভাল সমাজ গরলবে বন তাহে কান
নস্ত রিমিল চিতান রিবিন পাড়ায় ফল হেন্দে রিমিন বে বন হাডগাও আকালী।

২। ভগ আস্তি নীতু দাইনা আস্তি মজ আস্তি তফাং আতু তাকিন সিদ হা
কাহু—মহাৰাজ কিন্ উপেলা কানা।

৩। আসদানী গেল টাকা বং দাইনা গোলাচার। মিদ হয় কালু বাটশি
রলাং সিনিং ঝাকাবা।

সম্প্রতিক বাংলা যথেষ্ট ব্রেশ্ট্‌ নাটকের চর্চা

চিরঞ্জন দাস

সম্প্রতি বাংলা থিয়েটারে অপেশাদারী গ্রুপ থিয়েটারগুলির একাংশে ব্রেশ্ট্‌য়ের নাটক ও ব্রেশ্ট্‌য়ী রীতির অভিনয়ের একটা উন্মোচনও উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু কিছু নাট্যসংস্থা ইতিমধ্যেই ব্রেশ্ট্‌য়ী কিছু নাটকের বাংলা কণাস্বর, অনুবাদ ঘটিয়ে বা ব্রেশ্ট্‌য়ী পদ্ধতিতে মৌলিক নাটক প্রযোজনা করে সুনাম কৈনেছেন। কিছু কিছু প্রযোজনা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। কিছু নাটকের ব্যাপক অভিনয় ঘটছে এবং অভিনীত নাটক সম্পর্কে ব্রেশ্ট্‌য়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপনও হচ্ছে।

বার্টোল্ট্‌ ব্রেশ্ট্‌ বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, পরিচালক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ। জাতিতে তিনি জার্মান হলেও দীক্ষায় ছিলেন মার্ক্সবাদী। এবং তাঁর সমস্ত শিল্প কর্মে, সৃষ্টি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছিল মার্ক্সবাদের বিজ্ঞানজাত ফলাফল। তাই ব্রেশ্ট্‌য়ের জীবিত দশায় তো ধ্রুবেয় কথা স্বাধীনতার পরবর্তী-কালেও এদেশে ব্রেশ্ট্‌ চর্চা যেমন হয়নি তেমন তাঁর ঐশ্বর্যময় জীবনবাদী নাটকের সাপেও এদেশের পরিচয় ঘটেনি। সম্প্রতি ঘটছে এবং ব্রেশ্ট্‌ নাট্যপ্রিয় জগতে পরিচিত হচ্ছেন। এটা আনন্দের কথা, ভরসার কথা। যখন নাট্যবিষয়বস্তুতে জীবন সন্দর্শনের নামে বিকার অবক্ষয়, নীতিহীনতা, নিয়তি, লুপ্ততা ও সংগ্রামহীনতার খোলাখুলি অত্মপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে এবং পেশাদারী মঞ্চের ঠাইলে চমৎ ও অর্থমোহে প্রয়োগের নতুনত্ব ও আধুনিকতার নামে অবৈজ্ঞানিক ও জটিলতার বিভিন্ন গিঁচুড়ি প্রকরণের দাপাদাপি শুরু হয়েছে তখন ব্রেশ্ট্‌-এর নাটক বা ব্রেশ্ট্‌ চর্চা রীতিমত সাহসিকতা এবং বনিষ্ঠতার ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকতার জটিল মাইপ্যাচ ও চেতনাবিহীন শিল্প বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্রেশ্ট্‌ একটি প্রতিরোধ। জার্মানীর থিয়েটার আন্দোলনে ব্রেশ্ট্‌ নিজেরই তাঁর সৃষ্টি ও থিয়েটার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবক্ষয়, নীতিহীনতা, জীবন বিষ্ময়িতার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ প্রাচীর তৈরী করে। তাই সম্প্রতিকালের বাংলা থিয়েটারে তাঁর আগমন ও চর্চা জীবনবাদী থিয়েটারের যাত্রা পথের অনিবার্য ফলশ্রুতির পরিচায়ক।

কিন্তু ব্রেশ্ট্‌ পশ্চিমী থিয়েটারের তথাকথিত আধুনিক চর্চায় সাদা জাগানো নাট্যকার ছিলেন না বা তাঁর নাট্যরীতিও নিছক রীতিভাঙ্গার

নতুনত্বের চরক ছিল না। তাঁর নাটক ও নাট্যরীতি দু'টোই ছিল বিজ্ঞান। শিল্পও যে পুরোপুরি বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণ ধর্মী হতে পারে, ত্রেণ্ট্‌ সেটাই প্রমাণ করেছিলেন। মার্কসবাদ যেমন অংশবাক্য বা নিছক একটা আদর্শ নয়, বিজ্ঞান এবং তাকে আয়ত্ত করতে প্রয়োগ করতে হয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং সেখানে ঝাঁক ও ঝাঁকি থাকলে তা বিজ্ঞানই আনতে বাধ্য এবং এই বিজ্ঞানটিই সমাজ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যেমন ভুল সিদ্ধান্তে এনে জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে পারে তেমনই তার ফলাফল বিপরীতও হতে পারে। ত্রেণ্ট্‌র নাটক উপস্থাপনা এবং তাঁর প্রয়োগতত্ত্ব ও সঠিক বিশ্লেষণের মধ্যে আয়ত্ত ও প্রয়োগে না গেলে তা নিছক নতুনত্বের ভাগিদে বাহাদুরি সর্বস্বভার যেতে বাধ্য এবং তার ফলাফল বিপরীত ধর্মী হবেই। তাই ত্রেণ্ট্‌ চর্চা ও প্রয়োগ হতুগণনা না হয়ে বিশ্লেষণ ও মননশীল হওয়া আবশ্যিক। একজন শিল্পীর সারা জীবনের অহুশীলন ও সাধনার আহুত ফল আকস্মিক দাপাদাপির মাধ্যম না হওয়াই ভালো।

সম্প্রতি বাংলার ত্রেণ্ট্‌র 'সমাধান', 'সম্মান', 'তিনপরসার পালা', 'ভালো মাহুঘের পালা', 'মাদার ক্যারেজ', 'সেনোবাকরার রাইফেল', 'গ্যালিলিও', 'পাঁচু ও মাসী', 'ভীতু ভীমের ভাবনা', 'বিধি ও বাতিক্রম', 'আর টুহো ঈই', ইত্যাদি নাটক অনুদিত ও রূপান্তরিত কিংবা ছায়াবলয়নে রচিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। এর অনেকগুলিই বহুল অভিনীত ও জনপ্রিয়। বাংলা ভাষার মৌলিকভাবে রচিত অনেক নাটকেই ত্রেণ্ট্‌র রীতি অহুযায়ী প্রযোজিত বলে দাবি করা হয়।

কিন্তু আমার প্রশ্ন এখানেই—ত্রেণ্ট্‌র নাটকগুলি (যা অনুদিত বা রূপান্তরিত) বা বাংলা মৌলিক নাটকগুলি কি আদৌ ত্রেণ্ট্‌র ধর্ম ও রীতি অহুযায়ী সঙ্গীত? ধরা থাক যে-নাটকগুলি রূপান্তরিত হয়েছে (যেমন, তিন পরসার পালা, ভালো মাহুঘের পালা, পাঁচু ও মাসী, ভীতু ভীমের ভাবনা ইত্যাদি) সেগুলিতে কি আদৌ ত্রেণ্ট্‌র ভাবনার মৌলিকত্ব রক্ষা করা হয়েছে? আমরা জানি কোন ভাষার সাহিত্য সঠিকভাবে অনুদিত অবস্থায় পরিবেশিত না হয়ে তা বাঙালী জল-বাটি মাহুঘের রূপে রূপান্তরিত হলে তার শ্রম (labour) ও ঘটনাক্রমের সাহুজ্য বা বিকাশ বাহ্যত এবং অবাস্তব হওয়ার আশংকা থাকে। এবং তা অনেকটা শিব গড়তে বানরও হতে পারে। পশ্চিমী জীবনধারার সাথে আমাদের জীবনধারার মিলও যেমন আছে, অমিলও

বহু আছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থাকে চট করে যেমন উড়িয়ে দেয়া যায় না তেমনই জোখ করে সাহুজ্যও করে তোলা যায় না। এক দেশের জীবনধারণ সাধে অন্যদেশের জীবনধারণ মানবিক উপাধানের মিল থাকলেও তার প্রকাশভঙ্গী অর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক 'ভালো সাহুকের পালা'র ভালো সাহুক যেহেতু। তার জীবনধারণ যত সৎ উপাধান তা বাঙালি মানসিকতার সাধে মিলতে পারে কিন্তু বাঙালি জীবনে ফুলের দোকান থেকে ফুক করে কলের মালিক হওয়ার পরিক্রমাগুলি এবং সততা যাচাইয়ের স্তরগুলি আমাদের চোখে অবাস্তব ঠেকে। আবার 'পাঁচু ও মালী'র মধ্য দিয়ে যে ঋতু ভঙ্গুর অবক্ষয়ী সমাজের ক্রোধান্ত চেহারা তুলে ধরে খনতাত্ত্বিক কাঠামোকে সজোরে নাড়া দেবার চেষ্টা হয়েছে তা বাঙালীমানুষ পোষাকে ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। কেননা জার্মান শটফ্রমিকার ঐ বিবরণটা বহুল আলোচিত এবং সমস্ত সম্পর্কে তৎকালীন জনগণ যথেষ্ট অধ্যস্ত এবং সেই কারণে তার একটা বাস্তব মূল্যও আছে কিন্তু বাঙালী পরিবেশের সমস্ত কিংবা বাস্তবতা থাকলেও অভ্যস্ততার অভাবে তা ঋতুকটু অশ্লীল হওয়াই স্বাভাবিক যদিও ব্রেশ্টের ঐ নাটক অশ্লীল বলে বিদেশে কখনও অভিব্যক্ত হয়নি। 'তিন পরসার পালা'তে ব্রেশ্ট শুধু কিছু চরিত্র নিয়ে মজা করেন নি, পরিচরিত: তিনি সমাজের দু'টি অংশের মধ্য দিয়ে শ্রেণীবোধ, শোষণ সংগ্রাম এবং বুদ্ধোন্নতত ভড়ং ও মোড়কের বিকক্ষে আঘাত হানতে চেয়েছেন। কিন্তু শ্রেণীবোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম অবলুপ্ত চলে আর যাই হোক তাতে ব্রেশ্টের চিন্তা ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। 'ভীতু ভীমের ভাবনা' ব্রেশ্টের নামে এক আশ্চর্য্য প্রভাবণ। 'সাহাব ক্যারেজের' কোন মূর্ত্ত বা ভাবধারণা এত প্রতিফলিত হয়েছে জানি না। কিন্তু ভীমের আখ্যানের মধ্য দিয়ে যে আখ্যানগুলি তুলে ধরা হয়েছে তাতে ইতিহাসের গতিপ্রবাহের কোন শ্রেণী বিশ্লেষণ নেই বরং আখ্যানভাগ এমনভাবে তৈরী হয়েছে যাতে চলতি সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহই জাগতে পারে, অথচ ব্রেশ্ট দুনিয়াটা পাল্টে দিতে চেয়েছেন শিল্পের মাধ্যমে। পুরাতন ও চলতি সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ভাঁড়ো ভাঁড়ো করে দিয়ে শ্রেণীবিহীন, শোষণহীন সমাজ গড়তে চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর নিজের যেমন কোন বিশ্বাস ছিল না তেমনি তার শিল্প কর্মেও কোন দুর্বলতা ছিল না।

পূর্বেই বলেছি ব্রেশ্ট, যে জীবন দর্শনকে আয়ত্ত্ব করে শিল্প কর্মে নিযুক্ত

হয়েছিলেন তাকে যথাযথ আয়ত্ত ও অহুসীলন না করলে বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য। তাছাড়া রূপান্তরিত নাটকে কতগুলি সমস্যা থেকেই যায়। দেশ-জল ঘাটী-জীবন-সমস্যা'র রূপান্তরে বাস্তবতা আনতে রচনা প্রয়োজনার কিছু কিছু স্বাধীনতা নেয়া হয়ে থাকে এবং এই স্বাধীনতা কখনও আকাজিক বস্তুর বদলে অন্য-কাজিত বস্তু এনে ফেলে আর তাতে শিব গড়তে বাদ্যের তর থেকেই যায়।

ঠিক এই ধরনের অভিযোগ অনুদিত নাটক অর্থাৎ 'আর টুহো ঈই', 'সমাধান', 'সম্মান', 'মে দিগস', 'সেনোদাকতার রাইফেল', 'গ্যালিলিও', 'বিধি ও ব্যতিক্রম' বা 'কাকশিয়ান চক সার্কেল' সম্পর্কে করা যায় না। কেননা এসব নাটকে মূলকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু ব্রেশ্ট্ চর্চার আর একটি বিপদ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। মৌলিক কিছু বাংলা নাটক এবং প্রযোজনা নিয়ে। সে যেমন নিজের ইচ্ছে মত উদ্ভট, আজগুবি রীতি সবকিছুই ব্রেশ্টের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। নাটকে সূত্রধার, কিংবা গায়ক, কবিতা বলা ইত্যাদি ব্যাপার আখছার ঘটছে এবং সব কিছুই ব্রেশ্টের দোহাই দিয়ে ঘটছে।

নাটকে সূত্রধার, ভাষ্যকার, গান, কবিতা বলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্রেশ্ট্ নাটকে নতুন আনেন নি। পুরনো গ্রীক, এমনকি ভারতীয় নাটকে এবং উনিশ শতকের বহু নাটকে এসব জিনিষ ভুরি ভুরি ব্যবহার করেছিলেন একটা বিশেষ রীতি ও উপস্থাপনার দৃষ্টিকোণ নিয়ে। যেমন অতীতের ভারতীয় নাটকে সূত্রধার, চারণ বা নান্দী থাকত; তারা দৃশ্যের পারস্পর্য রক্ষা করতে কখনও নাটকের মূল সূত্রের পুর্বাঙ্কে ইঙ্গিত দিত। কিন্তু ব্রেশ্ট্ সূত্রধারকে ব্যবহার করলেন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে। তাঁর গ্রন্থনা রীতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং হুক্তির মধ্য দিয়ে সেতো উপনীত হওয়া। তাই সূত্রধার ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, চরিত্রেরা কখনও গায়ক হয়ে অবস্থা, প্রতিক্রিয়া বা সমস্যার ব্যাখ্যা করে গানের মধ্য দিয়ে বা কবিতার মধ্য দিয়ে। দর্শক বা পাঠককে বাস্তব থেকে কল্পনা লোকে নিয়ে যায় কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে এনে হাজির করে আরও বাস্তবে অর্থাৎ বিয়েটারের বাইরে তার জীবন গভীর মধ্যে। বিয়েটারের বিষয়ের সাথে তার জীবনের অবস্থার তুলনামূলক বিচার করার। একেই তিনি Alienation Effect বলেছেন। ঠিক এই ব্যাপারগুলি তাত্ত্বিকভাবে অস্বাভাবিক করার ব্যাপার আছে এবং সেটা না ঘটলে ব্রেশ্ট্ ভক্ত হতে চাইলেই সেটা স্থলভ হওয়া সম্ভব নয়।

ড্রেপ্ট-অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে মৌলিক নাটক লিখছেন তাঁরা। ড্রেপ্টের এই মূল বিষয়টি হয় অবজ্ঞা করেন না হয় সম্মুখে এড়িয়ে যান। কিন্তু কল যা বেয়ের ডা অ-নাটকীয়, নিয়ন্ত্রিত এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁর প্রয়োগরীতির বিকৃতি ও অজ্ঞানতাও দর্শকমনকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় ড্রেপ্টের নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তরিত প্রযোজনা সম্পর্কেও এই অগ্রিয় কথাটি বলতে হয়।

ড্রেপ্ট, Illusion এর পুরো পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর মত ছিল Illusion মানুষকে স্তম্ভিত ও বিচারবুদ্ধিহীন করে তোলে এবং Illusion এর Effect কোনক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক এবং কখনও তা বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচার করায় না। যেমন, Emotion তাঁর ধর্ম অনুযায়ী মানুষকে উত্তেজিত করে, হাস্য-কাঁদায়, অহুত্বকে তীব্রভাবে নাড়া দেয় কিন্তু বুদ্ধির জগতকে আঘাত করে না। ড্রেপ্ট, এই বুদ্ধির জগতকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, বুদ্ধি দিয়ে ঘটনা বা ঘটনার রসকে পাশা-পাশি অনুভব ও বিচার করলে তার ফলে হৃদয় প্রসারী অর্থাৎ নাটকের বাইরের স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তিনি Emotion বিরোধী। অনেকে এই কথা বোঝাতে চান, কিন্তু ধারণাটা ভ্রান্ত। অনাবশ্যক Emotion-কে তিনি বর্জন করতে বলেছেন কিন্তু চরিত্র বা ঘটনা বিকাসে চিত্রবুদ্ধিকে সামনে রেখে Emotion-কে গ্রহণ করেছেন। ঠিক এই পদ্ধতিতেই অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ সাজ সজ্জা, আলো বা মঞ্চ প্রকরণকে তিনি বর্জন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল, আড়ম্বর চোখ ও বুদ্ধি ধাঁধিয়ে দেয় এবং নাট্য সংঘাতে দর্শক চিত্তকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি আকস্মিক নাটকীয়তা (theatrical trick) বা চমক পুরোপুরি বর্জন করতেন কেননা এই ছোটো ব্যাপারই বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া না দিয়ে দর্শককে স্তম্ভিত করে দেয় এবং আকস্মিক ফলাফল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ড্রেপ্টের নাট্যগ্রন্থনারীতি ছিল বর্ণনাত্মক। বর্ণনার মতোই তিনি গল্প সাজাতেন, চরিত্র ও নাট্য সংঘাত সৃষ্টি করতেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যেন অনিবার্য গতিতে টেনে নিয়ে যেতেন। এই বর্ণনার চক্রকে অনেকটা মহাত্মারত্নের সাথে তুলনা করা যায়। মহাত্মারত্নের কর্মকাণ্ড ঘটে যাবার পর তা চক্রেব বলছেন জমেশ্বরকে। যেমনটি ঘটেছিল তাঁর বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে প্রবেশ করলে সেটা যে বর্ণনা সেটা অচিরেই আসবে। ভুলে যাই। ড্রেপ্টের নাট্যগ্রন্থনার মূল সর্ভ অনেকটা

এই বকরই কিন্তু তিনি বর্ণনার ব্যাখ্যা দিতেই বিজ্ঞানী মনোভরীতে । পুরনো বা তিনদেশী ঘটনাকেও সম-সাময়িকতার সূত্রে ব্যাখ্যা দিতেই নাটকের পাশাপাশি । তাঁর নাটকের গানগুলিও ঘটনার বর্ণনা কিন্তু তা যেন জীবন্ত সংলাপের মত । ছত্রে ছত্রে গীতিময়তার মুহূর্ত না কিন্তু গীতিনাট্য নয় । চরিত্রের অভিরাসিক, চালচলন ছন্দোবদ্ধ, তাৎপর্যময়, নৃত্যের বদলে পূর্ণ কিন্তু অপেরা বা নৃত্যনাট্য নয় । এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য । চরিত্রকে তিনি গোপন করতেন না তথাকথিত নাটকীয়তার জগৎ, দর্শক সম্মুখে উপস্থিত রাখতেন । মূল বিষয়ের অভিনেতার আলোর বৃত্তে, মঞ্চ সজ্জার ইজিতে নাট্যবস্ত্র অভিনয় করেন কিন্তু যে মুহূর্তে নাট্যবস্ত্রকে দর্শক চিত্তের মোহাচ্ছন্নতা থেকে সরিয়ে বুদ্ধির ধরজায় এনে ফেলা প্রয়োজন, সেই মুহূর্তে অভিনেতা আলোর বৃত্ত থেকে তার পাশের আবছায়া অঙ্ককায়ে সরে যান—দর্শককে যেন একটা ধাক্কা দেন—‘তুমি যা দেখছিলেন তা বিচার কর’ । তাই তাঁর নাট্য গ্রন্থনার সাথে বিশেষ অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চ-সজ্জা ও আলোক ও ধ্বনি প্রয়োগরীতি একটি অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য সূত্রে আবদ্ধ । ত্রেণ্টীয় রীতির এগুলো প্রাথমিক সূত্র । আর সেই সূত্রের ভিত্তি হচ্ছে দৃশ্যমূলক বস্তুবাদ । ঘটনা, বিষয় এবং তার নিকাশ, প্রয়োগ ও রীতিকে তিনি ঠিক নেতি এবং ইতিবাচক দু’টো কার্যের সংঘর্ষণে একটি গুণগত মৌলিক Effect এর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন ।

ত্রেণ্ট-চর্চার প্রয়োগ-পদ্ধতির অহুসরণে, আহরণে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যিক । দুঃখের বিষয় বহুল অভিনীত ত্রেণ্টীয় বাংলা প্রযোজনাকালিতে এই বিজ্ঞান অহুপস্থিত । কিন্তু তাঁর নাম জড়িয়ে খ্যাতনামা প্রযোজকরা স্ব-কপোলকল্পিত প্রযোজনায় ধরণকে জনমানুষের সামনে হুলে ধরে, ত্রেণ্ট সম্পর্কে একটি গোলাকর্ধাধা তৈরি করে দিচ্ছেন । আশা করি এই বিভ্রান্তি দূর হয়ে ত্রেণ্টকে ত্রেণ্ট হিসাবে তুলে ধরার সংমানসিকতা আমাদের মধ্যে দেখা দেবে ।

‘চেতনিক’ আগামী সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

প্রবন্ধ : শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন—নারায়ণ চৌধুরী

প্রবন্ধ : ডঃ সুধীর করণ

গল্প : বার্নিক রায়

ভট্টমাটির টেরাকোটা-টেম্পল/মনীষিমোহন রায়

মুর্শিদাবাদে এখন ট্যারিটকুলের পৌষমান। বেশময় বিল অথবা খিল জুড়ে যেমন নানাবর্ণের ট্যারিটপাখি আর হংসকুল এসে তাদের শোভায় সাজানো সলিল-সংসার বিহিরে বসে মুর্শিদাবাদের হাজারছুরাটিকে কেন্দ্র করে যেমন এইসময় নানানজাতের ধারাবাহিক ট্যারিটবৃন্দ এসে জমতে থাকেন। ইদানীং অবশ্য বছরের অন্ত্যস্ত সময়ও কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন (অবশ্যই নিঃসঙ্গ নন) ভ্রমণকারী যে এখানে আসেন না এমন নয়, তবে পৌষমাসেই সম্ভবত তাঁর মূলপ্রবাহ সাগরসৈকতের অবিচ্যম তরঙ্গের মতো মুহূর্তে আছড়ে পড়ে। চট্টল-চলল হুবক-হুবতী কিংবা তরতাজা ছাড়াছাড়ী থেকে শুক করে শুকগজীর প্রবীণ অমূল্যদ্বানী পর্যন্ত সকলেই আসেন এখানে। অজানা অচেনা মাহুষের প্রোফাইলে ভরে যায় চারদিক। হুখী হুখী সৌধিন পোষাকে সজ্জিত হুবক হুবতীরা ইতিউত্তি চলাফেরা করে; কখনো মুহূ কখনো তীব্র উচ্চনাদ তোলে—অসংখ্য যানবাহনের ধ্বনিতরঙ্গ মুখর করে তোলে দশদিক হাজারজা মুর্শিদাবাদ শহর সরগরম হয়ে ওঠে তখন।

তবে পরিচাপের কথা, প্রচারের অভাব অনাধীনতার ট্যারিটকুলের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় এমন অনেক কিছু—প্রসাদগুণে যাব তুলনা মেলে না। এমন কি হামেশাই গিণ্টিকরা নকলসোনা অকৃত্রিম কাকনমুলো বিকোর বাজারে।

রাণীভবানী এক মহিষসী নারী অথবা রাণীর নাম। তাঁর মন্দিরময় বড়নগর—যার মন্দিরে মন্দিরে টেম্পল-টেবাকোটার অমলিন শিল্পাধুরী বাংলায় স্থাপত্যশিল্পে গিরিশৃঙ্গের গরিমা নিয়ে বিরাট করছে; মরুমুখী ট্যারিটকুলের এক অজুলিমের ভগ্নাংশ কাচং কখনো সেখানে এসে পৌঁছয়। তবে সাধুনা এইটুকু যে বাংলার মন্দিরময় বড়নগরের কথা এখানে কোনো কোনো ভ্রমণকারীর কানে হিতকৃত্যবার মতো ছুঁবে না। কিন্তু মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের অপর পারে রাও চার পাঁচ মাইলের মধ্যেই যে মুর্শিদাবাদের কোনারক-সরশ একটি অনন্তসাধারণ টেরাকোটা-টেম্পল এখানে মাথা উঠু করে অন্যদিকে অবহেলার দীর অভিস্রবকে কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে, তার খবর প্রায় কেউ জানেন না। প্রচার আর পরিচর্যার কোলিতে পুন্সবিলাসীদের

বাধানে কস্মস-জিনিয়ার বড়ই কদর, কিন্তু লাক্ষ্মীক বর্নমলিকা তার চমকবিহীন রূপের পশরা নিয়ে অকালে অঝোরে অহরহই শুধু করে যায়।

ভট্টমাটি বা ভট্টবাটির ওই পরিত্যক্ত এবং বিবিক্ত পোড়ামাটির কাককাজ-কুশলতার সম্পন্ন অসামান্য ছোট্ট মন্দিরটির সঙ্গে লম্বাচওড়া কোনো রাজাবাদশার স্থিতি বিজড়িত নয়। ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায় তাতে কোনো যথার্থ অনু-সন্ধানীয়ই মনের অবিস্তা কাটবে না। তবে আমি বুঝি না, সঠিক ইতিহাস না জানলেও আপনার-আমার মন্দিরটির শিল্পমতিকে অস্তর দ্বিগে অনুভব করতে বাধাটা কোথায়? আমরা তো অনায়াসেই সেইসব নাম-না-জানা শিল্পীবৃন্দেও উদ্দেশ্যে আমাদের অস্তরের উজ্জলতম অভিধান উৎসর্গ করতে পারি।

মৃতশিল্পের কারিগরীতে পশ্চিমবাংলার একচ্ছত্র অধিকার। কেটনগর-কুমোবটুলির কথা ছেড়ে দিলেও খোদ মহরমপুর শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ-গুলিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে ধরণের নিপুণ-নিপুণ মাটির প্রতিমা-বাজির দর্শন মেলে, প্রকৃতপক্ষেই ভূ-ভারতে তার তুলনা নেই। এই মৃতশিল্পের মতোই টেরাকোটা অর্থাৎ মন্দির গায়ে পোড়ামাটির সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম অলংকরণ পশ্চিমবাংলার মৌলিক শিল্প-অবদান। যার পীঠস্থান হ'ল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। প্রত্যক্ষ বা প্রচুরভাবে বাঁকুড়ার সেই কুশলী শিল্পকূলই মূলত পশ্চিমবাংলার তাবৎ টেরাকোটা টেম্পলের অল্পমাত্র স্রষ্টা।

ভট্টমাটির এই অল্পমাত্র মন্দিরের সমীপবর্তী, ততো তলে প্রথমে আপনাকে লালবাগ মহকুমা-শাসকের অফিসসংলগ্ন ঘাটে এসে পৌঁছতে হবে। ফেরীঘাটে পার হয়ে যান ভাগীরথী। ঘাট এবং ঘাটের চারপাশের ভূবনমোহিনী শোভা আপনাকে কিছুকণ বিমোহিত করে রাখবে। তারপর সিধে পশ্চিমমুখে নবগ্রাম-গামী পীঠবাধানো পথ ধরে এগুতে থাকুন, তিনচার মাইল সাইকেল অথবা রিক্সা-যোগে। বাস পাবেন না, কেননা অসাধারণ অনিয়মিত। বরং এই ক্ষীণের গ্রহণে কোনো উৎসাহী সঙ্গী পেলে এটুকু পথ আপনি হেঁটেই 'মেরে দিতে পাবেন পথপ্রান্তরের মাহুভজনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে - বেশ আতিথানিক মেজাজ নিয়ে। আর তাছাড়া আপনার আমার জন্ত তো আর নয় - আলম-মহরম ভ্রমণট্রমণ। তাই ছুপাশের ভূ-প্রকৃতি, গাছ-গাছালি পথ করতে করতে এগিয়ে চলুন।

চান্নিহিকে চারিপাশে এখন ককসকে কমলালেবু রঙা রোদ্দুর। সূর্যীতল সমীপে আপনার স্নায়ুতে জানের শক্তি নিয়ে আসবে। এক অচেনা মাদুরী

শূন্যে ভরপুর আপনাব মন । সকল কর্মে সকল মননে ক্রিয়া করছে ইতিহাস-
চেতনা, প্রকৃতিপ্রণয়, রোমান্স-রোমাঞ্চ—আরও কত..... কত যে কি ! দুমাল
আগে শরতে এলে দেখতেই ইতিউত্তি কাশের কুহ ।

কিছুদিন পর শুরু হবে আকাশে আকাশে শিশুল আর কাকনের অপ্রতিহত
হুল্ললবন্দী । বসন্তবাতাসে ভেসে বেড়াবে আমের মুকুলের অবস করা সুগন্ধ ।

এখন ধানকাটা হয়ে গেছে । রাজ্যমাটির বুক জুড়ে শান্ততা—মানচিত্রের
মতো জটিলস্থল সপিল রেখা আঁকা । তবু, আপনি তো শহরে মাতৃব—তাই
অব্যবহৃত আকাশের নীচে, উদ্যোগ করে যাওয়া পথপ্রাস্তরের মধ্যাখ্যানে কখনো
কখনো আপনাব মনে হবেন অবিরল বৃক্ষরাজির অমলিন পত্রপুঞ্জ ঘন ঘন যেন অতীত
আবেগে পথের দুপাশে স্থির জোয়ারে লুটোপুটি খাচ্ছে । আরো এগোন দেখ-
বেন, পথের ধারের জলাশয়ে আপনমনে ফুটে আছে টকটকে লাল শীতের শালুক ।
একটু দূরে কিনারে কিনারে কম্বলতার নক্সাকাটা পুঙ্খবিলীর্ণ স্বচ্ছসলিলে পান-
কৌড়ি ডুব দিচ্ছে, ভেসে উঠছে—উড়ে বসছে গাছের শিখরে ।

পশ্চিমদে কিছু কিছু আশের ক্ষেত্রে আপনাব নজর পড়বে । দেখবেন,
তড়িঘড়ি করে এলোপাখাড়িভাবে ছ'চারখানা আবার ভেঙ্গে বসবেন না ! বরং
গরুরগাড়ি বোঝাই আখ, ওই যে চলেছে আপনাব চোখের উপর দিয়ে, ওই
গাড়ির চালকের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে নিন । দেখবেন, মাতৃসন্তান গরুর-
গাড়ির চালক হলেও নিতান্তই একেবারে গোমড়া মুখো গাড়েয়ান নয় !

এভাবেই হেসে খেলে, আচ্ছা, কাটিয়ে দেওয়া যেতো যদি দ্বিবিদিকহীন
করেকমাল !.....

তবে লালবাগের অফিসঘাট থেকে এষ্ট পীচবীধানো পথ ধরে মাইল তিনেক
আসবার পর দক্ষিণমুখো একটা মেঠো পথ ধরে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে
কমনশি আরো এক কিলোমিটার পথ ।.....

তারপর ওট দেপুন, নীল দিগন্তে ফুলের আগুন । সর্বেক্ষেত নাকি পুষ্প-
ক্ষেতের মাঝখানে ওই দাঁড়িয়ে আছে ভট্টমাটির টেরাকোটা টেম্পল । গঠন
ভঙ্গিমায় ঋজু—সুস্বভা আর সৌকুমার্য তায় অজের ভূষণ । পঞ্চরথ পাটার্ণে
তৈরী, পঞ্চদৃষ্টা সমন্বিত এষ্ট নিঃসঙ্গ শিবমন্দির । উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম—
চারদিকে চারিপাশের মন্দিরগায়ে পুরাণ ইতিহাস এবং স্থানিগুণ মিশ্রণ-মুতি
থেকে শুরু করে সমকালীন জীবন প্রবাহের এক বহুকোণ-মাত্রিমিত্ত সজীব-

শোভন শোভাযাত্রা । বড়নগরে আপনি স্বাক্ষরকারী-প্রতিষ্ঠিত একাধিক অনন্ত-
সাধারণ টেরাকোট-টম্পল দেখতে পাবেন – কিন্তু একটিমাত্র মন্দিরের একই
অঙ্গে একরূপ আপনি অনন্ত কোথাও খুঁজে পাবেন বলে মনে হয়না ।

ঐতিহাস যেটুকু পাওয়া গেছে, তা হ'ল মোটামুটি এইরকম : বর্ণনারায়ণ
রায় ছিলেন মুণিদকুলী খাঁর অধীনে একজন পদস্থ কর্মচারী । কানুনগো বর্ণ-
নারায়ণের সহযোগী কানুনগো জয়নারায়ণ রায় কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এই
ভট্টমাটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন । তখন পর্য্যন্ত গ্রামটির অল্প কোনো নাম ছিল
নিচয়ট । যেহেতু উক্ত ব্রাহ্মণকুলের উপাধি ছিল ভট্টাচার্য্য, সেহেতু ওই অঞ্চল
বা গ্রামটি পরবর্তীকালে ভট্টমাটি বা ভট্টবাটি বলে পরিচিত হয় । অত্য়মান কথা
অসঙ্গত হবে না যে উক্ত ব্রাহ্মণকুলের কোনো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি
মন্দিরটি, নির্মানকার্য্য সমাধা করেন । তারপর কালস্রোতে মহামারী জাতীর
কোন বিপর্য্যে গ্রামটি ক্রমে পরিত্যক্ত হয় । বর্তমানে শুই মোজার কোনো
ব্রাহ্মণের বাসস্থান নেই এবং মন্দির ও সংলগ্ন জমির অধিকারীসহ গ্রামবাসীরা
সকলেই মুসলমান ।

পরের ঐতিহাস পথের ধারের থানাখন্দ আর মাটির গভীরে মাটি হয়ে
আছে । ঐতিহ্যের অচলায়তন আঁকড়ে ধরে তার অনড় অচ্যুতরূপ নিব্বদীয়
নিচয়ট, কিন্তু ঐতিহ্যের শিকড় থেকে রসগ্রহণ করে তার ঐতিহাসিক নিদর্শন-
সমপ্তির সজজননীল সংরক্ষণ থেকে নিচুত হওয়া নিঃসন্দেহে কিছু কম নিব্বদীয় নয় ।
পুরাকীর্তি এবং মৃত্তিকলা নিয়ে অনেকটাই অনেক সময় বহু অশ্রক্ষেপ করেন ।
কিন্তু শ্রমশ্রাস্থ্য কোনো নিঃসঙ্গ অশ্রমোচনের অক্ষুণ্ণহত্যা এই সংরক্ষণকার্য্যের
উদগতিসাধন কোনমতেই সম্ভব নয় ।

সানিকভাবে পরিত্যক্ত প্রচার এবং পরিচর্যাবিহীন ভট্টমাটির এই টেরাকোট
টম্পল এখন ক্রমে এক অনিবার্য্য অবক্ষয়ের চরমসীমায় পৌঁছে যাচ্ছে । জংলা
গাছ এবং আশ্রয়বিহীন মালিন্যের স্দয়বিদায়ক শিকড়ে পরিক্রিষ্ট এর সূক্ষ্মতা আর
শৌক্যমাধুর্য্যের অমল মতিমা । *

* সম্পাদকীয় সংযোজন :—

আলোচিত মন্দিরটি, প্রায় বছর পনেরো আগে আমার দেখার স্বযোগ
হয় । সে-সময় মন্দিরটি ছিল অসল পরিবেষ্টিত । অনেক সন্তর্পনে কাঁটা
গাছের আশ্রয়ে এড়িয়ে মন্দিরের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তার দেয়ালে

পোড়ামাটির যে অপরূপ শিল্পকলায় নিদর্শন দেখলাম তাতে বিশ্বাসে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। মনে পড়ছে তখন ভেতরে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ দেখেছিলাম। মন্দিরটি সম্পর্কে পরে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। শুধু এটুকু খবর সংগ্রহ করেছিলাম, যে শিবলিঙ্গটির নাম 'রত্নেশ্বর'। এবং 'সম্ভবতঃ নবাবদেহও পূর্ববর্তী ভট্টবাটীর' কোনো 'রাজা এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন'। জানিনা এই রাজা 'ভট্টবাটীর কাছনগো'-বংশের অথবা ডাহাপাড়ার 'বংগাধিকারীদেব' কেউ কিনা। অথবা তাঁদেরও পূর্ববর্তী রাজা শশাংক কিনা। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। স্মর্তব্য যে স্থপতিশিল্পের যা চিরচরিত মাধ্যম সেই পাথরের চিরকালই অভাব সমতলভূমিপ্রধান বাংলার। আর সেটাজুড়েই বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীরা মাধ্যম হিসেবে পোড়ামাটির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই, যদিও এই পোড়ামাটির শিল্পচর্চা সাফল্যের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করে মধ্যযুগে। যাট চোক, বছর দেড়েক আগে আমি শুনেছি পাট যে শুই মন্দিরের শিবলিঙ্গটি আর মন্দিরে নেই। মুশিলাবাদ শহরস্থ জৈনক জমিদার তাঁর প্রায় গৃহসংলগ্ন নতুন মন্দিরে বেশ কয়েক বছর আগে সেটি নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। উক্ত অধুনা স্বর্গত জমিদারের দুই পুত্রের সংগে আলোচনার ফলে সম্প্রতি জানতে পারলাম যে তাঁদের মন্দিরে দণবায়ো বছর আগে নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং শিবলিঙ্গটির এখানে নামকরণ করা হয়েছে 'পরশীশ্বর' ব'লে। তখন তাঁরা ব'লেতে পারলেন না এটি 'ভট্টবাটী' থেকেই আনা হ'য়েছিল কিনা। সে যাট চোক, আমরা প্রস্তাব করছি মূল রচনা বর্ণিত 'রত্নেশ্বর' নামক মন্দিরটি তাৎসরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে অধিগ্রহণ ক'রে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ওপর অগ্রসন্ধান ও গবেষণা চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করুন। অসুখার মুশিলাবাদ জেলার টেরাকোটা শিল্পের সম্ভবতঃ এট দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নিদর্শনটি (অশ্রুটি বড়নগরে) অচিরে প্রকৃতি ও অবিবেচক ম'তুষের আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।

—)•(—

ছন্দ-চক্র

হীরামাল দাশগুপ্ত

আবার ছায়ার মিছিল খেমে যায় ।
অন্ধকার ছবিগুলো বোবার কণার মতো
নিগূঢ় ঈর্ষিতে নীল অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে ওঠে ।
টালির টিনের আর খোলার চালের ফাটা দিয়ে
ছায়াদের মুখে বুকে মৃত্যুর শব্দ পড়ে এক দুই তিন
চুয়ে চুয়ে কব কব শব্দ পড়ে টস্ টস্ কোরে
সারা রাত সারা রাত সারা রাত ধোরে ।

শহরের আঁশ দেহ নেশা-নগ্ন রূপসী-নিভ্রায়
অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নের ক্রিমি ক্লিন্ন বিভীষিকা দেখে
ক্ষুব্ধিত তির্যক হোয়ে যায় ।
লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ কোঁতুকে সময় হাসে
ধারালো ক্ষুরের হাসি দাঁত বের কোরে
সারা রাত সারা রাত সারা রাত ধোরে ।

আবার মিছিল শুরু হয় ! ছায়াব মিছিল !
শাদা মালা ঈগলের অতিকায় পাখার কাপটে
ধুলো হোয়ে উড়ে যায় অমৃতের পুত্রদের হলুদ পিপাসা
আর, পোকা-কাটা ফস্‌ফুসের ফাকাশে নিখাস ।
দুই বেলা দুই গ্রাস পচা গন্ধ মৃত্যু দিতে অলস জঠরে
মাক্তবরা নিজেদের দলে দলে সংখ্যায় ভাগ ভাগ কোরে
সারা দিন সারা দিন সারা দিন ধোরে ।

আবার মিছিল খেমে যায় ।
বিসপিল অন্ধকার হুড়কের মুখে
আবার রাত্রি তোলে ফণা ।
আবার আশ্রয় ঘরে

স্বনীকৃত সময়ের গন্ধি-বাঁটা খাটের তলায়
 ইহুদের অন্ধকার বেকালের অন্ধকারে সাধা ঠুকে বয়ে ।
 টেবিলের খোলা খাতা কবিতার অন্ধরে অন্ধরে
 কাটা ছাদ চুরে চুরে কব কব হুত্বা পড়ে টস্ টস্ কোরে
 সাধা রাত সাধা রাত সাধা রাত ধোয়ে !

স্নান মাঘ-সন্ধ্যার কুয়াসা থেকে
 বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিতাকে ভালবেসে
 গান ভালবেসে
 শব্দের জগতে তুমি, শব্দের জগতে
 তুমি আর মহাশ্বেতা, ভুবনমোহিনী
 কোমলতা
 কখনো বা উদাস্ত গভীর, কখনো বা
 করুণার মানবিক
 শিরের সমস্ত রাত
 স্নান মাঘ সন্ধ্যার কুয়াসা থেকে জেগে-ওঠা
 নবজন্মে, পবিত্র শপথে,
 তাঁর আশীর্বাদ ।

কালো মক্কা

মূল কবিতা : ল্যাংষ্টন টিউজ (১৯০২-১৯৬৭)

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কী-হর স্বগিত শব্দের দশা

তার দশা বুঝি কড়া বোদ্দুবে

গুহবানো আধতকানো আঙুর ?

নাকি বঙ্গ-বঙ্গে পু'জের পাঞ্জি
 জালিয়ে উড়াও ?
 চাৰপাশে স্থিতি চিনিব বহু
 অকথা সববডের মিটি ?
 সে কি স্বীতিমতো বোকাব মতন
 সৈথিয়েই যায় !
 নাকি তার শেষ দিখিবারণ !

মুনোরি সুধীর নন্দী

পথ চলতি
 হঠাৎ দেখি ক'টা পাহাড়
 কাঁধে কাঁধে মাথা দিয়ে
 দুপুর বেলা যুসোচ্ছে ;
 শীত পড়েছে
 ভিজে বোদ্ধুয়ে
 আর পাতাকরা গাছের আগার ;
 কাকেরা উড়ে বেড়াচ্ছে
 যা নেই মুখে ;
 সব কেমন যেন নিঃশ্বাস, নিস্তক ।
 শীতের হিমেল হাওয়া
 বরফ গলা জলে স্নান সেরে
 মুনোরি পাহাড়ে উঠে এলো ;
 বোদ্ধুয় পোয়াকে ওয়া
 স্থির আয়েজ ভরপুর ।
 নীচের ড়ান ভালি
 আশ্চর্য্য নিধর,
 পাখিরাও কেমন যেন মৌজী হ'য়ে গেছে ।

শীতের কাপন সেই কোহল লড়াই,
 বং বেরঙের পাভা বাহার,
 ফুল-কোটাঃনোর আড়খর নাই বা বইল ;
 বর্ণাঢ্য পঙ্কজের
 সে কী লম্বারোহ !
 আকাশ গাঢ় নীল ;
 লাল-কালো-সবুজ পীতবর্ডা
 প্রকৃতির জঠরে শিশু হ'য়ে
 তলিয়ে গেলেম
 এক অভ্যাস তবিস্রাব মথো ;
 একটু একটু ক'রে নেমে চলেছি
 নানান রঙের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
 সোমনামবুলিষ্টের মত
 সেই বিন্দুত অতীতের স্থখ-স্মৃতিতে—
 আমি পাহাড় ছিলেম,
 মাটি ছিলেম,
 গাছ হ'য়ে আলোর পানে চেয়েছিলেম
 উষ্ম হ'য়ে ,
 সেই দিনটিকে আজ কিরে পেলেম ,
 সুসৌরি পাহাড়
 তুমি, আমি অভেদাত্মা ।

ছিল, আজ নেই
 কবিরুল ইসলাম

একদা আমার স্বপ্ন ছিল, আজ নেই
 স্বপ্নহীন কেউ বেঁচে বর্তে আছে ভাবতে পারো ?

এই কবোটিরও ছিলো জিত—
 গাইতো গান একদা মধুর
 আজ নেই ।

আর পড়ে আছে হু হু পৌড়ো কান্না
 লব্ধ বিপ্লব নেই
 স্বপ্নশব্দে অমাগে উদ্ধার নেই
 নেই মাঝে লেশের আড়াল
 স্মৃতির অজারে নেই কোনো সুখ ।
 একটা আমাবণ্ড স্বপ্ন ছিলো ।

রাজা রামমোহন
 শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ব্রিটলে মাঝা যাননি, মাঝা গেছেন নিজের দেশেই
 কেন না আমরা আর রাজা-টাজা বুঝি না মোটেই
 তিনি ত বণ-পারে চড়ে হাজার মাইল এগিয়ে গেছেন
 করেকশো বছর তাঁর হাতের ভেতর ধুলিঘুটি
 আমরা একদিন না যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ছি
 পুকুরে বাথটনে চড়ে ভাবছি ভালছি অকুল পাথারে
 তেলেজলে আঁরা আমরা মরণ চপুষগুলি

ছিপ চাতে নদীজলে দিজি বিসর্জন... ...

আর রাজা—যে আমার চোখ ধুলে পূর্ণিমা চেনালো
 যে আমার ভূতপ্রেত ষাড় থেকে নামালো সেদিন
 তাকে আমি ভুলেই গিয়েছি
 কেন না তেমন-তেমন রাজকথা শুনি না এখন
 কেন না এখন আমরা লিলিপুট হ'রে শুধু এ গুকে থাকাই মারছি
 রামমোহন, তোমার বণ-পা যদি হ'ত চাবুক এখন
 তাহলে নিশ্চয় আমরা বহুক্ষণ আগতে পারতাম ।

কেন লিখি নিজেই জানিনা
 অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

এখনো কবিতা লিখি কেন লিখি নিজেই জানিনা,
 ঘেহেতু স্বর্ঘ ওঠে, ফুল কোটে, পাখি গান গায়,

কিংবা পানকী করে চলে, তবু তবু চেউ-এর মাঝায়,
তাই কি কবিতা লিখি, বুঝকে বাধ্যতে চাই বীণা ?

স্মৃতিকে ভাঙাল করি বায়ে বায়ে কেউ তো ধরে না,
সংখ্যাগুলো ব্যঙ্গ করে রক্ত করে আবার চোটকে,
স্মৃতি হুণা রস পানে পিপাসিত আকর্ষ আনাকে
“এই যে বলুন” বলে’ স্নিগ্ধকণ্ঠে পিপাসা করে না ।

তবে কি বুঝাই চোটা, তবু খেলা আশনার মনে,
তবুই আলত লীলা, জল ধরে আলপনা আঁকা,
কখনো হবে না সোজা এ পৃথিবী চিরদিন বাকা
আমাকে দেবে না হৃথ প্রাণ্টিহরা কবোক্ষ ইন্দ্রনে ।

তখন হঠাৎ তুমি বজ্রধ্বনি অন্তর কাঁপিয়ে,
“বাধার আনন্দ তোর, অপর যা কী হবে তা নিয়ে” ॥

তুমি তা বিশ্বাস কোরো

সনাতন গিত্র

তোমাকেই যদি বলি আমার শাখার
জীবনের কোনো পাখি রথকণ্ঠে শোনার ন গান
তোমাকেই যদি বলি বসন্তকে আকর্ষ হুণা করি
কেননা এখন ভালবাসার সময় নয়
যদি বলি শরতান পরেঘাটে ওঁৎ পেতে বলে
এ সময় মাহুঘের একতা আশা সংগ্রামের কত প্রয়োজন
পৃথিবী বদলে দিতে গ্যালন গ্যালন রক্ত চাট
সারা দেশ জুড়ে তবু একটিই পথ
সেই পথে শুয়ে আছে লক্ষ দেবশিত
সে পথের মাঝে মাঝে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হুণা শরতানের উল্লস খাবার
তবু যদি হুত্বার হুখোহুনি ছবরের একটিও পদক্ষেপ পড়ে
আমি তবে হেঁটে যাবো ওই পথ ধরে

ও পথেই অতীতের জীলবাশ। জয় নেবে আশীষী দিনের পূর্বলোকে
 পল্লবিত পত্রপুশে স্বাধীনতা নামধারী এসেছে
 তুমি তা বিশ্বাস কোরে। কাউকে বিশ্বাস করা যদিও এখন অস্বাভাবিক
 কেননা এখন দুঃসময়, চারিদিক বড়ো অন্ধকার।

যখন আসলে কিনা

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন না পেতায় যাবে ভাষা
 ইদানীং

একদল অশেষে এ-বন শাসন করে
 যে-বন শাসন করতে। কিংবা করতে পারতো।
 পুরুষসিংহের। আর পুরুষব্যাসের।

এ-বনে এখন তাই

বেধোরে হরিণী মরে

বিধায় বিধায় নেয়

বনভ্রমের গৌ।

সংকোচের বিহীনতার

দেওদার লজ্জাবতী হয়

দুঃখতম ছায়ার ওপর

দেখে দেখে নপুংসক

আমরাও ঠা ঠা ক'রে হাসি

যখন আসলে কিনা কাছাই সংগত ছিলো

কিংবা সংগত ছিলো অসি নিষ্কাশন।

এখনি বলা যাবে না

ব্রজগোপাল রায়

এখনি বলা যাবে না কোনদিকে মোড় নেবে...

কোন অবিশ্বস্তের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হবে

সময়ের অববাহিকায় ;

এখনে ঘোঁরাটে ঘোঁরাটে আকাশ

নদীতে চলল উজ্জ্বল

এখানে ওপারে ভূমিভূমি শব্দের চাব ;

আর মিছিলের পারে পারে অড়ানো

অলস-অভ্যাস - প্রতিদিন...

প্রতিদিন ক্লাস্ত হ'লে নামে পথের ধুলার ।

এখন জনতার স্বীকৃতি পাবে কিনা কোন মতবাদ

বলা যাবে না।

অথবা, কোনদিন এই সব ভূরা সত্য

সিঃক্সের ভেঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে

সব দুর্গের সঞ্চিত রসদ অরাজক হাতের চেটোর,

এখন বলা যাবে না

সময়ের তালে তালে আমরা

এগিয়ে এসেছি কিনা উত্তর ঘাঁটিতে ।

এবং এখন ঘোঁরনের উজ্জ্বল উজ্জ্বলতা

নেবে কিনা কোন এক আশ্চর্য-লপথ ;

উজ্জ্বল রক্তের চাপে বৃকের ভেতর বৃকে

যে-প্রচণ্ড শ্রোত

ভেঙে চূড়ে দিয়ে গেলে সম্মুখের বাধার পর্বত

জন্মের উর্বর মাঝে ভ'রে যাবে বিবর মাঠ

সবুজ-সবুজ শস্তে পূর্ণ বৃকের ভাঁড়ার

খুলে দেবে লৌহ কপাট ।

এখন বলা যাবে না

আমরা পৌঁছে যাব কিনা

সেই চূড়ান্ত-মানব-সীমার

যেখানে বাসকুলের রং-এর যৌতাত,—

জ্যোৎস্নাহৃৎসর রাত দিন দিনরাত,—

বিবর্ণ অতীত মুছে দিয়ে কোক্সাগরী টান

একরাস এলোচুলে ছড়াবে দৌরত...

উঠোনে উঠোনে পাভা
প্রতিবেশী—সকলের চোখেদুখে হাতেপাতে
স্বপ্নের স্বাদ ;
সব মাঠ আল ভেঙে
ছ'রে যাবে বিশাল আকাশ,
সব নদী মিলেমিশে সাগরের জল
অধৈ অতল ।

এখনি বলা যাবে না
কোনদিক নেবে বাক—
উড়ন্ত আকাশে পরিভ্রান্ত অশান্ত পাখিদের বাক ।

With Best Compliments from—

J. S. SYNDICATE & CO.

ENGINEERS & CONTRACTORS

DURGAPUR - 13

PHONE : 3036

গ্রেপ ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত থাকার
এবং লোড শেডিঙের দরুন দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব
হওয়ার অন্তে আমরা দুই লজিত । তবে ৩র্থ সংখ্যা যথাসময়ে এপ্রিল মাসের
শেষাংশে প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হবে ।

—সম্পাদক/চেতনিক

পত্রসভা (১৫২ নম্বর) সম্পাদক নিম্নলিখিত আকারে :

প্রবন্ধ : শব্দ সাহিত্যের স্থানায়ন : নাগরিক চৌধুরী
ভাষার কোবাসার : ডঃ হুমায় কবর
জিগুয়া/কুসিগ : অধ্যাপক জগদীশ নগচৌধুরী
পত্র : : বার্ষিক বার

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত/বীহেন চট্টোপাধ্যায়/লখাই কিশু/লক্ষ্মীনাথ
স্থাপোপাধ্যায়/কবিকল ইন্দ্রনাথ/কজন-এ-খোলা (বাংলা দেশ)
প্রভৃতি ।

দৈনিক 'চেতনিক' প্রকাশিত হয় : জাহ্নবী/এপ্রিল/জুলাই/সেপ্টেম্বর-
অক্টোবর (পূজা সংখ্যা)

বার্ষিক টাকার হার : ১০ টাকা । ভাকবার স্বতন্ত্র ।

প্রয়োজনবোধে সম্পাদক প্রকাশার্থে প্রেরিত যে কোনো লেখার পরিমর্দন-
সাধন করিতে পারেন ।

ডঃ স্বতন্ত্র সম্পাদনাধ্যায় ও প্রাথমিক সরকার : মক্কেল পত্রে এডো
উচ্চাঙ্কুর পরিকা অভ্যবসায় ।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : 'দেশ' পত্রিকার বাইরে এমনি একটি উচ্চাঙ্কুর নির্ভীক
সাহিত্যপত্রিকার অভাব বোধ করছিলেন আরও অনেক দিন থেকে ।

মহি বাগতি (যিনি পূর্বে 'চেতনিক'-কে 'বঙ্গবর্নন-এব' নামে তুলনা করে-
ছিলেন) : এবারের সম্পাদকীয়টি আরও উচ্চগ্রামে বাধা দেখলাম । আপনাত
বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ।

ডঃ অরুণেন্দ্র মিত্র : চমকায় !... এমন একটি সর্বজনস্বাক্ষর পত্রিকার
লকলেরই পূর্ণপোষকতা করা উচিত ।

সম্পাদক/বেতার বাতলা' (ডাকা) : জনৈক শাহবীর চেতনিক খুব হুমকি
হয়েছে । এক কপি হাতে পেলে খুব খুশি হবে ।

পূর্ণিমাবাসের খবর (বহুবনপুত্র) : ...মক্কেল বাংলার এই পত্রিকাটি সমস্ত
বাংলা দেশে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম । এর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় বেশ গ্র্যান্ডিট
পাথরের পাথুরি । সাহিত্য সংস্কৃতি তথা সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ধরে রাখা যায় ।
এর মত প্রবন্ধগুলিই এককালের স্থিতিবিধি ও নিয়মিত । চেতনিক পত্রিকাটি
নির্ভীক পাত্রিকের মতই বোধ হয় ।

অগ্রতিথী

গণেশ, রাম, সুগান্তর ও বড়ি বিড়ির মূলাবে
 পরিতৃপ্ত হোন—

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ (প্রাঃ লিঃ)

সোল সেলিং এজেন্ট : প্রিন্টার্স এন্ড মার্চেন্টস (প্রাঃ লিঃ)

পোঃ—অন্নদাবাদ, জেলা—মুর্শিদাবাদ

শারদীয় (চৈতনিক ১০৮) সম্পর্কে :

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র : “... পূর্ব খুলি হয়েছি, হুতীপত্রের ওপর একবার চুটি মিলেট বোঝা যায় আপনাব এই সংখ্যাটি কতো মনোজ্ঞ এবং সুন্দর হয়েছে...”।

অধ্যাপক ডঃ সতীশ করণ : কবিত্বের কাছ থেকে চৈতনিক পেয়েছি। পূর্ব ভাল হয়েছে।...সত্যিই বিশ্বকর্ম।

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ : নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বাঁধা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি সতীশ করণ, প্রমোদ মিত্র, হুতাশ বুদ্ধোপাধ্যায়, ডঃ বিজিত বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। ডঃ বুদ্ধোপাধ্যায় (আকাশবাণী, আগরতলা) পূর্ব প্রার্থনা করেছেন। একজন বলেছেন এতো ভালো সাহিত্য পত্রিকা পূর্ব কল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক যুগ্ম পাল : আজকাল সাহিত্যটা কলকাতা কেন্দ্রিক। বাঁধা তা কবেই তাঁদের অধিক অনেকটা পরীচ, তবু তাঁরা প্রায়ই এই কলকাতা চিন্তার ভোলেই যে কলকাতা ছাড়া বাংলার আর কোন চিন্তাবক নেই, কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও তাত্ত্বিক বাস্তব নেই—আপনার পত্রিকা পড়লে এই উন্নয়নমূলক দ্বিতীয় চিন্তার নিরত হয়েছি। ‘চৈতনিক’ আপনাব প্রচেষ্টার পরীচ বাংলার চিন্তন-আভিযাত্রের প্রতীক হয়ে উঠিয়েছে। [এই বাস্তবে দেখুন

মূল্য দুটাকা পত্রিকা পড়ুন

চেতনিক



চেতনিক

● প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ সান্তাল
হরেন্দ্রনাথ কলেন্দ (মহিলা)
কলকাতা-১

● সহযোগী

জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
সহ প্রধান শিক্ষক,
নিমতিতা হাই স্কুল
নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ
পুলকেশু সিংহ
পাঁচতুপী, মুর্শিদাবাদ
● প্রকল্পশিল্পী
পকানন চক্রবর্তী

● আহ্বায়ক

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ
অধ্যাপক, মহাবাজা বীরবিক্রম কলেজ
আগরতলা, জিমুরা

● সহযোগী

দীপক চট্টোপাধ্যায়
পি পি সি ডি
দুর্গাপুর ইন্সটিটিউট কারখানা
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৭ সি বসুজিহবাড়ী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

পোঃ ৩ জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

কর্ম—৪

অষ্টম আইন অনুসারে 'চেতনিক' সম্পর্কে ঘোষণা

প্রকাশন স্থান

প্রকাশন পারিষদিকতা

মুদ্রাকর প্রকাশক সম্পাদক

ও ব্যবহারিকার নাম,

জাতীয়তা ও ঠিকানা

পোঃ ৩ জেলা মুর্শিদাবাদ

ত্রেমাসিক

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয়তা ভারতীয়

পোঃ ৩ জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ

আমি অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগে ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত
বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক | চেতনিক

• **कृष्णाक्षक :** कपुलछत्र वनेनाभाधार

ଜାଲଦାନ/ସୁନିବା/ବାହାବ ମନ୍ତିଆର

सूत्र (मन्त्राधिकार)

প্রবন্ধ: অরুণাশঙ্কর রায় / নারায়ণ চৌধুরী / ড: সুবীণ কবির / অধ্যাপক
 জগদীশ গণচৌধুরী / রনীষিষোহন রায় / পুলকেশ্য সিংহ

গণ : বাণিক দ্বার

কবিতা : হীৰাগলি দাশগুপ্ত / সুখীৰ নন্দী / শঙ্করানন্দ ব্রুহোপাধ্যায় / কবিকল্প
ইন্দ্রনাথ / বণিতভূষণ ভট্টাচার্য / ফজল-এ-খোদা / ব্রজমোহন দাস /
সনাতন দিত্ত / অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

शुद्ध

सम्मानकोय

অন্য কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর ঘিরেছিলো : পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করার অপরূপে তীব্রমন শিকক গ্রেকডার। তর্ক টেউতে পারে এঁরা গ্রেকডার হ'লেন, না শহিদ ফলেন ? অবশ্য টেউদের মুক্তি দাবি করে অভিজ্ঞাবকদের মিছিল যের হ'য়েছিলো কিনা সে-সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোনো খবর একেতে দেখা যায়নি। অথবা, জানা যায়নি, তাঁরা, আমিনে মুক্তি পেয়ে থাকলে সে-সময় অভিজ্ঞাবকসমাজ তাঁদের কাছে সহর্ষে, মালায়ান করে-ছিলেন কিনা। তবে টেউনে বলে কাউকে কাউকে—অজ্ঞান করি তাঁরা অভিজ্ঞাবক ন'ন—শিহরিত কলেবরে, রক্তমা, ক'রতে, ভুনেতিলেম : দিন-দিনটে অলম্য ভানজার শিকক ! এরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় !' হার, অজ্ঞান পরীক্ষার, ভোমার খাননেজে শুধু দ্রুতভাগা এই ভিনজান-ই পুতিত হ'লো ! সংবাদপত্রেদীর পুশিশনী চেয়েছে অজ্ঞানে এমনি আরো কতো অজ্ঞান শিকক

ছাত্রজনকদের মনোভাবনাথনে একনিষ্ঠত্বটী হ'য়ে আছেন তার খবর কি নভিই তুমি জানো না? এ-কথা কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার ক'রতে পারবেন যে শুধু কাকুলে অভিজ্ঞান-ই আজ শিক্ষকপদলাভের একমাত্র হাড়পত্র ব'লে গণ্য? শিক্ষকোচিত মানসিকতার প্রশ্ন আজ বেমান্য উপেক্ষিত!

আমি বিভিন্ন স্থানের কিছুসংখ্যক প্রধান শিক্ষক এবং আদর্শনিষ্ঠ কিছু প্রাণী ও নবীন শিক্ষকের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁদের বক্তব্য থেকে সংগৃহীত এই সাধারণটুকু আপনাদের কাছে নিবেদন করা কর্তব্য ব'লে মনে করছি: অনেক বিদ্যালয়েই কিছু অনাচারী শিক্ষক আছেন যারা বিদ্যালয়-বহির্ভূত অবকাশকালে ছেলে পড়ানোর নামে অগণিত ছেলে ধ'রে থাকার স্বকঠিন কাজে নিজেদের নিয়োজিত ক'রে রাখেন এবং যথাসময়ে এই ছেলেদের বার্ষিক উন্নয়নগতি অব্যাহত রাখার কর্তব্যো মরিয়া হ'য়ে পড়েন। এই কর্তব্যসাধনকালে তাঁরা সর্ববিধ কলাকৌশল অবলম্বনে সিদ্ধান্ত। এমন কি ছাত্রদের অবস্থিতি স্থায়সংগত স্বার্থসংকর্ণে স্বীয় সহকর্মীদের অপমান করতে এঁদের স্বকঠি শিহরিত হয় না। এঁদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার উপায় নেই। কারণ ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের অর্পণেরও বেশি এবং মানসানুগত ছাত্রদের সকলেই এঁদের দ্বারা 'ধৃত' ও বৃত। প্রয়োজনে এঁরা এঁদের সভ্যতার মতো ব্যবহার ক'রতে সমর্থ। অদিকন্তু এঁদের অভিভাবকেরা এটলন মুশ্কেল আসান শিক্ষকদের স্বা-স্বলভ সাভিসের বিনিময়ে এঁদের অস্বস্ত্যবক ক'রে থাকেন। এমন কি নিজেরা সন্ত হ'য়ে এই ছোণকাকদের সমাজসৌন্দর্য গম্বুজরূপে ধারণ ক'রে রাখেন। কারণ বিগতস্পৃহ গলিভনৎদন্ত এই অন্ধ ধৃতরাষ্টেই তো সন্তানদের 'স্বার্থের' কথা ভেবে কৃত্রিম হ'তে পারেন না। কাজেই বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ— তাঁদেরও কেউ-কেউ অভিভাবক হ'ব। আত্মীয়তাসূত্রে এঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত— এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও অবশিষ্ট নিরীহ শিক্ষকেরা, তবে হোক নির্ভয়ে হোক, এঁদের পিতৃস্বাধীন ক'রে কৃত্তার্থ বোধ করেন। স্বভাবতঃই কৌতূহলী প্রশ্ন উঠতে পারে: যুষ্টিমের কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের, ফলতঃ সমগ্র জাতির, নবীনাশ ক'রে যাচ্ছেন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও অস্ত্র শিক্ষকেরা হাত গুটিয়ে ব'লে আছেন—এটা কি খুব স্বহ চিত্র! ব'লেতেই হয়: না, মোটেই না। এইখানেই আমার মনে প'ড়ে যায় রূপ কবি ইয়েজুৎপেভোর আত্মজীবনীৰ একটা লাটন: 'বহুলোকেবা, এমন কি যখন নিজেবা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছেন! তখনো, কোনো সূমতলব চরিতার্থ করতে একজোট হয় আর সকলও হয়। কিন্তু লং

লোকেরা একজোট হ'তে পারে না আর তাই তাদের সং প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হ'বে যার ।'

একটা জাতির চরিত্র ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে তা নির্ভর করে তার শিক্ষা-নীতি ও সেই নীতির বাস্তব রূপায়ণের ওপর দারিদ্র্য বোনের ওপর ভরসা তাদের চরিত্রের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কারক ডঃ টমাস আর্নল্ড-অনুসৃত শিক্ষা-বর্ণের মূল লক্ষ্য ছিলো ছেলেদেরদের 'moral principle', 'gentlemanly conduct' এবং 'intellectual ability'-র যথোচিত সঞ্চার। আজকের যুগে নিশ্চয় আমরা অনেকে আরো দুয়েকটি গুণ অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবো এই তালিকায়। তবে উল্লিখিত গুণগুলি যে শিক্ষানিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক এ-সম্পর্কে কোনো বিষয় থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের সামনে যদি উপযুক্ত আদর্শ উপস্থিত না থাকে, বরং জীবন বিপরীত চিত্রই চলাকেরা ক'রতে দেখে তারা অল্পকণ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলির ভিতরে বাইরে, তাহ'লে কি ক'রে তাদের অন্তরে জাগবে নৈতিক নিয়মনিষ্ঠা, কি ক'রে তারা আদর্শ ক'রবে সজ্ঞানোচিত সমাজ, কোন্ দায়িত্ববোধসম্পন্ন শালীষ সমগ্র পরিচর্যা চারাবুকের বুদ্ধিবৃত্তি লাভ ক'রবে মতীকরের মতমতী পরিণতি? ছাত্র-দের অপরাধমস্তা নিয়ে আমরা বিব্রত। আমরা অচরিত তাদের আচরণে দোষ-ত্রুটি দেখি। প্রতিজ্ঞাও শাস্তি দিতে নির্লজ্জের মতো বেত্রপাণি চট। কিন্তু একবারো ভেবে দেখিনে আমাদের নিজেদের যোগ্যতাতীন চালাকি, লবণচরিত্র কী বিপুল পরিমাণে দারী তাদের এইসব অলিত আচরণের অন্তে। এ-সময়ে জীবনমুখি থেকে ববীন্দ্রনাথের মূল্যবান অভিমতটি স্মরণ ক'রতে অনুপ্রাণিত করি আপনাদের। '...অপরাধ করা ছাত্রদের আর করা না করা শিক্ষকের ধর্ম। ...ছেলেদের অপরাধকে তাঁহারা বড়দের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকেন, ভুলিয়া যান যে ছোটছেলেরা নিজ'রের মতো বেগে চলে, —সে-জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ যেখানে বামিমাছে সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এই ক্ষুদ্র শিক্ষকের অপরাধকে বড় ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে। কিন্তু শাস্তির ভয় বড়দেরই হাতে...'।' বিচার এবং শাস্তি-বিধানের নিরক্ষণ অধিকার যদি থাকতো ছাত্রদের নিজেদের চাতে তাহ'লে বড়দের বহু সোনার চানের মতো আপাতনির্বল উজ্জল মুখ পোড়া হাড়ির তলার মতো রূপ ধারণ করতো। তাহ'লে সারা বছর ধ'রে ছেলেরা পণীকার

হলে এই নিয়ে চোখবার করে গড়ে তুলতো না। জীবের আনন্দিক ক্ষমতি। তারলে একশ্রেণীর স্ত্রী শিক্ষক ছেলেদের হাতে অসংকোচে বই তুলে দিতো না। পরীক্ষাকক্ষে, কিংবা বাড়িতে বসেই তাদের 'হল' থেকে কিছু নেব ক'রে নিয়ে আসা। প্রসঙ্গের উত্তর লিখে দিতো না চুক্তিরতো অর্থ কিংবা কিছু না। হুজুর বিনিময়ে। পরীক্ষাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসা একই দাপ্তরিক ফুলে-তারা উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষণের তান ক'রতে ক'রতে বিরক্ত হ'তে হ'তো না। দ্বিতীয় পরীক্ষকদের। কলতঃ অহর ভবিষ্যতে একদিন দুর্ভাগ্যবশত হাতে আপনাব পুত্র-পৌত্রের শিক্ষার তার তুলে দেবার আশংকা থাকতো না, কান্তজ্ঞে ভাকার ইচ্ছা নিরাস আর জন্ম ভবিষ্যতের অজ্ঞতার বড়াতলে বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবসার হ'তো না আপনাব আদার অনিচ্ছুক গলা।

একটা গল্প বলি। এক বৃদ্ধ বরাদি অহর হ'য়ে পড়েছে। ছেলেকে তেকে বললে, যা তো বাছা, কামারের কাছ থেকে একটা দা গড়িয়ে নিয়ে আর। ওই কুলাংগিতে আছে লোহা আর খানিকটা ইস্পাত। তবে লাভান, কামার নেটা ঘেন ইস্পাত চুই না করে। ছেলে বললে, না না, একডিলও ইস্পাত চুরি ক'রতে দেবো না। শেষে দা তৈরি হ'য়ে এলো। বৃদ্ধ বললে, হায়ে বাছা, ছোটো ছেলে পেয়ে কামারনেটা আবার ইস্পাত চুরি ক'রে বলেনি তো? ছেলে বললে, খেপেছো। আমি ভেমন কাঁচা ছেলেই নই। জগদর কোষ থেকে ইস্পাতটুকু বের ক'রে বললে, আসলে ইস্পাতই দিইনি। তার চুরি করবে কি!

সেই কথাই বলছিলাম। আমরা সবাই একে অন্যরকে ইস্পাত কাঁকি দিয়ে চ'লেছি। আর নিজের কান্টনিক রূপতত্তে মুক্ত হ'য়ে আল্লাহে আটখানা হচ্ছি। অসং শিক্ষকেরা দিচ্ছে ছাত্র আর অতিভাবকের ইস্পাত কাঁকি। শিক্ষকসম্প্রদায়কে কাঁকি দিচ্ছে লম্বাকি আমলা আর অবিবেচক অতিভাবকেরা। কতিটা কার? শুধু ছাত্রের? শুধু শিক্ষকের? না, গোটা দেশের, গোটা জাতির? দা-এর আকার একটা তৈরি হচ্ছে-টিকট, আমরা চাই বা না-চাই। তবে কোণ কাড়বার আগেই হ'য়ে যার লেটা লাউটক'রে। শিক্ষানীতিতে যতোই ভাবিতক বিম্ব ঘটানো হোক না। শিক্ষক যদি অসন্তুষ্ট থাকে, শিক্ষককে যদি চোটা হ'তে দেওয়া হয় তাহ'লে জাতির বেকদও বৈকে যাবেই। সব-উন্নয়ন প্রকল্পপনিকল্পনা ব্যর্থ হবেই। এই জ্ঞান এই শিক্ষক এই অতিভাবক এই আমলাগোষ্ঠী সবাই আমরা একটা পচা সমাজের পাক থেকে শাদুক শুগ'লি হ'তে-জ'য়ে তাবছি

নিজেদের শক্ত। এ-সমাজ থেকে বিভাগগর বিবেকানন্দ জন্মাবে না। জন্মাবে না স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ। এখানে কত পাবে যথার্থ কোকিলের পরিবর্তে বিরুদ্ধকণ্ঠ কর্তৃকর্ত বায়সকুল।

হুমহান শিক্ষানায়ক, পর্বতপ্রাজ্ঞবাক্তিগুণসম্পন্ন দার্শনিক আচার্য ব্রজেননাথ মিলের সাহিত্য ও রাজনীতির তীব্র সমালোচক হিসেবে নির্ভীকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এডওয়ার্ড টমসন্ ব'লেছিলেন, 'He was incapable of intellectual dishonesty.' আমরা কি আজকের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই intellectual dishonesty-র অপদার্য বলি নই? আজ আমাদের সামনে কোথায় ব্রজেননাথের প্রজ্ঞালোকিত চরিত্রাদর্শ, বিদ্যালয়গরের টম্পাতদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বিবেকানন্দের সংকীর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ অবিসংবাদিত লোকগুরুত্ব, এমন কি রবীন্দ্রনাথের সত্যতা-ভাবের পরিণামবশিতা? আজ গার্টের মতো এমন একজন সং ও শক্তির কবির দ্বন্দ্বকর নয় কি যিনি যোগার্ড সমাজদেহের দিকে অংগুলিনির্দেশ ক'রে অজ্ঞাত চিকিৎসকের মতো ঘোষণা করতেন : Thou ailest here and here !' তবে? যোগা একক নেতৃত্বের যখন অভাব তখন আমাদের মতো সীমিতক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কি চূপ ক'রে ব'সে থাকতে পারতেন? না, পাঠা উচিত? বিন্দু বিন্দু বারি নিয়েই বারিধি। আহুন, আমরা যাঁরা শিল্পী-সাহিত্যিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিদ তাঁরা একজোট হই। অগ্র শক্তি বিশ্লেষণে আর মহুর শক্তি সংশ্লেষণে। আমরা এক হই, অভেদ চই। অহুলদান করি, সিদ্ধান্ত করি। পরে কল্লুকে ঘোষণা করি : সমাজদেহটা প'চে গেছে। সমস্ত সমাজকাঠামোটাই পাণ্টে ফেলতে হবে। দুয়েকজন কদাচারী শিক্ষক, দুয়েকজন কপট ইন্ড্রিয়াল শিল্পী, দুয়েকজন নিম্ন তট্‌চাজ্, জোড়ি নন্দী, সমর বহুকে ইন্‌ক্রিমিনেইট্ ক'রে কী লাভ? গোটা কাঠামোটাই তট্‌নট্ ক'রে দিতে হবে। শক্ত কাঠামোর ওপর নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত একটা স্বাধিকর শান্তিপূর্ণ জনদমনী সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে ভিত্তিসের ভেতকারী অসং রাজনীতিজ্ঞের স্থান হবে না, ইন্‌সেন-ক্রিপিত চরিত্রাভিজাত্য (aristocracy of character) হীন অসং শিক্ষকের স্থান হবে না, যেখানে ছাত্রদের শ্রুত বৃত্তিকে ভিন্নোমা আর সার্টিকিফিকেটের সূত্র কাগজ ভাঁজে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে বিদ্যা আর যোগা বৃত্তি, যেখানে অধিকাংশ মানুষ হা-অর হা-অর ব'লে হা-হতাশ ক'রবে না, মনে করতে পারবে এই দেশ, এই মাটি, এই সম্পদ আমার। এই দেশের কল্যাণ আমারই কল্যাণ। নইলে বাপু মতোই আকাশে বোম কাটাও আর মহাকাশে রকেট পাঠাও, পেটের আগুন না নিভলে মনের আগুন নিভবে না। আর মনের আগুনে পুড়তে পুড়তে শেষে একদিন গোটা জাতিই ফুটুং হ'য়ে যাবে।

বার্টর্যাণ্ড ৱাসেল

অন্নদাশঙ্কর রায়

আপনার ‘বার্টর্যাণ্ড ৱাসেলের আত্মজীবনী’ প্রবন্ধটি * দু’বার পড়েছি। এককথায় বলতে পারি প্রবন্ধটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছে। বহু স্থানেই আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে আমাদের দৃষ্টিকোণ এক নয়।

প্রথমে দুটো একটা তথ্য প্রসঙ্গে বলি। ৱাসেলের ঐ গ্রন্থের † দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড আমি পড়িনি। Encyclopædia Britannica-র যে সংস্করণটি আমার কাছে আছে সেটি ১৯৬৪ সালের। তাতে ৱাসেলের বিদ্বত জীবনী আছে। সেটি আরও হয়েছে এই ভাবে—

“...English philosopher, famous also for his eloquent championship of individual liberty, which made his position in the intellectual life of his time comparable with that of Voltaire in the 18th century or with that of J. S. Mill in the 19th... .. His godfather (in a purely social sense) was J. S. Mill. At the age of three he was left an orphan. His father, Lord Amberley, had wished him to be brought up as an agnostic ; to avoid this he was made a ward of court and brought up by his grandmother at Pembroke lodge, in Richmond park. Instead of being sent to school he was taught by governesses and tutors and thus acquired his perfect knowledge of French and German.”

ইংলেণ্ডে সব ছেলেই স্কুলে যায়। ৱাসেল স্কুলে না গিয়েই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে ডবল কান্ট ক্লাস পেয়ে Fellow নির্বাচিত হন। তুলনামূলক নোভালা।

এর পরে Paris-এ কিছুদিন British Embassy-তে Attache পদে থেকে Alys Pearsall Smith-এর সঙ্গে বিবাহ। তার পরে Berlin-এ

* ত্রিবার্ষিক চৌধুরী লিখিত এই প্রবন্ধটি ‘লেখা ও বোঝা’ পত্রিকার কাউন্সিল-নোব (১৩৮০) সংখ্যায় প্রকাশিত।

† The Autobiography of Bertrand Russell 1872-1914, 1914-1944, 1944-1967-

কয়েক মাস কাটিয়ে 'German Social Democracy' নামক গ্রন্থ রচনা (1896) । প্রথম গ্রন্থই স্বাভাবিক বিবরণ ।

এর পরে লণ্ডনের বাইরে Haslemere এ Cottage নিয়ে একান্তভাবে দর্শন অধ্যয়ন ও A Critical Exposition of the Philosophy of Leibnitz' রচনা (1900) । তিন বছর বাদে 'The Principles of Mathematics' প্রকাশ (1903) । এর পর Whithead এর সহযোগে 'Principia Mathematica' (তিন খণ্ড, 1910, 1912, 1913) ।

ইতিমধ্যে Fellow of Royal Society' নির্বাচিত (1908)—অতি দুর্লভ সৌভাগ্য । তাঁর নিজের কলেজ তাঁকে Lecturer পদ দেয় 1910 সালে । দিতে পারত, যদি তিনি চাইতেন, পনেরো বছর আগে । সেই পনেরো বছর তিনি চাকরি না করে স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনা করেন । "During all this period Russell lived simply and worked hard."

"Lived simply and worked hard"—তাঁর সাধারণ জীবন সম্পর্কেও খাটে একথা । কখনো তিনি বিলাস বাসনের ধার ধারেননি ।

কেহিজে চাকরি পাবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ । রবীন্দ্রনাথ এর একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা লেখেন 'পূণের সঞ্চয়' পুস্তকে । যদি পড়ে না থাকেন সংগ্রহ করে পড়বেন ।

এর পর এল প্রথম মহাযুদ্ধ । "After World War I broke out he took an active part in the No Conscription Fellowship. He was fined £ 100 as the author of a leaflet criticizing a sentence of two years on a conscientious objector. His library was seized to pay the fine ; it was bought in by a friend, but many valuable books were lost. His college reprieved him of his lectureship. He was offered a post at Harvard University, but was refused a passport. He intended a course of lectures (published in the U. S. as *Political Morals* in 1918) but was prevented by the military authorities. In 1918 he was sentenced to six months' imprisonment for a pacifist article he had written in the *Tribunal*."

এর থেকে বোকা যাচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধকালে তাঁর চাকরি যার, অল্প কোনো চাকরি ছাটে না, জরিমানা দিতে হয়, জেলে যেতে হয় । বাইরে গিয়ে চাকরি

করতেও নেওয়া হয় না। এই অবস্থায় তিনি তাঁর বুদ্ধোপকরণের shares কহি Eliot কে দেন। Wittgenstein-এর আসবাব ক্রয়ের প্রয়োজন বা সাহায্য তাঁর ছিল না, ওটা পৰোপকারের পৰ্যায় পড়ে। 'Bargain' মানে 'দাঁও' নয়।

বাসেল বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এঁর individual liberty বা civil liberty-র অন্তে সর্বদা সচেষ্ট। পিতামহ লর্ড জন বাসেল civil liberty-র অন্তে সংগ্রাম করেছিলেন। Reforms Act-এরও তিনি একজন সূত্রধার। Crime-র হুকে এঁর সার ছিল না, যদিও সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় এঁর এখানে বসেই। বায়ট্রাও 'শান্তিবাদী' না হলেও 'হুদ্ধবাজ' ছিলেন না। কেউ যদি বেচ্ছায় হুকে যায় তা হলে তিনি বাধা দিতেন না, কিন্তু কাউকে বলপূর্বক হুকে ধরে নিয়ে গেলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। ইংলণ্ডেরও এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সে দেশে conscription ছিল না, যেমন ছিল ফ্রান্সে, জার্মানিতে, রাশিয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকেও conscription ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর বাদে দেখা গেল হুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে জোর ক'রে সৈন্য সংগ্রহ করা চাই। সেসময় conscription প্রথম প্রবর্তিত হয়। এটা ইংলণ্ডের ঐতিহ্যবিরোধী। বাসেল পরিবারের ঐতিহ্যবিরোধী। সুতরাং এই ইচ্ছাতেই বাসেল-প্রতিবাদী বলে দণ্ডিত হন। Conscription এড়াতে পারলে বাসেলের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেশের নেতাদের সংঘাত বাধত না। তবে তিনি হুকে সারও দিতেন না। বহু মনোবী সার দেননি। প্রথম মহাযুদ্ধ ইংলণ্ডের জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়। হুকে জিতেও ইংলণ্ডের কোনো সাফল্য ছিল না। অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন একটা আন্তঃgeneration হুকে নিহত হয়। সে gap পূরণ করা অসম্ভব।

এমনিতেই একজন অগ্রগণ্য intellectual হিসাবে তাঁর নাম সকলে জানত। যুদ্ধকালে তাঁর অনমনীয় মনোভাবের অন্তেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডবল কাষ্ট ক্লাসের মতো এটাও একপ্রকার ডবল কীৰ্তি। কিন্তু এই সময় তিনি অন্য দু'টি কারণে অধিকাংশের অপ্রিয় হন। একটি তো তাঁর marriage and morals সংক্রান্ত লোক কথা। অন্যটি তাঁর রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অধোদেশ্য Establishment বিরোধী মতবাদ। আপনি তাঁকে ধনতন্ত্রী বলে নিন্দাবাদ করেছেন। তখন কিন্তু ধনতন্ত্রবিরোধী বলেই নিন্দাবাদ শোনা যেত। তিনি পাল'মেন্টের অন্য দাঁড়ান Independent Labour

এরপর পঞ্চাশ পৃষ্ঠার দেখুন

পরঃ সাহিত্যের মূল্যায়ণ

নারায়ণ চৌধুরী

অপরাজেয় কথাসিঙ্গী পরঃচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য প্রতিভা। এই প্রতিভার কোন হোলদেও বুঁজে পাওয়া যায় না বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আগে ও পরে। বিভিন্নস্রে ও ববীজনাথ অবতাই পরঃচন্দ্রে অপেক্ষা অনেক বহুবিভারী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, তাঁরা দু'জন বঙ্গসৃষ্টিতে যেমন অনন্ত তেমনই মনীষা ও বৈবিক্যের ক্ষেত্রে বিচিন্নপথ সন্ধানী জিজ্ঞাসার ভরপুর; পক্ষান্তরে পরঃচন্দ্রের পর কথাসাহিত্যে কেউ কেউ এসেছেন বীরা পরঃচন্দ্রের তুল্য প্রতিভার অধিকারী না হলেও বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাতকে চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানসিদ্ধি করেছেন। যেমন বিজুতিতুম্বা বাংলা উপজালাে একটি নুতন আয়তন যোগ করেছেন—প্রকৃতিগ্রেস; ভাষাশংকর বকসারি চব্বিজের আট্টা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ-স্থিতির সবচেয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক লেখক ও বাস্তবতার সর্বাগ্রগণ্য সিঙ্গী। কিন্তু যেখানে পরঃচন্দ্র তুলনারহিত এবং পূর্বপর সকল চট্টোপাধ্যায়ের উর্ধে স্থিত, সে হলো কথাসাহিত্যের মনোহাযিকের ক্ষেত্র। এমন মনোহাযী ও লোকপ্রিয় গল্প-উপস্তাল আর কেউ সৃষ্টি করে যেতে পারেননি বাংলা ভাষায়। পরঃচন্দ্রকে বাংলার পাঠক সম্মানার 'অপরাজেয়' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অভিধাটি অকারণ নয়। বিভিন্নস্রে ও ববীজনাথ তাঁদের অপরিসীম সৃষ্টিকৃশলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিজুত ক্ষেত্র জুড়ে করেছেন; কিন্তু কথাসাহিত্যের সীমিত ক্ষেত্রে একে দেখতে পাই, পরঃচন্দ্র তাঁর লেখার জ্বালুতে বাংলার পাঠকচক্রে মেরুপ পতীকভাবে সম্বোধিত করেছেন এমন ওঠে-ছুই অগ্রগামী ও বিকপাল লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। মনোজ্ঞতার সিলে পরঃচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মনোজ্ঞতা তথা লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বভাবতঃই নিরন্তরের শিল্প জ্ঞান করায় একটা সহজ প্রবণতা আমাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী রয়েছে। বিশেষ বিশেষ লেখকের বেলায় এ কথা সত্য হতে পারে কিন্তু পরঃচন্দ্রের বেলায় এ কথা অ্যাবৌ সত্য নয়। লোকপ্রিয়তার নজিরে পরঃচন্দ্রকে খাট করে বেলায়র উপায় নেই, কেননা পরঃচন্দ্র বিজুত লোকপ্রিয় সিঙ্গীই নন, আরও অনেক কিছু। তাঁর সে সব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধেই আমরা কতক পরিমাণে চেষ্টা করবো, তবে মোড়াত্বেই যে-কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া

দরকার তা হলো তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী আত্ম পর্যন্ত বাংলার কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় আবির্ভূত হরনি। বাংলার পার্টিকপাটিকার স্বদয়সনে স্বদুত অধিকার স্থাপনার শরৎচন্দ্রের কুতিত্ব অবিসম্বাদী ও সর্বাধিক।

কোন গুণে শরৎচন্দ্র এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? সে এইজন্ত যে, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে কেবলমাত্র মাহুকের উপরই তাঁর সকল মনোযোগ সংহত করেছিলেন—মাতৃ-বাতিবিক্ত কোন অবাস্তব প্রসঙ্গের উত্থাপনার সময় ও উত্তম ক্রম করেন নি। মাহুকের ও মাহুকের স্বদয় এই ছিল তাঁর একান্ত অহুসঙ্কানের ক্ষেত্র। মাহুকের যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে বাস করে সেই পারিপার্শ্বিকের উন্মোচনে তাঁর তাত্পর্য উৎসাহ দেখা যায়নি, নিসর্গের রূপ বর্ণনার তাঁর সামান্যই অকৃত্রিম পরিলক্ষিত হয়েছে, এমন কি যে মাহুকের বা মাহুকের তাঁর মধ্যমনোযোগের বস্তু, তার দৈহিক কপসৌন্দর্য বর্ণনায়ও তিনি পাতার পর পাতা ভগাতে যাননি বস্তুচন্দ্রের কিংবা অকৃত্রিম একজন অগ্রগণ্য লেখকের ধরণে। তাঁর একমাত্র চিত্রিতব্য বিষয় ছিল মাহুকের ও তার মন। চরিত্রগুলির অস্বস্তির বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। তবে সেখানেও কথা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জটিল কুটিল মনের বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, সমাজের প্রচলিত অহুসাসন বা লঙ্কারের সঙ্গে অস্বস্তির সহজ প্রতিক্রিয়া যে-সংঘাত, সেই স বা হ্রস্বনিত আলো-ডুনের ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই ছিল তাঁর শিল্পমনের সমাধিক স্মৃতি। শরৎচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির আবেগজীবনের রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাড়ালী যে অত্যন্ত ভাবাবেগপরায়ণ জাতি সেটা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে যত স্পষ্টচিত্ত-ভাবে উপলব্ধি করা যায় এমন বোধকর আর করাও লেখা থেকে যায় না। অচরিতার্থ প্রেম, সমাজ নিষেক অথচ তৎসঙ্গেও অদম্য ভালবাসার আবেগ, বন্ধাত্মের বেদনা তথা মাহুকের ক্ষুধা, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃত্বের, নারীর সেবাপরায়ণতা, বিদ্রোহের তেজ, প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগকে শরৎচন্দ্র অতিশয় চমৎকার শিল্পরূপ দান করেছেন। বাংলার সমাজজীবন, বিশেষ, পল্লী সমাজজীবনের চিত্ররূপ উপস্থাপন করতে গিয়ে দুটি কাজ তিনি বিধিমতে নিষ্পন্ন করেছেন। এক, বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ ন্য-নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উদ্ঘাটন, দুই বাংলার সমাজে প্রচলিত একাধিক গভীরাঙ্গিক মূল্যবোধকে সজোরে আঘাত হান। অর্থাৎ, তাঁর লেখনী বাস্তবিকতা ও আদর্শবাদ—এই দুই খাতেই দুগুণ প্রবাহিত হয়েছে।

বাঙালী চরিত্রের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ধাতু বিশ্লেষণ করে ভাষণর তিনি তার কতকগুলি অসুচিত সংস্পর্গকে চূড়ান্ত স্বকর্মের সমালোচনা করেছেন। বাঙালীর অন্তরে তিনি বিজ্ঞোহর আগুন পুড়ে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর শিল্পকষ্টির সার্থকতা।

শরৎচন্দ্রের এই শিল্প সার্থকতা বিধানে ভাষা তাঁর একটি প্রধান মহায় হয়েছে। এমন মনোমুগ্ধকর ভাষা বাংলার খুব কম লেখকেরই লেখনীমুখে নিঃসৃত হয়েছে। শুধু ভাষা বললে কমই বলা হয়, বলতে হয় তাঁর ষ্টাইল, ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিকূলিত তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। শব্দ সম্পদ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের রীতি, চিন্তার ছাঁচ, বক্তব্য প্রকাশের স্বকীয় সব জড়িয়ে এবং সে সবকেও ছাড়িয়ে তাঁর শুই ষ্টাইল। ষ্টাইলের জাত্রে শরৎচন্দ্র বাঙালীর চিত্ত হরণ করেছেন। শ্রীমতী বাধামাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র বিনয় করে অবজ্ঞা বলেছেন যে, "ভাষার গুণের দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।" কিন্তু এই বিবৃতিতে সত্য বলে গ্রহণ করবার কোনই হেতু নেই। আর যদি সত্য বলে গৃহীত হয়ও সেক্ষেত্রেও বলবার কথা এই যে, শুই যে তিনি শব্দ সম্পদের 'সামান্যতা' নিয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন ওর মতোই রয়েছে তাঁর ভাষার যথার্থ শক্তি। নিসর্গকর্ণনা, প্রতিবেশচিত্রণ, বর্ণিত চরিত্রসমূহের দেহ সৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এ সমস্ত অবাস্তব বিষয়ের বিবরণ দ্বানে তিনি তাঁর মনোযোগ ফেপ করেন নি বলেই তাঁর শব্দসমৃদ্ধ স্বতন্ত্র 'সামান্য' রয়ে গেছে। কিন্তু শব্দসম্পদের বিশালতা বা বিস্তারের মতো তো শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে না, শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে যে সমস্ত শব্দ নিয়ে শিল্পীর সচরাচর কারবার সেই সমস্ত শব্দ সাজাবার কারবার মতো এবং কোথায় কোন শব্দের উপর ঐক্য আরোপ করতে হবে তার স্বকীয় মতো।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ভাষার কি কোন তুলনা হয়? শরৎচন্দ্রের যে কোন উপজ্ঞানের যে কোন পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশের যে কোন পাঁচ-ছয় লাইন পর পর তুলে আভ্যন্তর পাঠের রীতিতে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে তাঁর শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, শব্দের গুণন ও সংযম, অর্থের রীতি, অতীক্ষিত অর্থের স্পষ্টতা ও লক্ষ্যবোধিতা। এই থেকে আরও একটা কথা যা মনে আসে তা হলো এই, যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ পঞ্জীভিত্তিক লেখক হলেন

তাঁর ভাবাশির ছিল দলীয়-পন্থার অর্থাৎ দার্শনিক। দার্শনিক ঐক্যবাদের সম্মুখে তাঁর টাইল ভগ্নপূর। ভাববহুলত নিম্নলিখিত পাঁচটি ভেঙে ভেঙে ধ্বংসাবশ্যক করে বসানোর মত তিনি প্রতিটি শব্দ মেলে মেলে ওজন করে বসিয়েছেন। শব্দগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি এবং পাঠকের মনের উপর সেই ধ্বনির স্ফূর্তিত প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে বিচার করে দেখে তবে তিনি শব্দ ব্যবহার করতেন। এই প্রক্রিয়া ভাবাশিরের একান্তই দার্শনিক প্রক্রিয়া। মনশীলতা এর পর্যাতে পড়ে বিধৃত। যাকে বলে ‘অশিক্ষিতপটু কিংবা দৈবাহুপ্রহণু’ ‘কবিপ্রসিদ্ধি’, তাঁর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই—এ সম্পূর্ণই সচেতন মনের এক সিল। অহুশীলন তির এ শিল্প আরম্ভ হয় না, পরিমার্জনা তির এ শিল্পের সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হয় না।

শব্দচক্রে যে কতবড় ভাবাশিরী ছিলেন তাঁর মধ্যমস্থ সুস্বাদু এখনিও হয়নি। হলে যেথা যাবে তিনি এই ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখকেই নিশ্চয় করে দিয়েছেন। ভাবার অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা তাঁর হাতে বাঙালী পাঠকের অন্তরে প্রবেশের আসল চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে। আর বাঙালী পাঠকও যে তাঁকে তাঁর অন্তরের আসনে অচলপ্রতিষ্ঠ অধিকার দান করেছেন তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই ভাবার ভণে প্রভাবিত হয়ে। প্রভাবক্রিয়াটা কখনও সম্মান স্তরের, কখনও অজ্ঞান। বোধহয় খতিয়ে দেখলে অজ্ঞান অংশই বেশী। বাঙালী পাঠক তাঁদের অজান্তে অথবা অর্জাত-সাথে শব্দ-সাহিত্যের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়েছেন।

শব্দচক্রে রচনাধীতি থেকে এইবারে শব্দচক্রে রচনার বিষয়ের দিকে চুটি ফেরানো যাক কিংবা পরিমানে।

সকলেই জানেন শব্দচক্রে নারীচরিত্র অল্পে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা দার্শনিক পাণ্ডপিত্য প্রদর্শন করেছেন। নারীচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ করতে দিয়ে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছেন। শুধু যে পল্লী বাংলার মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত স্তরের সাধারণ সতীসাক্ষী পতিগতপ্রাণা গৃহস্থ, বাল-বিধবা, অরক্ষণীয় অহুত কন্যা, প্রোচা জননী প্রভৃতি নানান ধরণের নারীচরিত্রই তাঁর অতিক্রম্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা-ই নয়; সমাজ-শৈঠার বহির্ভূত সাধারণের অবজ্ঞাত ওষাকষিত পতিতা ও জটিলের উপরও তিনি তাঁর শিল্পকৌশল সম্বল অর্পণ করেছেন পরম উদারভাবে। তাঁদের বহির্ভূত প্রেক্ষিত জীবনের

অন্তর্নিহিত সহজাত নারীত্বের মহিমাকে রূপায়িত করেছেন একান্ত যত্নে । এই-
জন্ম তাঁকে সমাজের বক্ষণশীল অংশ থেকে কম নিষ্কাষীক সঙ্কল্পে হ্রস্ব কিস্তি
সমস্ত কষ্ট পর্যালোচনার অকুটি অগ্রাহ করে তিনি তাঁর মানবিকতার অবস্থানে
অবিচলিত থেকেছেন । যাত্রাবের স্বপ্ন-পতনকে অতিক্রম করেও যে তাঁর
অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অজের থাকে এই ভাবটিকে তিনি বাববার তাঁর পাঠকের
মনোযোগের সামনে তুলে ধরেছেন অকম্পিত হস্তে । সাবিত্রী, হাজিন্দারী,
চন্দ্রমুখী, বিজলী প্রভৃতি চরিত্র এই যাত্রাবের অঙ্গ-পদ প্রমাণ ।

পঞ্চাশতাব্দে, পতিপ্রাণা পত্নী-সাক্ষী নারীর আদর্শ তুলে ধরেছেন বিবাজ-বোঁ,
সুধালা (চরিত্রহীন), সর্ব (চন্দ্রনাথ), অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত), বোড়লী
(ধেনা-পাওনা), প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে । যাত্রাকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত
আত্মমর্য্যবাহুস্তা নারীর মহিমা ফুটিয়েছেন পণ্ডিতমশাই উপস্থানের সুস্থ চরিত্রের
মধ্য দিয়ে । পল্লীসমাজ-এর সমা বৈধব্যের অভিভাবগীর্ণা ও সামাজিক দুলা-
বোধের সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতির নিবন্ধের সংঘাতে কতবিকতরূপ নারীর এক
বেগনাকরণ উদাহরণ । বিন্দুর ছেলের বিন্দু আর রামের স্মৃতির নারায়ণী,
বড়দিদির মাধবী আর মেজদিদির নামচরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে স্নেহ-
বাৎসল্যের এক অপরূপ সিন্ধুভার আলোখা । অবলম্বীয়ার পোড়াকঠা ভামিনীর
চরিত্রে রূপ পেয়েছে কোন কোন নারীর আশ্রয়-ককতার খোলসের অন্তরালে
যে স্নেহের কল্পনারা বর্তমান থাকে তার চাঁতির ঠেঙ্গলা । পল্লীসমাজের
জোঠাইমা চরিত্রে পাই শ্রোতা জননীকে বিচক্ষণ সংসারবুদ্ধি ও ক্রায়ে প্রান্ত
পক্ষপাত ।

কিন্তু এসব কম-বেশী বাঙালী সংসারের পরিচিত কাঠামোর চিত্রাঙ্কন
নারীরূপের ছবি । পরবর্ত্তের নারীচরিত্রের মিতিল গুটিখানেই শেষ হয়ে যায়নি ।
তিনি কতকগুলি বিহীন চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন । যেমন, অত্যা (শ্রীকান্ত
২য় পর্ব), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষ
প্রস্ত), প্রভৃতি । অত্যা নিকটস্থ স্বামী সন্ধান প্রতিনিধী যুবক বোতিনীকে
সঙ্গে করে মর্য্য মূল্যকে ধসেছিল । স্বামীর পোঁজ সে পেয়েছিল কিন্তু তার
কর্ম্ম জীবনমাহা ও তত্ত্বাদিক বিকৃত কঠোর পরিচয় পেয়ে স্বামীর সঙ্গে একত্র বর
করণ ইচ্ছা তার উবে যায় । ইতিমধ্যে বোতিনী তাকে মনে মনে ভালগালে ।
বোতিনীর প্রেমকে মর্য্যাদা দিয়ে অত্যা তারই সঙ্গে বর বাঁধে ও স্বামী-স্ত্রী রূপে
বাস করতে থাকে । অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিক চরিত্র এই অত্যা । আমাদেব

পুৰুষ শাসিত সমাজের পুৰুষের বার্ষাহকূল একতরফা অস্বাভাবিক বিকল্পে
অভয়া এক বৃত্তিমতী বিদ্রোহিনী নারী । পুৰুষ দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে ঐ
করে কল্যাণী হলে তার কোন সাজা নেই, নারী একটু বেচল হলেই তার
উপর সমাজের গোধ বজায়ির মত বেবে আসে—এই নিত্য অস্ত্রাঘা
সংসারটাকেই আঘাত করতে চেরেছে অভয়া তার ভয়ভূত আচরণের মধ্য দিয়ে ।
অভয়ার তুল্য নির্ভীক দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র নেই গোটা শব্দ সাহিত্যের
বিস্তৃত আয়তনের ভিতর । শব্দেচন্দ্র প্রয়োজনবোধে কতখানি বিঘ্নী হতে
পারেন তার চেষ্টাও যেথেকেই অভয়া চরিত্রের মধ্যে ।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দাও একটি বিদ্রোহিনী চরিত্র । তবে তার
বিদ্রোহের জাত আলাদা, বিদ্রোহের কারণ ভিন্ন । দৈব জীবনের সমস্তাধি
সঙ্গে সে-বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই । সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞান পরিবারের কন্যা,
বধু হয়ে স্বভগ্নগৃহে আসার পর স্বভগ্নকূলের সকলের স্নেহ ও আদরে বেশ স্তব্ধ
তার দিন কাটছিল, কিন্তু একটি অস্ত্রাঘের প্রতিবিধানে ভেজাধিনী প্রতিবাদিনীর
ভূমিকা গ্রহণ করে সে আশ্চর্য চরিত্র-মহিমার পরিচয় দিল । কোন একটি
ঘটনার যেদিন সে জানতে পারল তার ভাবের অজিত সম্পত্তির সবটাই এক
অনাধিনী তান্তি-বৌ ও তার শিশুপুত্রকে ঠকিয়ে কৌশলে কেনা সম্পত্তি, সেদিন
সে মুহূর্তমাত্রেরও বিধা না করে স্বামী-পুত্রের হাত ধরে স্বভগ্নের ভিটা ত্যাগ
করে এক পোড়ো বাড়ীতে এলে ঠাই নিলে এবং জোরা ভ্রাতৃত্বাচার শত
উপবোধেও আর প্রাচুর্যের সংসারে ফিরে গেল না । অস্ত্রাঘকে কথ্যে গিয়ে
যেজ্ঞায় দ্বায়িত্ব বরণের এই গৌরবজনক ঘটনা আরও মহিমাম্বিত হয়েচে এই
কারণে যে, এই ক্ষেত্রে অস্ত্রাঘ অসতিষ্কৃত্য এসেছে এক গ্রামা নাগীর কাছ থেকে,
যে শ্রেণীর নারী জমিজমাত সংক্রান্ত বৈবয়িক বাপারে পুৰুষের প্রমত্তীন আহুগতা
স্বীকার করে নিতেই সচরাচর অভ্যস্ত । কিন্তু সুনন্দাও তেজটুই এসেছে কোথা
থেকে তা বুঝতে অস্বীকা হয় না । তার ভেজের উৎস হলো তার সরাসরিক
শাস্ত্রজ্ঞ শিতার শিক্ষা, যে-শিক্ষার ধর্মকে সব-কিছুর উর্দে স্থান দেওয়া হয়েছে ।
বাংলার অজ-পাড়াগাঁর অভ্যগ্নেরও যে এমন মহীয়সী চরিত্র থাকতে পারে সেইটা
একটা মত বাঁচোয়া ও সর্ববিধ প্রতিফলতা অগ্রাহ্য করেও বাঙালী জাতির টিকে
থাকার পক্ষে একটা মত বৃদ্ধি ।

কিরণময়ী একটি অভ্যাস্চর্য চরিত্র । এমন বুদ্ধিবীর্ণ সপ্রতিভ সর্বস কাব-
বৃত্তা সনাতনশাস্ত্র শাসনের বিকল্পে বিদ্রোহিনী নারী বোধকরি শেখপ্রসঙ্গের কমলও

নয়। কলকাতার নতুন ক্রিষ্ণময়ীর মূলগত পার্থক্য এখানে যে, কলকাতায় সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও আচরণে ভারতীয় নারীর স্বাভাবিকতায় সংযম বৃত্ত। সে একাধিক ভিথিতে হবিষ্যার করে, প্রায়ই আলু-ভাতে ভাত ফুটিয়ে খায়, কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন বহু তার জীবন। ক্রিষ্ণময়ীর ওসব বাগাই নেই। সে যা বিশ্বাস করে তা-ই করে। সে ঈশ্বর মানে না, শাস্ত্রের পবিত্রতার বিশ্বাস করে না, ভোগবান-বঞ্চিত শিক্ত নারীজীবনে স্বামী বর্তমানেই অনন্ত ভাস্কর্যের সঙ্গে অসুস্থিত লব্ধ পাত্তে। প্রতিহিংসার ভাঙনার পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা এবং তার প্রতি উৎসাহীন উপেক্ষাকে স্বীকার করার মতলবে তার অনন্তিক ভাট দিবাকরকে প্রলুব্ধ করে স্বামী যুদ্ধকে ভাগে, আরও কত কী করে। কিন্তু এ বৈষাচার অশিক্ষিতা নারীর বৈষাচার নয়, এর পিছনে আছে বুদ্ধি দিয়ে আচরণকে সমর্থন করার প্রথম মননশীলতা। শাস্ত্র পড়েই সে শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে শিখেছে। স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর সত্যতার সে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তর তর করে ঘেঁটেছে, তার ফলে শাস্ত্রনির্মাতা পুরুষদের কাপটা আর ভগ্নামিটাই শুধু তার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ সে পুঁজে পায়নি।

কিন্তু এমন যে স্ত্রীশিক্ষাশালিনী ক্রিষ্ণময়ী, সে কিন্তু শেষ বক্ষা করতে পারলো না। বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির মধ্যে বিপর্যয় হয়ে সে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল। শব্দেস্ত্র শেষ অবধি তাকে পাগল মানালেন কেন? তিনি কি ক্রিষ্ণময়ীকে তার বিশ্বাসে বিজয়িনী রেখে চরিত্রহীন উপভোগের অন্তিম উপলব্ধি করতে পারতেন না? এইখানেই ধাঁধা, আর এই ধাঁধার উল্লোচন-চেষ্টার মধ্যেই আমরা শব্দেস্ত্রের ব্যক্তিত্বের বৈষম্যতার পরিচয় পেতে পারি।

আমার মনে হয় শব্দেস্ত্র একই কালে একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী লেখক ও বক্ষণশীল প্রকৃতির স্বাপ্নয় ছিলেন। তাঁর বক্ষণশীলতা এসেছিল তাঁর ব্যক্তিগত কলীন ব্রাহ্মণের বক্ষাগত ব্রাহ্মণ্য স কারণ থেকে; আর বিদ্রোহের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাউলুলে ব্রাহ্ম্যমাণ ভবনুরে জীবনযাত্রার চক থেকে। কৌলিক সংস্কারে তিনি বক্ষণশীল আর জীবনচরণে তিনি বিদ্রোহী, বিপ্লবী। এই দুই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনও বক্ষণশীল সত্তা জয়ী হয়েচে, কখনও বিদ্রোহী সত্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ক্রিষ্ণময়ীর পরিচয় চিত্রণে, শব্দেস্ত্র বক্ষণশীলতার কাছে, আত্মসমর্পণ করেছেন। খুব সঙ্গত নিত্যক ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর সামনে দুটি বৃহত্তম এ ব্যাপারে পূর্ব-

উদাহরণের কাজ করেছে—বহিস্কেপের বিবৃতি উপস্থাপনের অধিবে কুশলক্ষীর
 বিশ্লেষণে আত্মহত্যা ও কৃষ্ণকান্তের উইল এর শেষে বিভলভারের ভূমিতে
 ঐক্যবিশিষ্ট বিবরণী যোগ্য হওয়া। শব্দচক্র অবশ্য আত্মহত্যা বা হত্যার পক্ষে
 যাননি মন্তব্যবিবৃতির পক্ষে কিংবদন্তীর ‘উদ্বাস্তগামিতার’ শাস্তিবিধান করে-
 ছেন। কিন্তু কল একই দাঁড়িয়েছে। ‘আত্মহত্যা বা হত্যা’ অন্তত দুটাই হোক
 আর উদাহরণসমূহ হোক, লৌকিক বিচারে দুই ধরনের অবস্থাই যুত্বের সামিল।

পূর্বসূরীর হত্যার ছাড়াও এ বাণীয়ে কিছু বস্তুগত কারণ শব্দচক্রকে
 বক্ষণশীলতার অহুতুলে প্রভাবিত করে থাকবে। শব্দচক্রের চিঠিপত্র থেকে
 তাঁর কতকটা আঁচ করা যায়। চরিত্রহীন ‘ভারতবর্ষ’ মাসিকে ধারাবাহিকভাবে
 প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতবর্ষ মাসিকের পরিচালকবৃন্দ উপস্থাপনাটি
 immoral বলে মত প্রকাশ করেন ও পাতুলিপি ফেরৎ দেন। স্বভাবতঃই
 শব্দচক্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে
 (প্রমথবাবু ভারতবর্ষ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) লিখিত এক চিঠিতে
 নিতান্ত আক্ষেপের স্বরে জানান, বইখনাকে immoral বলায় ভারতবর্ষের
 পরিচালকদের গৌড়ামিই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্যবুদ্ধি প্রকাশ পায়নি।

সে যাই হোক, তাঁদের যখন সকলেরই এত আপত্তি, সেটাজন্য ‘যাতে এটা
 in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করিব।’ (শব্দ সাহিত্য
 সংগ্রহ, ষাটশ সত্তার, পয়-সঙ্কলন, পৃ: ৩৬০)।

তারই ফলে কিংবদন্তী চরিত্রের অবশিষ্ট পরিণতি। পরিণতিটি স্বাধীন
 ইচ্ছা গ্রন্থত নয়, অতিমান গ্রন্থত।

ভাষার কোষাগার

সুখীর কুমার করণ

ভাষা হিসাবে সেই ভাষাই তত বেশি প্রগতিশীল, যে ভাষার শব্দভাণ্ডারে
 জমা আছে প্রচুর শব্দ-সম্ভার। শব্দই হচ্ছে ভাষার কোষাগারে সুলভান
 মণিযুক্ত। সেই কোষাগারে যতবেশি মণিযুক্তা সঞ্চিত থাকবে, ততবেশি
 শব্দে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। এই কারণেই শব্দের দেশ-বিচার এবং জাত বিচার

করতে নেই। শুধু থেকে যেমন জীবন্ত আহরণ করার বিধান আছে, তেমন বিবেশ থেকে শকাব্দী আহরণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ না-থাকই ভালো। অবশ্য, একবার অর্থ এ নয় যে,—নিবিচারে সব কিছুই গ্রহণ করতে হবে। কোন শব্দ গ্রাহ্য কোন শব্দ অগ্রাহ্য তা' বিচার-বিবেচনা করেই গ্রহণ করতে হবে। চেয়ারে না বসে কেদারায় বসবো কিংবা চলচ্চিত্র দর্শন না ক'রে সিনেমা দেখবো,—তা'ও কালের নিচারে নির্ধারিত হ'য়ে যাবে।

এ বিষয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। কমপক্ষে—হাজারের কাছাকাছি ভারতীয় শব্দকে ইংরাজ জাতি সাহেব বানিয়ে ফেলেছে। তাতে তাদের ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়েছে বেশি। বাংলা ভাষাও বেশ কিছু ইংরাজী শব্দকে জাতে তুলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে পরিমৃদু করেছে। সেই শব্দগুলিকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই শাউ দৃষ্টি পরানো হয়েছে। তা'তে তাদের জৌলুস বরং বেড়েছে, বলা চলে। লঠন, লাট, হাসপাতাল, মেম (সাহেব) পুলিশ, গেলান, লক্ষ, বাকসো, বেকি, আপিস, আশিল, রসিদ টেবিল-কে আর আমরা পিতৃগৃহে পাঠাতে রাজি নই। সেখানে ফিরে গেলেই ওদের চেহারা বদলে যাবে। ওরা হবে, ল্যান্টার্ন, লর্ড, হাসপিটাল, ম্যাডাম, পোলিশ, গ্রাস, ল্যাম্প, বক্স, বেক, অফিস, এপিল, রিসিট এবং টেব্ল।

এইভাবে অনেক নিদেশী শব্দকেই আমরা আশ্রয় করেছি, কখনো স্বরূপে কখনো বা ঘোমটা পরিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে সব ভাষাকেই টেকা দিয়েছে—ইংরাজি ভাষা। পৃথিবীর সব ভাষা থেকেই ওরা শব্দ সম্পদ আহরণ করেছে; যত পেরেছে দু'হাত ভরে নিয়েছে; তারপর পোশাকরস ক'রে তা'র বেশ কিছুকেই গৃহবন্দী করেছে। মহাত্মা, মহারাজা, রাজা, নওরোজ, দরবার, ধর্ম, কর্ম, নিবান, যোগ, গুরু এমন কি হট্টল অব্ জাগেরবন্টকেও ওরা অভিধানস্থ করে ছেড়েছে। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োজনীয়তা তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব কার্যে হওয়ার অনেক আগেই বেশ ভারতীয় শব্দ, ভারতীয় পদার্থবোধের সঙ্গে চালান চরে গিয়েছিল প্রাচীণ ভূখণ্ডে। গ্রীক ও রোমক বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রাচীনকালে বেশ জমজমাটই ছিল। হাতীর দাঁত, মণিযুক্তো, মল্লাপাতি, বেশমিগল প্রভৃতি আহরণ করা হ'ত ভারত ভূখণ্ড থেকে; সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভারতীয় শব্দও গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যেতো সেই সব দেশে। পরবর্তীকালে, অনেক

ভারতীয় শব্দ-রূপসী ঐগব দেশ থেকেই ইংল্যাণ্ডে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। কলে, ইংরাজিভাষায় সরাসরিভাবে ভারতীয় অনেক শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনই অনেক ভারতীয় শব্দ আরব-পারস্য গ্রীস-রোম পেরিয়ে চলে গেছে ইংল্যাণ্ডে। সেই সব শব্দরূপসীকে দেখলে এখন অবশ্য ভারতীয় বলে চেনা যাবে না, কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ তাদের ঠিকজী বিচার ক'রে জাত নির্দেশ করে দিয়েছেন। সেই প্রাচীনকালেই কর্পূর উড়ে গিয়ে ক্যান্ডর হয়ে গেল; মালয়ালম্ ভাষার শব্দ 'চন্দনম্' হয়ে গেল স্ত্রাণাল। শুধু কি তাই—শর্করা হয়ে গেল শুগার। আরব গিয়ে যে ভারতীয় শর্করা, শকর নাম নিয়ে আরব মুসল্লকের বালিন্দা হল,— তাই হল মিষ্টিমুখী শুগার। দক্ষিণ ভারতীয় 'মাংকা' হ'ল মাংগো। সংস্কৃত শৃঙ্গবের শব্দটি আরবদেশ আর গ্রীসদেশ দ্বারা দিলাতে পৌঁছে, হ'ল জিন্জাবার। এমন কি জিন্জাবেও প্রভাবে একটি ছীপের নাম-করণও হয়ে যায়—জান্জিবার। জান্জিবার ছিল ঐ বস্তুর ব্যবসায়িক ঘাঁটি। এ কালে অবশ্য আমরা 'শৃঙ্গবের' কে অজ্ঞাত ক'রে দিয়েছি। তাঁর স্থান নিয়েছে সংস্কৃত আদ্রিক-জাত 'আদা' শব্দ। যুগান্তের মৌরভ গিয়ে পৌঁছুলো 'মুক' থেকে; তাই হ'ল ইংরাজি মাংস্ক। তেঁতুলের প্রাণশব্দ ছিল আরবী ভাষায় ট্যামার শুধু ট্যামার নয়, ট্যামার-ই-হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুদেশীয় ট্যামার ইংরেজরা লুফে নিয়ে বানিয়ে দিল ট্যামারিন্ড।

এমনি ক'রে অনেক ভারতীয় শব্দ রূপসী তাদের অজ্ঞাতসারেই কখন পুরোপুরি হেতাজনা হয়ে গিয়েছে।

ওরা পান খেতে অভ্যস্ত নয়, পান ও-দেশের বস্তু ও নয়। কিন্তু ওদের শব্দভাণ্ডারে যার নাম বিট্‌ল (herel) তাঁর জন্মভূমিও ভারতবর্ষ। আর্য ভাষার পূর্ণ-জাত পান ওরা গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছে—মালয়ালাম্ ভাষার 'বেস্তিলা' শব্দ থেকে, যার অর্থ পান-ই। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, আমাদের 'পাট' ওদের ভাষায় জুট্‌। কিন্তু এই পাটবাণীকে ওরা পেলো কি ক'রে! আর, কোনরূপ লুটপাট করে সংগ্রহ করলেও, ওকে ওরা 'জুট্‌' নাম দিল কেন! ভাষাতাত্ত্বিকগণ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়িয়ে একসময় ইউরেকা বলে টেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—সব জুট্‌ জায় অর্থাৎ পাটকে ওড়িয়া ভাষায় ব'লে জুট-অ, মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে বলে জোট্‌। বালেশ্বরের বন্দর থেকে এই পাটবাণী তখন জাহাজে চড়তেন ব'লে সেই পিতৃগৃহের নামই তাঁর থেকে পেল ঈবৎ একটু পরিবর্তিত হ'য়ে। জুট্‌ হয়ে গেল জুট্‌। একসময় বাঙলাদেশের

খড়োবাড়ি ওদের এমনি পছন্দ হয়ে গেল যে, ওরা বানিরে কেললো ‘বাংলো’ । মালপত্র ভরতে হ’লে খলে চাই । ওরা নিয়ে গেল গানিবাগ । গানি হ’ল সংস্কৃত ঘোনি আর আর ব্যাগটি ওদের নিজস্ব । পতঙ্গীজ পাও মানেই কুটি, আমবা কিন্তু বলি পাউকুটি । তেমুনি ঘোনি মানেই ব্যাগ, ওরা বলে গানিবাগ ।

ইংরাজ বনিকরা একসময় এসে যখন বাবসা করার জন্য জাঁকিরে বসলো, তখন দাক্ষণ দাবদাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিক কারণেই লেনদেন হ’ত বটগাছের তলায় । এদেশী বেনেবা বটগাছের তলাতেই বসতেন । ওদেশী সওদাপাতি করার জন্য । ফলে বটগাছের সাহেবী নামই হয়ে গেল বেনিয়ান ট্রি অর্থাৎ বেনে-গাছ—অস্ত্রার্ধ বেনিয়া-বা যে গাছের তলায় বলে ‘বেওসা’ চালায় । এইভাবে বনিকদের জামার নামই হয়ে গেল বেনিয়ান ।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা বাবসা করতে এসে সোজাফজি বেশ কিছু ভারতীয় শব্দের সঙ্গে পরিচিত হ’য়ে গেল । ‘ম্যাংকা’ নামে দক্ষিণ ভারতীয় শব্দের কথা আগেই বলেছি, যার আর্থভাবার নাম অম্ম । কালিকটে এতো ভালো জাতের কাপড় বোনা হ’ত যে একজাতীয় কাপড়ের নামট হয়ে গেলো ক্যালিকো । ছিঁট বা ছিট কাপড়কে ওরাও নিয়ে গেল, নাম দিল—ছিঁট্‌ত্‌ (Chintz) । রাজা বিশ্বাবের জন্য সেপাই চাই ফলে এদেশী সৈনিকদের ওরা “সিপয়” বলেই চালিয়ে দিল । সেপাই যখন আছে তখন তার উদ্দিও চাই । ছাইবস্ত্রের বা থাক্‌ বস্ত্রের কাপড় দিয়ে বানানো হ’ল টুদি । ফলে—ওদের পোষাকের নামট হয়ে গেল খাখী বা খাকী । মাথায় ছাম্পো (হিন্দী) করতে গিয়ে ওরাই তৈরী করলো স্ক্যাম্প ।

এমন উদাহরণ আছে রাজার শব্দের ।

পালকি চড়ে মেমসাহেবরা নিজেদের ‘কুটিন’ বলে মনে করতে বলে—ওদের কর্তারা ভারতীয় পালকির নামের সঙ্গে ‘কুটিন’ ভেদে দিয়ে করলো পালাকুটিন । তামিল ‘কারি’ (বাংলা তরকারি) বেশভূষা না বদলেই সাহেবী গানায় ঢুকে পড়লো । মালয়ালী ভাবার উপর টেকা দিয়ে সেজন গাছের নামে ওরা টিক্‌ দিয়ে রাখলো । সেজন গাছের মালয়ালী নাম টেককা । ভারতবর্ষ থেকেই ওরা নিয়ে গেল ‘পায়জামা’ ।

আমরা সবাই জানি, বংশের ইংরাজি ব্যাপ্ত চা-এর ইংরাজি টি ! কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, ব্যাপ্ত আসলে মালয় দেশের এবং টি হচ্ছে চীন

দেখায়। এইভাবেই টম্যাটো আর পট্যাটো আমাদের কাছে নাহবে সেজে এলেও ওদের গাঁই গোত্র একেবারেই আলাদা। ওদের আদি বাল আমেরিকায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে ইংরাজি ভাষার যে সব শব্দ গৃহীত হয়েছে এবং এই গ্রহণ করার ঝোঁক এখনো যেমন প্রবল, তাতে স্বভাবতঃই এই ভাষার শব্দসম্ভার অল্প যে কোন ভাষার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। গ্রীক এবং ল্যাটিন্ ধাতু থেকে—ওরা তৈরি ক'রে চলেছেন নতুন নতুন শব্দ। ঐ সব গ্রন্থক হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বস্তুগুলোর উপর।

এই ভাবেই ওরা লুট করেছে—ছনিয়ার সব ভাষার কোথাগায়ে হানা দিয়ে। লুট করার কাজে লাগবে বলে 'লুট' শব্দটিকেও ওরা বন্দী করে রেখেছে। বেচারি লুট পুরোপুরি ভাষাতীর্থ লুণ্ঠন-বংশধর। ওদের স্ববাসের সঙ্গে আমাদের ডাকাত-কেও রেখেছে 'ডকোয়েট' নাম দিয়ে। শেষ পর্যন্ত "ঘেরাও" করার কার্যদাটা ভালো লেগেছে বলে ওকে ডেকে নিয়ে অভিধানস্থ করেছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে এখন ইংরাজির জয়যাত্রা। ইংরাজি ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে এই,—এ ভাষা অনেক কিছুকেই আপন-র ক'রে নিতে জানে। তার উদারতাই তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষার আসনে বসিয়েছে।

নির্বোধ

বার্ষিক রায়

সকালবেলায় নিশ্চিনৈমিত্তিক কাজে সকালবেলায় অনেকটা সময় কেটে যায় রতনের। স্বাস্থ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে থাকে, তারপর কোনোদিন হয় হয় কি হয় না, কিন্তু পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ে, কোনো বোধ হয় না, শুধু কাজ করে। কাজের মধ্যে বোধের বেদনা হারিয়ে যায়; অহুস্তব করতে পারে না। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি আছে; তাও একদিন হারিয়ে যায়; সতি কোনো নাগী আছে কিনা, অর্থাৎ যাকে নিয়ে গিটুইটারি গ্যাণ্ডের এতো কেরামতি। সেও একদিন মরে যায়। নিজেই হিটাব জালিয়ে চা করে, পাউকটি সৈকে, আলু ডিম সেদ্ধ করে, ডিম ছাড়ায়, আলু সেদ্ধর ওপর হুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দেয়, বাচ্চাদের দাঁত মাজিয়ে খেতে দেয়, এবং ঘড়ির কাঁটা

দেখে, কতোকণে সোরা ছুটা বাজবে, বাজলেই পোষাক পরিয়ে টেনে নিয়ে
 যায় ফুলে, ফুলে যেতে যেতে আঁচ করে নের তাকে বাজারে যেতে হবে।
 হাতে বাগ থাকে। বাজার করে কিতেই সকালের কাগজটা একটু পড়ে,
 তার পরেই চান করতে যায়, বাড়ি দেখে, সাইরেন বেজে উঠে, একটা ভাঙ্গা ও
 কোনোবাকমে মাছের তরকারি নিয়ে আলো চালের ভাত গেলে, ভাঙাভাঙি
 খেতে গিয়ে বুকে চাপ ধরে, মনে হয় মরে যাবে, চূপ করে বলে থাকে কিছুক্ষণ
 খাঙটা গলা থেকে পাকফলীতে যায়। যকুতে জমতে থাকে, তারপর আপিলে
 গিয়ে টেনসন কে কার নিকড়ে লাগছে, ক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যার বাড়ি ফেরে, এমনি
 ভাবেই সপ্তাহ কাটে, মাস কাটে, বছর ঘুরে যায় রতনের জীবনের আয়
 এগোয় অন্ধকারের দিকে, ঘন চুল পাতলা হয়ে টাক পড়ে, সটান গালের
 চামড়ায় কুকন দেখা যায়। এর মধ্যে চিন্তা ভাবনা অনুভব, দেশপ্রেম,
 স্বাধীনতা, বিদেশি শত্রু, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, কোর্ডের কেগামতি, সি-আই-এ
 ক্রেমিলিন ইনটেলিজেন্স গ্রুপ মার্কসবাদ ডাডিজম কোনো ব্যাপারই রতনকে
 নিব্রত করতে পারে না, তাড় তো এমনই হয়ে আছে, দেশের সংবাদপত্র ও
 সরকার এমনই রতনকে নয় করে দিয়েছে, শুধু মাসের শেষে বাজার করতে
 যাবার সময়, বুদির দোকানের বিল মেটাতে গিয়ে মনে হয়। শুধু নয় নয়,
 নয় হয়ে ফেলে গিয়ে কুকুরের মতো আশে পাশের লোককে কামড়াতে টেনে
 হয়, তবু লোকগুলি কেমন শান্ত নিবিকার, আর চেয়ারে বসে, ইনটেলেকচুয়াল
 দাড়ি বেখে মার্কসের উচ্চ মুনাকার থিওরি আওড়ায়, বৌকে বগল কাটা
 ও বুক খোলা ব্লাউজ পরিয়ে স্ননদ্রুত উঁচু করে লোকের সামনে বসতে দেয়,
 ঘন ঘন বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে যায়, আর যারা কাজ করে দিনে ছ'বেকে
 আট টাকা মজুরি পায়, তাদের অধিকাংশই চোরের দলে নাম লিখিয়েছে,
 ওয়াগন ত্রেকার ও মাস্তানদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে উপরি আয় করে, খায়, দায়,
 মেয়ে নিয়ে ঘোরে, ভোটের সময় তৎপর হয়ে ওঠে, তদলের কাছেই টাকা
 খেয়ে ফুলে ওঠে, বোম মারে, ছুরি চালায় শাসকবলের দলেও হয়ে গুলি ও
 বোম মারলে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে নেতার ডাকে ছেড়ে দিয়ে রসোগোজা
 চা খাওয়ায়, এই তো দিন, এই দিনের অর্ধ ঠাক্রি, রাতির মানে আলোর
 হাহাকার, হাহাকারে চিংকারে বন্ধ্য সময় স্থির হয়ে দাঁ করে আছে। শ্রুত
 পড়েছে, সকাল বেলা মলিনার চানর জড়িয়ে রতন বাজারে যায়, বাজার লাগ
 হয়েটার মোজা জুতো পরে কাপতে কাপতে হাঁটে, কুচাশার আশ্রয়ে সাধা

আরসা আচ্ছাদিত, সমস্ত শহরটা কুয়াশার ভয়, আকাশ আলো হয়ে গেছে
 দুর্গেবের মতো। কিন্তু শব্দও কোথাও নেই হাতে তুলে নিয়ে বাজাবে, কুয়াশার
 পত্বেকারে শোকার মতো মাত্রবগুলি কিলবিল করছে চারদিকে। রতনও
 এমনভাবে এগোচ্ছে শোকার মতো।

পথে যেতে যেতে দু'একটি লোকের সঙ্গে কথা হয়। হালসে, মুখ বাগান
 করে, প্রদারিত মুখ লক্ষ্যে হতে যায়, তারপর তুই স্ববিধতা ও জড়তা।
 তরকারি, মাছ, শাকসব্জি, ডাল ভাত এবং ভাতডাল সজ্জি শাক মাছ তরকারি
 আশিল কটিনওয়াক, ঘাম ক্রান্তি ঘুম না ঘুম জাগা মুখ ধোয়া ও চা পান চান
 করা ভাত খাওয়া, এই এই, এই ছাড়া জীবনের কোনো মানে নেই। নয়
 শুধু খেয়ে চেতনা জাগতে হয়, নতুবা চেতনা বা সংবেদনী মারতে হয়।

রতন একদিন অবাক হয়ে গেল বাজারে যেতে যেতে। রতনের ছেলেটাই
 দেখালো বস্তাকেকে, এর আগেও হয়তো দেখেছে, কিন্তু খেয়াল করে নি, কারণ
 বিষয় ও কৌতূহল নেই আর রতনের কেহানির চাকরি করে, তারপর দলাদলি,
 দলাদলি না করে এ হুগে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না, বাইরে পাটি, আপিসে
 সহকর্মী ঘরে বামী স্ত্রী ছেলেপুলে। হুতরাং বিষয় কোথায় থাকবে।
 দেখলো; এই সীতের সময় একটি সুন্দর লোক বসে আছে খালি গারে, পরনে
 একটা চেক কাটা লুঙ্গি, মাথায় অত্যধিক ময়লা গামছা বাঁধা, মুখে কোনো
 দাঁড়ি নেই, জ্বলপির কাছে চুলগুলি কাঁচালাকা বয়স চল্লিশ পরতাল্লিশ হবে,
 ভুঁড়ি বেগিয়ে পড়েছে, বুকের পুরুষ জন একটু ঝোলা। উচ্চতার চেয়ে
 শরীরের ব্যাপ্তি বেশি, চেহারা বং কালো, মনে হয় একতাল মাটির লুপ
 বসে আছে, চোখ দুটো গোল বড়ো বড়ো, সামনে একটা স্তাকড়া পেতে
 দিয়েছে, চার কোণে চারটে ভাঙা ইট দিয়ে চেপে রেখেছে, যাতে কাপড়টা
 উড়ে না যায়, একটা অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙা টোল খাওয়া টোলকানো যগ,
 যগটাকে একটা হুটো করে নারকোলের দড়িতে বেঁধেছে, মগের ভেতর জল,
 জলের মধ্যে এক খণ্ড ইট, আর একটা কাটি, দড়িটার অনেকগুলি সিঁট,
 কোমরের কাছে জড়ো করানো দড়িগুলি পাকিয়ে আছে, লোকটার পাশ দিয়ে
 গেলে লোকটা কিছুই বলে না শুধু মোহের মতো দৃষ্টিতে টলটল করে তাকিয়ে
 থাকে, চোখ তুলে দেখে, কথা বলে না। এ ছেন নিরীহ প্রাণীর ভিৎকে
 জ্যোটে না, করুণা পরবশ হয়ে দু'একটি মুদ্রা হয়তো ছুড়ে দিয়েছে সব শুক
 ব্যাকো পনেরো পরশা হবে। রতন পরশা দেয় না, পাঁচটা পরশা দিয়ে শুধু কি

উদ্ভক্তি হবে, আর বতনও রোজ পাঁচ পরশা করে দিতে পারে না, নিজেই ভিখিরি স্বভাবে আর কি হবে। কিন্তু এই মাটির মতো তুলকার বলবলে লোকটাকে দেখবার জন্তে এখন প্রতিদিনই সকালে বাঁঝারে যেতে বতন একটা কৌতূহল বোধ করে। কোনো নিদিষ্ট জায়গায় বসে না, আজ বসলো তুমুসো বাগের ওপর বাঁঝার ধারে একটা গলির মোড়ে, পরের দিন বড় বাঁঝার পাশে বাসের বাঁঝার ওপরে পরের দিন একটা চারের দোকানের পাশে, এতো নিরীহ, গোটেবচারা লোক আমি দেখি নি, বতন ভাবে। চঠাৎ একদিন দেখে দাড়িতে যুথ ভরে যান, ডাইনিদের মশ্র নোংরা মতো কাঁচা পাকা দাড়ির সঙ্গে ময়লা জমে থাকে, স্নাত করসা। বতন একদিন ওর সামনে দাঁড়ালো, দেখলো শুকে, শুকে দেখলো পেয়েই ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখালো, ইঙ্গিত করলো ছড়ানো স্নাতার কিছু পরশা দেয়, যুখে কোনো স্বপ্ন নেই, ধনি নেই, উদ্ধার নেই, বতন ওর সামনে দাড়িয়ে বইলো, চোখটা নাচালো যুখটা নাড়ালো একটু, তুল শরীরে দেখটা একটু কাঁপলো শুধু, বতন পরশা দিলো না, বুঝতে পারলো বতনের কাছ থেকে পরশা পাওয়া যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে ড'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে জানালো, কিছুই না ? কিন্তু কোনো কথা নেই। তারপর আপনমনে মগটার দড়ি ধরে টানলো, একটু শব্দ করে উঠলো তারপর মগটাকে আবার মাঝখানে স্থাপন করলো, এবার আপনমনেই একটু একটু নাড়লো দড়িটা, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বইলো কিছুক্ষণ, কোনোদিকে ভ্রক্ষেপ নেই, বতন লোকটার শরীরের চারদিক দেখছিল, সত্যি মোষের মতন গায়ে ময়লা, মাছি, অশ্লুপোকা বসে, গঠে না ওর শরীর থেকে মাঝার তুলগুলি পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে, আজকে আর মাঝার পাগড়ি নেই, এতো নিস্পৃহ আনন্দের বিশালতা কোথাও দেখা যায় না, বাস গাড়ি ট্যাক্সি, যান, খুলো ওড়ে, শুকে ঢেকে ঢেকে ফেলে, আচ্ছন্ন ফেলে দেয়, কিন্তু ও ঠিক মাটির মতোই স্থির, মাটিতে মাটি পড়ে পুঁক হয়ে ওঠে।

লোকটা তাবা ও কাল। চোখের ও স্পর্শের নোদ আছে, এই বোনেই সে তাকায় কিন্তু ওর শরীরের তুলতা ওর স্পর্শবোধকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। এই চোখের দেখার জগৎকে সে জানে। বতন বুঝতে পারে না, কে শুকে খাওয়ায়, খাবার জোটে কি করে, এবং শরীরটা ওর ঠিকই আছে, ব্যাধি বা বিস্ময় নেই, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে, প্রকৃতি শুকে প্রকৃতির সজ্জার মতো শুকে করে রেখেছে যেন, তাই বৌত্রে শিশিরে বৃষ্টিতে সামনে ছড়ানো

জাকড়া পেতে ময়লা ঘাসে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে পৃথিবীর দাব-দেয়, আনন্দে কারণ ওর চেতনা নেই, প্রতিস্পর্শী হবার ওর আসনা নেই, বিচ্ছিন্ন বস। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় লোকটা পুলিশের স্পাই নয়তো। কি জানি হতেও পারে, স্পাই, ভিথিরি, অচেতনতা, হতা ও অপরাধ একই, চেতনার মধ্যেই পাপপুণ্যের পার্থক্য। পাখির গানে পাপও নেই পুণ্যও নেই, আছে শুধু প্রকৃতি, মানুষ তাকে সৃষ্টি করেছে চেতনার, তাই মানুষের হৃদয়ে তাই তার অহংকার, এই অহংকারই তাকে মৃত্যু এনেছে। লোকটার সঙ্গে প্রকৃতির কোনো ষোণ নেই, লোকটাকে প্রকৃতিই টেনে নিয়েছে কোলে। না এসব কি ভাবছে রতন। এও মনের এক বিকার। শীত গড়িয়ে শ্রীপক্ষী আসে, বাতাসে উত্তাপ উপলব্ধি করা যায়, জড় পৃথিবী জড়িয়ে জড়িয়ে ওড়ে পৃথিবীর গায়ে রতনের জগৎও এমনি গড়িয়ে চলেছে, শুধু আয়ুর নয়, কোনো তাৎপর্য কোনো ইন্সটি কোনো ভবিষ্যৎ কোনো ইতিহাস নেই, তবু বেঁচে আছে, কারণ মৃত্যু হচ্ছে না, মৃত্যুর একটা কি অর্থ আছে, কি জানি, রতন তাণে এখন গেলেই হয় শীত চলে যাবার পর প্রথম বৃষ্টিতে প্রচুর মশা জন্মে, তারপর কোথায় যায়, পৃথিবীতে প্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভদের প্রাণ সৃষ্টি করে নথ দেয়, পৃথিবীর চামড়া ওপর কয়েকদিন শুষ্ক হুড়ি কেটে তারপর পৃথিবীর চামড়াও ভেতরে আলো বাতাসে লুকিয়ে পড়ে, পৃথিবীর কত অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে সবচেয়ে, আমরা তার কোনো বোঝ খবর জানি না, তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে রতন নামে এক প্রাণী বা কীট যদি মরে যায়, তাহলে এমন কি হবে?

না, আর এই লোকটাকে দেখবার কৌতুহল হয় না, শুকে দেখার প্রথম বিষয় হবে মরে গেছে, জড় পৃথিবীতে লোকটা জড়ের মতোই রতনের মনের কাছে লেপটে আছে, রতন কোনো বোধ নেই। শুকে দেখে মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক। এটাই হওয়া উচিত।

কথা শোনে না, কথা কইতে পারে না, স্ববির, ময়লা, নোংরা, কালো খলবলে মাটির মতো চেহারা যুল লোকটা নিরীহ গোবেচারা মতো চেয়ে থাকে, এমন কি শুকে কেউ ঘৃণাও করে না, করুণা করে একটা পরশাও ছুঁড়ে দেয় না, ও আছে, অথচ কোথাও নেই, আয়ুর অঙ্ককারে আকাশের নীচে চিত্তার আঙনে নিবিকার লোকটা একদিন শেষ হয়ে যাবে নিঃশেষে। রতনের হঠাৎ মনে হয়, ওর কাছের পৃথিবী এমনি লোকটার মতোই অসলা প্রাণীর

মতো নিশ্চয়ের লক্ষ্যে মরলা হয়ে জড়িয়ে আছে, কোনো চেতনা নেই, কণা নেই, শোনে না, উচ্চারণ করে না শুধু খুল মাটির মতো মাটি হয়ে বলে আছে সামনের কুটিতে ধুয়ে যাবে বলে । এই জগতেই বাস করছে সে এখন ।

দুদিন বাজারে যানি কুটির জন্তে । তৃতীয় দিনে বাজারে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখলো সে । হাজার শ্রাকড়া কুড়নে ডাটবিনে মরলা খুঁটে খাওয়া-কয়েকটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে লোকটার সামনে, একটা বাচ্চার ঠোঁট এত চওড়া ও উন্টানো যে অলীকতা লেগে একটা কাঁচা মাংসের থকথকে ছবি নিয়ে আসছে, চোখটা উন্টে বেরিয়ে পড়ছে, নরক থেকে বেরিয়ে এসে হাজার মিছিলে দাঁড়িয়ে আছে । ওরা নিরাকার লোকটাকে ইট মাথছে, কৌতুকে, আনন্দে, নিঃস্বভাব । লোকটার টাক মাথাটার ওপর লেগে কিছুটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে, রক্ত গাল বেয়ে নীচে নামছে, ওর সামনে বিছানো শ্রাকড়ার ওপর, দু' একটা তপ্ত রক্ত পড়ে জমে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু লোকটার কোনো চেত-
 তেন নেই, দেখছে, আর বুড়ো আঙুল তুটো উঠু করছে, চোখ দুটো গোল গোল করে তাকাচ্ছে কিন্তু উঠে না পর্যন্ত, সেই নরক বিছানো বাচ্চাটা আর একটা চাকলা মাথলো, লোকটার মাথার অ'ঘাত করলো ঠং করে, কিন্তু কিছু বললো না, শুধু একটু রক্ত বেরিয়ে পড়লো । রতন বাচ্চাগুলিকে একটু ভাড়া দিয়ে ধমকালো, ওরা তেলে দৌড়ে গেল দূরে ।

নির্বোধ লোকটা নীরবে নিম্পৃহ বসেই আছে, মাথা থেকে পায়ের কাছে শুধু রক্তের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে, মাটিতে মিশে যাচ্ছে, লোকটা বসেই আছে নিম্পৃহভাবে । রক্তও ওর চেতনাকে নাড়াতে পারে না ।

ত্রিপুরী ফুমুগ

—জগদীশ গণচৌধুরী

বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে এবং আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আগেকার নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরা বর্তমানে তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্য । এই ক্ষুদ্র প্রদেশটির আয়তন মাত্র ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা, ১৯৭১ সালের আদমশুমারী মতে, ১৫,৫৬,০৪২ । এ রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; এছাড়া আছেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপজাতি ।

এখানকার উপজাতিরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যেমন—ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জয়াতিয়া, বিয়াং, উচট, হালাম, কুকি, লুসটি, মঘ, চাকমা প্রভৃতি।
 নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উপজাতদের সংস্কৃতি সরল, আর সমতলবাসী বাঙালিদের সংস্কৃতি জটিল। সরল ও জটিল এই দু'ধরনের কৃষ্টি দীর্ঘ কয়েকশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করলে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সংমিশ্রণ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। তবে সরল সংস্কৃতির উপর প্রভাব পড়ে বেশি এবং এতে পরিবর্তনটাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। জটিল সংস্কৃতি দেয়, সরল সংস্কৃতি নেয়। এটা বিশ্বজোড়া রীতি। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বেলারও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জয়াতিয়া ও বিয়াংদের কথাভাষায় বহু সাধারণ প্রবাদ ও ধাঁধা রয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—তাদের ধাঁধার নমুনা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা। তাঁদের ভাষায় ধাঁধাকে বলা-চয় ফুসুং। তবে এসব ধাঁধা শুধুমাত্র গ্রাম্য ত্রিপুরীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অস্ট্রাল সম্প্রদায়ের লোকেরাও এগুলো বলেন। প্রতিটি ধাঁধাকে (ক) (খ) ও (গ) এই তিন অংশে ভাগ করে প্রথমাংশে ত্রিপুরীভাষায় ধাঁধাটি বলা হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে বাংলা অনুবাদ এবং তেতাংশে সমাধান বলে দেওয়া হয়েছে।

আর দশটি ভাষায় ব্যবহৃত ধাঁধার যেসব বৈশিষ্ট্য ত্রিপুরী ধাঁধারও সেসব আছে। ধাঁধায় থাকে প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা ও সমাধান। প্রশ্ন বা সমস্যাটি স্পষ্ট ও পরিষ্কার; কিন্তু উত্তর বা সমাধানটি বাহ্যিক কলহের ও রূপক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আসলে যা বোঝাতে চায়, তাকে উপমা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়। প্রশ্নকর্তা যেন গাছেব পাতায় পাতায় বিচরণ করেন; উদ্দেশ্য—উত্তরদাতার মনোযোগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করে, চিন্তাকে ধাঁধিয়ে জলখোলা করে, তাকে নোকা, আর নিজেকে চতুর বলে আহ্বির করা। এভাবে ধাঁধা কিছু-কণের ক্ষণ সংবেদন সৃষ্টি করে; এতে—বুদ্ধিগতির চর্চা হয়, সাময়িক নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় এবং সারাদিনের শারীরিক শ্রমজনিত কষ্টের লাঘব হয়। ধাঁধা আস্ত গবেটকেও ভাবিবে তোলে, দূর দূরান্তের কল্পলোকে বিচরণ করায় এবং কদাচ 'সমাধান' দিতে পারলে নিজেকে বড়ই চালাক ও বুদ্ধিমান বলে দাবী করার সুযোগ এনে দেয়। ধাঁধার স্রষ্টা কে বলা মুশ্কিল; তবে সামগ্রিকভাবে একটি সম্প্রদায়ের বুদ্ধিদীপ্ত সরল চাতুর্যের, আকর্ষণের, পরিবেশের ও পরিবর্তনের অন্ততম সূচক হ'ল ধাঁধা।

১। ক) অর-অ হুগ-অ, ধূনা তুলো ও এলোমেলো
অর-অ হুগিয়া, স্রতো,
থরাইলুংনি মুসা। ধানক্ষেতের নাড়া,
খ) এখানে দেখা যায়, বাঁশের বেড়া।
এখানে দেখা যায় না,
তারাবনের বাঘ।
গ) বিড়াত চমক।

২। ক) আ-ম পুংলাই মুলাইয়া, গ) বিড়াল।
হুত ছাতাই হুক ছাইয়া, ৪। ক) কপাংন কুপট চা-অ
পেপ বাই নাই ওয়া সাইয়া, খ) মরাকে গায় জাঙ্জ।
চামাম কুচুক কানগিয়া গ) বিড়শির টোপ দিয়ে মাছ ধরা
খ) ব'ঘের মতো শব্দ করে, কিন্তু ৫। ক) গলা চমক খেপ তকটয়া।
বাঘ নয়, খ) যে কলস কাঁকে নিতে অস্থির
বনজঙ্গলেও মতো অথচ বন গ) ডিম।
জঙ্গল না, ৬। ক) চারকোপা পুকুরি
বাঁশের কঞ্চি ভাজতে যেমন আচুক তংগ চৌধুরী।
শব্দ হয়, তাই হয়, কিন্তু খ) চতুষ্কোণ পুকুরে
কঞ্চি নয়, বসে আছেন চৌধুরী।
পাহাড়ের মতো খাড়া, তবে গ) পিঁড়।
পাহাড় না। ৭। ক) চিবুক কুপট লামা হিম
গ) তপুয়াই পাখী, খ) মরা সাপ পথ দিয়ে চলে।

- গ) গো-বান্ধবের দড়ি ।
- ৮। ক) চেলসা কাইসা করা কুরইন
বুলাং তান ।
খ) একজন কাঠুবিয়া দা/বুড়োল
ছাড়াই পাছ কাটে ।
গ) কাঠটোকরা পাখী ।
- ৯। ক) তাংগ ঈয়া অগ,
নাইলাই ভুগ লাটয়া ।
খ) হাত দিয়ে ধরা যায় কিন্তু
চোখে দেখা যায় না ।
গ) নিজেব মাথা ।
- ১০। ক) তুট কুরই ক চক ।
খ) জল ছাড়াই নৌকা চলে ।
গ) দোলনা ।
- ১১। ক) তুট ককং ককং
খ) জলের ধারে বসি বাওয়া ।
গ) জুমে কাওন ধানের দোহুলা-
মান পাছ ।
- ১২। ক) তাখুক নটরগ, লামা সেগলাই
খ) দুই ভাই লব নিয়ে কাড়াকাড়ি
করে ।
গ) মাহুবের দুই পা ।
- ১৩। ক) তান খেলে খুটয়া,
তান খেলাই খুটনাই ।
খ) কাট্লে মরে না,
না কাটলে মরে ।
গ) সছোজাত শিক্তর নাভি ।
- ১৪। ক) তুট সিচিং বিচিং, আবিসা মুখ
খ) জলের ভেতর শিক্তকে বুঝ
পাড়ায় ।
- গ) স্কন্ধবার বীধ ।
- ১৫। ক) জীখুকনই কান মলাই ।
খ) দুই ভাই কুড়ি লড়ে ।
গ) দোচালা ঘরের চাল ।
- ১৬। ক) তাখুক চিনিরগ দগাখাওঅই
বুলাই ।
খ) দুয়ার বন্ধ করে সাতভাই
নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে
গ) খটতাজা ।
- ১৭। ক) তুট ককং ককং হামচাং চাকড়া
খ) নদীর তীরে আগুন জলে ।
গ) জোনাকি পোকা ।
- ১৮। ক) দন দস্ত লগর-অ বগড়-অ,
জন-অ দস্ত খরপ্ ।
খ) বুলে নাড়ালে শব্দ হয়, বন্ধ
করলে শব্দ হয়ে ওঁটে যায় ।
গ) তালা ।
- ১৯। ক) নক বুং বুং ফকিসা মলা ।
খ) প্রতি ঘরে ফকির নাচে ।
গ) ঘরের চালে দোহুলামান খুল ।
- ২০। ক) নগনি বেয়ে নক বুসা ।
খ) ঘরের ভেতরেই ছোট ঘর ।
গ) মশারী ।
- ২১। ক) নখা গুরুম, ওয়াতই ওয়াইয়া
খ) মেঘ ডাকে, অখচ বৃষ্টি হয় না
গ) হকো ।
- ২২। ক) নাইচা জুকছাও, তাংছা টা-
জুক ইয়া ।
খ) দেখা যায়, কিন্তু ধরা ছোঁয়া
যায় না ।

- গ) আকাশ ।
- ২৩। ক) নখা লাকাও কুখই বির-অ ।
খ) আকাশে মরা পাখী উড়ে ।
গ) উজ্জীরমান হুড়ি ।
- ২৪। ক) পুমালে হিম-ইয়া,
হুড়িচে হিমু ।
খ) ছাগল হাতে না, হুড়ি হাতে ।
গ) কুমড়ো ও কুমড়োর লতা ।
- ২৫। ক) বুঝা কা বর বগ
বুঝা ত বর বগ ।
খ) মা যতট কঁদে,
সন্তান ততট বলে ।
গ) কর্মরত চরখা ।
- ২৬। ক) বুঝা ফাংখা,
বুঝাট বাটসা,
বুঝলট লেখাই পাটয়া ।
খ) গাছ কিনটি,
খোলস একটি
বীচি অগণিত ।
গ) উত্তন, ডেকচি ও ভাত ।
- ২৭। ক) বাব কর্ম, বাব নাই
আছুক পেখা, আছুকনাই ।
খ) হলুদ রং-এর ফুল,
পদ্মাসনে বসে আছে, পিড়ি
নাই ।
গ) কুমড়োফুল ও কুমড়ো ।
- ২৮। ক) বুঝইয়া মাসামছাওঅ,
ভাই ছয় কুড়ি ছয় জন
মছাওঅ ।
খ) এক মহিলা নাচার,

- নাচে ছয় কুড়ি ছয় জন ।
- গ) ফুলোর ভুলে খান ঝাড়া ।
- ২৯। ক) বুঝাই আই মিলিক, বুলাই
লাই মিলিক
চাখাইলে খুরিক মুরিক ।
খ) ফলভুলো ফলর, পাতাভুলো
চিকন,
নেলে মুখ আঁকা বাকা হয় ।
গ) লছা ।
- ৩০। ক) বুঝাং হাংসা
বুলাই লাটসা ।
খ) গাছও একটা
পাতাও একটা ।
গ) হাতপাখা ।
- ৩১। ক) বাগ খুংসা পুস পলবাটয়া ।
খ) একটি বাগানে ফুল ভুলে শেষ
করা যায় না ।
গ) নক্ষত্রখচিত আকাশ ।
- ৩২। ক) মাইতাং ভাংসা নক কুমলং ।
খ) একচড়া মানে সব ভরে যায় ।
গ) জালানো বাতি ।
- ৩৩। ক) মাইমুং রাপাই তুট বাবাগিরা
খ) হাতীর পায়ের ছাপমারা
যায়গায় জল জমে না ।
গ) কচুপাতা ।
- ৩৪। ক) রাজানি গাই কাকিসা বাখে
তাকেন তুই তাংগ ।
খ) রাজার গাট একবার মাত্র
প্রদত্ত করে মারা যায় ।
গ) কলা গাছ ।

৩৫। ক) রাজানি লাখা তাংগই মাইয়া।

খ) রাজার লাঠি ধরা কষ্টকর।

গ) সাপ।

৩৬। ক) রাজানি কিচিপ তাংগই মাইয়া।

খ) রাজার পাখা ধরা যায় না।

গ) ভীমকলের বাসা।

৩৭। ক) রাজানি পাকডী সরচিনি সবই সবাই লাংলিয়া।

খ) রাজার পাগড়ি ভাঙ্গ করতে করতে শেষ করা যায় না।

গ) দীর্ঘ পথ।

৩৮। ক) দা কুরই নকতাং

খ) দাঁ ছাড়াই ঘর বানায়।

গ) মাকড়সার জাল।

৩৯। ক) বুমা অংখা থমথম

বুমা অংখা বাগেয়েং ধোয়ং।

খ) মা বেশ আছে, ছেলে নাচছে

গ) ধান ভানার চামামকিস্তা।

৪০। ক) মুশই বাংচাক খাবু ককক,

তখা কচুম বাক কক।

খ) সোনার চরিত্র যতই পালায়

পেড়নে কাল কাক ততই বসে

গ) জুয়ের টিলার আঙনের লাগ

শিখা এঁবং পবে রাশি রাশি

কাল ছাই।

শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিন/মনীষিমোহন রায়

‘শিল্পের ইতিহাস কী মনোহর। মার্কসবাদীর পক্ষে কতই না শেখবার... শিল্পচর্চায় নিজেকে নিয়ম করবার সময় এবং স্রুয়োগ আমার হ’ল না, হবে না— একথা ভেবে সত্যিই বড় দুঃখ হয়।’—এই ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর শিল্পগতপ্রাণ কোনো রসসেন্সার নয়, এ উক্তি বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাজিত স্রষ্টা ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিনের—শিল্পের মনোহর বিষে যাঁর ছিল সজাগ ও সমর্থ দৃষ্টি। অল্পময় এক পরিশীলিত চেতনায় শানিত, অতুলনীয় এই মাত্রটি অকৃত্রিম অতুলক্লিসায় পাঠ করেছেন পুণকিন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাবলী। আর গোকির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংঘর্ষ ইতিবৃত্ত তো সর্বজনবিদিত। লেনিনের সজাগশোভন কিরণসম্পাতে গোকির জীবনগ্রন্থেই ছিল আলোকিত, উজ্জীবিত। সাহিত্যে গোকির সেই অবদান শুধু বাণিজ্যকেই উজ্জ্বল করে নি—ভরা থেকে গৃহাবশি ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে তার চূর্ণর জোয়ার।

সেই দুর্বার জোয়ারের অস্বাভাবিক যৌবনটিকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে বিবেক সর্বহারা মানব-সংসার। লেনিনের নেতৃত্বে এক নতুন প্রাণের আলোর স্পর্শ হয়েছিল একদিন কশমের শৈত্যের কাছার—তারপর অচিরেই দেশে দেশে ছড়ালো তার জালায় জালায় ইস্তাহার।

মারখাওয়া সেট, পোডখাওয়া সব লক্ষ মানুষ বহুগুণের পরিজ্ঞানহীন প্রভাবণা আর নিরক্ষণ শোষণের নষ্টনকে নির্ভয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে টকটকে লাল সূর্যের সম্মানে ভাস্বর হয়ে উঠলো। প্রমাণিত হ'ল, সমাজতন্ত্র অপরিণামদর্শী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই হুমকির ফলশ্রুতি। পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত তার ধ্বংসের মাধ্যম। শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামের কঠিনকঠোর পথ ধরে অনেক অসুখাগ্রের বিনিময়ে রক্তের অক্ষরে অনিবার্যভাবে বহন করে আনে সেই মাধ্যম—কবির রচনা করে মানবতার চরমতম শত্রু।

চিরায়ত কণ সাতিতোর প্রতি লেনিনের ছিল তৃণভীর আকর্ষণ। ব্যক্তিগত পাঠাগারে অসংখ্য কবিতা এবং সাহিত্যগ্রন্থে লেনিন রচিত মন্তব্যগুলি সেই অতুষ্কৃত অভিনিবেশেরই উজ্জল উদাহরণ। বিপ্লবের পর এক সময় তরুণদের যখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের প্রিয় কবি কে?' তরুণবৃন্দ সোৎসাহে উত্তর দেন, 'মায়াকোভস্কি'। উত্তর শুনে লেনিন সন্তুষ্ট হতে না পেয়ে হেসে বলেন, 'আমার তো মনে হয়, পুশকিন আরও ভালো'।

কবিতা এবং কবিতার কবি লেনিনকে আলোড়িত করেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কবি অক্ষর মিত্র সমৃদ্ধিত লেনিন রচিত তিন শতাধিক পংক্তিবিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতাটির (যতদূর জানা যায় এইটি তাঁর একমাত্র কবিতা) এবং অশ্ল-বাহকের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি : 'একদিন বালটিকের তীরে বেড়াতে বেড়াতে লেনিন তাঁর সঙ্গীকে বলেন যে পাঠি জনগণের মধ্যে প্রচারণার ক্ষেত্রে কবির কর্মকে যথেষ্ট ব্যবহার করেছে না ; তাঁর জুখে এই যে, প্রতিছন্দী সোস্তাল-রেকল্যুশনারি হল এ বিষয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। কাব্য সৃষ্টি যার তার কর্ম নয়, তাঁর সঙ্গী একথা বলতে লেনিন বলেন যে, যার এমন লেখার হাত আছে, যথেষ্ট পরিমাণ বৈপ্লবিক সদিচ্ছা আর বুদ্ধি থাকলে সে বৈপ্লবিক কবিতাও লিখতে পারে। সঙ্গী তাঁকে চেষ্টা করে দেখতে উপদেশ দিলে তিনি একটি "কাব্য" রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তিন দিন বাধে পড়ে শোনান। এই দীর্ঘ কবিতায় লেনিন ১৯০১-১৯০৭ সালের বিপ্লবের একটা চিত্র চিত্তেছেন যাকে তিনি বলেছেন প্রথম "বসন্ত", তারপর রূপ

দিয়েছেন প্রতিক্রিয়ার, যাকে তিনি বলেছেন “শীত”, আহ্বান দিয়েছেন মুক্তির
জন্তে নতুন সংগ্রামের ।’ লেনিন রচিত উক্ত কবিতার কিছু অংশ :

বসন্তকে বরফের শিকলে বেঁধে
শীত-জন্মান অকালে মারলো তাকে ।
কাঁদার ছোপের মতো এখানে ওখানে দেখা যায়
তুষার কবরে শোয়া শোচনীয় গ্রামগুলির
ছোট ছোট কালো গির্জাচূড়া ।

অপর কিছু অংশ : —

আমাদের উপর নেমে এল উজ্জল সূর্যের বসন্ত,
ম্রিয়মান দুর্গত দেশে স্বর্গের উপহারের মতো,
জীবনের অগ্রদূতের মতো, সেই লাল বসন্ত !

* * *

অকস্মকে লাল সূর্য তার রশ্মির তলোয়ারে
ফেড়ে ফেললো মেঘ, ছিঁড়ে গেল কুয়াশার শবাজ্জ্বলন ।

* * *

নিদ্রিত মানুষকে আকর্ষন করলো সে আলোকের দিকে ।

* * *

নদীর মতো প্রবাহিত হল জনতা
যেমন করে বসন্তে জেগে ওঠে জগজ্জ্বাত ।

বেটোফেনের সঙ্গীতের প্রতি অপরিণীম অহুঃসারের কথা উল্লেখ করে তাঁর
এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী লিখেছেন, ‘বেটোফেনের সিম্ফনি শোনবার সময় লেনিনের
ভাবান্তর দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে যাই ।’ লেনিনকে দেখা যেত
সদা কর্মব্যস্ত — কিন্তু বেটোফেনের সঙ্গীত আসবে লেনিন যেন বসেছিলেন
নিপলন্দ...সেই অপরূপ স্রবসৃষ্টির মধ্যে নিজেকে তিনি একেবারে মগ্নে দিয়েছিলেন ।’

বিপ্লবের পর লেনিনের নির্দেশানুসারে সর্বপ্রথম উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষাকে
সর্বস্তরের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে একই সারিতে স্থান দেওয়া হয় । যদিও লেনিন
তথাকথিত সংস্কৃতিবিশারদ ছিলেন না এবং পল্লবগ্রাহিতা যেহেতু ছিল তাঁর
অভাববিকল্প সেহেতু, শিল্পসংস্কৃতি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ভাষা তিনি রচনা করে
যান নি — কেননা, সদাসক্রিয় কর্মময় জীবনে সে সময় বা স্রয়োগ তাঁর ছিল না ।
তথাপি, লেনিনের পত্নী ও অস্তরঙ্গ সহযোগিনী ক্লুপস্কায়া (যিনি ছিলেন ।

‘বিশিষ্ট রাষ্ট্রকর্মী, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাচীন লক্ষ্য ও বিখ্যাত শিক্ষাবিদ’) বিবরণে জানা যায়, লেনিন চিরায়ত সাহিত্যের শুধু একজন নিখিষ্ট পাঠকই ছিলেন না, ছিলেন তাঁর স্বসংস্কার সমালোচক। পুশকিন, তুর্গেনেভ, লেবমস্তভ, নেক্রাসভ, চেনিশেভস্কি, ডলন্তস, চেকভ, উসপেনস্কির থেকে গোটে, হাইনে, গোর্কি এবং দেশ-বিদেশের আরো অনেকে ছিলেন তাঁর স্বদয়সনে প্রতিষ্ঠিত।

সঙ্গীতের সূক্ষ্মগ্রাসারী প্রণোদনা তাঁকে খুবই উদ্দীপ্ত করেছে এবং নিভৃত গৃহকোণে সঙ্গীতের কলি নিজকর্ণে গেয়েছেন বহুবার। সাইবেরিয়ার নির্ধাসন-কালে লেনিনকর্ত্তের সঙ্গীতধ্বনি প্রায়শই মুখের করে তুলতো নিকেতন। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, ‘গানের কথাগুলি তাঁর কণ্ঠে কী ভাবে বেজে উঠতো তা না শুনলে বোঝানো মুশকিল।’

ডলন্তসের ‘জীবন্ত শব্দ’ নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন লেনিন; আবার কোনো কোনো নাটকের ‘অকিঞ্চিৎকরত বা অভিনয়ের অবাঞ্ছনীয়তা’ বিবর্ত হয়ে উঠতেন। যথার্থ স্বসংস্কার মতোই অহেতুকী নাট্যকল্পনা বা মেলোড্রামাপূর্ণ দৃশ্যের শিথিল উপস্থাপনার ইপ্সিয়ে উঠতেন লেনিন। পক্ষান্তরে, সঠিক শিল্পগুণ সমন্বিত নাটক্যভিনয় দেখে যথাসময়ে সোজাসে বলে উঠতেন, ‘বেশ উৎসাহে’।

বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও শিক্ষার জনকমিশার (যিনি শিল্প-সংস্কৃতি প্রশঙ্গে নানা প্রবন্ধের রচয়িতা) লুনাচারস্কির ‘লেনিন স্মৃতি’তে সাহিত্য ও শিল্প প্রশঙ্গে লেনিনের পর্যালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, ‘দিনেবারে প্রাতি ভ্লাদিমির ইলিচ যে অসীম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা সবাই জানে।’

ক্রায় সেৎকিনের (জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা) উক্তি প্রসঙ্গত বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়, ‘জনগণকে যিনি দেখতেন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই লেনিন যতদূরই জনগণের বহুমুখী সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এটাকে তিনি মনে করতেন বিপ্লবের সর্বোত্তম স্বকৃতি এবং কমিউনিস্ট রূপারণের নিশ্চিত গ্যারান্টি বলে।’

মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে শিল্পকৃষ্টির অসামান্য ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ‘What is to be done’ গ্রন্থে লেনিন তাঁর স্বকীয় অভিমত

স্বপ্ন সৃষ্টি করেই তুলে ধরেছেন, ‘কখনো কখনো মানুষ যদি ঘটনাকে মনে মনে অনেক আগে থেকে এক সার্বিক চিত্র হিসেবে দেখতে না পেতো, তার মানসিক প্রতিরূপটি যদি আগেই কল্পনার না আনতে পারতো; তবে আমি ভাবতেই পারি না কোন শক্তি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতো তার সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞান।’

বিপ্লবের পর লেনিন স্বাক্ষরিত প্রথম নির্দেশনায় স্বপ্ন সৃষ্টি অকরে লেখা ছিল, ‘শিল্পকলাকে অতি অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু শৈল্পিক মূল্যকে লজ্জন করে নয়।’ মানব ইতিহাসের এই মনোহর বিষয় যেন সত্যত প্রমজীবী সাধারণ নরনারীর বাস্তব স্বার্থ ও মানবীয় ধারান্বানে সজীবিত থাকে। তাতে কল্পনা থাকবে, কিন্তু অসার মলস কাল্পনিকতার অলৌক স্বর্গে যেন তার অধিষ্ঠান না হয়। তাই শিল্পকে জনগণের অস্ত্রবের কাছাকাছি পৌঁছেই যুগপৎ শিল্প-সাহিত্য ও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জ্ঞান-উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠবে। এ বাণীয়ে শিল্পীদের অগ্রণী এবং সক্রিয় হতে হবে। সংগ্রামসংকুল সাহসিকতা ও শৌকষদৃষ্টি বৈপ্লবিক স্বত্বকে রাখতে হবে সচেতন, সদাজাগ্রত। কোনো আপোষকারী স্ববিধাবাদ অথবা হতাশাক্রিয় জীবনবিমুখী হতাশাস যেন সাহিত্য-শিল্পের ত্রিসীমানায় প্রবেশাধিকার না পায়। তাই শিল্পীর অপরিহার্য মহত্ব কোথায় নিহিত—সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন ঘোষণা করেছেন, ‘An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of revolution.—বলা বাহুল্য এই aspects of revolution শুধু রাই বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে না—মানব-জীবনের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এর সঠিক প্রতিকলন প্রয়োজন। লেনিনের কথায় ‘Art belongs to the people. Its roots should be deeply implanted in the very thick of the labouring masses. It must unite and elevate their feelings, thoughts and will. It must stir to activity and develop the art instincts within them. (On art and literature : V. I. Lenin). আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব সর্বোন্নত শিল্পকলা। কারণ—‘There can be no real and effective “freedom” in a society based on the power of money, in a society in which the masses of working people live in poverty and the handful of rich live like parasites.... The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is

simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution... It will be a free literature, because the idea of socialism and sympathy with the working people, and not greed or careerism, will bring ever new forces to its ranks '

শিল্প হ'ল জনগণের সম্পত্তি । পাবলো নেক্‌সার কথায়, 'কবিডাকে কঠিন মতো সবাই মিলে ভাগ করে খেতে হবে ।' শুধু কবিডা নয়, সকল শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য । শিল্প কখনোই মুষ্টিমেয় পরভ্রমজীবীর লেখের সম্পত্তি নয় । শিল্প বা সংস্কৃতি সমাজের আত্মিক শক্তিকেই বলমান করে । ছিন্নমূল ভাববিলাসের মতোই সারবস্তাতীন শিল্পগুণবিবর্জিত কোন বস্তুকে আবার যথার্থ শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করাও বিভ্রান্তিকর । শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ করার জন্য প্রাচীন শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের ইতিবাচক সারাংশ সুনির্বাচিতভাবে পরিগ্রহণ করতে হবে । পরিগ্রহণ করতে হবে ধূপদী সাহিত্য-শিল্পের অমূল্য অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ 'মানবতার মুহূর্তে'র (মার্কস কথিত) অবিস্মরণীয় নিদর্শনগুলিকে এবং আয়ত্ত করতে হবে তার কলাকৌশলগত আঙ্গিক-প্রকরণ । আবার আঙ্গিককৌশলের উদ্ভট ও অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরকেও বর্জন করে শিল্প-শরীরকে শাণিত করতে হবে মেঘবিহীন চিকনতায় । কেননা, শিল্পকলা প্রহেলিকাপূর্ণ 'ফ্রিঙ্ক্স' জাতীয় কোন বহস্য নয় ; তা হ'ল সমাজতাত্ত্বিক সমাজের নির্যাত একটি আত্মিক শক্তি । শিল্প হচ্ছে, বাস্তবতার যে গুরুত্বময় ও জীবন্ত রূপগুলি সোজা-সুজি ইন্ড্রিগ্রাহ্‌ হয়ে ওঠে তারই জগৎ প্রতিচ্ছবি । গণচেতনায় তা আগিয়ে তোলে মহৎ ভাবাবেগ । তাদের সুশৃঙ্খল শিকায় সুশিক্ষিত করে তোলে । জীবনের নগ্নত্ব ও অগণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে সমাজের যুগোত্তম প্রথরভাবে প্রকাশ করে ; সঙ্গত আনন্দ আরো তীব্রভাবে অনুভব করতে সমাজকে সক্ষম করে তোলে ।

লেনিন বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, সমাজতাত্ত্বিক সংস্কৃতির শত্রু কিন্তু হবে অসাধারণ প্রবল । সে হয়ে উঠবে 'পাঁচালো, চতুর, নাছোড়বান্দা ।' অনেক কিছুকেই হয়তো মনে হবে নির্দোষ, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়বে—লিঙ্গী হয়তো নিজেও পুরোপুরি সজাগ নয় প্রলেভারীর-বিরোধী ঠিক 'এক কলক চ্যাটচেটে, দুর্গদী, বাসবোধকারী গ্যাস ।' সে ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন । শুধু তৎপরতার সঙ্গে পরিচরিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ

সুসজ্জিত প্রয়োজন। গঠিতভাবে জানতে হইবে, কাকে সমর্থন করতে হইবে, কাকে পরোক্ষণ করতে হবে এবং যথাসময়ে তিরস্কার করতে হবে কাকে।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হ'ল, জাতীয় সংস্কৃতির ধনিকে কেন্দ্র করে। লেনিনের মতে, 'জাতীয় সংস্কৃতির ধনি হ'ল একটি বুর্জোয়া জোচ্চুরী।' প্রত্যেক জাতিঃ সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বহুশুণী উপাদান। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে শোষিত জনগণ—আর তাদের জীবনযাপনের অবস্থানেই অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। অগতঃ এই সঙ্গে প্রতিটি জাতির মধ্যেই একটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি আছে অধিপতি সংস্কৃতি হিসেবে। তাই জাতীয় সংস্কৃতি হ'ল আসলে অমিত্য, যাজক ও বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি লেনিন বলেছেন, 'আমাদের ধনি গণতন্ত্রের এবং বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি।' আর এই ধনি সামনে রেখে প্রত্যেকটি জাতির সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করতে হবে শুধু তার গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ—যা নিঃসন্দেহেই জাতিঃ বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ একটি জাতি নয় সমগ্র মানবসমাজ অতীতে যা কিছু অর্জন করেছে তার প্রতি প্রদর্শনীয় করে তুলতে না শেখালে ইতিহাস অসত্য ও নৈরাজ্যবাদকে কোনোটিনিই করা করবে না এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যা কিছু সর্বাধুনিক তার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ থেকেও সমাজকে বঞ্চিত করবে। তাই চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি ছিল লেনিনের অগতীর আকর্ষণ। সেইজন্যই তিনি একদা আলোচনাকালে মার্সাকো-তর্কিমপেকা পুশকিনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

১৯৩০ সালে রাশিয়ার বৈদেশিক সমিতির চেয়ারম্যান এক্ পেজোফের বিবরণে জানা যায় লেনিন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রচয়িতাদের অন্ততম বলে মনে করতেন। গভীর মনোসংযোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন রচনা পাঠ করেছেন এবং গোঁড়ি প্রমুখ মহান লেখকদের সেইসব রচনাসমূহ পাঠ করতে অল্পপ্রাণিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পার্সোনাটি', 'স্ত্রাশনালিভ্য', 'বহর বাইরে' উপন্যাস এবং বিভিন্ন নাটক ও কবিতাবলীর একটি সংকলন চাঁড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত 'একত্রিরেস্তে লুজ' (প্রাচ্যের আলোকবাহি) নামে একটি গ্রন্থ লেনিন তাঁর নিজস্ব পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষাদর্শন সম্পর্কেও ছিল তাঁর অপরিণীত অঙ্গসঙ্কেতা।

সুনাচারস্বির 'লেনিন স্মৃতি'তে বা ক্লাব সংকিনের বিবরণে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিনের ভূমিকায় যে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সংস্কৃতিপ্রসঙ্গে তিনি তড়িৎকর্তৃক চালাওভাবে কোনো ছাঁচে-চালা পথ অনুসরণের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিলেন। স্বর্ণিতমস্তক ক্ষুণ্ণতার রাতারাতি এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়ার বিপজ্জনক ঘটকাবিতা থেকে বিরত হয়ে, স্বজনশীল শ্রম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার শাণিত এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে পরীক্ষিত ও স্থানিকভাবে উপলব্ধ, তাকেই শুধু গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ীপদের লেনিন বিক্রম করেছেন, যারা তারতো পিন্সল থেকে মুহর্তেই প্রলেভারীয় সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা যায়, যার অ অ ন থ থেকে ইঞ্জিন-কামান পর্যন্ত কিছুই আগের মতো হবে না। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও নিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তাদের সংস্কৃতির মণশ্রুতি আশ্রয় করবার ক্ষমতা অগ্রণী কর্মীদের দীর মস্তিষ্ক তাই বৃগপৎ পরিগ্রহণ ও পরিনর্কনের ক্ষমতা সংগ্রাম করতে হবে।

আজ দেশের অক্ষান্তরে এক ভয়ানক পরিচর্গার আশ্রয় ও প্রসঙ্গে পাই আত্মঘাতী অপসংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করতে উচ্ছাস। যদিও সমাজবান্ধা তথা রাষ্ট্রবান্ধার প্রকৃতি ও চরিত্রের ওপরই অপসংস্কৃতির এই কংসিত প্রবাহের গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিগন্ত হতে পারে। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে মনাকার উদগ্রবাসনা চরিতার্থের প্রায়জনেই মানবিক বোধগুলি ক্রমে শোচনীয়ভাবে বাণিজ্যের লেননেনের বিবরণ হয়ে ওঠে এবং শিল্পীর স্বাধীনতা পর্যবসিত হয় শোচনীয় এক চাক্ষুর ভগ্নাশ্রিতে। তবু সর্বোচ্চ সমাজবান্ধা সমাজতন্ত্র প্রক্টার কর্তনকঠোর লড়াইয়ের পাশাপাশি স্তনিপুণ সাক্ষরতা ও সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সর্বত্রই মানবসংসারের সেট অসামান্য বিশ্ববিজয়ের মহান স্রষ্টার সংগ্রাম শাণিত জীবনের এই আলোকিত অংশের প্রতি আজ আমাদের চট্টিকে তাই নিশ্চয়ভাবে নিবদ্ধ রাখতে হবে। কারণ লেনিন শুধু বিশ্বের প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাঞ্জের স্রষ্টাট নন - তিনি আধুনিক পৃথিবীর স্রষ্টা ও স্রষ্ট জীবনমুখী সাংস্কৃতিক চেতনারও একজন সঠিক উদ্ভাট। তাঁর কাছে পাঠ না নিলে আমাদের মনন ও চেতনার স্ফুটের স্তবগুলিও থেকে যাবে অসংস্কৃত, অনালোকিত।

॥ গড়িয়ার গান—মুর্শিদাবাদ ॥

—পুলকেন্দ্র সিংহ

বোলান বা জারি গান মুর্শিদাবাদের জনসমষ্টির সংগে অঙ্গান্বিতাবে জড়িত। এছাড়াও আরো কিছু অপ্রধান লোক-গীতি ও ছড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যার সঙ্গে যুহস্তর ও বাপকতর জনসমাজের তত্ত্বানি নিবিড় সম্পর্ক হয়তো নাট, কিন্তু এই জেলার অঞ্চল বা নির্দিষ্ট এলাকার সঙ্গে যেসব লোক-সঙ্গীত বা ছড়া কিংবা লোক-সংস্কৃতির বিশেষ একাত্মতা আছে, তার মধ্যে অন্ততম উল্লেখ্য হচ্ছে আলোচ্য ‘গড়িয়ার গান’।

মুর্শিদাবাদ জেলার জাজপুর মহকুমার প্রাচীন গ্রাম হিলোড়ার তরুণ সাহিত্যসেবী শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ-এর সহায়তায় ঐ গ্রাম থেকে গড়িয়ার গান সম্পর্কে বিচিহ্নতর ও চমকপ্রদ তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। গড়িয়ার গানের মধ্য দিয়ে গ্রাম-মুর্শিদাবাদের অস্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এখনো আদিম বিশ্বাস ও ঐশ্বর্যমূলক প্রক্রিয়াটির যে কতখানি প্রভাব আছে তা জানা যাবে। এখানকার লোকসমাজে যে আদিবাসী প্রভাব (অষ্টিক ইত্যাদি) কতখানি সক্রিয় এসব আলোচনার মধ্যে তার পরিচয় মিলবে। এবং সমাজতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান উদাহরণ (যা প্রত্যক্ষ অমূল্যস্বত্ব নে প্রাপ্য) হিসেবে অবশ্যই গণ্য হবে।

গড়িয়া পূজা গ্রামাঞ্চলে আশ্বিন মাসে জিতাঠমীর সময় হয়ে থাকে। এই পূজার প্রচলন হয় সাঁওতালীদের দ্বারা। ক্রমে এটা হরিজন ও তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই পূজার কারণ হিসেবে জানা যায় যে—অপদেবতাদের হাত থেকে পরিজ্ঞাপ পেতে অস্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা এই পূজা করে থাকে। এর ফলে অপদেবতা গ্রামের লোকের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মাতৃস্ব মারা গেলে তাদের মৃত আত্মাদের পূজার নিমিত্ত এই গড়িয়া পূজা।

এই পূজা যেখানে হয় সেখানে একটা বেদী তৈরী করা হয়। বেদির পাশে একটি নিমগাছ থাকে—অর্থাৎ নিমগাছের নিচে বেদি তৈরী হয়। বেদির নিচে থাকে সাতটি মরার মাথা। হনুমানের বাচ্চা হলে পরে তার যে ফুল পড়ে সেই ফুলকে তুলিয়ে নেওয়া হয়। এবং সেই ফুল যেখানে পূজারী বসে সেখানকার মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। এবং সেখানে হাতিনুড়া গাছ, কুল গাছ,

হুগাঁওপ গাছ, কালীঝোপ গাছ, একখণ্ড লিছি, হলুদ, তাঁহার পরশা ছাটি, হরিভকী চটা, মাটির নিচে গর্ত করে রেখে দিতে হয়। এ'ছাড়া আগ্নেয় কাঁছে রাখতে হয় ছটপটির গাছ। নিম্ন গাছে সাপলা ফুল এবং পদ্ম-ফুল ফুলিয়ে রাখতে হয়। ফুলগুলি লাল রঙের হয়। এবং সবকটি ফুল জমায় জলে। ফুল ফুলিয়ে রাখার কারণ জলের তলে 'কিচ'নি' নামে যে অপদেবতা থাকে তাঁদের খুশি করতে এই ফুল ঝোলানো হয়। যেন কিচ'নি' গাছে ফুলে আছে! ঐ ফুলে পূজারী মন্ত্র পড়ে দিলে তখন সেই ফুল কেউ ভাবিজে কবে নেয়। কেউ বাড়িতে ফুলিয়ে রাখে কেউবা চিবিয়ে খায়, যাতে অপদেবতা তাঁদের উপর তর করতে না পারে, তাঁদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। স্ত্রীবোগে ঐ ফুল বেশ কাজ দেয়।

ধূপ-ধূনো সহকারে পূজার বসে পূজারী বা পুরোহিত। এই পুরোহিত হচ্ছেন চরিত্রজন। ৫ মিনিট মত সময় তিনি গানস্থ থাকেন। ইতিমধ্যে একে একে ভক্তবৃন্দের সমাগম হতে থাকে। পুরোহিত গান আরম্ভ করেন। ঢোল ও করতাল বাজে। ঐ সময়কার গান :—

হিমসাগর তেল মায়ের কেশে কোকিল আলতা হাতে

মায়ের দুহাতে দুখানা পত্র মনোজ্ঞিত নাচিতে আসে

এস এস মা! এই শ্রাণান ঘাটে—

মা নাচ করিতে করিতে আসে।

এরপর দেখা যায় নেদীর পাশে উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথা ঢুলতে থাকে। মা তখন তাঁদের মাথায় 'তর' করেন। ক্রমশ মাথার দোলা জোঁর হয়। অবশেষে তারা লাকলাকি শুরু করে দেয়—মাথা দেলার। তখন পূজারী আবার গান শুরু করে দেয়—

গড়িয়ামায়ের পূজো দেবরে।

মায়ের আসন টলেবের।

টলে লিঃহাসন।

গড়িয়ামায়ের পূজো দেবরে।

কার স্মৃতিতে বন্দি আছে মা আসি দাও দরশন যে

মায়ের পূজো দেয়, সন্ধ্যা দেয়, বাতি দেবরে।

এই শ্রাণান ঘাটেবের।

এই গান চলতে চলতে যদি হঠাৎ সকলে ঝিরিয়ে পড়ে তাহলে জানতে

হবে—কেউ মন্দ করেছে, মাকে আসতে দিচ্ছে না -তখন পুজারী “হট্, বরাবর ইট্” বলে হংকার দেন আর পুনরায় গান শুরু করেন—

ভাৰা মা ভবাই, কাৰ কাছতে হলে, মা বন্দীগো

পাবান হইয়া কি আছেো মাগো ?

খোল খোল মা জুয়াৰ দেখিগো !

যে জন কালী বলে ভাকে তার কোন বিপদ থাকে গো ?

দলপিপি কি হতে পারে কুক্ষের বাণীগো

খোল-খোল মা জুয়াৰ খোল গো ।

দলপিপি অৰ্থ—পানকোড়ি, এখানে মন্দকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে উক্ত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

এরপর দেখা যায় পুজারী সমস্ত সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে । এর অৰ্থ সমস্ত অপদেবতা তাদের উপর ভর করেছে । কিছুক্ষণ নাচায় পর সকলে বেদির উপর বসিত কুশ গাছের তৈরী মোটা চাবুক একটি করে হাতে তুলে নেয় । পরস্পর পরস্পরকে চাবুক দিয়ে মাগামারি শুরু করে দেয় । চাবুকের আঘাতে হাত, পা, পিঠ ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে । ভয়ও চলে নৃত্যসহ এট আদিম ও বীভৎস উদ্‌যাতন । তারপর একজন দাঁড়িয়ে মা কালীর ভজিতে চিৎকার করে ওঠে “হট বর হট বর” । পুজারী বুঝতে পারেন গড়িয়া মা এগার চলে যাবেন । তখন তিনি একটি পাতে মণ্ডা, পাঠার রক্ত, চিনি বেখে দেন নৃত্যরত সকলের সামনে । জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? কোথায় থাক ? “ওরে আমি...নিমগাছে থাকি ।” ইত্যাদি । তুমি কি খাবে ?—‘আমি রক্ত খাব’—উত্তর হবে ।

এরপর একবাটি সত্যকাটা পাঠার রক্ত তাকে দেওয়া হয়—সে তখন চুমুক মেরে রক্ত খেয়ে ফেলে । এইভাবে কেউ খায় মণ্ডা, কেউ খায় চিনি, কেউবা ধূপের ধোঁয়া । সকলের খাওয়ার শেষে গড়িয়া মাকে বিদায় দিতে হয় । আরম্ভ হয় গান :—

যাক্ত মা কাঁপায়ে হিয়া

মা, বায়ের চরণ আগে দিয়া,

রক্ষা করো মা তুমি আসিয়া

তোর সন্তান মা কাঁদে আজি

রক্ষা কর মা দিবানিশি

রক্ষা কর মা রক্ষা কালী ।

প্রধান পুরোহিত জোরে জোরে বলে ওঠে—রাম, রাম, রাম, তখন সকলে আন্তে আন্তে বসে পড়ে । অর্থাৎ অপদেবতা শালায় ।

এইভাবে সাতদিন পুজোর পর ষট পুর্নবিগীতে ফেলা হয় । অপদেবতা ছর হয়ে গ্রামের মন্ডল হয় ।

স্বাভি সত্তা স্বপ্ন

হীরলাল দাশগুপ্ত

তাহোলে কি বোঝাফিত আমার অতীত আর
স্বপ্নসঙ্কীর্ণকল্প এই বর্তমান
হুগ হুগ আবর্তিত বিন্দুতে বিন্দুতে
অভ্যন্তরীণ জন্ম মৃত্যু মৃত চেতনার
বর্ণহীন বাস্তবের ক্রান্তিকর ধারাবাহিকতা ?

তাহোলে কি
এই বস্তুগতিবিশ্বকোষে লাবণ্যযোজন
শূন্যে চেউয়ে চেউয়ে শূন্যে মিশে যাবে ?
দেয়ালে টাটানো এই শাদাকালো আলোছায়া
স্বপ্নশিখিওজা পলাতক কণিকার ছাঁপ,
সবুজের অনগছমস্ত অন্ধকারে
শব্দহীন পায়ের আওয়াজ,
বেড়ালের অগ্নিচোখে সময়ের শিকার সন্ধান,
প্রাণপিণাসায় এই প্রতিদিন প্রাণান্ত প্রদাহ,
এ কি শুধু ছায়াবাদের ছায়ায় মিছিল ?

সময়ের ঘূর্ণমান সংকেতে সংকেতে
আমার সম্ভাবীজে অগণিত আরক্তিম প্রাণ
হবে নাকি প্রলয়ের অগ্নিজবা ফেটন উন্মুখ ?
এই প্রেম শাস্ত সাম্য স্বাধীনতা স্বপ্নইজ্জ্বাল ?
ভূগোলের রক্তমণ্ডে ইতিহাস মস্তবিস্ময়তা
আলোয়ার বস্তুপথে কবছের অন্ধ চর্চ্চমণ ?

তাহোলে কি
মিথ্যা এই অরণ্যের সবুজ পিণাসা,
আকাশের মাঝে নিত্য সমুদ্রের সিক্ত অতিশায়,
নক্ষত্রের নীলস্বরে শিশিরের গান ?

স্মৃতি লব্ধা স্বপ্নের কল্যান ছায়াপথে পথে
 বাগাবিনী বেহেদীর বিচিত্র সাপের খেলা ।
 সময়ের উদ্ভবধনে
 সময়ের অপকৃত্য
 শরীরের এলোমেলো গুচতর গোপনে গোপনে !

বকখালি
 সুধীর নন্দী

কী নীল আকাশ
 তারার চুম্বকি বসানো ;
 অক্ষয়ত শক্তি ।
 সমুদ্রের বুক থেকে মহর প্রবাস—
 স্থিরস্থিরে বাতাস
 কাউপাতার কীক দিয়ে
 এসে আলতো ছুঁয়ে গেল
 আমার আঙ্গিকে ;
 পশ্চিম আকাশের
 ডুবে যাওয়া সূর্যের আলোর বং মাথা
 তার সর্বাঙ্গে ।
 কেমন একটা অদ্ভুত সুন্দর ।
 সমুদ্র ডাকছে ;
 কেমন যেন একটা ভিত্তি
 চাপা কর্তের আহ্বান ।
 উৎকর্ষ হ'লে আছি
 সেই মেঘমজ্জিত আহ্বান কখন আসবে
 কাউবনের ওপার থেকে
 আলিঙ্গিতের স্বরকা গুরুপথে !

লহুজের সেই ডাক
 পাকবস্ত্র শব্দ নির্বোধ
 কৈ ভুলেব না ত
 বায়ুকন্ডাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ।
 লহুজ বুঝি হুমিয়ে পড়েছে
 বকখালির আকাশের নিচে
 নিঃস্বাস পরিমণ্ডলে
 শুধু হুম আর হুম ;
 তুমি, আমি সবাই
 নিদ্রিত, অচৈতন্য ।
 এই হুমন্ত পুরীর রাজকন্ডে কখন আগবে
 কে জানে ?

সবাই যেমে আছি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সবাই যেমে আছি তাই মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ
 মাঝে মাঝে চমকে দেবার মত কথাবার্তা
 খোশগল্পে বিভোর সকলে
 সকালের কাগজ কিংবা সন্ধ্যাহের পত্রিকার কিংবা
 মাসান্তিক চিত্রিত সংখ্যায়

যে যেখানে আছি সবাই এক একটি আরলাগোষ্টী
 নিজেদের স্বেচ্ছাচারী আইনকাহুন কিংবা স্বযোগস্ববিধা নিয়ে
 এক একটি দুর্গে অধিষ্ঠিত

মারাত্মকতার সেই টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন স্বদেশ
 পদস্পর্শ চিনি হাত বাড়াই ঢাকঢোল বাজাতে
 কিন্তু মিলি না আলো, মিলে বাই না

বক্কেব ভিতরে কোন শব্দ শুনি না

তুখু এ ওর গানের ওপর হেলে পড়ে সার্কাস দেখাই

আগলে আনরা লবাই খেমে আছি

তাই ক্রত যেতে গিয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ি

ফুটপাথে উঠে যাচ্ছে ট্যাক...

ভারতবর্ষ, তুমি কি বুঝোছ

তুমি খেমে আছো ভাবতে কার ভাল লাগে

খামলেই আগুন জলে, রক্ত বরে যায় ।

এসো

কবিরুল ইসলাম

এসো প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রতিপদ করি ।

এসো হে আমার সহযোদ্ধা

হৃদ্য দাঁও

জেনো আমি প্রস্তুত ।

এসো প্রতিমুহূর্তে এই মৃত্যু

আর আপোষ আর অসম্মান থেকে উদ্ধার করো

মৃত্যু বড়ই তুচ্ছ, কিন্তু এই প্রয়োজনহীন টিকে-থাকা

নপুংসক ।

এসো'হে'শববাহকবৃন্দ

এই দীর্ঘ শবযাত্রাকে কিরিয়ে দাঁও

এসো

পূর্বদিকে মুখ ফেরাই ।

এসো প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করি ।

স্বাধীনতার দিন

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

অগত গ্রহণ নয়, ভবু স্বর্ষ কালো হয়ে আসে ।

তুমিকের পাছপালার রঙার খুলির রঙো তুফা কুটে ওঠে,
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই পাশে ঝোলে শ্বতির কফাল,
মহাশূন্ত বলসে যায় চরকে-ওঠা হাড়ের সংকটে ।

নির্বাচিত পছপাল নিশেষে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কসলের বন চূবে খায়,
লম্বা বিকেল জুড়ে গোপনে গোপনে বেলা যায়,
ডগনি সে আসে, তার বা-হাতে বাকানো ডলোরায়,
স্বর্ষ টুকরো টুকরো ক'রে কক্ষপল আকাশে ছড়ায় ।

নানা রূপে তাকে দেখি, কখনো টেনে, ফেরিঘাটে,
বা পাশে ঝোলানো বাগে বাঁশীগুলি উঁচু হয়ে থাকে,
হাত-পা বাঁধা আদালতে হাসিমুখে শেকল বাজায়,
কখনো মিছিলে, জেলে, কখনো সে পুলিশ নাচার ।

দেগি, আর রাস্তাঘাটে টলমল রক্তের কলস
হঠাৎ ফাটিয়ে দিয়ে সেট ছেলে অন্ধকারে চলে,
ভাসে মৌন ডালপালা, মৌতমী অঞ্চল তর। প্রতিটি সকালে
স্বর্ষের ঢাকনা খুলে সব রোদ নিচু করে চলে ।

যদিও গ্রহণ নয়, ভারতীয় স্বর্ষ ভবু অন্ধকারে ঢাকা,
পাহাড় পেরিয়ে নদী, নদীর পাঁজরে দোলে আঁধারনা চাঁদের পতাকা,
গেতখামার কারখানায় তার গল্প বদাবলি হয়,
ভাঙ্গা কেরাগির ছেলে খরস্রোতে বিশাল বিষয়,
কিছু দেশহোদী লোক রাষ্ট্রহোদী ব'লে তাকে কাগজ ছাপায়
সে যখন কথা বলে অন্ধকারে কাঁপে গ্রাম, শব্দগুলি প্রান্তর কাঁপায় ।

যতদূর চ'লে যাই, ছ'পাশে দাঁড়িয়ে হালে লক্ষ লক্ষ কৃষক-কফাল,
শ্বতিতে মশাল জলে, জলে রক্ত, জ'লে যায় চিন্তার চিত্তার ।

তোর কপালে দুঃখ আছে

কজল-এ-খোদা

মা বলতেন—

‘খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস

তোর কপালে দুঃখ আছে !’

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি

আমি বলি, কথা দিয়ে কখনো কি কথা রাখা যায়

নাকি কোনদিন রাখা গেছে—

কথা দেয়া যায়, কথাতো যায় না রাখা ।

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি ।

ফড়িঙের পিছু পিছু যখন ছুটেছি অকারণ

সারাদিনি নদীর জপে কাটতো সাবাবেলা

বাটুল চাউর হাতে কোণ ঝাড়ে তুপুর গড়াতো

সে বয়সে আমি কত কখাই না বলতাম

“মা তোমায় বড় চলে লাল পেড়ে ডুববে গা’ড়ী এনে দেব

সোনার কাঁকন কানপাশা নাকফুল

আরো অনেক অনেক কিছু এনে দেব দেগে নিও ।”

মা বলতেন—

‘খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস

তোর কপালে দুঃখ আছে !’

আজো মাকে দেয়া সেই কথা

আমি রাখতে পারি নি ।

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি ।

মনে পড়ে সেই ঘুড়ি শুড়াবার কথা

অতির হাতের ঘুড়ি কেটে গিয়েছিল বলে সেকি কান্না

শেষে কথা দিতে হোল

লাল নীল সাধা বকম বকম ঘুড়ি কিনে দেব বড় হলে

এখন সবুজ অক্লজকে কথা দেয় যেমন নকশে,
বড় হলে হারবেল এনে দেবে হাজারে হাজার
মডিকে আমার দেয়া সেই কথা আজো রাখতে পারিনি !

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি ।

মা বলেন আমি অনেক বেশী কথা বলতাম
হয়তো জাহানারার মনে আছে,
শিউলী তলার বৌ বৌ খেলা ছিলে
ওকে কথা দিয়ে ফেলি ওর পুতুল বিয়েতে
অনেক বাজনা এনে দেব

মিনির বাবার মত বড় হলে
যেমন পাশের বাড়ী এনেলো রমার বিয়েতে,
এখন জাহানারার মেয়ে বানী বনি বজ্ঞনাকে,
আমার মতন কেউ কথা দিলে বাজনা আনবে
তাদেরও পুতুলের বিয়ে দিতে—
আমি জাহানকে দেয়া কথা রাখতে পারিনি, আজো !
এ আমার এক দোষ !

মা বলতেন -
'খোকা তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোব কপালে দুঃখ আছে ।'

মনে আছে ঠিক বিয়েও প্রথম রাতে
কথা দিয়েছিলাম সুলতানী নববধূ সুননা মাহমুদাকে
সে ছাড়া কারো কথা মনে আনব না
সে ছাড়া কারো চোখে চোপ রাখব না
আর কারো প্রেমে ভুলেও কখনো চবনা মলিন ।
সব গেছে - সব কথা গেছে !

আমার এ এক দোষ, আমি বড় বেশী কথা বলি
কথায় কথায় শুধু কথা দিয়ে ফেলি ।

মা বলতেন—
'খোকা; তুই বড় বেশী কথা বলিস
তোব কপালে দুঃখ আছে !'

ঈশ্বরের জন্মে জন্মে

ব্রজগোপাল ব্রায়

ভী-বণ কষ্ট...ভয়ানক কষ্ট - কষ্ট ভয়ানক...

সেই মহামতি চার্লক

স্বপ্রাচীন বৃক্ষের সারি কেটে ছেঁটে

পাকে পাকে বসিয়েছে সময়ের ছাট

আজ সে শুধু স্মৃতি—ইতিহাস বিস্ময়...

কালের বয়সের মত বিষন্ন ধোঁয়াটে !

ঈশ্বর—কেমন যেন একদিন একরাশ পাণে

ভরাডুবি হ'য়েছিল অগচ্চ প্রাণ তার

বিনষ্ট হ'তে হ'তে অলৌকিক সূর্যতাপে

পাহাড় জমিয়ে গেল মৃত্যুর আর মৃত্যুর বৃক্ষের ভেতর

জন্ম অবধি ঈশ্বরের জন্মে জন্মে

আগ্নিমতার বিশ্বস্ত স্বাক্ষর ।

এখনো তো এ পৃথিবী পুড়ে পুড়ে

হ'য়ে আছে তামাটে ..

স্বপ্নেরা অমানিশার জোনাকির মত

একা—একঘাটে

অস্পষ্টতার কুহেলীতে পু'ড়েছে ঢাকা...

অগণিত বোঝায়া কয়েটিই স্বাস্থ্য ধ'রে টানাটানি করে...

জ্যোৎস্নার ফুলঝুরি বৃক্ষের বাধার মত

নিহত রাজির রক্তে সাধা ,

লবুজের কোকল বনানী, চান, আজ স্বপ্নাতা বৃক্ষের ফল !"

ভয়ানক কষ্ট ..ভী—বণ কষ্ট...

ব্রজাণ্ডের পীড়িত বেয়ে আজো নেমে আসে

সে—ই তুফার্ত কুয়াসার ঢল..... !"

মরীচিকা

সনাতন মিত্র

বচ্ছ নিৰ্বাৰেয় মতো গণতন্ত্ৰ

শাসনাত্মক স্বাধীনতা

এইসব শব্দগুলো এদেশে এখনো

সুপ্রাচীন ভূৰ্জপত্রে খুঁজে পাওয়া যায়

সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে সবটাই মরীচিকা শুধু

গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, জন্মগত অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি....।

আয়নায় যে-মুখ

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সামনে দাঁড়ালেই

আয়নায় যে-মুখ ফোটে

আশৈশব ভেবে আসছি

ওটা আমার-ই

আর মুখ হ'য়ে নিজেকেই করি তারিফ

অংগারক-আচ্ছন্ন গুচ্ছিন্ন এই পরিবেশে

মজবুত মুদগর একটা চোখে পড়ে না কারো

যে বলবে ঠেকে

ও-মুখ তোমার নয় সেবকুফ্ !

ওটা অস্তরীক্ষচারী কোনো রঙিন মাতালের তামাসা

কিংবা কোনো বিশ্বস্ত চন্দাবৎ এগিয়ে এসে

লোষ্টাঘাতে বিচূর্ণ করে না জাহ্নকরী আয়নাটা

হাত ধ'রে টেনে নামায় না সিংহাসন থেকে আমাকে

দেখায় না নির্যম বন্ধুর মতো সেই অনন্ত পথ

যে-পথে একবার-ই নয়

সত্তেরো বার বিশ্বস্ত করা যায়

দুর্ধৰ্ম মোগলবাহিনী ।

Partyর টিকিটে। ঐ পার্টি যাঁদের পার্টি তঁরা সোশ্যালিস্ট প্রমজীবী। বস্তুত Shaw, Wells, Webb দম্পতীর মতো রাসেলও ছিলেন একপ্রকার না একপ্রকার সমাজতন্ত্রী পরিবর্তনের পক্ষপাতী। অথচ Marxist ন'ন। তখনকার দিনের ইংরেজ Marxist-বাও পাল'মেণ্টারি পদ্ধতিতে পরিবর্তন চেয়েছিলেন, বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে নয়। কেবল রাসেল কেন, তাঁর মণ্ডলীর আর সবাই সোভিয়েট রাশিয়ার বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। প্রমিক নেতারা তো আরো বেশি ক'রে সোভিয়েট বিরোধী। এখনো তাই।

এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয় যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিপক্ষে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিজাত বা বুর্জোয়া রাজনীতিকরা নন, lower middle class বা upper working class এর হিটলার মুসোলিনিরা। দেখতে দেখতে Fascism ও Nazism মাথা তোলে। ইংলও সেটা এড়ায়, কারণ তার মেরুদণ্ড তার solid middle class. “দু'দিকের চরমপন্থীদের আমরাই সামলে রাখছি,” আমাকে বলেছিলেন ইংলণ্ডের এক আলাপী। ‘আমরা’ এখানে ‘আমরা মধ্যশ্রেণীর লোক।’ মধ্যশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল নয়।

ইংলণ্ডের পেণ্ডুলাম কখনো কোনো চরম প্রান্তে যাবে না। না চরম দক্ষিণে, না চরম বামে। সে দেশের প্রমিকরাও এটা চায় না। শ্রেণীযুদ্ধ তাঁদের কল্পনার বাইরে—যদিও সেখানেও কমিউনিজম নিষ্ক্রিয় নয়। Labour Party কিছুদিন বাদে ক্ষমতার আসনে বসার পর তার সোশ্যালিস্ট মতবাদও লোকের গা-সওয়া হয়ে যায়। লোকে সোশ্যালিস্টদের ডরায় না। Marriage and morals সংক্রান্ত মতও ক্রমে সহজ হয়। যুদ্ধে পুরুষ সংখ্যা কমে গেছে, অনেক মেয়ের বিয়ে হয় না, হবেও না—তা বলে কি সঙ্গস্থ থেকে তারা চির-বঞ্চিত হবে, সন্তানহীন থেকেও? জনমত ওদের দিক থেকেও ভাবে। ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ইতিমধ্যে ওরাও ভোটাধিকার পেয়েছে। ওদের ভোটেরও মূল্য আছে।

এর নীট ফল, রাসেল বা Wells বা Shaw-কে কেউ আর advanced thinker বলে অতিরিক্ত মর্যাদা দেয় না। Intellectual circle এও তাঁরা back number. রাজনীতিক মহলেও তাঁরা কারো পক্ষে ভয়াবহ নয়। ভয়াবহ হয়ে ওঠেন Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, অপর পক্ষে capitalistদেরও আর সে দোঁড়িও প্রভাব নেই। তাঁদের প্রতিহত করেছে প্রমিকদের সত্যবদ্ধ Trade Union Movement তথা solid labour vote.

Shaw, Russell, Wells প্রভৃতির প্রভাবের মধ্যাহ্ন অভিজাত হয় ১৯৩০ নাগাদ। Rollandও, রবীন্দ্রনাথেরও। আসলে ওঁরা একটি idealist-generation. ওঁরা অভিজাত না বুজোঁরা এটা অবাস্তব। এদিক থেকে বিচার করাটাই ভুল। তাঁদের নেতৃত্বের মূলে যা ছিল তা তাঁদের শ্রেণী-সজ্জা নয়, তাঁদের আদর্শবাদ। তবে সেই আদর্শবাদ তাঁদের মধ্যেই ছিল, তাঁদের তাহিদের বা জাতিদের মধ্যে ছিল না। এর কোনো class explanation নেই। যেমন আপনার বা আমার কোনো caste explanation নেই।

কলেজ জীবনে আমি রাসেলের 'Roads to Freedom' ও 'Principles of Social Reconstruction' প'ড়ে তাঁর পক্ষপাতী হই। তখন তো মনে হয় নি যে তিনি ধনতন্ত্রের পোষক। না, ধনতন্ত্রেরও নয়, বণতন্ত্রেরও নয়, গণতন্ত্রেরই সমর্থক তিনি ও গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবারও তিনি পোষক। এ রকম লোক কখনো বক্তাক্ত বিপ্লব সমর্থন করতে পারেন না। যিনি স্বদেশে conscription-এর বিরোধী তিনি বিদেশে military বা Labour conscription-এর অনুমোদন করতে পারেন না। রুশ বা রবীন্দ্রনাথ যদি সোভিয়েট রাশিয়ার military conscription-এর ও forced labour-এর অনুমোদন ক'রে থাকেন তবে সেটা কোনো এক ছর্বল মুহূর্তে। তাঁদের জীবন-ই এর জীবন্ত প্রতিবাদ। 'Soviet Russia minus military conscription and forced labour and liquidation of Kulaks and purge of all opposition elements by violence and bloodshed'—এমন যদি চতো তা হলে আদর্শবাদীরা একবাক্যে সমর্থন করতেন। কিন্তু তা তো নয়। এতদিনে ওটা settled fact হয়ে গেছে।

আদর্শবাদীদের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া সম্ভব ছিল না। যারা নিয়েছিলেন তাঁরা পরে disillusioned হন। তা বলে তাঁরা মার্কিন ধনতন্ত্রেরও পক্ষপাতী নন। উক্ত ধনতন্ত্র ১৯৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পর থেকে বণতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তার economy তখন থেকেই war economy. হুঙ্ক যদি বরাবরের সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, ধনতন্ত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। মাত্রম যতই অহিংসায় মর্য যুঝবে ততই হুঙ্কবিরোধী হবে। যতই হুঙ্কবিরোধী হবে ততই ধনতন্ত্রের হুঙ্কপরাধপতার বিরোধী হবে। গান্ধী-বাদই ধনতন্ত্রের প্রবলতম শত্রু।

বাসেল গান্ধীবাদী না হলেও গান্ধীবাদীদের কাজই প্রকারান্তরে ক'রে গেছেন। তাঁর শেষজীবনের কার্যকলাপ সাময়িকতাকে দুর্বল করেছে। সাময়িকতার সে প্রেক্ষিমাণ আর নেই। ধনতন্ত্র এখন যার ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই কমজোহী। বহু যুবক draft (conscription) এড়িয়েছে।

বাসেলের 'Marriage and Morals' বের হয় 1929 সালে। তিনি Nobel Prize পান 1950 সালে। Nobel Prize পুরস্কারে বইয়ের জন্তে দেয় না। আপনার লেখার চরিত্র ভাল আছে। হাতেও পাবে যে বাসেলের ঐ দিকটাই সুইডেনের লোকের অতি প্রিয়। ও দেশের Marriage and Morals বাসেলের অহুগামী বা বাসেলই ওর অহুগামী। আপনি একে বুদ্ধোন্নতদের সঙ্গে equate করেছেন। কিন্তু সুইডেনের শ্রমিকরাও কম যার না। রাজস্ব তো ওদেরই হাতে। সোভিয়েট-এর Marriage and Morals সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাই তেমন অলীক যেমন অলীক বুদ্ধোন্নত Marriage and Morals সম্বন্ধে। কেউ শাদাও নয়, কেউ কালোও নয়—black and white morality বৃগু গেছে।

খাদি কেনা মানেই গ্রামময় ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা—কোন একচেটিয়া পুঁজিপতিকে আরও বড়লোক করা নয়।

আপনার সেবায়—

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি

সমগ্র ভারতে খাদি জগতে একটি সুপরিচিত নাম।

খাদি ও গ্রামোন্নয়ন কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত।

বহরমপুর | পোঃ খাগড়া | মুন্সিদাবাদ

ফোন বি এইচ. বি—২০৮

‘চেতনিক’-এর আদর্শ সকল হোক

ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল হল

জিয়াগঞ্জ | মুন্সিদাবাদ

‘চেতনিক’ সম্পাদক আরও কয়েকটি দ্বারা হার অভিন্নত

শ্রীমত অরুণাচল সরকার :

‘চেতনিক’ বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকা হইবে। কলকাতার-ও এর হতো পত্রিকা হুব বেনিমেই। এর সঙ্গে আমার আর্থিক অভিন্নতা থাকিবে।’ ২২-৪-৭৫

‘আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকণ্টে নির্ভয়ে বক্তব্য বলেছেন। কলাকল আপনার হাতে নয়। বা কলেজ কবিতা।’

১৭-৫-৭৫

শ্রীমত নারায়ণ চৌধুরী

‘চেতনিক (২য় বর্ষ) তৃতীয় সংখ্যার কিছুকিছু লেখা পড়লাম। আপনার সম্পাদকীয়টি সুশীলিত। রচনার মধ্য ও শেষভাগে যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে তার সঙ্গে পুরোপুরি আমি একমত।’ ‘.....এই সংখ্যার জরপ্রকাশ নারায়ণ সম্পাদিত রচনাটি (শ্রীমত নতেন সাহা) বেশ ভালো লেখা।.....’

কবি হীরালাল দাশগুপ্ত

‘আপনার সম্পাদকীয়টি (৩য় সংখ্যার) পড়লাম। চমৎকার!’

সম্পাদক, ‘বেতার বাংলা’ (ঢাকা)

‘সত্যিই আপনার ‘শারদীয় চেতনিক’ (১৩৮১) বেশ ভাল হয়েছে। কতকগুলি রচনা সমকালীন সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে বিবাহ করি।... ..’

‘চেতনিক’-এর পরবর্তী তৃতীয় বর্ষ প্রথম (জুলাই) সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :—

প্রবন্ধ : অরুণাচল সরকার / নারায়ণ চৌধুরী / নতেন সাহা (বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পাঠকদের অনুরোধে জরপ্রকাশ সম্পাদিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ) / ড. নিশিরহুমা সিংহ

গল্প : বাণিক দাস

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত / লখাই কিছ / ড. হুমায়ুন নকী / ড. শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায় / কবিরাজ ইন্দ্রনাথ / মণিকর্ণ ভট্টাচার্য / কবিরাজ খোলা (ঢাকা) প্রভৃতি।

‘চেতনিক’-এর বার্ষিক টাকার হার ১০ টাকা। ডাকবার ব্যয়।

ত্রৈমাসিক ‘চেতনিক’ প্রকাশিত হয় বোট চার বার : জুলাই | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর (শারদীয়) | আনুমানিক এপ্রিল।

মূল্য দুটাকা পঁচিশ পয়সা

দ্বৈত/হৈমন্তিক চিত্রক

১৩৮২

৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় (মুখ্য) সপ্তাহ



অতীতকাল বাস্তবায়ন
 সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিকে

‘অবোধবরী’-দেব দুর্নীতি বিকৃত কচি ও

চেতবিক

চৌকিত দুর্বোধাতার বিকৃত অকৃত

সংস্কৃত । অকৃতলক্ষ্য কন্যোপাধ্য

পংখ্যাবরত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র

পোঃ ও মেলা মুম্বাইবাহ : পশ্চিমবং

প্রকাশকাল : জুলাই/পূজা/আহুয়ারী/

এপ্রিল ।

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

◆ স্থায়ী পরামর্শ পরিষদ ◆

সভাপতি : শ্রীঅরুণচন্দ্র রায় (কলিকাতা ৬৮)

সহ সভাপতি

ডঃ হুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ আমর চক্রবর্তী (হা পল্ল, ইউ এস-এ), অধ্যাপক
অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক হুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিণা
বক্স বহু, ডঃ হুধীকুমার নন্দী (সময়সাহক ও আহ্বায়ক), অধ্যাপক ডঃ হুধী
কুমার করণ ।

বিশিষ্ট সদস্যবর্গ

শ্রীহীরালাল শানগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মুম্বয় পাল, শ্রীবানিক
রায়, ডঃ শিশিরকুমার সিংহ (আহ্বায়ক), শ্রীমতেন সাহা, শ্রীভবেন্দ্র সরকার,
অধ্যাপক সোমেন গুপ্ত, শ্রীরামপ্রসাদ পাল শ্রীবিশ্বনাথ রায়, শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ
গোস্বামী, শ্রীঅমল সঙ্কমহার, ডাঃ হুশীল মজিত ।

সহযোগিতা করে থাকেন

শ্রীপুলকেন্দ্র সিংহ (পাচুপী, মুম্বাইবাহ), শ্রীজগদীশপাল রায়, (মুম্বাইবাহ)
শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায় (পি পি সি ডি হুগাপুর), শ্রীহুশীল চক্রবর্তী, ৭৪/এ আত-
তোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫)

প্রচ্ছদ শিল্পী

শ্রীপকানন চক্রবর্তী

.. হুধ থেকে যতহুধ অহুমান করতে পারছি প্রেস-এর অহুবিধাই আপহুধের
সবচেয়ে বড় অহুবিধা । প্রেসের মজি মাজিক চলতে হলে পত্রিকা কোন
সময়েই নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না । যেমন আপনাদের
শারদীয় সংখ্যা পূজাবকাশের পূর্বে বেরতে পারলো না কেবল ছাপাখানার
অহুবিধার জন্তই । এমন কি মধ্যবর্তী একটি (৩য় বর্ষ :২) সংখ্যার প্রকাশ
পথ্য হুগিত রাখতে হয়েছে একই কারণে । এ বিষয়ে হুধী কোন ব্যবস্থা
অবলম্বন করতে পারলে ভাল হয় ।

..... নারায়ণ চৌধুরী

৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় (মুখ্য) সংখ্যা। প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র

প্রকাশকাল : জুলাই, পূজা/জ্যানিউয়ারি/এপ্রিল

সম্পাদক ॥ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিম বঙ্গ

মুঠা

সম্পাদকীয়

কবিতা : অমিয় চক্রবর্তী / হীরালাল দাশগুপ্ত / দক্ষিণারঞ্জন বসু / কিরণশঙ্কর

সেনগুপ্ত / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫-৮, ১০২

প্রবন্ধ : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রচেতনার অরূপ ॥ নয় / অন্নদাশঙ্কর

বসু ॥ লেখকের সংকট ॥ উনিশ / নারায়ণ চৌধুরী ॥ আন্তর্জাতিক নারী

বর্ষের ভাবনা ॥ তেইশ / ডঃ সুধীর নন্দী ॥ সাহিত্য : নন্দনভাস্করের

দৃষ্টিতে ॥ পনের / কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥ স্বাধীনতা সংগ্রামে পথের দাবীর

ভূমিকা ॥ উনত্রিশ / ডঃ হুমায়ুন কবীর ॥ উপকথার নায়ক / তেত্রিশ

ডঃ শিশির সিংহ ও অধ্যাপক জগদীশ গগ চৌধুরী ॥ ত্রিপুরার আকলিক

কথা ভাষার বৈশিষ্ট্য ॥ আটত্রিশ / সত্যেন সাহা ॥ সাধারিক শিক্ষা-

ক্ষেত্রে ॥ পুলকেন্দ্র সিংহ ॥ DAVID McCUTCHION প্রসঙ্গ ॥

বিয়াল্লিশ/সাদনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ একটি সবজনীন উৎসব ॥ ছিয়ানবই/

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চেনা গোলাপ ॥ উনপঞ্চাশ

পত্র : ডঃ ক্রমাগতসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ শেষ চিঠি / পঁচাত্তর

গল্প : বেমানা বিশ্বনাথম ॥ চুরাঙ্গ / বানিক রায় ॥ উনষাট / দিব্যেন লাতিডী ॥

আটত্রিশ / মনীষিমোহন রায় ॥ শতাত্তর / অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ছিয়ান

কবিতা : লখাই কিশু / অমলকর গুপ্ত / অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/কিরণ ইন্দ্র/

বলরাম রায়চৌধুরী / ব্রজগোপাল রায় / বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় / সনাতন

মিত্র / দীপক চট্টোপাধ্যায় / ভাবন মুখোপাধ্যায় / রামপ্রসাদ মল্লিক /

চন্দ্রশেখর ঘোষ / অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ একশো ছুই হতে একশো

বিশ

ক্যাশমার টেক্সটাইল কর্পোরেশনের

ইউনিট

বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস্

ও

মণীন্দ্র মিলস্

এর

সূতা ও কাপড়

সারা ভারতে সুনাম কিনিচ্ছে।

নূতন সংস্কার

N T C EMPORIUM

পুজার আগে খাগড়াতে খুলছে

যেখানে স্যামান্টো পাবেন

NTC Unit-এর প্রস্তুত ধুতি, শাড়ী,

পল্লিন, লংক্লথ, প্রিন্ট ইত্যাদি।

কলিকাতা অফিস

রিটেল শপ

মিল

৫, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট

১) মিল গেট

কাশিমবাজার

কলিকাতা—১

২। চুনাখালি

ফোন : বহরমপুর ৫৩১

ফোন : ২২-১৪০৭

নিমতলা

জন্ম খ্যাসারি প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)

কাকপকীয় কুনজরের আশংকার স্বল্পবৃত্ত বাড়িখানার মাঝার আগেই চালিয়ে-
ছিলের চালাই করা চিক। হঠাৎ খেরাল হ'লো ঘরে আশার নিশ্চয় কেব'নগরের
মশার উৎপাত হয়েছে। তাই কটপট একখানা মশারি ম্যানেজ ক'রে নিয়েছি।
দিনকুপুবেও মশারির অভ্যস্তরেই অবস্থান করি। এবং মশারির ভিতরেই
উত্তন আলিয়ে হতলব করেছি খ্যাসারির ভাল বাজা ক'রে কাগা দিয়ে পরিবেশন
ক'রে সজার নাস্তা করাযো আপনাদের মতো স্বাস্থ্যিক ঐদরিকদের। কার্নিক
মশকুলের আশংকার মশারির বাইরে যেতে ভয়সা হয় না। তাই এই বিদুরের
খুদুড়ো যা জুটেছে তাই দ্বিগুণে জুড়োতে চাই আপনাদের অঠংজালা।
খ্যাসারি খেলে ককট রোগ হয়—এ খবরটা অসাধু পসারিদের আবাটি ঘটনা
ব'লে মনে করাই অতএব বৃদ্ধমানের কাজ।

তবে মশাই, একটা মুশ'কিলের কথা এখন থেকেই মাথা চাড়া দিচ্ছে
আমার মনে। উত্তন না-হয় ধরানো গেলো। ভালও গড়ানো গেলো ভাল
থেকে তের্চতে। ধ'রে নেওয়া গেলো সেই উত্তরের আস্তন লেহন করলো না
লোভী ভিত মেলো মশারির চাল কিংবা চার চোয়াল। এবং নিষ্ঠুরাটে এক
সময়ে রাজাও হ'লো উপাদের খ্যাসারির ভাল। ধ'রে নিলেম কাগার সছিত্ত
আশ্রয়ে ধরা-ও দিলো সেই ব্রহ্মবাদসহোদর খ্যাসারির ভালের পর্যালপরিমাণ
তরলিত চক্রিকা। কিন্তু সেই ভালধারিণী খায়া কী-উপায়ে পৌঁছে দেবো
কিংবা উপড় ক'রে দেবো আপনাদের পাতিত পদপদে! কারণ মশারির চার
চোয়ালের কোনো প্রাঙ্কাংশটুকুও আমি উত্তোলিত হ'তে দিতে রাজি নই।
মশা-র আমার বড়ো ভয়। কোনো বরাতয় ই আর আমাকে নির্ভর ক'রতে
পারছে না। আত্মীয়পরিজন, অচুগৃহীতঅচুগ্রাহকগণ যে ট আত্মক না কেন
আমাকে সাহুনা দিতে—আমি তাদেও যদিও বলছি তোমাদের সহায়ত্বভূতিতে
আমি অভিকৃত, তোমাদের জাবকতার আমি জরীভূত, তোমাদের স্বস্তিবাচক
সংঘনাদে আমি নগীভূত তবু আমি প্রত্যেককেই দেখছি ঐরংজনের স কুচিত
নিকটনজবে। শুধু তর কেউ ব্রি মশারি কাক ক'রে মশা ঢুকিয়ে দিলে
আমার স্বগতিক বিশ্বসংসারে। মশাতংকে আমি থাকি সগা মিশ্রাণ।

অবশ্য কেউ যদি ব'লে বলে 'আপনার দেহে তো বসা-র অভাব নেই,
তবে মশা-র এতো আভ্যক কেন মশাই? মশার হল আপনার দেহের দুর্ভেদ

বসাবরণ ভেদ ক'রে রক্তমোক্ষণে অক্ষম যখন তখন তো আপনি দুর্দম দুর্জয় — তাহ'লে জেবে আমার জুতসই জবাব দেবার ক্ষমতা কিছুই থাকে না বুঝে। তবে ভয়সা রাখি এমন বিপজ্জনকভাবে কেউ আমাকে বেগুফু, বানাতে চাইবে না। হে আমার স্বাবকবুদ্ধ, আমি তোমাদের হাঁক ছেড়ে ব'লতে চাই : এ আমার একপ্রকার হাড়মুট্‌মুটি রোগ। সত্যিনের বেটিকে বচিতে কুটে ঝোল না খেলে এ-রোগ সারবার নয়। এ-রোগ য'র হয়েছে একমাত্র সে-ই জানে এর কী আলা। সব সময়ই যান্ত্র থাকতে হয় নতুন-নতুন ফন্দিফাঁকির উদ্ভাটন-উদ্ভাবনে। চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল। এবন্দিধ মানসবৈকল্যের কবল থেকে আর বুঝি আমার নিস্তার নেই। চ্য ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আতিং ক্রিস্টল (Irving Christol)-এর একটা নিষ্ঠুর উক্তি আমার বুকের হাড়ের পাহার থেকে পাহারে ক্রমাগত ঠক'র খেয়ে ফিগছে : No one who has ever had a nervous breakdown is ever quite the same afterwards, no matter how pleased a doctor may be with his condition.' [Vide his article entitled 'AMERICA RECOVERS FROM THE FRANTIC 'SIXTIES : SPAN VOL. XIV NO. 9] মনের কব্জা যার একবার বিকল হ'য়েছে ভবিষ্যতে সে আর কোনোদিন ঠিক আগের মতো অবস্থা ফিরে পায় না। চিকিৎসক যতোই পুঁশি হোন-না কেন তার অবস্থা দেখে।

তাহ'লে কি আমি সবচেয়ে সেই অমোঘ পরিণতির পানে ধেয়ে চ'লেছি যার চৌহদ্দির চৌকাঠ পেঁরিয়ে কেউ কখনো ফিরে আসে না? গল্পের সেই থুথুয়ে বড়ি মতে অস্বীকার ক'রেছিলো এই অজুহাতে যে সে ম'বলে তার কুলগাছ আগলার লোক মিলবে না। কুলগাছের মোহনীয়ায়ার মোহে মুগ্ধ আসক্তি-আবদ্ধ বড়ির পরিণতি কী হয়েছিলো তা অহুমান করা কঠিন নয়। বেচারির মাঝার মোদা একটা বুদ্ধি খেলেনি। কুলগাছটা কেটে ফেলে সেট কাঠের চিতায় নিয়ে উঠলেই সব সমস্তার হুটু সমাধান সম্ভবতঃ অসম্ভব হতো না। আমিও তাই ভাবা'ছ : আমার এই সাধের জমিজমিতে শত্রুও কবলে প'ড়তে দেবো না ব'লেই যখন চকে আর মশারিতে তাকে স্তব্ধকৃত সংকীর্ণ ক'রে নিয়েছি তখন একান্তই যদি হৃদয়কাল উপাস্ত হয় তাহ'লে আকণ্ঠ খ্যালাবির ডাল গলে ওই উল্লুনের আগুন মশারির চালে চোয়ালে লাগিয়ে দিয়ে জমিজমের তস-ই না-হয় ভয়ংকর শেখের সেদিনের মোকাবিলা করা যাবে। সত্যিনকন্ডাকে 'ছাইখা' বলার ভুলটুকু নিয়েও অন্তত যেতে পারি যেন এই ধরালোক ছেড়ে পরলোকে। জ—য় হিন্দ!

অন্তরাল

অমিয় চক্রবর্তী

কোয়লা, কোয়লা ।

এখনো আছ উচু ডালে

অন্তরালে

হুমিয়ে থাকো রাত সকালে

সাবাজীবন—

একটু আধটু চোখ বুলেছ (কী দেখেছ),

বনাকীর্ণ প্রাণের রথন

শিষায় স্বনন

ঝিমিয়ে এল, সব ভুলেছ :

যুহু শূন্তে হাওয়ার ঘোলা —

হে কোয়লা ।

কোয়লা, কোয়লা ।

আমরা তো চোখ বুজি, বুঁজি

মানবলংসারে,

কথার ধাঁধায় হারাই, বুঁজি

শেষের পারে —

প্রাণের ধারে

তুমি যা পাও তাই কি বুজি ।

কার দেওয়া কেউ জানিনা তা

উচু ডালে তোর সকালে

শিশির কিছু, কচি পাতা

পরা—তোমার এই আড়ালে

দেখে যাবো তীর্থ ঘরে
 তোমার দেশের মুক্ত হবো
 পবন মালা,
 বিদায়-সন্ধ্যা-তারার জ্বালা।
 হে কোয়ালী ॥*

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

অগষ্ট, ১৯৭৫

*২৪শে অগষ্ট ১৯৭৫ U.S.A. থেকে ডঃ চক্রবর্তীর পত্রাংশ :

...অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালী নামে একটি অতি আশ্চর্য জন্তু অরণ্যে থাকে— তাণ্ডা
 সকলেরই প্রিয়, তাদের জীবনযাত্রাও অপূর্ণ। কোয়ালীরা থাকে ফ্যুকার্লিটস্
 বা গ্লিম গাছের উচ্চ ডালে, প্রায় সারাজীবন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। খায়
 শুধু কচি পাতা আর শিশির বিন্দু। এত লাজুক আর অন্তরালবর্তী তাদের
 জীবন, এবং দেখতে এত সুন্দর যে কোয়ালীকে 'ভোলা শক্ত'। তাদের
 উদ্দেশে ওই লীরিকটা লিখেছিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে বিদায় নেবার সময়।....'

ক্যা মী লি অ্যা লু
 চলমান দৃশ্য নাট্য
 হীরামাল দাশগুপ্ত

প্রথম দৃশ্য।

বিঃসার বহুস্বরূপী হাওম !

ধীরে ধীরে বস্তুমুখী নীল গাত্রি নামে।

বিচিত্রবর্ণের সুগন্ধ অন্ধকার আলো।

স্বরে স্বরে ছন্দে ছন্দে

ভবংগিত অংগে অংগে জীবনের মৃদুবিলাস !

বহুস্বপ্নের সারা রাত।

সহস্র সহস্র সারা রাত

বর্ণের। গন্ধের। শব্দের।

দ্বিতীয় দৃশ্য !

তীর্থ কুটির। ফুটো চাল। ভাঙা বেড়া।

কবি খোজে ছন্দের মিল।

গৃহীণীৰ বিশিৰ্ণ শৰীৰ

ভাষাহীন ছই চোখে হৃদয় হতাশা ।

কবি শুধু ছন্দপতন ধ্বনি শোনে ।

অদূৰ হাৰেম থেকে ভেসে ভেসে আসে

বক্তনীর গোলাপের সুব ।

অভিভূত কবি

মাটির সবুজ ছেড়ে নক্ষত্রের নীলে নীলে খোজে

চিরস্থানী নীলনয়নাকে

ছন্দোময়ী অরূপ রূপসী !

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজপথে কংকাল মিছিল !

উৎসর্গ নেমে আসে হৈমেনে ভাঁড়াবে ।

ট্রাম বাসে ভিড় ঠেলে দশটা-পাঁচটা করে

ভীকাস ভাইআনো ।

চিরস্থানী উড়ে যায়

প্রত্যাশিত ধুলো বালি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ।

কবিতার ভদ্রনামে লাড়লের ফলায় ফলায় ।

দৃশ্য চতুর্থ ।

অভূত পশুদের অস্তিত্বের বিকাব ব্যঙ্গনা ।

কেউ হাসে । কেউ নাচে । কেউ গান গায় ।

কেউবা বেহুস বেতাল ছোয়ে পড়ে যায় মকের গুপ্ত ।

হঠাৎ একটা বাঘ ক্রন্দাক্ত স্ত্রীর ছোয়ে যায় ।

দর্শক আভাস পায়

পূর্ববর্তী দৃশ্যের প্রসঙ্গ চলে ।

এ নাটকের শেষ নেই

যাত্রি আর দৈন শুধু দীর্ঘে ঘীরে দৃশ্য বদলায় ।

অজ্ঞান আরও পাথর

দক্ষিণাবজ্ঞান বসু

সপ্তাহের বরা টেনে টেনে দৈনিক নাটক

ক্লাস্ট পের স্বাভাবিক সহ্যার আকাশে ।

নিরন্তর সূর্যকণ্ঠ ছড়ায় বক্তাক্ত ছায়া

দিগন্তে নীলাচল জুড়ে ধূসর ব্যাঘ্র ।

অনেক মনীষিবাদী, তা স্বকের খণ্ড খণ্ড কথা

শরীরী লক্ষ্যকায়ে কণে কণে দাঁড়ায় গম্বুধে ।
 চারিদিকে বিজ্ঞতার ভান হাজিকে প্রাণের দেখে,
 ঘনশক্ত পাখরের লাহাড়ের মতো অন্ধকার ।
 ভায়ে ধূয়ে মুছে ফেলা কতটা সম্ভব বলা
 শুধুমাত্র বক্তৃতার অবিচল শিলাবৃষ্টি দিয়ে ?
 সে প্রস্নেহই আনাগোনা পথে-প্রান্তে কলে ও কলেজে,
 ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা তো নিপাত ভূতলে, কে দেবে উত্তর ।
 লহসা বোমার শব্দ, ট্রাম-বাস জলে জলে ছাই —
 এ তুর্বাধ্য শাসানিতে অন্ধকার আরও পাথর !
 নিখাস প্রাশাসে কষ্ট, পুরুষের যুকের ওপর
 জলের আড়াল থেকে মাছেদের ভয়াৰ্ত্ত বৃষ্টি ।

তোমাকে দেখতে চাই একবার
 কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমাকে দেখতে চাই একবার
 তুমি যৌবনের তেজে বহু আকাঙ্ক্ষায়
 বাঘের মতো উদ্দীপিত ;
 ছুই হাতে অনেক বিবর্ণতা ভাঙতে ভাঙতে
 শোনিতে ঐক্যে বেদে
 আবার এক নতুন নির্মাণে
 দাকণ ঐশ্বর্য গড়ে তুলতে চাইছে ।

আর তখন
 তোমাকে একবার উদ্দীপিত হতে দেখলে
 আমিও জীবন ঝড়ো হাওয়ার মুখে,
 নড়বড়ে চাড়ির ভেতরে
 ধরজায় পিঠ দিয়ে প্রাণপণে দাঁড়াতে ।

রবীন্দ্রচৈতন্যের স্বরূপ / ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কৌতূহলের অস্ত নেই। কারণ এই নতুন যুগের কবি এমন একটি দর্শন তাদের সম্মুখে এনেছেন যা প্রকৃতই অতি মূল্যবান। তিনি শুধু মহাকাবি ছিলেন ব'লেই এই কৌতূহল নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের। বিশেষতঃ বাংলার বাইরের লোকের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-স্বাদন সম্ভব হয়নি। বড়জোর শতকরা একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিছুটা পরিচয় রাখেন এর। তবু তাঁরাও যখন কৌতূহলী তখন বুঝতে হবে অস্ত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটি নতুন জীবনবাতা এনে দিয়েছে। সাধারণ লোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক সাহিত্যিক আলোচনা স্তরে চায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণী, তাঁর জীবনের এবং অস্তত্বের ছন্দোময়তার উপলব্ধি খুব চক্ৰবর্তী নয়।

রবীন্দ্রদর্শনের নিগূঢ়তাকে, অনিবার্যতাকে গ্রহণ করবার জন্তে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি কত প্রয়োজন? উৎসবশেষে যখন আলোকোজ্জ্বল মন্দির গুপ্ত ঘরানাকাপাত হবে তখন কোন্ শাস্ত্র প্রেরণা আমাদের উদ্ধৃদ্ধ করে দিতে থাকবে, কোন্ শাস্ত্র আমাদের ভাঙারে সজ্জিত থাকবে চিরকালের সম্পদ হয়ে? শুষ্কগেট সব শেষ হলো, না অস্তবে কিছু বেশ রেখে গেল? রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে অস্ত কোন্ বিচিত্রলোকের সন্ধান পাব আমরা? —এসব বিষয়ে স্থির চিহ্নে 'আত্মজিজ্ঞাসা'র অবকাশ এসেছে।

সমাজজীবনে কবির স্থান :

কবির অভাবে সমাজের ক্ষতি কী? কবির সাতাষা সমাজের সমৃদ্ধি হয় কতোটুক? সূর্যালোক, মলয়পবন ও বসন্তের অভাবে জীবন হয়তো কোনক্রমে চলে যেত। কিন্তু জীবন হ'ত তাত্ত্বিক অত্যন্ত রিক্ত, দারিদ্র ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যবহারিক জীবনে কবির প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু যে-শাস্ত্র মাতৃষের মনে নবীন আশার সঞ্চার করে সেই শাস্ত্রের জন্তেই কবির আবির্ভাবের প্রয়োজন। কবির আবির্ভাব সম্ভব হয় কারণ সমাজের অবচেতন মনে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। উপহৃষ্ট পরিমানে আলো-বাতাস যোগাতে পারে যে মাটি কেবল সেই মাটিতেই বনস্পতির জন্ম সম্ভব। কবি মাতৃষের চিত্ত থেকেই বসাহরণ

করেন। সাধারণ স্রষ্টাব্যবস্থার মনে রয়েছে অসুখট চেষ্টা, অসুখট আকাংক্ষা, অসুখট স্বপ্ন। কবির কাব্যে মানবজীবনের সেই অসুখট আশা-আকাংক্ষা, বিবাদ-বেদনা সুস্পষ্ট রূপ পায় অল্পপম সৌন্দর্যে। এক হিসেবে যুক্ত জনসাধারণই কবিকে সৃষ্টি ক'রেছে। অসুখটিকে কবির কল্পনার প্রসারতাই আমাদের সৃষ্টি করে। সমাজের মনে যদি সৌন্দর্য-সৃষ্টির আকৃতি না থাকতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব হ'তো না এই বাড়ালি সমাজে।

মহাকবির অস্তিত্ব :

মহাকবি আখ্যা এমন কবিকে আমরা দিইনে যিনি শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রেই নিবৃত্ত হন। যিনি জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, পথনির্দেশ করেন, বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতে বিচলিত, বিমুঢ় জাতিকে যিনি মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের অশ্রাব্য ইংগিত দেন তাঁকেই ব'লবো মহাকবি। তিনি জাতির মনের গতি ও প্রকৃতির খবর রাখেন, নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখেন এবং সেট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন এক রূপলোকের সৃষ্টি করেন যেখানে জাত অনির্বচনীয়ের সন্ধান পায়, মুক্তির সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে-রূপ আমাদের সামনে ভূলে ধ'রেছেন তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার একটা গভীর আগ্রহ নিশ্চয় আমাদের মনে রয়েছে। নইলে তাঁকে মহাকবি ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার কোনো সার্থকতা নেই।

কবিকৃত্য :

সাধারণ জীবনযাত্রা অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিবাহিত হয়। এই সীমাকে অতিক্রম করবার প্রেরণা আমরা আমাদের জীবনে কোথাও খুঁজে পাইনে। কবির কাজ এই সংকীর্ণতার উল্লে ওঠবার নির্দেশ প্রদান, নতুন দিগন্তের উদ্ঘাটন, বৃহত্তর জীবনব্যবস্থার সৃষ্টিসাধন, উদার, মুক্ত, বিস্তৃত জগতের সন্ধান দান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন :

প্রকৃতির পরিবর্তমান সৌন্দর্য কেবল দৃষ্টবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে না। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ যদি জন্মায় তাহ'লে আমাদের জীবন আরো সুন্দর হয়। তাই প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যকে অস্তরে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গেও আমাদের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মানবাত্মার আয়তন তারায় তারায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার এমন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে যে তার অহীলন করলে আমরা বৃহত্তর জীবনকে আন্ধান ক'রতে পারি।

স্বপ্ন জীবন :

স্বপ্ন জীবনযাত্রা কী ক'রে নির্বাহ করা যায়? রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে-সব অশুভূতি বিদ্রাক্ষকের মতো আমাদের মনে জেগে ওঠে তাদের যদি ধ'রে রাখতে পারি, যদি মতঃ অশুভূতকে জীবনের ছন্দে গেঁথে তুলতে পারি, তাহ'লে স্বপ্ন জীবনযাত্রা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ :

কবি আনন্দের এমন একটা বেগ অশুভব করেন যার প্রচণ্ড আলোড়নে তাঁর কাব্য পাঠে আমাদের এই গতানুগতিক জীবনের প্রাত্যহিক বিষ্ময়নিটা কেটে যায়। কবি যখন বর্ষার বর্ণনা করেন, ব'রষা মেঘশমায়েছের মধ্যে বিদ্রাক্ষকের বর্ণনা করেন তখন আমাদের অস্থিরের একটা উদ্বেজনা একটা তাঁর আবেগের সৃষ্টি হয়। তাঁর বর্ণিত বসন্তের সৌন্দর্যের হাটে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি। কবির কাব্যপাঠকালে আমরা পাপিন জীবনের সংকীর্ণ গভীকে অতিক্রম ক'রে যাই।

কবির অধ্যাত্মবাদের অভিনবত্ব : আধুনিক জীবন বেদ ও

ঔপনিষদিক তত্ত্বের সমন্বয় :

জড়বিজ্ঞানের যুগ, নাস্তিকের যুগ—যা যন্ত্রসভাভার বিন্দু'ত ঘটেছে, পুরাতন গভীকে অতিক্রম ক'রে নতুন নতুন ঐশ্বর্যোপকরণ সৃষ্টি ক'রেছে—সেই যুগে তিনি উপনিষদের বাণী শুনিয়েছেন। তাই ব'লে তিনি প্র' গ্রন্থায়ণীল ন'ন। তিনি ব'লেছেন প্রগতিশীল জাতিসমূহের সংগে সমতা বজায় রেখে ব্যাবহারিক ঐশ্বর্য-উৎপাদন এবং ভোগ করার সংগে সংগে প্রয়োজনসাপেক্ষে ভোগের ক্ষেত্রও প্রস্তুত থাকতে হবে। ভোগের আসক্তি এমন চবেনা যাতে, প্রয়োজন হ'লে, ভোগের প্রবৃত্তি না-জাগে।

আধুনিক জীবনবেদ ও উপনিষদের তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ক'রেছেন কবি। উপনিষদের ভগবৎ অশুভূতি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আবিষ্কার নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের নৈকট্যবোধ ছ'হাজার বছর পরে রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিধ্বনিত হল। তবে ঔপনিষদিক অশুভূতি উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনের নি'ভর মুহূর্তে বিচিন্তভাবে ভগবানের লীলা অশুভব ক'রেছেন। আমরা যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মূলভূমিস্থান করি তাহ'লে তাঁর মধ্যে দিয়েই ভগবানের সম্পর্কে

নৈকট্যবোধ আসবে। কবির মতে এর জন্মে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপাসনার প্রয়োজন নেই। সেটা ‘পারলৌকিক নৈমিত্তিকতা’। ‘আধ্যাত্মিকতা’ নয়। প্রকৃতিসম্পর্কে চেতনার মধ্যে দিয়েই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংগে একাত্মতাবোধের মতো দিয়েই ভগবানের সংগে যোগাধিকার সম্ভব। ভগবৎ উপলব্ধি সম্পর্কে এট তবু কবি তাঁর বহু শু বিচিত্র রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রাতিপন্ন করেছেন।

ঋতুচক্র প্রাকৃতিক নিয়মের, বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন। রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার ক’রেও ব’লেছেন এইটিই একমাত্র সত্য নয়, গভীরতম সত্য নয়। ভগবান মানবমনে বিচিহ্নাভূতি সৃষ্টির মানসে প্রকৃতির সৃষ্টি ক’রেছেন। এর মধ্যে দিয়ে একটা আনন্দলীলার প্রবাহ বইছে। এবং এটি আনন্দলীলার মধ্যে দিয়েই ভগবান মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক’রেছেন। জড়-বিজ্ঞানকেও এঁনিই পরিচালিত ক’রেছেন।

মানবজীবনের তাৎপর্য :

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য যদি হয় ভগবৎ উপলব্ধি তাহলে মানবজীবনের তাৎপর্য কী? অনন্ত জন্মের ভিতর দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা। এক জীবনে এই সার্থকতা, এই পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। বহুজীবনের অভিজ্ঞতার পর মানুষ ভাগবৎ মিলনতীর্থে এসে উপনীত হয়।

অভাস্ত পৌনঃপুনিকতায় জীর্ণ ক্লান্ত পৃথিবীর যে রূপান্তর ঘটেছে, বালা-যৌবন-সার্থক্য-ক্রমাগত্রে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে তা একটি সুপারিকলিত নৃত্যছন্দে ঘটেছে। এলোমেলোভাবে নয়। জীর্ণকে ঝেড়ে ফেলা আর নতুনকে গ্রহণ নৃত্যের তালে-তালেই ঘটেছে।

এই জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, অনন্তকালে বিস্তৃত, সৌরলোকে ব্যাপ্ত। সৌর-জগতের কেন্দ্রস্থলে মানুষকে স্থাপনের কারণ সৌরজগতের দূরতম নক্ষত্রলোকের সংগে যোঁদন সে একাত্মবোধ ক’রতে পারবে সোঁদন-ই হবে সে পরিপূর্ণ। সকলের বশি, সকলের প্রভাব প্রতিটি মানুষের ওপর এসে প’ড়ছে। মানুষের জীবনের কোন সীমা নেই।

রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ রসোপলব্ধি :

গান কী? সুরের যাক, শব্দযোজনকৌশল, ভাবাভূতির গভীরতা এই তিনের সুষম সমন্বয়। ভাববস্তুকে যখন আমরা গ্রহণ ক’রতে পারি তখনই সেই গান হয় জনপ্রিয়। বাসপ্রসাদের গান এই অর্থে জনপ্রিয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগীত এই অর্থে জনপ্রিয় নয়। আজকাল বহু উৎসবাহুষ্ঠানেই

বনীজসংগীত গীত ও শ্রুত হতে দেখা গেলেও তাঁর সংগীতের ভাববস্তুকে উপেক্ষা ক'রে আমরা তাঁর স্বর ও শব্দযোজনকৌশলের প্রতিই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে অভ্যস্ত। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর'—এই বহু প্রচলিত গানটির 'অসীম' কথাটিকে বাদ দিয়ে বাকি অংশের ভাবটুকুকে গ্রহণ করতে চাইলে তা অর্থহীন হবে। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' ভগবানকেও ভক্তের কাছে এগিয়ে আসতে হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোকাবরণে আত্মগোপন ক'বে নেমে আসছেন তিনি। জ্যোতিষ্কালোকের পিছনেও এক উজ্জলতর জ্যোতির অস্তিত্ব রয়েছে। এই জ্যোতিই ভগবান।

বনীজনাথকে আমরা মহাকবি আখ্যা দিয়েছি ; কিন্তু তাঁকে আমাদের জীবননিয়ন্ত্রণের অধিকার দিই'ন। ভগবৎ-উপলক্ষি তাঁর জীবনে গভীরভাবে জড়িত ; তাকে বাদ দিয়ে তাঁর কাব্যোপলক্ষি সম্ভব নয়।

সমগ্র জীবন তাঁর কাছে একটি পবিত্র হোমযজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠাত। সর্ব-প্রকার ক্ষুদ্রতা ও নীচতাকে এই হোমানলে আহুতি দান করা প্রয়োজন। বনীজনাথের জীবনে সমস্ত পর্যায়েই এই উপলক্ষি দেখি। জীবনের রঞ্জে রঞ্জে এত ভগবৎ উপলক্ষি আমাদের নেই। তবে কী-ক'রে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন ক'রবো ? বনীজনাথ লিখেছেন এমন এক জগতের জন্তে যে জগৎ ভগবানের অস্তিত্বে, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনে উপনিষদ, নৈকবপদাবলী প্রভৃতি ভগবৎ-উপলক্ষের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। তাই বনীজনাথ সরাসরিভাবে এত যুগের অবিশ্বাসী, সংশয়ী ইউরোপীয় সমাজের জন্তে লেখেননি। তিনি লিখেছেন এমন জাতির জন্তে যারা নিবিবাদে ভগবানের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছে, যারা রামচন্দ্রের অবতারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন, যারা বিশ্বাস করে শ্রাবণঘন গহন মেঘের আওতায় আত্মগোপন ক'রে ভগবান মাচুষের কাছে নেমে আসছেন।

বুদ্ধির অননিগম্য যদি কিছু না-থাকে তাহ'লে বুদ্ধিবাদী বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধে কেন ? যদ্যপি মাচুষকে এতটা বেশি মূল্য দিয়েছে সেই পাশ্চাত্য জগতে কিসের এমন অস্তিত্ব ঘটেছে যার ফলে তারা ভীত, চঞ্চল, দিশাভাবী ? জগতের সমস্তার সমাধান করতে হ'লে মৈত্রী, শ্রম, ভালবাসাকে পার্বক ক'রে তুলতে হ'লে বনীজকাব্যের এত ভাগবৎ-উপলক্ষি সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ যে ভাববিলাসমাত্র নয়, এটি যে অপরিহার্য-
রূপে আমাদের জীবনে গ্রহণযোগ্য পাশ্চাত্যী জগৎও এ-সত্য উপলব্ধি ক'রতে
পেৰেছে, যদিও রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়লাভের সুযোগ তাদের জীবনে
অত্যন্ত সীমিত।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-ই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান দিক। তবে এ ছাড়াও
সাধারণ মাতৃবেগ সৌন্দর্যোপলব্ধির উপযোগী অজস্র কবিতাও রচনা ক'রেছেন
কবি। কাজেই এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধিবাদ দিয়েও রবীন্দ্র সাহিত্যের আংশিক
বর্ণনাস্থান সম্ভব। তবে কবিকে গ্রহণ ক'রবো অথচ কবির অহুত্বটিকে গ্রহণ
করবো না—এটা কারো পক্ষেই কলাপকর নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্পর্শে
এসে অন্ততঃ কিছু লোক-ও যদি এই উপলব্ধি লাভ ক'রতে পারেন তা হ'লেও
সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

DR SRIKUMAR BANERJEE

M. A., Ph. D., M. L. C.

Phone • 46-2827

31 SOUTHERN AVENUE
CALCUTTA-29

My dear Atul,

*I am glad that you took this verbatim copy of my
centenary speech on Radindranath at Murshidabad and
gladly give you my permission to publish it under the
title you have suggested.*

Yours affectly,

Sd/- Srikumar Banerjee

সাহিত্য : নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে

ডক্টর সুধীর নন্দী

সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন, যে, সাহিত্যের ভেলাতে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যবাসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সাহিত্য হল সাহিত্যের মূলে। আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সাহিত্য কথটির মনস্তাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পটভূমিতে আলোচনা করা হবে।

শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টির কোনও এক দেবদুল্লভ মুহূর্তে অমুভূতির তথা আবেগের চিত্রটিকে ভাবার আরশিতে ধরে দিয়ে সঙ্গদয় সামাজিকের কাছে তা উপস্থিত করতে চান; লেখা ছাপা হয়, ‘গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি’। উদাহরণ দিই, ক্লাসিক উদাহরণ।

মৈথুনক্রিয়ারত ক্রোঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হনন করল। দহ্মা বস্তাকর আবেগউচ্চকিত এক নিবিড় মুহূর্তে সেই বিয়োগাশ্রু নাটক দর্শন করলেন। তাঁর মনে যে কারুণ্যবস সঞ্চারিত হল তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সঙ্গদয় সামাজিকের মনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে করলেন? কেমন করে করলেন? কবিব মনের ভাব কেমন করে রসিকের মনে সঞ্চারিত হয়, তার পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সমালোচক এই তত্ত্বটিকে সত্যের মধ্যাধা দিয়ে বসেন কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই। তাঁরা ধরে নেন যে পাঠক ত সহজেই কবির কথা বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হল: সত্যি সত্যিই পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের মনের অন্তরে প্রবেশ করে তার আবেগ এবং অমুভূতির কথা বুঝতে পারেন কি? পাঠক বা সমালোচকের পক্ষে কবির অমুভূতির জগৎ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রতীতি জন্মাতে পারে কি?

কবিশুক্র রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’ নাটকের পেকে ‘মালিনী’র কয়েকটি কথা তুলে দিই।

“বাক্যকন্ডা আমি, দেখি নাই

বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাই

জন্মাবধি চতুর্দিকে প্রথের প্রাচীর,

আমারে কে করে দেয় ঘরের বাতির

কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহাবাজ!

ওগো ছেড়ে দে মা—কত্য়া আমি নহি আজ,
 নহি রাজস্বতা—যে মোর অন্তঃস্বামী
 অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই তুমি আমি ।”

কবি এখন মালিনীতে রূপান্তরিতা ; মালিনীর ভূমিকায় মহাকবি যে অশ্রুভূতির
 কথা বললেন সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য । তুমি আমরা কেন মালিনীর
 মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই আবেগ-অশ্রুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই
 হৈয়ালিপূর্ণ । মালিনীর মাতা রাজমহিষী, তাঁর গর্ভে মালিনীর জন্ম । তিনিও
 তাঁর বালিকা কত্য়ায় এই অন্তঃস্বামী অশ্রুভূতিলোকের কোনও সন্ধানই রাখেন না ,
 হয়তো এই অশ্রুভূতিলোকের দুর্বোধ্যতাও ইঙ্গিত কনিষ্ঠক দিতে চাইলেন তাঁর
 পাঠকে তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বললেন :

মহিষী ॥ “তুনিলে তো মহারাজ ? এ কথা কাহার ?
 তুনিয়া বুঝিতে নারি । এ কি বালিকার !
 এই কি তোমার কত্য়া ! আমি ঐক আপনি
 ইহাও ধরেছি গর্ভে !”

রাজমহিষীর ‘তুনিয়া বুঝিতে নারি’র স্বাকৃতি সমস্ত পাঠকের । আধুনিক
 সেন্সটিক্‌সে এই শব্দের অর্থের অনিদিষ্ট তত্ত্বটিতে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মধ্যদায়
 নির্দিষ্ট করা হয়েছে । কবি যে অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে শব্দ
 ব্যবহার করেন সে স্বর্গটুকু ত্রুটিগম্য ।

আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যাপবেদনার কথা বলি, সেই ব্যথা
 বা বেদনার কথা, আমাদের যে সাধারণ সুখ বা আনন্দের কথা বলি সেই সুখ
 বা আনন্দের কথা কি একান্ত প্রিয়জনরাও বুঝতে পাবেন ? সাহিত্যিকের
 উত্তম অশ্রুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার বাটরে থাকে বলেই আমাদের
 বিশ্বাস । আরও উদাহরণ দিই (এই উদাহরণটি দিয়েছেন স্বয়ঃ কবিগুরু
 রবীন্দ্রনাথ) :—

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্ঠমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন । তিনি
 তপোবনভরুদের ডাক দিয়ে বললেন

‘ওগো সন্ন্যাস হত তপোবন ভরুগণ,
 তোমাদের জল না করি দান
 যে আগে জল না করিত পান,
 শাব ছিল যার শাঁজতে তবু

স্নেহে পাভাটি না ছিঁড়িত কভু,
 তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
 যে জন মাতিত মহোৎসবে,
 পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
 তোমরা সকলে দেহো বিদায় !'

জানিনা তপোবনতরুউদ্ভিষ্ট কর্ণের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের বোধগম্য হবে কি না ? এ যুগের নগরবাদী মাতৃষের সঙ্গে প্রকৃতির হল অনাঅনুগত । নাগরিক সভ্যতাপুষ্ঠ পাঠক বা সমালোচক মাতৃষ এবং প্রকৃতির কথকথিত একাত্মত্বটুকু অহুধাবন করতে পারবেন না বলেই মনে হয় আর তা না পারলে শকুন্তলা কাব্যের আবেদন বহুলাংশেই এ যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে । কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত কথের সূক্ষ্ম বেদনাটুকুকে অহুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে আহুন, সে অঙ্কে আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রসভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে দেখিয়েছেন—

রাজপ্রেমসী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান করছেন :

"নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
 চুতয়জরি চুমি',
 কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছে
 কেমনে ভুলিলে তুমি !"

এই গানের অস্বরস্বিত ভাবটি হল এই দৃশ্যটির মর্মকথা । এটি প্রত্যাখ্যানের বেদনা অঙ্গিকাংশ পাঠকপাঠিকার কাছেই অবোধ্য । অকৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ বললেও ভুল হয় না । রাজা কৃতজ্ঞের অপরাধ এটি যুগের পাঠক পাঠিকার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয় । প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এ যুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় না এ যুগের মেয়েরা বা ছেলেরা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে দ্বিতীয়বার কেন বহুবারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অহুপ্রবেশ করে থাকে । সেই প্রত্যাখ্যানকে সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিতে absolute বা স্বয়ংস্বর করে তুলে জীবনকে মকভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না । অতএব কাব্যে যখন অহুভূতির, আবেগের কথা বলা হয় আর সে কথা না বললে কথা কাব্য

হয়েই ওঠে না তখন আমরা বলব যে কবির অহুত্বের অহুত্বমণ কণা পাঠকের পক্ষে হুঃসাধ্য। এক বৃগের পরিবেশ অস্ত্র বৃগে অলভ্য; একই কালে একই পরিবেশে বাস করে আবার দুটি স্নাত্ত্বের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই সত্যটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন : ‘ভিন্নকচিহ্নি লোকাঃ’ ভিন্ন লোকের ভিন্ন কচি। তাই আমরা কেউই একই জিনিষ দেখিনা, একই জিনিষ বুঝিনা, একই জিনিষ জানিনা। অর্থাৎ অতিপরিচিত দেখার বস্তুটিকে আমরা সকলেই ভিন্ন ভাবে দেখি। আবার উদাহরণ দিই—আপনি আমি শিমূল সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, শিমূল গাছের তুলো হয়, সজনে গাছ থেকে ডাঁটা পেড়ে খাই, বড়জোর সজনে গাছ চুর্যোপোকার উপভবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক আছেন, শিমূল সজনে হয়তো তাঁদের আরও কিছু স্বভিচারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে শিমূল সজনে কবি রবীন্দ্রনাথকে ঝগে আবদ্ধ করে, কোন্ এক অনাদিকালের মায়ায় কবিমনকে আচ্ছন্ন করে সে শিমূল সজনের কথা আমরা জানি না। গাছের এই অলখ সামান্য শক্তি—এই অমৃতময় রূপ, এই রূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। সেই দেখা হল ‘দর্শন’ করা, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখতে গিয়ে সেই দেখার কথা তাঁর একটি প্রবন্ধে বললেন, “এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দ রূপ, সে দেখা এখনও আমাদের : দেখা হয় নি স্নাত্ত্বের মুখে যে তার অমৃতরূপ, সে দেখার এখনো অনেক বাকি—‘আনন্দরূপমযুতঃ’ এই কথাটি যেদিন আমরা এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ, তাঁর ‘দক্ষিণঃ মুখং’, একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব : যো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিস্থ, যো বনস্পতিস্থ তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।”

অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয়। মন দেখে মন শোনে, সেই মনই চল রূপকার; সেই মনই বজ্রা আবার সেই মনই শ্রোতা; সে মন রঃ লাগায়। সেই মনই আবার বং অবলোকন করে। অতএব একের দেখা একের শোনা চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে যায়। একথা কবাবা কথা নয়, এ সত্য মনস্তত্ত্বসম্মত। সাহিত্যের যথার্থ সমালোচনা

তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনার সকালন (Communication)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখা, সাহিত্যিকের শোনা পাঠকের 'দর্শনে' এবং 'শ্রবণে' রূপান্তরিত করতে পারব তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ *emotions recollected in tranquillity*-র কথা বলেন, সেই আবেগঅমুভূতির নিবিড়তা যদি চিরকালের জন্য অকুঞ্জনার জানার বাইরে থেকে যায় তাহলে কেমন করে কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচনা সম্ভব হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সমালোচনার অর্থই তো হল, সমালোচক বিচার করবেন, কবি তাঁর অমুভূতির কথা, তাঁর ভাবাবেগের কথা, তাঁর হৃদয়উদ্বেগের কথা যথাযথভাবে পাঠকে জানাতে পেরেছেন কি না। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই অমুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন কবির জীবনান্বন্দ্য কবির জীবনবাদ এ সবার দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। অতএব কবির আবেগ অমুভূতির যথার্থ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির মানস-সত্তা তথা জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হল। কবির অমুভূতিলোক সাহিত্যিকের অমুভবের জগৎ চিরকালের জন্য পাঠকের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজের মনোমত একটি রসের জগৎ সৃষ্টি করে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হলেও পাঠক কখনই সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না আর সে অমুপ্রবেশটুকু না ঘটলে সাহিত্যসমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্যরসের অমুভব, সাহিত্যরসের আন্বাদন করা সম্ভব হলেও সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। অতএব বলা চলে 'সাহিত্য সমালোচনা' কথাটি সোনার পাথর বাটি, যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিবোধিতা নিত্য স্তম্ভভিত্তিক।

✓
লেখকের সংকট/অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যে কাজ ভালোবাসি সে কাজ করতে পেলে দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটতে রাজি আছি। কিন্তু তার বিনিময়ে যেন আমাকে আমার সংসার চালানোর মতো সংস্থান দেওয়া হয়। নহতো আমাকে বাধ্য হয়ে এমন কিছু

করতে হবে যার থেকে সংসার চালানোর মতো অর্থ আসে। কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি যে কাজ করতে ভালোবাসি এস কাজ করা হয় না। করা হয় এমন কিছু কাজ যে কাজ আমার ভালো লাগে না।

যা ভালোবাসিনে তা করা আমার প্রতিভার অপব্যবহার। যা ভালোবাসি তা করতে না পারা আমার প্রতিভার অপব্যবহার। এই অপব্যবহার ও অপব্যবহার আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিত। প্রয়োজনের কাজ ও প্রেমের কাজ এই দু'ভাগে প্রতিদিনকে ভাগ করে দিতে হতো। প্রয়োজনের কাজ না করলে প্রেমের কাজ করার মতো সংস্থান জোটে না। প্রেমের কাজ থেকে অর্থ যদি বা কিছু আসে তা প্রয়োজনের তৃণনায় অকিঞ্চিৎকর। প্রেমের কাজ থেকে অর্থ নেওয়া উচিত। ক না এবিষয়ে সংশয় ভুয়ায়। সংশয় উচিত নয়। কারণ সেইটাই আদর্শ। যারা যে কাজ ভালোবাসে তারা সে কাজ করবে। কবিরা কবিতা লিখবে। চিত্রীরা চিত্র আঁকবে। নর্তকরা নাচবে গায়করা গাইবে, বাদকরা বাজাবে। ভাস্কররা গডবে মূর্তি, নির্মাতারা নির্মাণ করবে মন্দির। অভিনয় করবে অভিনেতারা। খেলা দেখাবে খেলোয়াড়রা। বুঝবে সৈনিকরা। রাজ্য চালাবে রাজনীতিকরা। বিচারের ভার বিচারকের উপরে। আইনজ্ঞের উপরে আইনের ভার। চিকিৎসার কাজ চিকিৎসকের অর্থ নেওয়া উচিত নয়, এই যদি হয় নীতি তা হলে তো সমাজকেই করতে হয় এদের সকলের ভরণপোষণের প্রয়োজনোপযোগী ব্যবস্থা। কিন্তু তা করতে গেলে দেখা যাবে মুড়ি মিছড়ির একদর। কিংবা মুড়ির দর মিছড়ির চেয়েও বেশি। গুণোপযোগী না করলে সে ব্যবস্থাও ধোপে টিকবে না। ডাক্তারে ডাক্তারে অনেক তফাৎ। এঞ্জিনীয়ারে এঞ্জিনীয়ারেও তাই। শিল্পীতে শিল্পীতেও তাই। সৈনিকে সৈনিকেও তাই। সোভিয়েট রাশিয়াকেও এ তফাৎ মেনে নিতে হয়েছে। এখন আর প্রয়োজন অহুসারে নয়, গুণ অহুসারে পারিশ্রমিক। তবে তোমার যদি প্রয়োজন না থাকে তুমি কম নিতে পারো, নাও নিতে পারো। সমষ্টির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা সেটা গুণোপযোগীই হয়ে থাকে। তবে সমাজকে এটাও দেখতে হয় যে গুণ যাদের নেই তাদেরও প্রাণ আছে, প্রাণরক্ষার তাগিদ আছে। সে তাগিদ মেটানোর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম ব্যবস্থা চাই।

আপল কষাটা হলো, লেখক যা লিখবে রাজ্য বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা জনসাধারণ বা পাঠকসম্প্রদায় বা প্রকাশক বা সম্পাদক সে লেখার বিনিময়ে লেখককে সংসার চালানোর মতো অর্থ বা অন্ন সরবরাহ করবেন সে যদি

তার লেখার বিনিময়ে কিছুই না পায় বা যৎসামান্য পায়, তাকে যদি নানতম প্রয়োজনের জন্তে দিনের অধিকাংশ সময় ভাবতে ও খাটতে হয় তা হলে তার কবিতার ধারা আপনি ক্লান্ত হয়ে যায় বা কোনো মতে নিয়মবন্ধার জন্তে সে যা লেখে তা ছাত্রদের কটিন বৈধে অক কষার মতো ব্যাপার হয়। কবিতা এমন অপস্রগ নয় যে তোমার যখন সময় হবে তারও তখন সময় হবে। বরং তার যখন সময় হবে তখনই তোমার সময় হওয়া চাই। নয়তো সে চলল নিকদ্দেশ হয়ে।

লেখার জন্তে কিছুই দেব না, এটা একটা ব্রাহ্মীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সব জিনিসের দাম আছে, এর যেন কোনো দামই নেই। এটা যেন সময়সাপেক্ষ নয়, অপব্যয় নয় অন্নবস্ত্রনিভর। যে লেখে সে যেন মাতৃষই নয়, তার যেন ঘরসংসার নেই। অর্থাৎ একথা যেই তুললে অমনি তোমার লেখার চাহিদা গেল বন্ধ হয়ে। তোমার লেখা আর ছাপা হবে না। তুমি লিখতে চাপ্তো তো নিজের ঘরে নিজের জন্তে লেখো। নিজের খরচে ছাপাও। কিন্তু যে কাজ আমি ভালোবাসি তার বিনিময়ে কেউ যদি কিছু দিতে না চায় আর অভিমানে বশত আমিও যদি তা সমাজকে না দিই তা হলে তা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্তে, তা লোকতৃপ্তির জন্তে নয়। এটা যে কোনো লেখকের পক্ষেই কঠিন। সে দিন দিন নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। লোকজনের সঙ্গে খাপছাড়া বনে যায়। লেখা দশজনের তৃপ্তির জন্তেও বটে। তারা দাম দিক আর নাই দিক একবার তো পড়ক, পড়ে তৃপ্ত হোক, লেখকমাত্রেয়ই এটা মনোগত অভিলাষ। অন্তত ভাবীকালে পড়বে এটুকু সান্ত্বনাও যদি না থাকে তবে তো সে বক্তব্যমাত্রেয় মাতৃষই নয়, সে কাঠপাপরের দেবতা। কেউ আমার লেখা কোনো কালেই পড়বে না, লেখা আমার একক তৃপ্তির জন্তেই, এই যদি হয় লেখকের ধারণা তা হলে তার লেখা একদিন পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছবে। সেও দিন দিন দায়িত্বহীন হয়ে মদ গাঁজা হাশিশ ধরবে।

অপরপক্ষে সমাজের কাছ থেকে বিনিময় আদায় করে নেবার জন্তে আদা মুন খেয়ে লাগা কিংবা যে ধরণের লেখার বাজার দর আছে সেই ধরণের লেখা জোগানো, এতে হয়তো সংসার চালানোর রসদ জুটবে, কিন্তু এ তো সে কাজ নয় যে কাজ আমি ভালোবাসি করতে। এও তো দরকারী কাজের মতো দায় সারার কাজ। এতে আমার অন্তরাত্মের তৃপ্তি নেই। এটা আমার প্রতিভার অপব্যবহার বা অণুবহার। এর চেয়ে সবকারী কাজ বা দরকারী

কাজ ভালো। তাতে জীবনের অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্বয়োগ। এতে তেমন কোনো স্বয়োগ নেই। এতে হয়তো লেখার অভ্যাস বজায় থাকে। লিখতে লিখতে লেখার ভাষা মন্থন হয়, শৈলী পরিপাটি হয়। কিন্তু সার্ব কোথায়? শাস কোথায়?

লেখকের পক্ষা হচ্ছে ক্ষুধার পক্ষা। টাকা না পেলে লিখব না এটা যেমন ভুল, তেমনি ভুল, টাকা পাচ্ছি বলেই লিখছি। লিখে আপনাকে সৃষ্টির দায় থেকে মুক্ত করা এর চেয়ে উচ্চতর মার্গের কথা। না লিখে আমি পারিনি, কে যেন আমাকে জোর করে লিখিয়ে নিচ্ছে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে, এটাও উচ্চতর মার্গের উপলব্ধি। সত্যিকার সাধনলব্ধ সত্যের বা রসের বা রূপের মূল্য কে কবে পেয়েছে বা পেতে পারে! দেবেই বা কোন্ রাজা বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা পাঠকসামগ্রিক! শেষ বিশ্লেষণে কবি বা রূপকার হচ্ছে দাতা। পাঠক বা দর্শক হচ্ছে গ্রহীতা। বিনিময়ের প্রশ্ন যদি ওঠে তো সেটা নিঃস্বার্থ ও নিশর্ত ভালবাসার। আমি ভালোবাসি দিতে, তুমি ভালোবাস নিতে। আমি ভালোবাসি বাদিতে, তুমি ভালোবাস খেতে। বিনিময় বলতে এই বোঝায়। এই নিয়ে সম্বন্ধে যারা তাড়াই স্থায়ী।

কোনো কোনো লেখকের হাতে লেখনী হতে পারে তবুবারিও চেয়ে জোবালো। তাঁর এক একটা শব্দ মস্তে মস্তো কাজ করে। তার থেকে ঘটতে পারে বিপ্লব বা যুদ্ধ। কে না জানে যে ফরাসী বিপ্লবের জন্মে ঐতিহাসিকরা দায়ী করেন ক্রমশো ভল্‌ফের ও এনসাইক্লোপিডিয়া রচনানিবৃত গোষ্ঠীকে? তেমনি প্রথম মহাযুদ্ধের জন্মে নীচশেকে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইজদী উৎসাদনের জন্মে ভাগনাতের জামাতা জার্মান বানে য়াওয়া ইংরেজ বংলীয় হাউসটন চেম্বারলেনকে? লেখনী দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যায়, মারানো যায়, মোহিত করা যায়, সন্মোহিত করা যায়, বীরত্বে উদ্বোধিত করা যায়, কাপুরুষ করে রাখা যায়, আকাশে তুলে দেওয়া যায়, পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায়। মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা জীবনী, মিথ্যা কাহিনী মানুষের কন্ম অনিশ্চিত করেনি। লেখকমাত্রেরই সত্যনিষ্ঠ বা নীতিবদ্ধ বা কুচিমান বা রূপশ্রষ্টা বা বসন্ত নন। লেখার প্রকাশ নিষিদ্ধ করার বা লেখককে নীরব করার পক্ষেও যুক্তি আছে। কিন্তু এর ফলে ইতিহাসের এক একটা যুগ অন্ধকার যুগে পরিণত হয়েছে। কারণ লেখকরাই সত্যতার আলো।

আলো নিবিয়ে দেওয়া যত সহজ আলো জ্বালিয়ে তোলা তত সহজ নয়। এই ঝড় ঝাপটার যুগে কে কেমন করে আলো জ্বালিয়ে রাখবে এটা কি তার একাধি দুর্ভাবনা? না সমাজেরও এ বিষয়ে কিছু করার আছে?

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের ভাবনা

নারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান বৎসর (১৯৭৫) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রূপে চিহ্নিত হয়েছে ও তার সেইভাবে উদযাপন চলছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে নারীর মর্যাদা ও গৌরবের দিকটি তুলে ধরে নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠান, আলোচনা-চক্র, ভাষণ, লিখন ইত্যাদির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদপত্রে এটি সমস্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাঠ করতে করতে হঠাৎ মনে হলো এটি জোয়ারে সামান্য এই লেখক আমিও কেননা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ যোগ করার চেষ্টা করি। সেই চিন্তা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত।

অবশ্য গোড়াতেই বলে নিউ, আমি অতিথেকে ধার দিয়ে যাব না। নারীকে স্বর্গের দেবী বানাবার ইচ্ছাও আমার নেই, আবার মহু প্রমুখ এদেশের শাস্ত্রীয় বিধানদাতাদের মত নারীকে নরকের দ্বার রূপে অভিহিত করার প্রভুত্বাঙ্কক আত্মগর্বি মনোভাবও আমার নেই। পাশ্চাত্যের নারীবিশেষী লেখকেরা, যেমন শোপেনহাফ, নারীর গুণাবলীর প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে কেবলমাত্র তার দোষের দিকগুলিকেই লোকচক্ষে প্রকটিত করে তোলাবার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই ধারা বেয়ে তাঁরই দেশের আর একজন মাত্র পরবর্তীকালে নারীকে রক্তন ও সম্মানপালনের যন্ত্র ভিন্ন আর কোন ভূমিকায় অধিষ্ঠিতা দেখতে চাননি। আমি জার্মান ফুয়েবার হিটলারের কথা বলছি। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। নারীকে সৌন্দর্য, মাধুর্য, লজ্জা, কমণীয়তা, স্নেহশীলতা, সেবা, মমতা ইত্যাদি বিচিত্র সদৃশ্যের আধার কল্পনা করে তাকে জীবনের মর্মমূলে নিহিত হ্লাদিনী শক্তিরূপে স্বীকৃতি করা হয়েছে। শুধু মোহিনী নয়, কামিনী নয়, তাকে স্বর্গের কল্যাণলক্ষ্মী রূপে বন্দনা করে তার পায়ে পূজার সর্ববিধ উপচার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারী দেবীরূপে চর্চিতা হয়েছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মনোভাব ছিল অদ্বুত। তাঁরা একই সঙ্গে নারীকে শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার ও কোপের সহচরী রূপে কল্পনা করেছেন। যিনি সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী ও সংগ্রাম জয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়, তিনিই আবার সেবাদাসী! জায়া প্রিয়া মাতা দেবী ও দাসী সব ভূমিকা একটি সম্মান আরোপ করতে নারীকে এদেশে সনাতনকাল থেকে কতকগুলি পদস্পর্শবিষোধী স্নায়ুর অবড়জড় পুঁচলীতে পরিণত করে পাষাণীয় চেতনিক

তেইশ

তোলা হয়েছে। পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকগুলির পুনরাবিরুদ্ধতায় এক বক্তব্য অল্প বক্তব্যে খণ্ডিত হয়ে গেছে।

নারী দেবীও নয়, দাসীও নয়। মনে হয় তার অবস্থান এই দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যবর্তী কোনও এক জায়গায়। সেটা কোথায় আধুনিককালীন চিন্তাধারার আলোকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। নারীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সর্বপ্রথমে নিরূপণ করা দরকার। আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এ কাজে আমাদের সহায় হতে পারে। অবশ্য নারীর স্বভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থার যুগযুগব্যাপী অভ্যাস ও আবচাৱের ফলে নারীর মনের গভন এমন একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরি হয়ে গেছে যে তার অভ্যাসই প্রায় তার স্বভাবের স্থান গ্রহণ করেছে। অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলা হয়। সেটা অকারণ বলা হয় না। বিশেষ করে নারীজাতির বেলায় এ কথা যথাযথ বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। দুইচক্রের এক্সা-প্রতিএক্সার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য-পুষ্ট পুরুষজাতির অগ্রায় শাসন নারীর স্বভাবকে ছুঁড়ে-মুঁড়ে দিয়েছে এবং সেই পশ্চাদ্গত নারীস্বভাব আবার নিজের অসুচি প্রভাব খাটিয়ে সমাজকে পছন্দে টেনে রেখেছে! এই হলো আমাদের সমাজের চিত্র, বস্তুতঃ সব সমাজেরই চিত্র। কম-বেশ এ কথা সকল দেশ সম্পর্কেই সমান খাটে।

নারী ও পুরুষের সমানাদিকারের তত্ত্ব আজ একটি বাস্তবীয় আদর্শরূপে সবদেশেই স্বীকৃত। এ যুগের প্রবর্তমান স্তর সামোয় নীতির সঙ্গে এই তত্ত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এ তত্ত্বের সমর্থনে সমাজদর্শী ব্যক্তি মাত্রকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে কৌতুক ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, এই তত্ত্বকে কাজে খাটাবার পথে নারীই নারীর সবচেয়ে বড় বাধা। যখনই নারীপুরুষের সমানাদিকারের নীতিকে বাস্তবে রূপদান করবার জন্য প্রকল্প, প্রস্তাব, কার্যক্রম, আইন ইত্যাদি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়, নারীর কাছ থেকে তার বিরুদ্ধতা আসে অভাবনীয় রূপে। কখনও কখনও নারীর উন্নতির চেষ্টায় নারীই সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কেন এমনটা হয় সেটা আপাতদৃষ্টিতে একটা ধাঁধার মত মনে হতে পারে কিন্তু পূর্বের অচল্লেদে নারীস্বভাবের বিশেষ ছাঁচের বিষয়ে যে কথা বলেছি সে-কথা মনে রাখলে একে আর ধাঁধা বলে মনে হবে না। নারীস্বভাবেই নারীর অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় নিহিত।

দুই-চারটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। ইংলণ্ডে যখন গত শতকের শেষের দিকে এবং এ শতকের গোড়ায় পার্লামেন্টের নির্বাচনে মেয়েদের ভোটদান ও আসনলাভের অধিকারের দাবিতে ইংলণ্ডের তদানীন্তন আলোকপ্রাপ্তা নারীকুল লেডী গ্যাহ্‌স্টের নেতৃত্বে সাক্সজিস্ট আন্দোলন করেন, সে দেশে একটা তুমুল সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। রক্ষণশীল দলের সদস্যদের বাধা দেবার কথা, তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রক্ষণশীল সদস্যদের ঘণীরাও সব দল বেধে সাক্সজিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধতায় নেমেছিলেন। নারীই নারীর উন্নয়নচেষ্টার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাক্সজিস্টরা দমবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁরা পথাবরোধ করে, পার্লামেন্ট হাউসের দরজা আনবার শাশি আর কাঁচ ভেঙে তাঁদের দাবি আদায়ের অস্ত্রকূলে জনমত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের দাবির কাছে পার্লামেন্টকে নতি স্বীকার করতে হলো। ইংলণ্ডের নারীকুল ভোটদানকার পেল। কিন্তু তার ফল কী দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেই সে কথা জানেন। ভোটাধিকারপ্রাপ্তা সাবালিকা ইংরেজগণনার দল বেছে বেছে সেই সব পুরুষ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পঠাতে লাগলেন যাদের গুণগণনা ছিল সামান্যই কিন্তু সকলেই যারা স্বরূপ ছিলেন। বার্নার্ড শ' এ ব্যাপারে ঠাট্টা করে লিখেছেন, স্বন্দর মুখের জয় সবই না হলেও নারীজাতির মধ্যে অবশ্যই। নির্বাচনপ্রার্থীদের স্বন্দর মুখ সত্ত্বেও ভোটাধিকার অর্জনকারিণীদের বিচার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ভাঙিয়ে দিয়েছিল। নারীর রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভরে উঠেছিল।

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক হিন্দু কোড বিলে পুরুষদের একবিবাহ, বিবাহিতা নারীর ডিভোর্সের অধিকার এবং পিতার সুস্পষ্টত্বে পুত্রের সহিত কন্যাসম্প্রদানেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। এ সবই অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থা এবং যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত। বিশেষতঃ এই বিলের অর্থনৈতিক বিধানটির তাৎপৰ্য সন্দেহপ্রসারী। নারীর অস্বল্পত অবস্থার একটা প্রধান কারণ তার অর্থনৈতিক পরাধীনতা। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতার কারণেই ভারতীয় হিন্দু নারীর পায়ে যুগ যুগ ধরে অধীনতার শৃঙ্খল পরানো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যদি কিয়ৎপরিমাণেও আত্মনির্ভর হতে পারতো তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষের পক্ষে তাকে

এমন নিরক্ষর কাজে শাসন ও পীড়ন করা সম্ভব হুঁতো না। হিন্দু কোড বিলে পুত্রের সঙ্গে কন্যাসম্মানকে পিতৃসম্পত্তিতে সমানাদিকার দানের প্রস্তাবে নারীকে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার ক্ষেত্রে বেশি দূর না হলেও কিছু পরিমাণ অগ্রসর হওয়ার প্রয়োগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র-সীমিত সুতরাং স্বতাব্যতঃই এর দ্বারা সমস্তের সামান্য মাত্র অংশই প্রাপ্য। কিন্তু তাক্ষরের ব্যাপার এই যে, এই বিল যখন পূর্বে পবে আলোচনার মধ্য দিয়ে লোকসভায় আইনরূপে বিধিবদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখন কিন্তু সচল ও অভিজাত হিন্দু সমাজের একাধিক প্রভাবশালী মহিলা এই বিলের বিকলচরণ করবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নেমেছিলেন। খুব সম্ভব তাঁরা তাঁদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের মজুরিতেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি কাজের মূলে ঘাঁড় প্ররোচনা থাকুক, তাঁরা যে তাঁদের নিজের পায়ে নিজের কুড়ল মাঝে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

দীর্ঘদিনের অত্যাচার-প্রপীড়নের ফলে নারী আপন স্বর্ণ সম্পর্কে আপন অবিহিত নয়। সহস্র বৎসরের অভ্যাসে পুরুষের আশ্রয় ও শ্রম দ্বিতীয় স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে পাত্তরতা নারীর সব স্খা ধরিত্রীর অশ্রুপূর্ণ যে অসামান্য সহনশীলতা ও ক্ষমার চিত্র দেখতে পাই (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একবার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত শুভদা উপন্যাসের শুভদা চরিত্র, বিবাজ বৌ উপন্যাসের বিবাজবৌ চরিত্র, শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদা দি দ প্রভৃতি) তা কখনোই সম্ভব হতে পারতো না, নারীর মধ্যে দাসীত্বের সঞ্চার যদি বদ্ধমূল না হতো। আমেরিকার নিগ্রো-মুক্তির প্রথম পর্বে এবং রাশিয়ার জার আলেকজান্ডারের আমলে যখন সাফদেব দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন অনেক নিগ্রো আর সাফ ই স্বাধীনতার সুর্যোগ গ্রহণ করতে চায়নি। দীর্ঘদিনের দাসত্বের অভ্যাসে প্রভুভক্তি তাঁদের কাছে অস্তিত্বের স্বার্থকতার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যদিও সেই আশ্রয় ছিল অত্যাচারে ও নিপেষণে পদে পদে যন্ত্রণাজঙ্কর। ভারতীয় নারীও এই মুক্তিপূর্ব নিগ্রো আর সাফদেব মতই অবস্থা। শৃঙ্খলমোচনে তাঁদের বড়ই আপত্তি।

তৃতীয়তঃ নারীর মধ্যে সংরক্ষণকামিতা বড় বেশি। অধিকারের বৃত্ত তার খুবই সংকীর্ণ, কিন্তু যেটুকু আছে তাকে সে প্রাণপণ বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় আর তার থেকে মাঝে মাঝে ষটে নানারকমের বিপত্তি। কিন্তু

ও ঐশ্বৰ্য্যৰ সম্পদহীনতাকে সে প্ৰায়শঃ স্বামী নামক সম্পত্তিৰ উপৰ পুৰাপুৰি
অধিকাৰ কায়েম কৰে পূৰণ কৰতে চায়। স্বামী পুত্ৰসংসাৰ এই নিম্নে তার
যে ছোট্ট গভীৰক জগৎ, সেই জগতে তার অধিকাৰ পাকা কৰবাব জন্ত তার
প্ৰযত্নৰ অন্ত নেই তার নিৰাপত্তাৰ আকাঙ্ক্ষা বড়ই তীব্ৰ। এই বোধৰ
পৰিতৃপ্তিৰ জন্ত সে সবলে তার স্বামীপুত্ৰকে আঁকড়ে ধৰে এবং স্বামীপুত্ৰৰ
সহায় দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অপগত হলে তার ভৱণপোষণৰ উপায় ৰূপে গয়নাৰ পাটবা
(মধ্যবিত্ত ঘৰেৰ ঘৰণী হলে) কিংবা শ্ৰমকমতা (শ্ৰমিক পৰিবাৰেৰ নারী
হলে)-কে বিশেষভাবে আশ্ৰয় কৰে। মোট কথা স্বামী বত্থানেই হোক
আৰ স্বামী বিহনেই হোক নিৰাপত্তাবোধৰ তার বড়ই প্ৰয়োজন। না হলে
অস্তিত্ব তার পদে পদে বিপন্ন হয়। আসলে স্বামীপ্ৰেম, পতিভক্তি, সন্তীহ
প্ৰভৃতি যে সব বড় বড় আদৰ্শৰ কথা বলা হয়, সেগুলি আৰ কিছু নয়,
যতিয়ে দেখিলে তা নারীৰ নিৰাপত্তাৰ মহামূল্য মাস্তুল স্বৰূপ। নারী সন্তীহেৰ
মূল্যে তার জীবনব্যাপী আশ্ৰয়দাতাৰ স্বপ্ন শোধ কৰে।

এট পৰ্যন্ত নারীৰ স একককামিতা বা স্বামীসংসাৰেৰ স্বাধা বৃহত্তৰ সম্পদেৰ
অভাববোধেৰ নিবৃত্তিৰ অভাৱ খুবই বৃদ্ধৰ ও স্পষ্টত। কিন্তু এই সীমা
ছাড়ালেই মুশকিল। নারী যদি একবাৰ বৃহত্তৰ সম্পদ বা ক্মতাৰ স্বাদ পায়
তা হলে বাধেৰ প্ৰথম মণ্ডব্যৱস্তেৰ স্বাদেৰ মত তার সেই স্বাদেৰ স্পৃহা কমেই
তুনিবাৰ আৰ তৃষ্ণ হয় ওঠে। ক্মতা পেয়ে ক্মতা সে ছাড়তে তো
চায়ই না, এবং উত্তৰোত্তৰ আৰও বেশি ক্মতা কৰায়ত্ত কৰাব জৰ্ক মত
হয়ে ওঠে। তখন ক্মতা দখল কৰা আৰ একবাৰ ক্মতা পেলে যেনতেন-
প্ৰকাৰেণ সেই ক্মতা বক্ষা কৰাই তার একমাত্র বাসনে পৰিণত হয়। এদেশে
নারী কৰ্তৃক জমিদাৰী কিংবা অত্ৰুপ সম্পত্তি গ্ৰহণেৰ যতগুলি চেষ্টাস্থ দেখা
যায় তার বেশিৰভাগ ক্ষেত্ৰেই হস্তিতৰ নজিৰ চোখে পড়ে। অত্যাচাৰী প্ৰজা-
পাঁড়ক ৰূপে তারা তুৰ্ম্ময় কেনে। শুধু তাই নয়, বিপক্ষেৰ প্ৰতি শক্তাচৰণে
আৰ ক্মাহীনতাৰ ও তাৰেৰ জুড়ি দেখা যায় না। ভুলবল কোণল সবহ
তখন তাৰেৰ হাতেৰ তেলোয় অমলকী ফলটিৰ মত হয়ে দাঁড়ায়।

স্বতৰা-পুৰুষ আৰ নারীৰ সমানানিকাৰেৰ আদৰ্শ তত্ত্বগতভাবে স্তন্যে
যতই সুপ্ৰাৰ্থা শোনাক, কোথাও কোথাও তাতে সীমাৰেখা টানা দৰকাৰ।
নারী আৰ পুৰুষ শাৰীৰিক মনস্তাত্বিক কাৰণেই পুৰাপুৰি সমান ওতে পায়ে না।
তাৰেৰ চুইয়েৰ বিবৰণেৰ ক্ষেত্ৰ আলাদা এবং সে ক্ষেত্ৰ আলাদা থাকট ভাল।

এই মৌলিক ভেদ বেঁধাটি যেন নিয়ে তারপর পুরুষ আর সমানত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন বাধা দেখি না। নারীকে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বাস্থ্যে ও ব্যক্তিগত, শক্তি ও প্রতিভায় যত বেশি উজ্জ্বল করে তোলা যায় ততই সমাজের কল্যাণ। তা ব'লে ভাল চুকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীকে পাশাপাশি 'দেখাই' হবে এ কথা যেনে নেনারও কোন যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য আমরা যখন নারীর চলাচলের বৃত্তের ব্যতিক্রমের কথা বলছি, তার দ্বারা এ কথা বোঝাচ্ছি না যে, নারীকে পুনরায় রক্ষণশীলার খাঁচায় পুরে দিতে হবে কিংবা সম্মান গর্ভে ধারণ ও সম্মান পালন ছাড়া তার অন্য কোন করণীয় নেই। মোটেই নয়। নারীর প্রসূপ শক্তিকে সব দিক থেকেই বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার জন্ম শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত শিক্ষা সমাজ সেবা রাজনীতি প্রশাসন প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রের তার কোনটিই তার পক্ষে অনাচরণীয় রূপে চলে না। রাখতে চাইলেও সে কথা কেউ স্তব্ধ নেই। যুগের প্রয়োজনেই নারী ঘরের বাইরে চলেছে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে পুরুষের শরিক হয়েছে, তাকে আর ঘরের কোণায় আবদ্ধ রাখা যাবে না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পুরুষ আর নারীর অমূল্যত্বের ক্ষেত্রে একা-কার করে তুলতে হবে, দুইয়ের মধ্যবর্তী সব বৈধা ঘুটিয়ে দিতে হবে। শাচীরক আর জৈব কারণেই এই ধরনের একীকরণ সম্ভব নয়। পুরুষ আর নারীর আচরণের সমস্ত স্তরে জোর করে একীকরণ করতে গেলে 'হত্যার চেয়ে আহত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

জোর করে একীকরণের চেষ্টা করতে গেলে কী রকম ফল দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশে মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ নাকি লজ্জা, তাদের প্রায়শঃ লজ্জানতা লতিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কবিদের কাব্যে ক্রীড়াশীলা নক্সুখী সত্যতলজ্জাকম্প বোডশীর বা যুবতীর যে-বর্ণনা পাই তার রূপ মধুর। মেয়েদের সঙ্কম এতই স্বতঃসিদ্ধ যে, সেট সঙ্কমের পানটি পেকে চুনটি পর্যন্ত স্বপবার উপায় নেই। খসলে তদ্রকম দুইপক্ষে মারামার বেধে য'ওয়াও আশ্চর্য নয়। এমন কি কখনও কখনও অতীতে এইজনা 'রায়ট' হতেও দেখা গেছে। কিন্তু পথেঘাটে আজকাল শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণীদের যে বেশে সজ্জিতা দেখতে পাই তা কি কবিপ্রোক্ত ও প্রবাদবিদিত নারীর লজ্জাশীলতার ধারণাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে? গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমেও এই অনাবরণ চেষ্টায় গুট অভিশ্রায় আমরা

অস্বাভাবিক কবিতা কবিতা না, তবে ঐতিহ্যের দ্বারা মহিমাবিত ভারতীয় নারীর সহজাত লজ্জার ধারণার সঙ্গে যে এ জিনিস একেবারেই মেলেই না সে কথাটি বলা দরকার। আধুনিক তরুণী একই সঙ্গে লজ্জানীলতার খ্যাতিও সুবিধা আহরণ করতে চাইবে আবার পোশাকে-আমাকে লজ্জার ধার দিয়েও যাবে না—এ হয় না। দুইয়ের ভিতর একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ‘পথের দাবী’র ভূমিকা

কল্পিত সেনগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ও সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যের পাঠকমহলে সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাস পাঠকদের কাছে এখনো শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, তাঁর সৃষ্ট নায়ক নায়িকারা খুবই জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রসৃষ্ট নায়কদের মধ্যে একজন শ্রীকান্ত, তাঁর দয়াদীপন ও মানবিক গুণের জন্য পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয়। এই চরিত্রটির মধ্যে সৃষ্টি মনের বাঙালিরা তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ের প্রতিচ্ছবি দেখেন। চরিত্রটি বহু পরিবেশের সাক্ষী অথচ সংযত, এবং সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আশাবাদী। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ এবং নারীদের প্রতি কর্তব্য বোধ সম্পন্ন। এ চরিত্র জীবনকে ভালবাসতে প্রেরণা দেয়।

আর একটি বিস্ময়কর চরিত্র ‘পথের দাবী’র সবাসুতী। যিনি বহুনামে, নানাবেশে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়ে অভিজ্ঞত করেন। যে মানুষটি দেশের মুক্তিসামনায় উৎসর্গীকৃত-জীবন। কোন মোহ নেই, লোভ নেই, আত্মগরিমা নেই, সাধারণ এক মানুষ। একটি আদর্শ বিপ্লবী চরিত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নৈপুনিক কর্মসূচীতে স্তব্ধ হয়েছিল। সে সময়ে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে মশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। লাহোর থেকে বার্মা পর্যন্ত সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের প্রচার চলছিল, যাতে ভারতীয় সৈন্যরা এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। এই বিপ্লব

প্রচেষ্টার নায়ক ছিলেন বাড়ালি বাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিপিন গান্ধী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং আরো অনেকে ; মাগাটি পিংলে, পাঞ্জাবী কর্তার সিং, সর্দার গুরুদীং সিং প্রমুখ আরো অনেকে । ধারা আত গোপনে এই বিপ্লব প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন ‘পথের দাবী’র সভাসাচী এঁদের সবাকার মিলিত একটি প্রতিনিধি চরিত্র ।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ‘পথের দাবী’র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফৌজী শক্তিকে সহযোগী করে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সামায়িক দিশেহারা ও হতাশার অবস্থা দেখা দিয়েছিল । আবার পূর্ণোন্মেষে বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে স্বতন্ত্রবাদী বিপ্লবী সংগঠনের কাজ শুরু হয় । এত নব উত্তোষের দিনে ‘পথের দাবী’ প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ১৯২২ সালের দিকে ‘বঙ্গবাণী’ মাসিক পত্রিকায় ‘পথের দাবী’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । প্রকাশের দিন থেকে বিপ্লবী যুবসমাজের দৃষ্টি এই লেখার প্রতি অকুণ্ঠ হয় । তাঁরা ‘পথের দাবী’র কাহিনী ও চরিত্রগুলির মধ্যে নিজেদের জীবন ও স্বপ্নের প্রতিফলিত রূপ দেখতে পান এবং সংলাপ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন । ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে ‘পথের দাবী’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । প্রকাশের কয়েকমাস পরে ১৯২৭ সালের জানুয়ারির ১২ তারিখ ইংরেজ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে । বাজেয়াপ্ত করার পরে বইটির চাহিদা আরো বেড়ে যায় ; এক কপি বই একশ টাকায় পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে । অসাধু লোকেরা প্রকাশকের অজান্তে গোপনে বইটি ছাপিয়ে বাবসা করেছে বলেও তখন শোনা যেত ।

‘পথের দাবী’র প্রকাশ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা দরকার । ‘পথের দাবী’র মত বই ইংরেজ আমলে কখনই প্রকাশিত হতে পারত না—যদি স্ত্রীর আন্তত্বের মুখার্জির মত লোকের এতে আগ্রহ না থাকতো । রমাপ্রসাদ মুখার্জি, জামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ তাঁর পুত্ররা উৎসাহী হওয়ায় ‘পথের দাবী’ ছাপা হয়ে পাঠকদের হাতে আসতে পেরেছে । ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকাটি স্ত্রীর আন্তত্বের বাড়ি থেকে তাঁদের পরিবারের অর্ধাঙ্গকুলো প্রকাশিত হতো সম্প্রতি স্ত্রীর আন্তত্বপুত্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয় এক প্রবন্ধে ‘পথের দাবী’ প্রকাশের ঘটনাবলী সাবস্তাবে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন ও কাজকর্মের কয়দায় ছাপানো, বাধানো ও

বিক্রির ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। পাছে পুলিশ বইটি প্রকাশের কথা জানতে পারে তাই 'বঙ্গবাণী'র মার্চ সংখ্যায় উপজ্ঞাসটির সমাপ্তি ঘোষণা না করে ক্রমশঃ কথটা ছাপা হয়েছিল। তারপরে আগষ্ট মাসে স্ত্রীর আন্ততঃ্য পরিবারের টাকায় বইটি প্রকাশ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, 'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল হারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) এম. কে. লাইব্রারী'র কটন প্রেসে এবং বইটি বাণ্যত করেছিলেন নৈটকথানা রাস্তায় মুহম্মদ হুমাইল দপ্তরী। 'পথের দাবী' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, সেই সঙ্গে প্রকাশক, মুদ্রণালয় ও বাণ্যতকারীর নামও সর্বোত্তম যুক্ত হয়ে আছে।

বিশদশকের শেষ ভাগে দেশের মুক্তিসংগ্রামে উদ্ভূত করার মত এত বইপত্র ছিল না। যে কয়টি বই পড়া হতো তার মধ্যে আনন্দমঠ, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা, গ্যারিবল্ডির জীবনী, আয়ার ব্রদ্রোহের কথা ইত্যাদির মধ্যে 'পথের দাবী' ছিল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। অতি গোপনে বইটি রাখা হতো, রাত জেগে পড়া হতো, বইটি নিয়ে আলাপ আলোচনা ছিল শিক্ষার অংশ। বিপ্লবী দলের নেতারা চিঠিপত্রে 'পথের দাবী'র চরিত্রগুলি থেকে চুটাস্ত টেনে বক্তব্য প্রকাশ করতে। এভাবে ১৯২২ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত একজন ফেরাদী বিপ্লবীর মত 'পথের দাবী' স্বদেশমুক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে, সংগঠন গড়েছে। কত যুবক যুবতী এই নিষিদ্ধ বইটি রাখার দায়ে পুলিশের অত্যাচার সহ্যেছেন, জেল খেটেছেন।

কিন্তু গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের পর তরঙ্গে এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসিত বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক সাহেব 'পথের দাবী'র ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ব্রিটিশশাসিত অবিভক্ত বাংলাদেশে ফজলুল হক সাহেব কৃষিজীবী ও গ্রামের গরিবদের জন্য কিছু ভাল কাজ করে সাতসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সাহিত্যের স্বাধীনতায় তাঁর একাজটিও অরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে বকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর বিশেষ ভূমিকা আছে, পরের পর্যায়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এক গৌরবময় স্থান গ্রহণ করে। এসময়ে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি

স্বাধীন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে স্বদেশচেতনা ও প্রগতিশীল মনোভাবের চিন্তা ও স্বপ্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন থেকে সুগঠিত শ্রমিকশ্রেণী উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করল তাবই সঙ্গে এল ম্যাক্সিম গর্কীর ‘মা’। স্বদেশচেতনাকে পরিপুষ্ট করল ‘মা’ শ্রেণীচেতনা দিয়ে। ‘মা’ কব সাহিত্যের একটি চিরায়ত সৃষ্টি। নভেবর বিপ্লবে সার্বক ভূমিকা গ্রহণ করে এ বই সারা জগতের শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সাধি হয়েছে। দেশকালের সীমা পার হয়ে এই বই আমাদেরও মুক্তি সংগ্রামের সাধি।

আজ সারাদেশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। নতুন করে শরৎচন্দ্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপে অভিনয় হচ্ছে, বন্ধারা ভাসন দিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ছে শরৎচন্দ্র সমাজবিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক ছিলেন না। সমাজের ভালমন্দ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না বলেই প্রবলপ্রত্যাপ বিদেশী শাসনকালে বিপ্লবী যুগ সমাজের উদ্দেশ্যে তরুণের বিদ্রোহ’ অভিভাষণ দিতে পেরেছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে চলার মত সাহস ও বাগ্ম্য মন ছিল বলেই তাঁর পক্ষে ‘পনের দাবী’ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষের অস্তরের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তা প্রতি তিনি অক্ষাণীল ছিলেন বলে সজ্জামুগ্ধ মন নিয়ে রমা, পিয়ারী-বাস্তী, অন্নদাদিদের চরিত্র উপস্থিত করতে পেরেছেন বিরাট এক জিজ্ঞাসার মত সমাজে নারীর স্থান কোথায়? তিনিই প্রথম গদ্যরূপে বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় এনেছেন। শরৎচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ পরে আজো রয়েছে তাঁর দেগা গ্রাম, সেই সমাজ। হয়তো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেই পানাপুকুর, ভাঙারাস্তা, রোগ, বুড়কের দীর্ঘশ্বাস আর শক্তিমানের পীড়ন আজো আছে। রমা রমেশ, সতীশ কিরণময়ী, অর্পূর্ভ ভারতীদের কথা এখনো শোনা যায়।

শরৎচন্দ্র আজো জনপ্রিয়তার শীর্ষে, আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমীক্ষায় একথা প্রমাণিত হওয়ায় অনেকেই ভুল ধারণা ভেঙে গেছে যারা মনে করতেন শরৎ সাহিত্যের চাহিদা কমে গেছে। এই জনপ্রিয়তায় একথা আবার প্রতিপন্ন হল যে সাহিত্যিকের প্রেরণা লাভ করেন জনজীবন ও মানুষের সংগ্রাম থেকে। যে সাহিত্যিক সংগ্রামের কাছাকাছি থাকতে পারেন তাঁর সাহিত্য বলিষ্ঠ হবার তত উপাদান লাভ করে। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। মানুষের অপবাজ্যে শক্তির প্রকাশ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং আশাবাদে উজ্জ্বল সত্যিকার সাহিত্য।

উপকথার নায়ক

ড: সুধীরকুমার করণ

মানুষ যখন পশু ছিল তখন থেকেই সে অল্প পশুদের স্বভাব লক্ষ্য করতে করতে নিজের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। এবং মানুষ যে পশু নয় একথা বারবার ঘোষণা করে পশুর সঙ্গে তার আত্মীয়তা-সূত্র ছিন্ন করার বাসনায় বিবাহিত হয়েছে। অথচ মানুষ ভালভাবেই জানে যে রূপে পৃথক হ'লেও স্বভাবে সে পশুর আত্মীয়। তবুও রূপগত পার্থক্য থাকার জন্য সেই আদিম কাল থেকে, অরণ্যে পর্বতে, সমুদ্রে তটিনীতে অসংখ্য প্রাণীপুঞ্জর দিকে, সে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিপাত করে এসেছে। জৈব কারণেই, স্থলচর-জলচর-নভঃচর প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে অস্বত্ত্ব করেছে এবং এটোভাবেই কোন প্রাণী তিক্ত, কে দুর্বল, কে বুদ্ধিমান, কে ভীক—কে ভয়, কে অভয়, কে কি, সবকিছু ধারণাই ক্রমশঃ মানুষের নখদর্পণে এসে পড়েছিল। এই সব প্রাণীদের কিছু কিছু আবার অস্বভাবও মানুষের অন্তরঙ্গ হয়েছিল। মূলতঃ তার আদিম ধর্মবিশ্বাসের ও যাদুবিশ্বাসের মাধ্যমে নাচে-গানে পর্ব-পার্বণেও বিভিন্ন প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে মানুষের ভয়ে বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, জীবিত প্রাণী কোন কোন সময়ে অলৌকিকরূপেও প্রতিভাত হয়েছে এবং আত্মসম্পর্কিত আদিম বিশ্বাসের ফলে মৃত পশুও তাদের কাছে পূজা হয়ে উঠেছিল। টোটেম-হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর পূজাপ্রাপ্তি আজও পৃথিবীর বহু আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান, এমন কি সভ্য সমাজেও অধুনাতন লোক বিশ্বাস থেকে এই আদিম-ভাবপ্রবাহ এখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় নি।

লোকবিশ্বাস যে কবে যত প্রাচীন, পশু সম্পর্কিত নানা আলৌকিক বিশ্বাসও সেই কবে তত দৃঢ়। লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কাহিনীতে, পশু মানুষের মতই বাক্যবাগীশ, মানুষের চেয়েও ক্ষমতাবান, এবং প্রায়শ্চ অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এই লোকবিশ্বাস থেকেই উপকথার উদ্ভব।

উপকথাকে যদি অলিখিত আদি সাহিত্যের মর্যাদা দান করা যায় তা হলে সম্ভবতঃ শৃগালই হবে সেই আদি সাহিত্যের বিশিষ্ট নায়ক। শৃগালকাহিনী পুরাণে প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও ভারতীয় পুরাণে শৃগাল একেবারে অবহেলিত নয়। ধর্মবিশ্বাসের সংগেও তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু মূলতঃ লোককথাতেই

শুগালের স্থান একান্তভাবেই বিশিষ্ট এবং একথা সহজেই বলা চলে যাহ্নবের
কল্পজগতে শুগালের প্রতি পক্ষপাতই বেশি।

উপকথায় বিভিন্ন পন্থচরিত্র অনেকসময় কিছু কিছু দোষ বা গুণের প্রতীক
হয়ে দাঁড়ায়। সাহসিকতা, ভীকতা, মূর্ততা, হিংস্রতা, মূৰ্খতা প্রভৃতি দোষ
এবং গুণ যাহ্নবের উপর যখন আরোপিত হয়, তখন বিভিন্ন পন্থও সঙ্গে তা'
তুলনাবাচক হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই সিংহ আমাদের কাছে শৌর্যের প্রতীক,
শুগাল মূর্ততার, মেঘ ভীকতার এবং ব্যাঘ্র হিংস্রতার।

শুগাল সাধারণতঃ মূর্ততার প্রতীক। তবে ভীকতার প্রতীক হিসাবেও
সে চিহ্নিত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং জাতকগ্রন্থে
শুগালচরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যান বর্তমান।

প্রসঙ্গক্রমে জাতক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সিগালজাতক
দন্দুর জাতক, জম্বুখাদকজাতক, সন্ধ্যাদাধজাতক, পুতিমাংসজাতক এবং আরো
কয়েকটি জাতক কাহিনীতে বিশিষ্ট নায়ক জামঘোষ শুগাল। কয়েকটি জাতকে
তার মূর্ততার কাহিনী আছে, কয়েকটি মূৰ্খতার কাহিনী।

সিগালজাতকে লোভী শিয়ালের দুরবস্থার চিত্র খুব হাস্যকররূপেই চিত্রিত।
একদা বোধিসত্ত্ব শুগালজন্ম পরিগ্রহ করে, নদীর ধারে এক অরণ্যের মধ্যে
বাস করতো। একদিন নদীর ধারে এক বৃদ্ধ হস্তীকে মৃত অবস্থায় পড়ে
থাকতে দেখে শুগালটি খুব খুশি,—বেশ কিছুদিন বিনা পরিশ্রমেই প্রচুর
আহারের আয়োজন তার সামনে। সে প্রথমে হাতির দাঁত কামড়ে গাবার
চেষ্টা করে ব্যর্থ হোলো। তারপর কখনো কান, কখনো লেজ কখনও পা
ধরে টানাটানি। কিন্তু তেমন জুৎসই মনে হোলো না এসব। শেষপর্যন্ত
পেটের মধ্যে ফুটো করে সে একেবারে হাতীর উদরস্থ হয়ে মনের আনন্দে
ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ইত্যাদি খেয়ে ভাবলো—যাক্ আহাব আর বাসস্থান একসঙ্গেই
পাওয়া গেল—বারবার বের হ'বার প্রয়োজনই বা কি? কাজেই সেখানে
সে থেকে গেল। দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর যখন
বৌত্ত্বরণে মগ্ন হাতি শুকিয়ে যেতে লাগলো তখন শেয়াল আর কিছুতেই
সেখান থেকে বেরুতে পারে না। হাতির চামড়া যত সংকুচিত হতে থাকে
শেয়াল ততই জাঁহি জাঁহি ডাক ছাড়ে। কিন্তু পালাবার পথ বন্ধ। মৃত্যু
নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে একটু পথ করে সে বোঁরয়ে এল বটে, কিন্তু
তার মূল্য হিসেবে দিতে হল তার নিজের চামড়া। কলাগাছের মত মন্দ,

চর্মহীন একটি দেহ দেখে শেয়াল বললো,—এই হচ্ছে আমার লোভের শাস্তি ।
অতিলোভ বর্জনীয় ।

বিরোচন জাতকে আছে শৃগালের হস্তশিকার কাহিনী । সিংহের মত
বিক্রম প্রদর্শন করতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হ'য়ে মরতে হ'য়েছিল তাকে ।
অর্থাৎ যার কর্ম তাবে সাজে ।

আর এক দিগাল-জাতকে ধূর্ত শেয়ালের কাহিনী আছে, যার সঙ্গে
বাঙলা উপকথায় শেয়াল পণ্ডিত ও কুমীর কাচিনীর সম্পর্ক আছে । শেয়াল
মরতে গিয়ে এক মাতাল লাঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে মরার মত হয়েছিল এক
ঝোপের ধারে । শেয়াল এসে সেই লাঠিটা ধরে একটু টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে
মাতালও লাঠিটাকে আবে জোরে চেপে ধরলো । শেয়াল দু'রে সরে গিয়ে
বললো :— এমন মড়া তো দেখিনি মশায়, যে মরে ও লাঠি চেপে ধরে ।

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রেও শৃগালসম্পর্কিত অনেক কাহিনী বর্তমান ।
এইসব কারণে বহু পণ্ডিত ব্যাক্ত মনে করেন যে ভারতবর্ষে পশু পাখি-সংক্রান্ত
উপকথার আদিভূমি ।

প্রসঙ্গতঃ ঈশপের কথা মনে পড়তে পারে । ঈশপের গল্পগুলির সৃষ্টিকর্তা
ঈশপ নন বলেই অনেকের অভিমত , সেগুলির সংকলয়িতা ব্যাসদেব । তবুও
হেরোডোটাস, সফ্রোটাস, প্লাটো সকলেই ঈশপকে প্রশংসা করেছেন ।

ঈশপের বেপ কয়েকটি গল্পই ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত । জাতক থেকেই
অসুতঃপক্ষে তেরখানি কাহিনী সেখানে আছে । দাঁড়কাক ও শৃগাল স্বর্ণভিন্দ প্রস্থ
হংসী, সিংহচমারত গর্দভ, নেকড়ে ও মেঘলাবক প্রভৃতি বহু পরিচিত কাহিনীগুলি
মূলতঃ জাতক কাহিনী । মহাভারতের নিকটেও ঈশপের গল্প পূর্ণা ।

অগুহপালিত প্রাণীর মধ্যে শেয়ালই মাতৃষের সবচেয়ে কাছাকাছি ; পক্ষীর
কোল ঘেসেই তার আশ্রয় । ইটের পাঁজায়, নদীনালায় ধারে, ঝোপঝাড়ের
মধ্যে দিনের বেলায় তার বিশ্রাম । রাত পোহালেই গৃহস্থের হাস-মুগ্ধগী-
পায়রাব সন্ধানে লোকালয়ে তার সংগ্রহ ভ্রমণ । মাতৃষের সবচেয়ে কাছাকাছি
বলেই, মাতৃষের কৌতূহল তার সম্পর্কে বেশি । সে যদি কুকুর বেড়াল গোক
ছাগলের মত গৃহপোষ্য হ'ত তা'হলে বোধহয় সে এতখানি কৌতূহলের বিষয়
হ'ত না । এই একই কারণে কাক এবং হনুমানও 'কাকচরিত্রের' বৈশিষ্ট্য
লাভ করেছে ।

সাধারণ লোকবিশ্বাসের মধ্যে শেয়াল সর্বত্রই বিশিষ্ট । ভারতীয় পুরাণে,

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পর্বের কাহিনীতে শেয়ালের আলৌকিক ক্ষমতার কথা বোঝিত হয়েছে। যমুনানদীর উদ্ভাটন তরঙ্গের মধ্যে সে বাহুদেবকে পথ দেখিয়ে যমুনাপারে নিয়ে যায়। দেবী কালিকার পার্শ্চর্য রূপেও সে পূজাপ্রাপ্তির স্বর্ঘ্যাদা লাভ করেছে। দেবভোগের মত শিবাভোগও পৌরাণিকতার মধ্যে স্বীকৃত।

আপানেও এক শৃগাল-দেবতার নাম ইনারি সামা। এই দেবতার মন্দির আছে। ইনারি সামা সম্পর্কে যে কাহিনী আছে তাতে জানা যায়—এক সপ্তদাগর দম্পতি একদল বাণকের হাত থেকে একটি শৃগালশাবককে মুক্ত করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। এই ঘটনার দশ বছর পরে সপ্তদাগর পুত্রের কঠিন ব্যাধি হয়, ব্যাধিমুক্ত হ'তে হলে জীবিত শৃগালের যকুং সেবন করতে হবে। এক পর্বতবাসীকে তিনি নিযুক্ত করলেন শৃগালের যকুং নিয়ে আসার জন্ত। পনের দিন পর্বতবাসী যকুং দিয়ে গেল। কিন্তু আসল পর্বতবাসী এসে বললো যে যকুং পাওয়া যায় নি। সপ্তদাগর ব্যাপার না বুঝতে পেয়ে অবাক। রাতে স্বপ্ন দেখলেন এক মহিলা বলছে,—‘আপনি যে শৃগাল শাবকের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, আমি তার মা। আপনার বিপদের দিনে আমি তাকে হত্যা করে আপনার কাছে যকুং পাঠিয়েছি। যিনি দিয়ে গেছেন তিনি আমার স্বামী। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সপ্তদাগর শৃগাল পূজার জন্ত মন্দির তৈরি করলেন।’

পৌরাণিক কথা বাদ দিলেও লক্ষ্য করা যায় যে, শৃগাল-দর্শনে মজল অমঙ্গলের সূচনা সম্পর্কে, প্রাচীন কাল থেকেই জনবিশ্বাস প্রবাহিত। কুস্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় সীতাহরণের সময় রামচন্দ্র তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে শৃগাল দেখে শংকিত হয়েছিলেন, অমঙ্গল আশংকায়। ‘বামে সর্প হেরিলেন, শৃগাল দক্ষিণে। তোলাশাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।’ বিপরীত দর্শনে মজলের আভাস। গ্রামাঞ্চলের ‘বাম-শেয়ালী’ একটি প্রতিষ্ঠিত প্রবাদ। বাঁ দিকে শৃগাল দেখলে মজল। এই আভিমতকে দক্ষিণপন্থী করায় চেষ্টার বোধহয় ২১শ বচনে বলা হয়েছে—‘বাম থেকে ডাইনে ভালো, যদি ফিরে চায়।’ শিবাবর আবাব ঘোড়তর অমঙ্গলের বাহক।

বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শৃগালী শৃগাল সম্পর্কে অলৌকিক লোকবিশ্বাস বর্তমান। কোন কোন বিশেষ তিথিতে গভীর রাত্রে কোন বিশেষ শৃগালের মাথায় শিং গজায়; তখন সে এক অপরিচিত কণ্ঠে ডাকতে

থাকে। যদি ঠিক সেইসময় কেউ কোন কাজে হাত দেয়, তা'হলে তার সাক্ষাৎ অনিবার্য।

প্রসঙ্গতঃ এই বিশ্বাস-মূলক ঘটনার উদাহরণ হিসাবে একটি লোকশ্রুতি উল্লেখ করছি। 'শীতকাল। গভীর রাত্রি। ঘুমন্ত গ্রাম। এক জায়গায় গ্রাম-প্রান্তে আখ মাড়াই হচ্ছে, অতএব সেইখানেই কয়েকজন কৃষক জাগ্রত। একদিকে গরু দিয়ে আখমাড়াই চল ঘোবানো হচ্ছে, অতীতকালে এক বিঘাট 'ডেগ'-এ (বিঘাট কড়াই) আখের রস ফুটে ফুটে শুভ হতে যাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলো ওরা যে কড়াই যেন শুভে উপচে পড়তে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এক অদ্ভুত শিখাধ্বনিও এসে পৌঁছলো। সবাই হরিষধি দিয়ে উঠলো, আর জালা জালা শুভ তুলতে লাগলো।' এ অবস্থা খুব বেশি সময় ধরে থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ পক্ষ থাকে ততক্ষণ নাকি শুভ তুলে শেষ করা যায় না। শেষালের শি-ও তা'র মাথায় বেশিক্ষণ থাকে না।

জনশ্রুতি, অনেকে নাকি মাঠে মাঠে শেষালের শি-ও কুড়িয়ে পায়। যে পায় তার সৌভাগ্যের অস্ত থাকে না।

তা ছাড়া খেঁক-শিয়ালের বিবাহ সংক্রান্ত প্রবাদ এবং ছড়ার সঙ্গে তো প্রায় সকলেই পরিচিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, লোককথার মধ্যে শেষালের স্থান যে গৌণ নয়, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইউরোপে রেইনার্ড ডি ফল্স এর উপকথা অবলম্বনে একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বহু গল্প-কবিতা ও রচিত হয়েছে এবং রেইনার্ড ডি ফল্স এর মূলেও সেট আদিকালের লোককথা।

শেষালের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাচ্য এবং পশ্চাত্য উভয়দেশেই লোকবিশ্বাস বর্তমান। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—তার রূপ পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাস। চীনদেশে এবং জাপানে বিশ্বাস করা হয় যে, শেষাল ইচ্ছামতো মানবীয় রূপ ধারণ করতে পারে। শুধু তাই নয়,—শেষাল নাকি যখনই পণ্ডিত পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে সে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়।

বলা হয়—পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে মানুষও অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু,—শৃগালের মত ত.দেব একনিষ্ঠতা দৈর্ঘ্য এবং বিশ্বাস নেই বলে মানুষ তেমন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। চীনদেশে শৃগাল সংক্রান্ত যে সমস্ত লোকবিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই

বতি আশ্রিত। এই ধরনের একটি লোককথায় বলা হয়েছে এক হতভাগ্য ছাত্রের পরিণামের কথা। এক ছাত্র, নির্জনে অধ্যয়ন করার জন্য গ্রামের সীমানায় অবস্থিত এক ভগ্নমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তার ধ্যানভঙ্গ করার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব ঘটতো। বলাবাহুল্য, ছাত্রটির পাঠচর্চায় বিঘ্ন ঘটে গেল এবং সেই তরুণীর সঙ্গে অত্যধিক কামচর্চা কলে, রাজবোলে তার মৃত্যু ঘটলো। এ কাহিনীর মধ্যে উপদেশাত্মক কিছু পাওয়া গেলেও,—কাহিনীটি কিন্তু একান্তভাবে লোকবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। শেষাল নাকি এইভাবেই মাহুষের প্রাণসত্তা অপহরণ করে। যতদিন পর্যন্ত সে মাহুষের প্রাণসত্তাকে অপহরণ করতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত সে লীলা বিলাসে অভুলনীয়া নারীরূপেই ভ্রমণ করতে আসে। প্রাণসত্তা অপহরণ করে সে নাকি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়।

এ জাতীয় লোকবিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্রই নানাতাবে বর্তমান। সাধারণতঃ চীনা উপকথায় শৃগালকে ধূর্ত লম্পট এবং প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে উপস্থাপিত করা হয়। নারীরূপেই তাদের আগমন ঘটে বেশি, তবে, পুরুষরূপী শৃগালের কাহিনীও শোনা যায়।

উত্তর আমেরিকার বেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এবং গ্রীসল্যান্ডের ডব্লিউ. মোন্টগোমের মধ্যেও সংখ্যাচৌন শৃগালকাহিনী বর্তমান। ভারতীয় উপকথায় শৃগালের রূপান্তরনের কাহিনী অবশ্য শোনা যায় না, কিন্তু ভারতীয় উপকথায় শৃগাল যে অস্বাভাবিক বিশিষ্ট নায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; অ-গৃহীতালিত জন্তুর মধ্যে তার স্থানই সবার আগে।

ত্রিপুরার আঞ্চলিক বাংলা-কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ : অধ্যাপক জগদীশ গণচৌধুরী

ইংরেজশাসিত পরাবীন ভারতে একমাত্র ত্রিপুরারাজ্যেরই রাজভাষা ছিল বাংলা। গত দু'শ বছর ধরে এই রাজ্যে সমস্ত কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার কম বিন্যয়ের ব্যাপার নয়। ত্রিপুরারাজ্যে বাংলাভাষাতে সমস্ত কাজকর্ম চালানোর জন্য পরিভাষারও সৃষ্টি করেছিলেন। এমন কি রাজাদের মোহরেও উৎকীর্ণ

ছিল বাংলা ভাষা। স্ববীজনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা আজ আর কারও অজানা নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস—‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থটি—ত্রিপুরার রাজাদের অর্থাভ্রুকুলোই প্রকাশিত হয়। অথচ ত্রিপুরার রাজারা কিন্তু বাঙালি নন। তাঁদের মাতৃভাষা ত্রিপুরী—‘ককবরক’। কিন্তু বিষয়ের বিষয় এই যে, ত্রিপুরার রাজাদের প্রধান ভাষা হল বাংলাভাষা। তাঁরা বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও করেছেন। রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং রাজকুমারী অনঙ্গমোহনীর রচিত গানগুলো খুবই উৎকৃষ্ট—একথা সঙ্গীতবিশারদরাও স্বীকার করেছেন। এ রাজ্যের মোট ১৬লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৭লক্ষ আদি অধিবাসী (উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত),—ত্রিপুরী।^১ এই ত্রিপুরীরা বাংলাভাষা জানেন। যারা লেখাপড়া শেখেন তাঁরা বাংলাভাষার মাধ্যমেই লেখাপড়া শেখেন। বাংলা-ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা না হলেও এটিই তাঁদের প্রধান ভাষা। যেসব আদিবাসী শহরে বাস করেন তাঁরা ভো বাংলা জানেনই (অনেকে আবার কেবলমাত্র বাংলাই জানেন—ককবরক জানেন না), এমন কি যারা সুরুর গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন তাঁরাও বাংলা জানেন—বলতে পারেন অথবা কমপক্ষে বুঝতে পারেন।

বর্তমান ত্রিপুরাসরকারও বাংলাভাষাকে রাজ্যের সরকারীভাষারূপে স্বীকৃতি দান করেছেন। স্ততঃ বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাসে ত্রিপুরার ঐতিহ্য অনস্বীকার্য। এই রাজ্যে ব্যবহৃত বাংলাভাষার কথ্যরূপ সম্বন্ধে কোতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই ত্রিপুরার আঞ্চলিক কথ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ত্রিপুরার অঞ্চলভেদে কথ্যভাষার প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা (বিলানিয়া, অমরপুর ই:) অঞ্চলের কথ্যভাষা-বাংলাদেশের নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষা ছাড়া বিশেষভাবে প্রভাবিত। আবার পশ্চিম ত্রিপুরা অঞ্চলের যাব প্রধান কেন্দ্রস্থল আগরতলা শহর, রাজ্যের রাজধানী,—কথ্যভাষায় পূর্ব-বঙ্গের (বাংলাদেশের) সিলেট (শ্রীহট্ট) ও কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব

১ ত্রিপুরার উনিশটি উপজাতির (ত্রিপুরী, রিখাং, চাকমা, জমাতিয়া, লুসাই, নোয়াতিয়া ইত্যাদি) মধ্যে ত্রিপুরী একটি। কিন্তু আমরা এখানে ত্রিপুরার আদি অধিবাসীদেরকে বোঝাতেই ‘ত্রিপুরী’ কথাটা ব্যবহার করেছি।

খুব বেশি। এ ছাড়া নোয়াখালি ও চট্টগ্রামী ভাষার প্রভাবও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান। তবে রাজধানী আগরতলার কথ্যভাষা পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাবে (Standard dialect এর প্রভাবে) ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আর তার ফলে এই অঞ্চলের কথ্যভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার আঞ্চলিক কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য সহজে আলোচনা করলে কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ধনি পরিবর্তনের কিছু সূত্রও বের করা সম্ভব হবে।

এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে ধনি পরিবর্তন ঘটেছে সে সহজে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা যেতে পারে :

১) নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে আঞ্চলিক কথ্যভাষায় 'সক্যা'কে 'হইন্দা', 'সে' কে 'হে', 'সুত্তর'কে 'হউউ', 'সুন'-কে 'হুন' বলা হয়ে থাকে। এর থেকে আমরা ধনি পরিবর্তনের যে সূত্রটি পাচ্ছি সেটি হল এ অঞ্চলের কথ্যভাষায়—শ, স > হ-তে পরিণত হয় এবং র > ড-তে (কখনো কখনো)।

২) আবার কোথাও কোথাও দেখি 'পিসি'কে 'টিসি'র মত উচ্চারণ করতে এবং 'পড়'কে 'হড়'-এর মত। যেমন : পান খাবেন—ফান খাটবান নি)। 'প' প্রথমে মহাপ্রাণিত হয়ে 'ফ' হয় এবং মহাপ্রাণবর্ণ ফ > হ এ পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার (বাড়ীঘর) মধ্যেও আমরা মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-এ পরিবর্তন (এবং লোপ) দেখতে পাই। যেমন : বধু > বহু > বউ, মধু > মহু > মৌ ইত্যাদি।

৩) পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় (বাড়ীঘরে) দেখি 'ক' মধ্যবর্তী 'ই' ও 'উ' প্রথমে অপিনিহিত হয় ও পরে অভিশ্রুতির ফলে বিকৃত হয়ে যায় এবং তখন 'উ', 'ই' পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে নতুন রূপ লাভ করে। যেমন : করিয়া > *কইয়া > কইয়া > কবে। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষার মধ্যে দেখা যায় যে, অপিনিহিত 'ই' বজায় থাকে এবং 'র' ইত্যাদি মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে যায়—

করিয়াছে (= করিয়া + আছে— 'আছে') *কইরিয়াছে > কইয়াছে (বঙ্গালীতে এই রূপটি পাওয়া যায়) > কইছে।

এছাড়া কইয়া (< করিয়া , বইয়া (< বলিয়া) ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

৪) থা>ঝ-এর (থা>জ্ঝ>ঝ) উদাহরণ (মথ্য>মজ্ঝ>মঝ)
রাষ্ট্রীতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষায় থা>ঝ-তো হয়ই
অধিকন্তু 'ট'-র (অপিনিহিত্য প্রভাবজাত) আগম হয়। যেমন :

মথ্যো>মাইঝে।

৫) বিশেষভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের কথ্যভাষায় অম্বোষ
মূর্ধণ্যবর্ণ ঘোষ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হয়। যেমন : মাটি>মাড়ি (ট>ড) ;
খাটি>খাড়ি (আত্মনাসিক চন্দ্রবিন্দু লোপ শায়), একটা>একডা ইত্যাদি।

৬) রাষ্ট্রীয় স্বত্বগত বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কথ্যভাষায় মত এই
অঞ্চলের (ত্রিপুরার সর্বত্র) কথ্যভাষাতেও 'ন'>ল-এ পরিবর্তিত হয়।

নাম বা নাব>লাম—রিক্সা থেকে নাম>... লাম ইত্যাদি।

নডা>লড়া ; নগর>লগর।

৭। মহাপ্রাণ বর্ণ কখনো কখনো (বিশেষভাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে)
আবার অল্পপ্রাণ বর্ণেও পরিবর্তিত হয় : -ঝাক>জাক—ঝ>জ।

৮) এখানে ঘা'চ্ছ (>ঘাই'তেছি) বলতে বলা হয়— 'ঘাইগিয়া'।
স্থানীয় লোকযুগে উচ্চারিত হয় 'ঘাইগ্যা' (= যজাইগ্যার মত), খাইগ্যা
ইত্যাদি। পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরাঞ্চলেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সশেট অঞ্চলের
প্রভাব। উপরোক্ত ক্রিয়াগুলির ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

৯) দস্তাবর্ণের মূর্ধন্যোভবন এ অঞ্চলের কথ্যভাষায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য :
দঙ>ডঙ ; দংশন>ডংশন , দীঘি>ডীঘি।

পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা—রাষ্ট্রীতেও উপরোক্ত ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে থাকে।

দংশ>ডংশ>ডাঁশ ; দঙবং>ডঙবং (বিশেষ করে বীরভূম ও মুর্শি-
দাবাদ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়)। দালান (ফারসী) বাড়ি>ডালান বাড়ি।

১০) রাষ্ট্রীয় মত 'ম' এর 'ন'-এ পরিবর্তন ও দেখা যায় (বিশেষ করে
পশ্চিম ত্রিপুরায়)। যেমন : মাপ>নাপ।

১১) শব্দাত্মক 'ক' প্রায়ই 'ট' তে পরিবর্তিত হয় (২নং সূত্রের মত)।
এটি এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য : কাকা>কাটা (=ক>
খ) , টাকা>টাহা বা টিহা বা ট্যাহ।

ওপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধ্বনিস্বত্বগত বৈশিষ্ট্য
এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সঙ্গপরিষরে সেনসব আলোচনা
করা সম্ভব নয় বলে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোই আলোচনা করা হল।

DAVID McCUTCHION প্রসঙ্গ

পুলকেন্দু সিংহ*

ডেভিড জে. ম্যাককাচন এর নামের বানানটা তাঁরই হাতে লেখা আমার পুরনো ডায়েরিতে আছে। নামের বানানটি রীতিমত রপ্ত করেছিলাম সেই তখন—১৯৬৫র জাহুয়ারিতে। ভারতপাঠিক ম্যাককাচন সাহেব শুটি কম প্রাচীনগণীয় বিদেশীদের অন্ততম ধারা হৃদয়-মন ও আত্মার সঙ্গে ভারতাত্ম্যার মিলন ঘটিয়েছেন—যেমন দীনবন্ধু এনড্রুজ, ভগিনী নিবেদিতা বা শ্রীমার কথা মনে পড়ছে। তাঁদের পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা। ডেভিড সাহেবের পেছনে ছিল বোধহয় অসংখ্য প্রেরণা।

DAVID J. McCUTCHION সাহেবের জন্ম ইংলণ্ডের কেভেনট্রিতে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পারবারে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৮-এ স্কুলের শিক্ষা শেষ কেভেনট্রিতেই। তারপর ইন্দোনেসিয়ার নিয়ম মত একবৎসরের জন্ত সৈন্ত বাহিনীতে যোগদান করেন। তারপর কেম্ব্রিজের জ্যাস কলেজ থেকে ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি এই তিন বিষয়ে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের স্নাতক হন ১৯৫৩-তে। এর চার বছর পর স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ। ফরাসি দেশে দু'বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭তে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকরূপে। ১৯৬০ সালে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। চারবছরের মধ্যে সেখানকার রিডার পদে উন্নীত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার থাকার সময়ে তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ করেন ও পাঁচখুপী এসে আমার খোঁজ করে সাক্ষাৎ করেন। সেটা ছিল ১৯৬৫-র জাহুয়ারি। সেই দিনটি আমার কাছে নিশ্চয় অবিস্মরণীয়! আমি তখন বিভাগীয় ট্রেনিঙে চুঁচড়োতে ছিলাম। ছুটিতে এসেছিলাম বাড়ি।

আমাদের দেশের কোন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত গবেষক নিজে এসে আমার মত এক অখ্যাত ও অতি সাধারণ তরুণের সঙ্গে দেখা করবেন এটা ভাবা যায় না। এরকম দুর্ভটনা অস্বতঃ আমার চেংগে এখনো দ্বিতীয়টি পড়েনি। উচ্চ ডিগ্রির আভিজাত্য থেকে পাণ্ডিত্যের উচ্চাঙ্গ থেকে নেমে এসে গ্রামের ধূলিমুখা পথে ঘাড়ে কামেরা নিয়ে একইটি ধুলো মেখে না খেয়ে না ভুমিয়ে মন্দিরের টেবাকোটোর গিল্পুপ্রায় শৌন্দর্যের ঐশ্ব্যকে লোক-সমক্ষে তুলে ধরবেন - কে এমন 'বাতুল' আছেন আমাদের দেশে! মেয়ানার দেশে এক মহৎপ্রাণ

মন্দিরশ্রেণিক বাড়লকে বুক ভরে দেখবার, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকণ গ্রাম্য সংস্কৃতি ও মন্দির শিল্প নিয়ে আলোচনার চুল্লি জ্বলছে। তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রাম্য সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহ করতে হাতে নাতে শিক্ষালাভ করার চুল্লি সৌভাগ্য পেয়েছে। দেশী পণ্ডিতেরা কেউ এত আবেগ আর ভালবাসা নিয়ে কাউকে কিছু শেখাবেন না। তিনি চেয়েছিলেন মুশিদাবাদে আরো ঘুরবেন আমার সঙ্গে। প্রাচীন মন্দির মসজিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থ রচনা করবেন।

মুশিদাবাদের কান্দি অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচথুপী এসেছিলেন আমার কাছে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত চৌধুরেন বঙ্কন সান্মাল। সান্মাল মশায় প্রথম দিন (১লা জানুয়ারী '৬৫) DAVID সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। বহরমপুরে ও পরে কান্দিতে DAVID সাহেবের বিশেষ পারাচিত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সাংবাদিক মেজর সজ্জিদানন্দ ঘোষ এর কাছ থেকে আমার খোঁজ খবর নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বিশেষ কাজে সান্মাল মশায় কলকাতা ফিরে যাবেন। আগামীকাল DAVID সাহেব পুনরায় আসবেন ও তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে গ্রামে গ্রামান্তরে। কোথায় যেতে হবে সেটা নিবাচনের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাল। তাঁর মত পণ্ডিতের সহচর্য পাওয়া নিশ্চয় সৌভাগ্যের বিষয়। হুতরাং আমিও খুবই উৎসাহ আর প্রেরণা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভয় হচ্ছিল—তিনি সাহেব বাংলা জানেন না, আমি জানিনা ইংরেজি—তার ওপরে অতবড় পণ্ডিত। কি করে যে কথাবার্তা বলব কি যে বলব সারাগাত জেগে ভেবে ভেবে রাত কাবার হয়ে গেল। পরদিন সকালেই তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বহরমপুর থেকে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছোটো দামী ক্যামেরা। তাঁকে নিয়ে পাঁচথুপী গ্রামে নবরত্ন মন্দিরে গেলাম। তিনি পাশের চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে তেতুল। ছাদ থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ছবি তুলবেন। মন্দিরগুলির ইতিহাস ও গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁকে সাহায্য করা অপেক্ষা তাঁর কাছ থেকেই অনেক তথ্য জানা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি মন্দিরের সামনের দিকের পোড়া মাটির কাজের বিষয়বৈচিত্র্য সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলেন। মন্দিরের সামনের দিকে বামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য। অস্ট্রাল অনেক মন্দিরেই এট বকম পোড়া মাটির কাজ দেখতে পাওয়া যায়। পোড়া মাটির কাজের নমুনা দেখে তিনি মন্দিরের নির্মাণসময় অনুমান করে নিতে পারছিলেন। আমাকে

টুকিটাকি প্রদর্শন করছিলেন। আমি তাঁকে ভৌতিক প্রদর্শন করে অনেককিছুই জানতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ও মুর্শিদাবাদের বড়নগর প্রভৃতি স্থান দ্বারা এসেছিলেন। তাঁকে নবরত্ন মন্দিরটি দ্বারা দ্বারা দেখালাম। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের (পঃ বঙ্গ সরকার) শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী মশাই এসে মন্দিরটি দেখে এটিকে জৈন প্রত্নবস্তু পঞ্চায়তন মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মন্দিরটি প্রায় দু'শো বছরের প্রাচীন। পৌরাণিক ইটের উপর নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরের গায়ে মূর্তি। এখানে মোট নটি শিবলিঙ্গ আছে। যার অষ্ট মন্দিরটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হয়ে থাকে। ২টির মধ্যে ৪টি খেতপ্রস্তরনির্মিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে ৪টি শিবলিঙ্গও মন্দিরের বহির্দেশসংলগ্ন স্থানে ৪টি শিবলিঙ্গ। বর্তমান মন্দিরটি সঙ্করের অভাবে জীর্ণ। আমি শরবর্তী সময়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগে আবেদন করি ও তার ফলে বর্তমানে এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তা মনোনীত হয়েছে।

নবরত্ন মন্দিরের পরে গোলাম দক্ষিণলাডার প্রাচীন মসজিদে। এটি বোধহয় হলেন সাহেব আমলের তৈরি। অনেকে মনে করেন এটি মহাম্মদ বিন তোগলকের আমলে তৈরি। কিন্তু দৃষ্টি বলে ঐতিহ্যের গৃহশিক্ষক মোলানা গোলাম হাজারতের কথামত ঐতিহ্যেই এই মন্দির নির্মাণ করেন। পাঁচখুপি সংলগ্ন 'বারহকোনা'র বুদ্ধ বিহার ভেঙ্গে তারই মাল মশলা 'দয়ে এই মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদসংলগ্ন একটি মাদ্রাসা ছিল। এই মাদ্রাসার বায় নিবাহ করা হোত মোগল দরবার থেকে। আতা বিনি নামক জনৈক মহিলা মোলানা হাজারত বংশের শেষ নারী যার আমল পর্যন্ত এই মসজিদের মাদ্রাসায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলত। দুই দু'শতকের অনেক ছাত্র এখানে আসত। এই মসজিদের কয়েকটি ছবি তুললেন তিনি।

এরপর আমরা পাঁচখুপি থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে বৃগজাবা গ্রামে গোলাম। দুজনে দুটো সাইকেলে। গ্রামের প্রাচীনেবা ইতিহাসের বড় ধার ধারেন না। তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্যই পাওয়া গেল না। এখানে প্রাক্তন জমিদারদের একজন কফি, কলা, মিষ্টি দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ক্লাস্ট্রহীন এক বিয়ুপ্ত মন্দিরতাপস দিনভোর ছবি তুললেন আর তথ্য সংগ্রহ করলেন। ফটো নিলেন পুরোহিত মশায়ের পূজারত অবস্থায়। মন্দিরের অনেকগুলিই আজ ভেঙ্গে গিয়েছে। এখানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। তার মধ্যে যোগেশ্বর

শিব-এর মন্দিরটি বেশ উচু। ষাট নামে গ্রামের নাম হুগলিয়া। খড়গ্রাম থানার এডোয়ালী গ্রামের রাজা রামজীবন এই মন্দিরগুলি বহুকাল আগে নির্মাণ করেন। এখানেও মন্দিরের সামনের পোড়া মাটির কাজ অনবদ্য। এখানেও মন্দিরের সামনে পোড়া মাটির ইঁটে সেই একই রাম দাবণের মুদ্রা দৃষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হুগলিয়ার মন্দিরগুলির একটি পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। যাই হোক আমরা উভয়েই কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাঁর প্যান্ট, জামা, মাথায় ধুলো। কারণ বেশ, শুয়ে তিনি ফটো তুলেছেন তারই চিহ্ন। ফেরার নির্দিষ্ট সময় কাবার হয়ে গিয়েছে। ফেরার পথে সাইকেলের টিউব গলে। আমি বললাম ‘আপনি চলে যান আমি হেঁটে যাচ্ছি।’ তিনি রাজি হলেন না। বলেন—‘হুগলি হেঁটে হেঁটেই ফিরি, ভালই লাগবে।’ ফিরতে ফিরতে দেশের কথা, গ্রামের কথা, মন্দিরের কথা, লোকজীবন ও সংস্কৃতির কথাও উঠল। খাতি সমস্তা ও দারিদ্র্যের কথাও বাদ গেল না। আমি বললাম—‘দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনে পেকে দেশটা ঝাঁঝ হয়ে গিয়েছে স্বাধীনোত্তর কালে গ্রামোন্নয়ন হুকুম হয়েছে—কিন্তু আশাহুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ইংরেজদের প্রতি আমার অনুযোগ বিনীতভাবে স্বীকার করে নিলেন। অত্যন্ত সারল্য ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন তিনি। কোথাও পাণ্ডিত্যের অহংকার নাই। পাছে আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চলানো অস্ববিধে হয় সেজন্য অত্যন্ত আন্তে আন্তে সরল ইংরেজিতে স্পষ্ট উচ্চারণে কথাবার্তা বলছিলেন। আমার বুঝতে তত কষ্ট হল না। আমাকে ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতে হোল। তাঁর ব্যবহারে আমি বিশেষভাবে বিশ্বস্ত হলাম। তাঁর উদার প্রসঙ্গ সাহচর্যে গ্রাম্য এলাকায় ভ্রমণ ও তথ্যাদি সংগ্রহের বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কলাম পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা আমার বেশ কাজে লেগেছিল। তিনি তাঁর ঠিকানা দিলেন আমাকে। আমারটাও নিলেন। নিজে ডাকবাংলোর বাসে ঝুলতে ঝুলতে সন্ধ্যার আধারে ফিরে গেলেন। কোথাও পরিশ্রমের ক্লান্তি নাই। চোখে মুখে এক উদার ও ভাবুক হৃদয়ের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ প্রজ্ঞার প্রকাশিত।

কয়েকমাস পরে চুঁচুয়া ট্রেনিং সেন্টার থেকে Study tour-এ আমি একটি দলের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গেলাম। তিনি তখন তাঁর class

নিজ্বিলেন। তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে অপেক্ষা কৰ্বলম। তিনি class কৰে নিজের ঘৰে ক্বিৰে আমাকে চিনতে পেরেই মাথা হুয়ে নমস্কাৰ কৰলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁকে প্রণাম কৰি কিন্তু তাঁর আগেই তিনি আমাকে বুকো জড়িয়ে ধৰলেন। আমার গোটা নামটা তাঁর মনে পড়ছিল না। তবে সিন্হা ও ‘পাক্‌থুণী’ মনে ছিল। আমার গোটা নামটা বলে তাঁকে সাহায্য কৰলম। আমাকে জলযোগে আপ্যায়িত কৰলেন। উৎসাহের সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ কৰিয়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। আমাদের ট্ৰেণিং সেন্টাৰের নির্দিষ্ট গাৰ্ডিতে স্থপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ও সহকৰ্মিবৃন্দ অপেক্ষা কৰছিলেন। তিনি নিজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ কৰলেন কয়েকদিন পরে ব্ৰিটিশ কাউন্সিলে তাঁর গৃহীত মন্দিরের ফটো বৰ্ডিন ফাইন্ড পৰ্দায় প্ৰতিফলিত কৰে তাঁর বক্তৃতা দেবার কথা আছে। বিশেষ আমন্ত্ৰিতদের সামনে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় চিত্ৰ ও তথ্য সহযোগে ব্যাখ্যা কৰলেন। সেইসঙ্গে আমার সঙ্গে তোলা তাঁর অনেক ছবি দেখাবেন বললেন ও আমাকে আমন্ত্ৰণ জানালেন। দুভাগ্যবশতঃ আমি সেদিন অসুস্থ হয়ে পড়তে সে-অন্ত্ৰণানে যেতে পাৰিনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ও সম্পৰ্ক অত্যন্ত অস্থবল হয়ে উঠেছিল। তাঁর অক্লান্ত আন্তৰিকতায় আমি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্ৰতি আমার শ্ৰদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। আমি বহরমপুৰ থেকে প্ৰকাশিত সাপ্তাহিক ‘পৰিক্ৰমা’ কাগজে একটি প্ৰবন্ধ লিখি। প্ৰবন্ধটি প্ৰকাশিত হয় ১৯৬৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বৰ সংখ্যায়। প্ৰবন্ধটির নাম ‘পণ্ডিত গবেষক DAVID McCUTCHION’।

আমার প্ৰবন্ধটিই বোধহয় মাক্‌কান্ন সাহেন সম্পৰ্কে প্ৰথম প্ৰকাশিত আলোচনা। উক্ত আলোচনা পাঠ কৰে কান্দির ডাঃ শক্তিদানন্দ ঘোষ মহাশয় উক্ত ‘পৰিক্ৰমা’ পাত্ৰিকার অক্টোবৰ ৩, ১৯৬৭তে একটি পত্ৰ লেখেন। ঐ পত্ৰে তিনি লেখেন—“গত ৬৯৬৭ তারিখের পৰিক্ৰমায় শ্ৰীপুলকেন্দু সিংহ লিখিত ‘পণ্ডিত গবেষক DAVID McCUTCHION’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটি পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। ডেভিড সাহেন এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন। তাঁহার বন্ধু ও সহকৰ্মী বাঙ্গালী গবেষকের নাম শ্ৰীহিতেশ বৰুৱা সান্তাল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৰ্মচাৰী এবং ইনিও মন্দিৰগাত্ৰে পোড়ামাটির অলংকরণের কাজ লইয়া গবেষণা কৰেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকেও আলাদা আলাদা ভাবে শ্ৰীযুক্ত সান্তাল ও শ্ৰীযুক্ত ডেভিড কান্দি মহকুমাত্ৰে

তাহাদের গবেষণার কার্য উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। কান্দি মহকুমাত্তে বাঘডাঙ্গা, রূপপুর, দোহালিয়া, পাঁচপুণী, হুগুয়া, সাহোয়া, গোবরাহাটি, গোকর্ন প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন। ১৯২৬৭ তারিখের ব্যক্তিগত চিঠিতে ডেভিড আমাকে জানাইয়াছেন যে এই বৎসর নভেম্বর থেকে বাংলা-দেশের মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা কাজের সুবিধার জন্ত এবং এই সম্পর্কিত পুস্তক লিখবার জন্ত তিনি একবৎসরের ছুটি লওয়া প'রকল্পনা করিয়াছেন। ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকায় বীরভূম জেলায় মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিক্রমাটি অবগতির জন্ত শ্রীডেভিডকে পাঠাইলাম।”

১৯৭০ এর শেষ দিকে কিছুদিনের জন্ত ম্যাককাচন্ সাহেব দেশে যান। তিনি শুধু বাংলা দেশ নয়—বিশ্ব, উড়িয়া ও বাংলাতেও ব্যাপকভাবে পরি-ভ্রমণ করেন। তার জন্ত তাঁর যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক অনটন সহ্য করতে হইত। নিজের খাড বন্ধক দিয়ে যাতায়াত খরচ সংগ্রহ করতে হইত। তাঁকে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকার একাজে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রণী হননি। তাঁর মত লোকও এই বিরাট গবেষণার কাজে সহায়তা পাননি, এর চেয়ে তখনের আর কি থাকতে পারে। তিনি বিপুল পরিশ্রমে তাঁর সংগৃহীত অজস্র তথ্যের কতকংশ নিয়ে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন—“লেইট মিউজিভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল।” তাঁর জীবিতকালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারেনি।

অমাবসিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য বোম্বয় ভেঙ্গে যায়। ১৯ই জানুয়ারি ১৯৭২ কলকাতায় তঠাৎ তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। শরীর অবশ হয়ে যায়। ১৯ই জানুয়ারি সকালে উড্ডাণ্ড নাশিং হোমে স্থানান্তরিত হন কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর বাবুসাহায্যী। ১২ই জানুয়ারি রাত্রে ১১টায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দেশে তাঁর বৃদ্ধ পিতা মাতা জীবিত ছিলেন। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭২ কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। কলকাতায় তাঁর গুণমুগ্ধ জ্ঞানিগুণিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, পরমেশ্বরগত কবি বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ‘দেখা হয় নাই’ গ্রন্থে ডেভিড সাহেব এর উপর একটি দয়দী আলোচনা করেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়গৃহীত একটি আলোক-

চিহ্নে গ্রামে তথ্য সংগ্রহের ফীকে বিশ্বাসের কালে খোলা গরুর গাড়িতে শোয়া তাঁর কর্মজীবনের একটি মুহূর্ত মুর্ত হ'য়ে আছে । *

তাঁর মৃত্যুর পরে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে “লেইট মিউজিয়াম টেম্পলস অব বেঙ্গল” গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । এবং ঐ গ্রন্থ রচনার অন্ত পঃ বঙ্গ সরকার তাঁকে মরণোত্তর ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ দান করে তাঁর মহৎ কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন ।

1961-র Census ভিত্তিক পরবর্তীকালে প্রকাশিত DISTRICT CENSUS HANDBOOK—MURSHIDABAD এ DAVID McCUTCHION (ঐ বানানে মুদ্রিত হয়েছে) রচিত মুর্শিদাবাদ জেলার মন্দিরগুলি নিয়ে তাঁর রচিত সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান আলোচনা “Notes on Some Old Temples and a Mosque in Murshidabad District” প্রকাশিত হয়েছে । জেলার কয়েকটি বিশিষ্ট মন্দির ও মসজিদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন । বলাবাহুল্য উক্ত স্থানগুলি তিনি পরিভ্রমণ করেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । জিয়াগঞ্জ থানার—‘বড়নগর’, ভট্টমাটি, কিরিয়েশ্বরী, কান্দি থানার গোকর্ণের নরসি হৃদেবের মন্দির, গোবরহাটা গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দির, রূপপুর (কান্দি) এর কত্রদেব ও বাঘডাঙ্গা গ্রামের সুরেশ্বর শিবমন্দির, বড়এগা থানার—পাঁচপুপীর নবরত্ন মন্দির, এবং জোরবাংলা গঠনের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির, ফুলস্বরী গ্রামের চাবচালা শিবমন্দির, সাদপুরের চাবচালা মন্দির, সাগরদিঘী থানার থেকুর গ্রামের ১৪২৪ খৃঃ-এ প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মসজিদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন ।

কিছুদিন আগে আমি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর গ্রন্থটি দেখবার সুযোগ পেয়েছি । কলকাতার গুরুসদয় মিউজিয়াম দেখার সময় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অংকিত মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ‘জড়ান পট’ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমতটি দেখে আনন্দ হল । তিনি রাজস্থানী অঙ্কন কৌশল ও আঙ্গিকের ছাপ পড়েছে মুর্শিদাবাদের ঐ পটে এই একম অভিমত দিয়েছেন । পটটি দেখে আমারও তাই দারুণা হল । ভেভিড সাহেব তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের বাশস্ত্র পণ্ডিত ও অধ্যাপক আবার স্থাপত্যকলার ও একজন যোদ্ধা—কিন্তু মন্দির যেন তাঁর প্রাণের আরাধ, মনের শাস্তি ।

গ্রাম বাংলার অখ্যাত অবহেলিত ভগ্নপ্রায় মন্দির মসজিদকে তাঁর মত আর কে ভাল বেসেছেন জানা নাই । এই মন্দির প্রেমিককে বিনম্র প্রজ্ঞা জানাই ।

[বংশপরম্পরায় নবাব পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার এক সময় মুর্শিদাবাদ শহর সংযুক্ত শিল্পচর্চার পটভূমি হয়ে দাঁড়ায়। মায়ী অল্প করে কলক আশেও তার জের ছিল। অথচ এতো স্বল্পকালের মধ্যে তা নিজীব ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বিস্মৃতির পাতাল থেকে কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায়কে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করা হবে 'চেতনিক'-এ আগামী কয়েক কিস্তিতে। একজন জীবিত শিল্পীকে নিয়ে শুরু করা গেল 'চেনা গোলাপ' এই শিরোনাম দিয়ে এই পর্বের আবেগ-উন্মোচন। সম্পাদক/চেতনিক]

চেনা গোলাপ

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন রেডিওতে ঘোষিত হল বিখ্যাত ঠুঁড়ি ও খেয়াল গায়ক তাবাপদ চক্রবর্তী মশায়েব যুত্ম সংবাদ। সংগে সংগে মনে পড়লো অংকেকটি নাম, যে নাম ঠুঁড়ি জগতে একটি প্রতিষ্ঠানের সমান। মালু সাহেব। আর ঠিক এরই পিছু পিছু এসে হাজির হ'ল তেইশ-চব্বিশ বছর আগের, এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যার অবিস্মরণীয় দৃশ্য। মুর্শিদাবাদের কেজার এক ঘাটের নিচ থেকে উঠে আসা সিঁড়ির মাধ্যম ব'লে গল্প করছি লক্ষ্য থেকে সত্তা আগত এক বন্ধুর সংগে। হঠাৎ তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে মুগ্ধ চিন্তে ব'লে উঠলেন, 'আহা: আহা:!' চিত্রাঙ্গিতের মতো ব'লে রইলাম দু'জনে স্থানকালপাত্র ভুলে। বর্ষা দু'ফুলপ্রাণী ভাগিরথীর বুকে তরুণ ক'রে ভেসে আসছে বকের পাংকের মতো পাণ তুলে এক নৌকো। তার ভেতর থেকে উচ্ছিন্ন হচ্ছে স্বরে স্বরধুনী ডি, পাংশুকারের 'চল মন গঙ্গা যমুনা তীর।' গুরুনিতম্ভারবিরতানবীন ললনার মতো বর্ষা ভরি বাতাস সেই স্বরের গমকে গমকে আবেগে নত খলিত বিলম্বিত। অচিরে সেই নৌকা এসে ভিড়লো আমাদের অধরে। নৌকো থেকে নেমে এলো কয়েকজন, হাতে হারমোনিয়াম আর তবলা। পিছু পিছু দেওদারের মতো উন্নত একটি দেহ। বন্ধুকে পরিচয় দিলাম: এঁর নাম সৈয়দ আলি মির্জা। বন্ধু স্বীকার করলেন লক্ষ্যেতেও এতো স্বরেলা উচ্চানাদী ভরাট গলা খুব কম শুনেছেন।

কলকাতার জীবন্ত ভেবজচিত্র দীর্ঘকায় অপ্রশস্তবন্ধ মির্জা সাহেবের জন্ম মুর্শিদাবাদ শহরের কেজার নিজামত পরিবারে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর। পিতা আসমা কাদার সৈয়দ আসাদ আলি মির্জা ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যা শেষ নবাব নাজিম ফিরাইদুন ঝাঝ তৃতীয় পুত্র। প্রসংগত, নবাব নাজিমের

প্রথম পুত্র ছিলেন নবাব হাসান আলি মির্জা যাঁর পুত্র হিজ হাটেনিস্ নবাব স্ত্রীর ওয়াশিক আলি মির্জা। স্ত্রীর ওয়াশিক্ ছিলেন অক্সফোর্ডে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সতীর্থ। যাই হোক, আলি মির্জা সাহেবের মা মেহেদি খাতুন কিন্তু ছিলেন একজন সাধারণ দর্জির মেয়ে। কিন্তু নবাবী হারেমে যখন ঠাই পেয়েছিলেন তখন অহুমান করা যেতে পারে তিনি অহুন্দরী ছিলেন না।

মির্জা সাহেব মুর্শিদাবাদের সম্পূর্ণ অবৈতনিক নিত্যালয় নবাব বাহাদুরজ্ ইন্সটিটিউশন্-এ দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সেই সময় থেকেই তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন থেকে যখনই যেখানে সংগীতের টিমটিমে আসর কি ভজজমাট জলসা বা মাইফেলের খবর পেতেন ছুটে যেতেন তান সেখানে, অধীর আগ্রহে স্তনতেন বড়বড় সংগীতসাধকের সমাহিত কণ্ঠনিবেদন। মির্জা সাহেব তাঁর খুল্লতা-তপুয় অগ্রজ মজুমদার সাহেবের কাছে সংগীতে তালিম নিতে শুরু করেন ছাত্রাবস্থাতেই। আপাতত বলে রাখি মজুমদার সাহেবের আনল নাম আনওয়ার আলি মির্জা। পিতা নবাব নাজিমের কানষ্টপুত্র বাকের আলি। মজুমদার সাহেব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায় তাঁর ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে এক স্থানে উল্লেখ করেছেন তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে। মজুমদার সাহেব খেয়াল গাজাল ঝুঁড়ি ও দাদরায় হৃদয়ক শিল্পী ও সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ঝুঁড়ি ও গাজালে তিনি কি করে ভারতবিশ্বা ও শিল্পী হ'য়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে পরে ভিন্ন এক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

যা বর্ণাঙ্কিত। আলি মির্জা সর্বপ্রথম তাঁর প্রায় বিশ বছরের বড় উক্ত মজুমদার সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি এই বিখ্যাত গায়কের কণ্ঠে যে সব ঝুঁড়ি গাজাল প্রভৃতি শুনতেন, একবার শুনেই শ্রীতিধরের মতো সেগুলি নিজকণ্ঠে নিখুঁতভাবে তুলে নিতেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদ নিবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেবের কাছে নাড়া বাধেন। ওস্তাদজী ১২৬৮ সালে প্রায় ২২-২৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এঁর কাছে মির্জা সাহেব খেয়াল শেখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওস্তাদজী এঁকে খুব ভাল-বাসতেন। তিনি এঁকে তাঁর সঙ্গীত বাগবাগিনীর অমোঘ ভাণ্ডার উন্মার করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মির্জা সাহেব অধ্যাবসায়ের্চিত্ত ঐর্ষ্যের অভাবে তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁর নিজের জবানিতেই বলি : ওস্তাদজী আমাকে চেলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি নিইনি। কারণ

আমি ওস্তাদ হ'তে চাইনি। ভাল গাইয়ে হওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। আমি দেখেছিলাম ওস্তাদজী সংগীতশাস্ত্রে এতো বড়ো পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ভাল গাইয়ে ছিলেন না বলে গুণী সমাজের বাইরে তাঁকে আর কেউ চিনতেই পারে নি। তাই আমি তাঁকে ব'লেছিলাম, ওস্তাদজী, আপনি আমাকে এতো বেশি দিতে চাইলে কি হবে? আমি নিতে পারবো না। দশ পনেরো বিশ যা নিতে পারবো তাই ভাঙিয়ে তামাম জিন্দোগ চলে যাবে আমার। আমাকে ওস্তাদ হ'তে বলবেন না। আমি শুধু গায়ক হ'তে পারলেই খুশ হব।

তা গায়ক তিনি হয়েছেন। কতো বড় গায়ক তার একটু নমুনা তুলে ধরা যাক। ১৯৬৩ সাল। জুন মাস। স্থান ৮৫ নং পাক স্ট্রিটে মুশিদাবাদ নবাবের কলকাতার বাসভবনের বিশাল হলঘর। নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সোজখানির প্রতিযোগিতা চলছে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি, ওস্তাদ মুনাফার খাঁ, ওস্তাদ দাবির খাঁ, ওস্তাদ আমির খাঁ। দু'তিন হাজার শ্রোতার সামনে বহু গুণী প্রাত্যোগী খালি গলায় অর্থাৎ কোন প্রকার বাজ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে বিস্তৃত রাগরাগিণীর মাধ্যমে কাব্বালা প্রান্তরে অচুর্চিত সেই প্রাচীন বিসাদময় ঘটনার করুণ কাহিনী ধীরে ধীরে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত করে চলেছেন। এক সময় এলো মির্জা সাহেবের পালা। তিনি যেই শুরু করলেন প্রকৃতিদত্ত সুরেলা কণ্ঠে তাঁর আবৃত্তি সংগে সংগে সমগ্র হল বিপুল প্রত্যাশায় টান টান হয়ে উঠলো। শুধু সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসাই নয়, কণে কণে অভিজ্ঞ তারিফ উচ্চারিত হতে লাগলে এমন কি প্রাজ্ঞ বিচারকবর্গের কণ্ঠ থেকেও। বড়ে গোলাম আলি বললেন, মির্জা সাহেব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোজখান। দাবির খাঁ বললেন, সোজখানিতে তামাম ভারতে আপনার দোস্ত পাওয়া যাবে না। একই কথা কিন্তু ভিন্ন ভাঙিতে, বললেন ওস্তাদ মুনাফার খাঁ জ্ঞান আমির খাঁও। ডঃ দাবির খাঁ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : ‘.....He is a very good classical singer. As far as my experience goes he hasn't got equal in Sozekhani.....’ আর বড়ে গোলাম আলি লিখেছেন : Nawab Syed Ali Meerza.....is.....a.....sousin of the late Nawab Syed Anwar Ali Meerza alias Munjiboo Sahab who was famous for Thumri and Khayal. I have often come in close contact with the said Ali Meerza in several musical sooties

and found him well versed in classical songs. At present he seems to me as one of the best Sozekhans in Bharat...'

ঠুড়'রি দাদ'রা গাজাল ও ভজন মির্জা সাহেবের কণ্ঠে ঘাঁষা শুনেছেন তাঁদেরই স্মৃতিতে জেগে উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাই ও গুরু মাজু সাহেবের অপার্থির কণ্ঠের জাদুকরী দক্ষতার কথা । ঠুড়'রির এমন উপযুক্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ বাংলায় আর কতো জনের আছে জানি না । দুবেলা পেটপুরে খেতে না পাওয়া বাবুটি বছরের এই নিঃসংগ সংগীতশিল্পী ঠুড়'রি গেয়ে এখনো ভেল্কি দেখাতে পারেন । ভৈরবী ঠুড়'রিতে যখন তিনি গেয়ে উঠেন :

ক্যায়সি বাজাইরে শ্রাম

বন্সি বাজাইরে শ্রাম ॥

কিংবা ইমন কলাণ রাগে :

রাজা তোরা পানিয়া মো'লে না ভাঁরো যায় রে

উঁচিলে যাঁয়ে ঘাড়া নাহ ডুবে

পাতলি কামারা বাল খায় খায় যায়রে ॥

[অর্থাৎ রাজা তোমার জন্যে জল ভ'রে নিয়ে আসা আমার দ্বারা হল না । বড়া খালি উঠে উঠে আসে, কিছুতেই ডোবে না । আমার কটি স্মরণ : 'বাল' (কোমড়ের 'গাত') বার বার খুঁবে যাচ্ছে ।]

কিংবা নাটমঞ্জার রাগে দাদ'রা :

মোরে নায়না লাগি গুঁইয়া

জিয়া চাহে সো করে ॥

কিংবা ইমন কলাণ জাতীয় রাগে গাজাল :

শুন এ'রি সাখি মোরা শ্রাম পিয়া

নাহি স্বপ্নেমে দরোশা দেখাবাতা হ্যার

উনে চুড়ানাকো যোগানিয়া বাহু

এ'রি মোরে মনমে সামাবাতা হ্যার ॥

[অর্থাৎ শোন ও'রে সাখি, আমার প্রিয়তম শ্রাম আর স্বপ্নেও দেখা দেয় না । তাই তাকে খুঁজে জানতে আমি যোগিনী হয়ে যাবো, আমার মনে এই এক চিন্তা ঢুকে গেছে ।]

কিংবা যখন শুনেবেন তাঁর নিজেরই দেওয়া সুরে সন্ন্যাস জাতীয় ভজন :

বাদাল রে তু জল ভর লে আয়ে

ছোট ছোট বৃন্দ বাগান লাগি

কোয়েলা শাবাদা শোনা আয়ে ॥

তখন সুবিন্দুবেব স্বকীয় বলিষ্টতায়, মুছ'বার সুস্মৃতিসুস্ম কালে, স্ব-ক্ষেপের অভিনব কৌশল প্রয়োগে মুগ্ধ চিত্তে মুগ্ধ কর্তে আপনার পক্ষে স্বীকার না করা সম্ভব হবে না — এমন সুবেলা দবদী দবাগ গলা 'লাগে না মিলে এক' ।

এ-হেন মনমাতালকরা শিল্পীর ঘরোয়া জীবনের পরিচয় জানতে আগ্রাহ হওয়া স্বাভাবিক । বনীন্দ্রনাথের দুটো লাইন মনে পড়ে কি আপনাদের ? আমার তো হামেশায় মনে পড়ে যায় :

হাঁটের পরে হাঁট

মাঝে মাঝে-কোট

যখন দেখি মির্জা সাহেবকে জীবন বিশাল নবাবী ইমারতের একটা সীত-সেতে প্রকোপ্তে জীবন পোষাকে সার্ণ দেহটা ঢেকে অতিবিশভাগতকে সাদর আহ্বান জানাতে । কিংবা কোট হয়তো আমরাই । কারণ আমাদের এতো কাছে অনাত্রাত কুসুমলম্ব এক মহৎ শিল্পী বাসটি বছর ধরে যেমন অকাণ্ডে এই এই পৃথিবীর আলো বাতাস গ্রহণ করছেন তেমনি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতায় পৃথিবীর মাহুতকে তাঁর মধুনিষাদী সুবেলা কর্তের প্রাক্ষরসে পরিবিক্ত করে আমাদের মনকে মাতিয়ে তাতিয়ে তুলতে সদা-উদগ্রীণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কোটদষ্ট কলের মতো কিংবা হয়তো কীটের মতোই খলসভাবে তাঁর অশেষ সজ্জানবায় উজ্জ্বল অস্তিত্বকে বাস বাসনের মতো স্নান করে রেখেছি অমার্জনীয় উপেক্ষায়, অনাদরে, অশ্রদ্ধায় । মাঝে মধ্যে কখনো আনন্দবাজার কখনো যুগান্তর কখনো বা বহুমুখী প্রতিনিধি আসেন তাঁকে নিয়ে স্বয়ং পরিচয় পৃষ্ঠায় নির্মম রসরচনা লেখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করতে । নিজের দাবিরদ্বা সর্বাগ্রহণ্য এই গুণী শিল্পী তাঁর জীবনে অত্যন্ত ভুল (অর্থাৎ বাংলা ভাষা না লেখা ও রক্ষণ-শীলতার গতি তাগ না করার) নীতি ও পথ সম্পর্কে যে আক্ষেপোক্তি করেন, অনুচা কন্যাচতুষ্টয়ীর জন্তে অসহায় বেদনার্ত পিতৃ হৃদয়ের যে আকশোষ ব্যক্ত করেন তা ফলাও করে নিখুঁত শিল্প নৈপুণ্যে বর্ণনা করে তাঁরা অচেতন পাঠকের প্রাণাংগা অর্জন করে থাকেন । কিন্তু সরকারকে, জনসাধারণকে শিল্পীর প্রতি তাঁদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেবার জন্যে একটা লাইনও লেখেন না । কেউ কেউ এতোদূর দায়িত্ববোধহীন যে ভুল তথ্য দিতেও কৃষ্টিত হন না । এই প্রতিনিদ্রিত্বের একজন মির্জা সাহেবের সংগে সরাসরি মুলাকাত

করে গিয়েও তাঁদের পত্রিকার ২০ শে জানুয়ারি (১৯৭০ সালের) সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় তাঁর পরিচয় দেন ‘বডে গোলাম আলি’র ছাত্র’ বলে। কিন্তু বডে গোলাম আলি সাহেবের নিজের লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি একটু আগে তাঁর থেকেই স্মৃতি পাঠক সহজেই প্রমাণ পাবেন যে মির্জা সাহেব তাঁর ছাত্র নন : I have often come in close contact with the said Sved Ali Meerza in several musical sources . . ? বরং দুজনে এক-ই মঞ্চ থেকে বেশ কয়েক বার সংগীত পরিবেশন করেন।

যাই হোক, এটি শিল্পী সম্পর্কে সুনাম মৃণিদাবাদ জেল সমাজ শিক্ষা-নিকারিক মশায় ১৯৬৭ তে তার এক প্রতিবেদনে (স্রঃ তার মেমো নং ৪২০) শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিবের কাছে মির্জা সাহেবের অশুভলৈখিক পেনসন মঞ্জুরের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু আজও তাঁর কোনো কলাকল জ্ঞানো যায়নি। আমি জানি পঞ্চম শ্রেণীর কাদের বঙ্গ সাহেব দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করার পর যখন এটি শিক্ষামূলক পেনসন পেলেন তখন এতো দেরি হয়ে গেছিল যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে মাত্র দু’তিন বছর তা ভোগ করার সুযোগ পান রোগশয্যা থেকে। আমরা আশা করবো তাঁর ছাত্র আলি মির্জা সাহেবের ক্ষেত্রে এটি দুঃখজনক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবে না।

নেপথ্যের অঙ্ককার

রচনা/বংশপাল

অনুবাদ/বোম্বায়া দিশ্বনাথম্

চৌধুরী পীরবক্সের ঠাকুরা দারোগা ছিলেন। বোজগার করতেন ভালই। চাকরি জীবনেই ছোট্ট একটা পাকবাড়ি তৈরি করে নেন। দুটি ছেলেই মাত্রিক পাশ করিয়ে একজনকে বেলে, অন্যকে ডাকঘরের কাজ পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেদের বিয়ে থা হল, নাতিপুত্রির মুখ দেখার সৌভাগ্যও না হয়ে যায়নি। কিন্তু চাকরিতে ছেলেবা তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই তাঁকে চোখ বুজতে হলো। বাড়িটা ছোট্ট হলেও বংশমর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে চৌধুরী ওটাকেই “বড়বাড়ি” আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে মেয়েরা থাকতো বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে। পুরুষেরা গুলতানি করতো বাস্তার ধারের বৈঠকখানায়। নামকরণ গালভরা হলেও

বেকজুল বৈঠকীতেই দিন গুজরান হত তাদের। কাজেই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান সংসারের স্থান সংকুলানের জন্ত সদর দরজায় পর্দা খুলিয়ে বৈঠকখানাটাকেও অন্ধরের সামল করে নিতে হলো। বৈঠকখানা না থাকলেও ঠাঁট বজায় রাখার চাকর্য প্রয়াস।

বিয়ের পর স্থানান্তর আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল। হুতরাং সুবিধেমনত এদক ওদক ছাড়িয়ে না পড়ে আর উপায় রইলো না। চৌধুরী সাহেবের ছোট ছেলে ইলার্হাণ্ডের চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি মোটামুটি লেখাপড়া শিখে নিজেদের পছন্দসই কাজকর্ম জুটিয়ে নিলো। ছোট ছেলে পীরবক্স কিন্তু প্রাইমারীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলো না।

তাহলেও ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং শিগগিরই মা বক্সীর রূপায় বা আল্লার দোয়ায় অনেকগুলি বেঙ্গগীতে ঘর ভরে উঠলো। বংশমর্যদার উপযুক্ত উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হল। মর্যাদামাফিক কাজ যখন জুটলো না তখন অগত্যা একটি তেল কলের চাকরিতেই যোগ দিতে হলো। একাজের উপযুক্ত সে ছিল না তবু বংশমর্যদার তকমাটার জোর ছিল—মজুরীগিরির বদলে কলম পেয়ার কাজই জুটলো। মুন্সিগিরি। মাইনে মাসে বারো টাকা।

আয়ের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত একটা সঁাতসঁোতে বস্তিতেই তাকে ঘর নিতে হল; ভাড়া মাসে দুটাকা। আশে পাশে মুচি, মেপক, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরাঘাটা লোকেদের বাস। সামনেই বমজানী শোপানী। ভাঁটি খানার পোয়ায় জায়গাটা অন্ধকার করে থাকে। সোড়ার গন্ধে ঘরে টেকা দায়। গলিটার মুখেই জলের কল থেকে চুইয়ে পড়া জলধারা কাঁচা গলিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে বরাবর কালো হয়ে সর্বক্ষণ বয়ে যায়। তারই দুশাশ দিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠেছে পুরু হয়ে। রাজোর মশা বাড়ির ভগভগ আওয়াজ সর্বক্ষণ আলো বাতাসহীন গলিটার মিশকালো অন্ধকারকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

এই বস্তিতে পীরবক্সের মত লোকেরও লেখাপড়া জানা সমস্ত বাক্তি হিসাবে খ্যাতি ছিল। আর তার আদার অবজ্ঞা ছিল দরজায় ঝোলানো দামী পর্দাটা। বাড়ির ভেতরে যাই ঘটুক না কেন, শতে আলপী দেওয়া দামী পর্দা যেমনকার তেমনি কুলতো। বস্তির লোকদের কাছে পীরবক্স তাই ছিল চৌধুরী সাহেব বা মুন্সিজী। তার বাড়ির মেয়েরা ছিল অস্বর্ণশ্রী—কেউ কোনদিন তাদের বাড়ির বার হতে দেখেনি।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সময়ের গুণে দেউড়ির নড়বড়ে দরজাটা খসতে খসতে একদিন রাত্রে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে গেল। পীরবক্স নিজেরই সে রাত্রে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু শাণা রাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটলো—কি জানি যদি চোর আসে। কিন্তু চোর এলোনা। বাইরে অবস্থাপন্ন জানলেও চোরেব নৈবার মত কিছুই পীরবক্সের ঘরে ছিল না।

অবশ্য চোরেব চেয়ে পর্দার সমস্যাটাই ছিল বেশি। কারণ দরজা না থাকলে পর্দা টাঙানো ছাড়া অস্ত্র পণ নেই। কিন্তু পুরানো জীর্ণ পর্দাটা একদিন ঝড়ের রাত্রে এমন ফালা ফালা হয়ে গেল যে খাটাবার আর উপায় রইলো না। পাশা হয়ে ঘরের শেষ সখল দামী সওরকটাই টাঙিয়ে দিতে হল।

পাড়ার লোক দেখে বলল : চৌধুরী সাহেব এমন দামী জিনিস আজ কালের দিনে কেউ নষ্ট করে, সস্তা চাদর ঝুলিয়ে দিন না! পীরবক্সের জানা ছিল আট আনার কমে দুগুণ কাপড় পাওয়া শক্ত। হেসে বলে, তাতে আর হয়েছে কি? আমাদের বড় বাড়িতেও তো এই ধরণের পর্দাই বরাবর খাটানো হয়।

পনেরো বছরে পীরবক্সের মাইনে বার থেকে বেড়ে হল আঠেবো টাকা। কিন্তু আজ্ঞার রূপায় ছেলে মেয়ে মিলিয়ে সন্তান হল আদভজন। তার উপর পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা কেউ দায়িত্ব না নেওয়ায় মা তারই কাছে পড়ে রইলেন।

সংসারে বামেলা ঝগড়াট এবং অস্থির নিস্থির লেগেই থাকে। বাড়ির পাঁচজন মেয়েমানুষের কাপড় জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে গা থেকে খসে খসে পড়ে, পীরবক্সের নিজের পায়জামা আর পাঞ্জাবিও শালীনতা রক্ষা করে চলার অতুণ-যুক্ত। কিন্তু কোনক্রমেই কোন কিনারা সে করে উঠতে পারলো না। চারিদিকে অফুল পাথার। কারখানা থেকে মাত তারিখের আগে বেতন মিলবে না। এডভান্স মালিক দিতে নারাজ। জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকায় বার আনা সুদে ধার কখনও কখনও সে নিয়েছে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। এ অবস্থায় কাবুলীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথই বা কি! হুঁক ফেঁদে সে নিয়েছেও! কাজেই শেষ পর্যন্ত তারই কাছে ধর্ণা দিতে হল। মাসিক টাকায় চার আনা সুদে চার টাকা ধার নিলে। আট মাসে ঋণ পরিশোধ করার চুক্তি হল।

খাঁয়ের কিস্তি মেটাতে না পারলে তার অলশাস্তাবী পরিবর্তির কথা চিন্তা করে পীরবক্সের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাই সাতটা মাস মারি বাঁচি করে সে

কিন্তু শোধ করলে। কিন্তু জীবনের ভরা বর্ষায় গম'ত দুবেৰ কথা বাজিয়াও যখন টাকার ভিন শেষ হল তখন আর ধাব না করে পেরে উঠলো না। খাঁ সাহেবের হাতেপায়ে ধৰে, দেড়া হুদ দিতে রাজি হয়ে আরো একমাস সময় নিলো। কিন্তু ভাজিমাংসে অবস্থা আরো সড়িন হয়ে উঠলো। মাগসি ভাতা নিয়ে বিশ টাকা বেতনের মশো অগ্রিম নেওয়ার দরুন মাত্র চারটি টাকা তার হাতে এলো! এদিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার পথা পর্যন্তও জুটছে না; ছেলে মেসেগুলো সারা সপাহটা প্রায় টিপোস দিগেই কাটিয়েছে। কোনদিন দুচার পয়সার সস্তা খাবার নয়তো একবাটি করে বাজরা লেঙ্ক খেয়ে শুষ্টি শুঙ্ক কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট করে টাকা থেকে দেড় টাকা কেটে বাবর খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়া পীরবক্সের পক্ষে সম্ভব হল না।

কাজেই পীরবক্সের কাছে বাবর থা একটা মুক্তিমান আতঙ্ক হয়ে বইলো। ওর কথা মনে হলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।.....

‘চৌধুরী’! তড়িৎ স্পর্শের মত চমকে উঠলো পীরবক্স; শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল গলাটা। তাত পা শুলো এলিয়ে পড়লো। কিন্তু গলা চড়িয়ে চৌদ্ধ পুরুষের নাম ধবে যখন গালাগলি করতে করতে পদা ঠেলাঠেলি শুরু করলো বাবর থা নিজীবতা লভেও তখন বেড়িয়ে এসে সে তার যুগোমুখি দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য তার অভিজ্ঞ বক্তৃতা গরম হয়ে উঠে তখনই আবার শাস্ত হয়ে গেল! খাঁয়ের পা ধবে সেদিনকার মত মাপ চাইলো।

ক্রুদ্ধ বাবর থা তখন অগ্নিশর্মা। তার চিংকারে চৌধুরীর দরজার সামনে বস্তির যত মুচি আর মজুদের ভীড় জমে গেল উত্তেজিতভাবে লাঠি টুকে বাবর চিংকার করে বললে—টাকা দিতে পারবিনা তো কেন নিয়েছিলি বদমাস, তোরা মাইনের টাকা কি করেছিল? বদমস্, আমার পয়সা মারবিন...আজ তোরা চামড়া না ছাড়িয়ে নিয়েছি তো.....পয়সা নেই, আমার পদা, লবানী চাল মারিস! দে, তোরা বউয়ের গয়না গুলে দে, নিয়ে আর ঘরের বাসন যা আছে, নিয়ে আয়, আমি তাই নিয়ে যাবো। শুধু তাতে আজ কিছুতেই কিরবো না।

নিরুপায় এবং হতবুদ্ধি পীরবক্স দুর্ভাগ্য তুলে বাবর খাঁয়ের কল্যাণ কামনা করে বললো, ‘শপথ করছি, বিশ্বাস কর ঘরে একটা কানা কড়িও নেই, বাসনপয়, কাপড়চোপড় কিছু নেই। এর পরেও যদি কিছু চাপ আমার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করগে।

বাবর খাঁ জলে উঠলো। 'দেখে দে তোর শপথ, ওতে আমার কাজ নেই; আর তোর চামড়াই বা আমার কি কাজে লাগবে, ওতে তো জ্বলোও বানানো যাবে না? তোর চামড়ার চেয়ে এই পর্দাটারও ত দাম বেশি, বলতে বলতেই টাঙনো পর্দাটা বাবর খাঁ এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো।' দরজার সামনে থেকে পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর জীবনশিকড়ও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাটা গাছের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পর্দাহীন দরজার মধ্য দিয়ে তাকাবার মত মনোবল চৌধুরীর ছিল না। পর্দার এপাশে সংঘটিত ঘটনার উদ্বেজনা ও আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পর্দার অস্ত-রালে থাকা মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে জড়ো হয়ে বলির পাঠার মত খবখব করে কাঁপছিল। সহসা পর্দাটা হিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাম্পুষ্টের মত তারা এমন স কুঁচিত হয়ে উঠলো যে দরজার মুখে ভীড় করে দাঁড়ানো জনতার মনে হল তাদের পরনের শাড়ি কাপড়গুলো কে যেন অকস্মাৎ তাদের গা থেকে একটানে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে পর্দাটাই ছিল বাড়ির সমস্ত মেয়েদের আবর। পর্দা না থাকলে তারা প্রায় নিবস্ত্র ও উল্জ।

জটলা পাকিয়ে থাকা আশে পাশের মুচি, মেথর, ধোপা কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা ঘাটা লেখা পড়া না জানা লোকগুলো ঘুণা আর লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। হঠাৎ এই নয় চেহারাগুলো যেন বাবর খাঁয়ের কঠোরতায় পর্যস্ত চাবুক মারলো। বার্ষিকার মানির সঙ্গে সঙ্গে গুণু করে পর্দাটা উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটি দুর্বোধ্য শপথ উচ্চারণ করলো সে। তারপর নিরাস হয়ে ফিরে গেল।

আতঙ্কে চিংকার করে উঠে ভীড়ের সামনে থেকে আড়ালে মেয়েদের ছুটে পালাতে দেখে লজ্জা আর কেমন যেন এক অবাস্তব করুণায় জনতা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। চৌধুরী বেহুস হয়ে পড়েই রইলো। যেন ঘুমুচ্ছে, যখন হাঁস হল দেখলে পর্দাটা তারই সামনে উঠোনের উপর গুটিয়ে জড়পিণ্ডের মত রয়েছে। কিন্তু উঠে টাঙিয়ে দেবার মত উদ্যম তার শরীরে ছিল না। তার প্রয়োজনও আর ছিল না। যে ভূমি আভিজাত্যকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখে ছিল ঐ পর্দা, তার মৃত্যু ঘটেছে।

চারিদিকে সংগ্রাম

বাণিক রায়

সত্যব্রত খালসিটোলার শুঁড়িখানার বাইরে এসে দাঁড়ালো ; সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে, রুষ্টি পড়ছে সামান্য একটু একটু ঘাম দেখা দিয়েছে চোখেমুখে, চুলগুলি শাদা, চোখে চশমা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, চোখে মুখে দীর্ঘ, একটা দৃঢ়তা। একটা বিড়ি ধরালো দেশলাই জালিয়ে, দেশলাইটা পকেটে রাখলো, জামাটা খদ্দেরও, কিন্তু প্রচণ্ড মোটা, রুষ্টির ছু'একটা কোটা মাথায় এসে পড়ছে, বেশ লাগছে, যদিও একটু ঠাণ্ডাও আমেজ। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখে একটা বুড়ো গোছের লোক বসে ঝিমোচ্ছে, আর তার পাশে একটি মেয়েছেলে কয়েকটি বাচ্চাকে নিয়ে ছেঁড়া চটের ওপর বসে আছে ; বাচ্চাগুলি কুকুরের মতো চিৎকার করছে, আর মেয়েছেলেটা চিৎকার করে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। এ পাশে শুঁড়িখানার সিঁড়ির নীচে বুড়োটা ঝিমোচ্ছে, সত্যব্রতের মনে হলো হয়তো না খেতে পেয়ে ভিক্ষের আশায় ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বুড়োটা এমন করছে। সামনে নেমে এলো, মনে হলো একটা সিকি দেয়, তার পবেই মনে হলো না, পরশা দিয়ে এদের মুক্তি আনা যায় না—কিন্তু কি যেন কৌতুক বোধ হলো, কাছে এসে বললো : এই, ঝিমোচ্ছে কেন, বাপধন, একটু চোখ খোল, ঘুমিয়ে আর কতোকাল কাটাবে। একটু চোখ মেলে তাকাও, চাইবার হলে তাকিয়ে চাও, এতো চোখ বুজে থেকো না। বুড়ো বিড়িগড় করে কি বললো একবার চোখ খুলে আবার চোখ বন্ধ করলো, ঘাড়টা ঝুঁয়ে পড়লো ডান দিকে, দেয়ালে মাথাটা ঠক করে ঘা খেলো একবার, ও পাশে মেয়ে ছেলেটা তখনো চিৎকার করছে, বাচ্চাগুলো চেষ্টাচ্ছে জোর, একটু নত হয়ে সত্যব্রত বুড়োর কাছে ঝুঁকে পড়লো, না, তন্দ্রা ত নয় নেশা, নেশায় চোখ বুঁজে এসেছে ওর। শুঁড়িখানার কালীমার্কী কোনো রকমে খেয়েছে, হয়তো ভিক্ষে করা পরশা দিয়েই মদ কিনে খেয়েছে, বাইরের কোনো চিৎকার, জগৎ, ছবি ওকে বিভ্রান্ত করতে পারছে না। সত্যব্রত মনে মনে হাসলো, না, তার তেমন নেশা হয় না, সে মদ খেলেও চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারে, জগৎ তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায় না। সত্যব্রতের মনের কোণে একপ্রকার

যুগা আগলো, সারাজীবন সে এদের চোখ ঝুলতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি, বরং বুজ্ঞে এসেছে। কিন্তু সে নিজে ভাবিতো থাকলেও কি দেখতে পাচ্ছে। একটা কালো পর্দা চারিদিকে ঢেকে ফেলেছে, এবার জোরে বুষ্টি এলো, ভাবলো এই বুষ্টিতে চলে যাবে, কিন্তু পারলো না, আর একটা বিড়ি ধরালো, সেটাও শেষ হয়ে গেল, বুড়োটা ভিজছে, মেয়েছেলেটা বাচ্চাগুলোকে কুকুরের ছানার মতো, দুই বগলে হাতে নিয়ে স্তম্ভিখানার শেডের তলায় এলো। সত্যতঃ আবার ভেতরে গেল, একটা কোণের টেবিলে বসলো অন্ধকার জায়গাটা এখান থেকে ঘরের সব জায়গা দেখতে পাওয়া যায়, ঘণ্টা মাতালের চিংকার ভরে গেছে, মাগী, প্রেম, টাকা, জুয়া, দেহ। না, তার আর মাস থাবার ইচ্ছে হলো না। একটা মটিং ছিল কিন্তু এ বুষ্টিতে যাবে কি করে। ঘরের ছবিটা বাইরের ছবির সঙ্গে এক হয়ে গেল। বাইরে এসে তাকালো আবার, বুড়োটা একবারে শুয়ে পড়েছে, বুষ্টি একটু সরেছে এবার। তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো, কাদা গির্দাগদ করছে, পাঁচ পাঁচে রাস্তার চাপ সারা বুকে উঠে এলো, রাস্তায় হাঁটা যায় না এতো লোক, গায়ে গা ঘেঁসে যায়, কোনো রকমে ছোঁয়া বাঁচিয়ে মোড়ে এসে দাঁড়ালো সত্যতঃ। কিন্তু আবার আর এক দৃশ্য, এই দৃশ্য সে আজকাল রোজই দেখে। হ্যাঁ, এই মেয়েছেলেটিকেই তো, সে দেখেছে কালকেই এই পথে একটু দূরে। একটি সাতাশ আটাশ বছরের মেয়েছেলে, পরনে একটা স্ফাভা জড়ানো, বুক খোলা, একটু ফসা রং, খুলোর পলেক্তরা পড়েছে, হুটো স্তন এখনো নেতিয়ে পড়ে নি, স্নায়ুগুলোর জোরগুলোর জোর আছে, দুটি বাচ্চা দু'পাশে, আর একটি পেটের কাছে, মেয়েছেলেটা চোখ বুজ্ঞে আছে, মনে হচ্ছে মুছাঁয় ঘুমিয়ে আছে, বাচ্চা দুটোও স্তনের কাছে মুখ রেখে নীরবে নিঃশব্দে পড়ে আছে, কোনোটা এক বছরের কোনোটা তার ওপরে, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা দেখছে একবার, খামছে, তারপর হাঁটছে, কেউ পরশা দিচ্ছে, পরশা বেশ পড়েছে, প্রায় ডগডু ফুটপাথ বিকলের শাদায় চমকে উঠেছে যেন। কেউ পরশা তুলে নিচ্ছে না। কে জানে, সত্যতঃ ভাবলো, কখন মেয়েছেলেটা কপট নিদ্রা ভেঙে উঠে বসে, নতুবা যারা তাকে এইভাবে রেখে যায়, তাবাই হয়তো নিতে আসে; কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করেছে মেয়েছেলেটি, মড়ার মতো নিস্তেজ পড়ে থানে, জ্রঞ্জন নেই, বাচ্চাগুলিও তাই, হয়তো কোনো গৃহস্থ থাইয়ে রাখে, ভিক্ষে করবার অদ্ভুত কৌশল, তার পাশ দিয়ে কাম ক্রোধ লোভ বিলাস অভিজ্ঞাত্য-

গর্ব হেঁটে চলে যায়, কিন্তু তাকে নাড়াতে পারে না, বরং সকলের ওপর তার খোলা বুকের শক্ত ময়লা স্থান ছোটো বাচ্চা সমেত বড়ো হয়ে সারা চৌরঙ্গি পাড়ার আকাশে আলোর কুয়াশায় ছড়িয়ে পড়ে। ভিথিরিবড় এক নিজস্ব রীতি ও অভিজ্ঞতা আছে, বড়ো নেশায় বৃন্দ হয়ে চোখ বুজে আছে, আর এও চোখ বুজে আছে আর এক নেশার আদমতায়, নারীর বুকের গোপন মোহের নেশায় উদ্দামতায় হুমিয়ে আছে সে, কারণ হুম পাড়য়ে দেবে সকলকে। সত্যতঃ বেশিক্ষণ নাড়াতে পারলো না, ঘেমা হলো, কারণ তারও চোখ বুজে আসছে, নেশাটা কি উঠছে? না, তার নেশা তেমন চড়ে না, হলো তো ভালোই হতো। মিটিং করে কোনো ফল নেই, দায়িত্ববোধ শুদের বোঝানো যাবে না, হাসি পায়, যেন ওর নিজের দায়িত্ববোধ আছে, পাটকলের প্রমিকের কথা শুনেবে না, পাট হয়েছে কি হয় নি, তারা জানে না, তাদের বোনাস দিতে হবে শতকরা দু'ভাগ, কোম্পানি দিতে চাইছে না। বলছে লোকসান হয় নি, কিন্তু লাভ হচ্ছে না, সুতরাং শতকরা পাঁচভাগের বেশি কিছুতেই বোনাস দেবে না।

অনেকদিন কুম্ভার বাড়ি যাওয়া হয় নি, একদিন ঘুরে ঘুরতে তার বাড়িতে এলো সন্ধ্যা বেলা, তখনই মধ্য কথা হয় না, কিন্তু তবু সত্যতঃ পুরনো বন্ধুত্বের ভাগিদে আসে। কুম্ভার চূপ করে থাকে, কথা বলে কম, কথা বললে স্পষ্ট ও ফোট কথা বলে, আত্ম অক্ষরের ওপরে ঝোক দেয়, একদিন কুম্ভার জনগণের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিয়েছে, পথে পথে রাস্তায় রাস্তায় দিনরাত ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কবে কোনদিন সে ইনটেকেকটুরাল হয়ে গেল, জগতের সঙ্গে তার আর প্রত্যক্ষ যোগ নেই, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো অভিজ্ঞতা ঘটছে না, সংবেদনা নেই, অতীতের ঐতিহাসের পৃষ্ঠায় গৌরবের মুখ দেখে, এবং ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন করে, চা খেলো ওরা নীরবে, সত্যতঃ কথা শুনেতে চাইলো, বিশ্বজোড়া যুদ্ধাঙ্গীতির মধ্যে দেশের অবস্থা কি, জুঁকুঁকে বললো, ডুববে আর কি। সত্য আর কথা এগিয়ে নিতে পারলো। কিন্তু এর উদ্দেশ্যই সারা পৃথিবীতে পড়বে। সত্যতঃ বললো, কিন্তু আমাদের দেশের কি হবে। যুদ্ধ যুদ্ধ ঘোবালো মনে হলো এটী জঘন্য তুচ্ছ দেশের জন্তে কুম্ভার কোনো দায় নেই। এই সময় অ'রেকজন প্রবেশ করলো, চোখে মদিরতা, চুপে উদ্দামীন মুক্তি, পেস'কে বিমলতা। ঢুকেই বললো, এই যে কুম্ভার তোমার কাছে বাঘের গান শুনেতে এলুম। বাঘের সঙ্গে আমাদের

দেশজ সংস্কৃতির কেমন একটা মিল আছে। রাঁকুড়ার মাতৃষেবা যেন কথা বলে। সত্য ওদের দিকে একটু তাকালো। একটা সিগার ধরালো মুখে। কোনো কথা বললো না বিদায় নিয়ে পরে চলে এলো। আসবার সময় নতুন জুতালোক, কবি বললো, মিছিল কেমন চলছে, যুনিয়ন করেও তাহলে মাতৃষ বেঁচে থাকতে পারে।

কাপড়ের মিলে এলো দুপুরে সাতাত্ত একদিন। কয়েকজনকে চার্জশীট করেছে কোম্পানি, কিন্তু কোনো কারণ দেওয়া নি। মজদুররা ধর্মঘট করেছে। কোম্পানির বক্তব্য যারা ধর্মঘট করেছে, যাদের চার্জশীট করা হয়েছে, তারা মিলের ক্ষতি করেছে। ধর্মঘট আজ প্রায় পনেরো দিন হলো, কিন্তু সমাধানের কোনো লক্ষণ নেই। কর্তৃপক্ষ বলছে, মিল চলবে না এও ভালো, কিন্তু কোম্পানি এইসব মজদুরদের নেবে না। এমনকি প্রতিডেট ফাণ্ড ও একমাসের মাইনে দিতে রাজি কর্তৃপক্ষ। প্রমিকেরা লেবর কমিশনারের কাছে আবেদন করেছে, আজকে লেখা নেই মিটি। অক্সপেক্টর ট্রেড যুনিয়নের নেতারা ধর্মঘট বেআইনী বলছে। কিন্তু এরা মরিয়া। গাড়ি করেই সাতাত্ত পৌছল নিউ সেক্রেটারিয়েটে, অয়েন্ট লেবর কমিশনারের ঘরে মিটিং। সাতাত্ত বললো আপনি কি রিপোর্ট দেবেন। কমিশনার বললো, আমি যা শুনেছি, দেখেছি, তার ওপরই যা বলবার বলবো। আর ধর্মঘট তো পুরো হচ্ছে না। সাতাত্ত বললো, কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই ধর্মঘট হচ্ছে না এ কথা বলা যায় না। নিয়মের ব্যতিক্রমই বলে নিয়ম আছে। কমিশনার বললো; আপনাদের পক্ষে তো কোনো ভোরদার প্রমাণ নেই। বেটেখাটো জুতালোক, হাসিখুশি, সপ্রতিভ, আইনের প্যাচ জানে এবং ধারণা গোথো। হেসে হেসেই কথা হচ্ছিল, আরো কিছু কথা হলো, কিন্তু তার মত পার্ট্যানো যাবে বলে মনে হলো না। শেষ চেষ্টা করলো সাতাত্ত, বললো, দেখবেন যারা ধর্মঘট করেছে তারা যেন ভিকটিমাইজড না হয়। অক্সপেক্টর নেতা বললো কোম্পানি এই ক্ষতি সহ্যবে কেন? সাতাত্ত একবার কোনো উত্তর দিলো না। সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বাইরে তখন অন্ধকার পড়বে পড়বে করেছে, আকাশের নিচে পাখিরা চোঁচাচ্ছে জোরে। গাছে বসতে পাচ্ছে না, গাড়ি করে না গিয়ে আপন মনে গজার ধারে পাথচাঁরি করলো, ইডেনের দার দিয়ে এগোতে লাগলো, পাশেই কতকগুলো মেঘ কালো মোটা চেহারা, লাজ নাড়াচ্ছে, একটা মাটির কিছুটা অংশ কাদা

করে দিয়েছে, জল প্যাচ প্যাচ করছে চারিদিকে, ল্যাজের কাপটে কাঁদা উঠছে, ঘোষণা চোখ বুজে আছে, কিন্তু মুখে চিবোচ্ছে অনবরত, উঠবার শক্তি নেই, চলবার ক্ষমতা নেই একেবারে ।

বুধতে বুধতে অনিমাদেব বাড়ি এলো সে তাদেবই পাটির মেয়ে, বয়েস প্রায় চল্লিশেরই কাছাকাছি, দেহে যৌবনের আভা এখনো মেলার নি, মাঝে মাঝে সত্যত এদেব বাড়ি থাকে, অনিমা একটা মেয়ে ফুলে পড়ায় ওর আরো ভাই বোন আছে সঙ্গে, বিয়ে করেনি, সত্যত আসতেই অনিমা বললো, কি ব্যাপার, এই অসময়ে? সত্যত হাসলো, দশটা টাকা দিয়ে বললো, কিছু আনো, খিদে পেয়েছে । অনিমা বললো মনে হচ্ছে ব্যবসায় ছেবে গেছো । সত্য বললো, না, চাচা জেতার কোনো প্রস্ন নেই, সব সমস্তা মেটানো যায় না । অনিমা বললো, তোমার বেশ প্রতিপাক্ত আছে । অথচ কোনো কাজ করতে হয় না । সত্যত বললো, জীবননাশেরও প্রস্ন আছে চাচা জেতার । অনিমা বললো, তাতেই তো জীবনের চরম আনন্দ, বোম্বাস । চেসে বললো সত্যত, সেই বোম্বাসের জন্তেই তো তোমার কাছে আসি । রাত্রি তখন গভীর হয়ে এসেছে গাছের নীচে পাতার বৃক্কের আদমতাব মতো । সত্যত সেদিন বাড়ি ফেরে নি ।

সত্যতের মেয়ে ঈশ্বলে যাবার আগে বললো, তোমাকে কিন্তু ড্যাডি রাজি হতেই হবে, আমাদের সিস্টার তোমার কথা বলে দিয়েছি । মিটিংএ তোমাকে আসতেই হবে, ফাদারও বলে দিয়েছে । সত্যত কোনো কথা বললো না, সত্যতের স্ত্রী মলি বললো, কেন, তুমি কথা বলছো না কেন । মেয়ের একটা প্রেস্টিজ আছে । ওরা এতো করে বলে দিয়েছে । মেয়েকে লগেটোতে পড়াতে পারো অথচ তাদেব ফুলে যেতে তোমায় এতো সঙ্কেচ ! গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে না, আজকে আমি নিউ মার্কেটে মার্কেটিং করতে বেরবো একটু । বব্ করা চুলে গন্ধের ডেট তুলে মলি ঘরে চলে গেল । বাগ কাঁধে ফুলিয়ে সত্যত বাইরে বেরিয়ে এলো, ব্র্যাণার্ন রোডে ভিলা আপিলে একবার ঘেতে হবে, পেনে তাকে বাইরে যেতে হবে পরের মাসে । আরো কয়েকজন যাচ্ছে তার সঙ্গে ।

কাজ শেষে বেরিয়ে আসতেই অস্তু এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, বললো, কি হে সত্য ফুনিয়ন কেমন চলছে, সত্য কোনো কথা বললো না ; বন্ধুটি বললো, চলো, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু ভিজিয়ে নিট । সত্যত কোনো

কথা বললো না। বন্ধুটি আপন মনে বলে চললো, এ দেশে কিছু হবে না, কিছু বোঝেই না, মিছিল করলে হাঙ্গামে, লাইনে দাঁড়াতে বললে পালিয়ে যায়, স্বেচ্ছা গান দিতে বললে বলে গলা বাধা করেছে, মিছিল করবার জন্তুও পয়সা দিতে চায়, সব কাজ যেন ওদের হয়ে আমাকেই করে দিতে হবে, শুধু ফলটি টুপ করে থাকবে। সত্যতঃ কোনো কথা বললো না, হাসলো শুধু, বললো আমার অল্প কাজ আছে, চল। অল্প ট্রেড যুনিয়নের নেতা বন্ধুটি, কিস্তি মজুরদের মধ্যে সংশয় দূরীকরণ দিতে পারে ওর সঙ্গে মিশলে, তাই সত্যতঃ এড়িয়ে গেল।

ডালহৌসি দিয়ে হাটতে শুরু করলো, পাটি আপিসে যেতে হবে, এই সময় একটা গাড়ি ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, গাড়ির দিকে বিস্মিত হতে চোখ তুলে থাকতেই দেখলো জুট মিলের ম্যানেজার, হেসে মুগ্ধ বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বললো, আসুন। আপনাকে নিয়েছি। সত্যতঃ প্রথমে না না করলো, পরে পীড়াপীড়িতে উঠতে বাধ্য হলো গাড়ি এসে থামলো গ্রাণ্ডের কাছে, ম্যানেজার একরকম জোর করে তাকে হোটেলের ভেতর নিয়ে এলো, সত্যতঃ কোনো কথা বলতে পারলো না। শুধু বলতে চেষ্টা করলো এ আমার ঘাড়ে নয় না। আর আমার কাজ আছে। ম্যানেজার বললো, কাজ তো আছেই। আপনি যে দশ পাসেট বে'নাসের কথা বলেছেন, তাতেই শেষ পর্যন্ত সকলে রাজি হয়েছে, মালিক চায় কি, পরে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বেশ ভারি সোঝাই করেছে ওরা লাফ খেল ছুটেনে, সঙ্গে হটাক। নাচের ব্যবস্থা ছিল তবে ইচ্ছে হলো না, ভিডিথানায় কান্ডগানি, এখানে উল্লাস মদে। খেয়ে বেকতেই কুকুরের মতো ভিথিররা ভিক্ষের জন্তু ঘিরে দাঁড়ালো, সত্যতঃ খেঁচা হলো, মনে হলো বমি উগড়ে আনবে; এতো দামী খাবারের পর মংলাজমা বস্তার মতো গন্ধ-ওঠা ভিথিরদের চেহারা বড়ো বিসঙ্গ। তাড়াতাড়ি বুঝা গাড়িতে উঠলো, গাড়ি চলতে শুরু করলো, স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়েই অ্যুটার্চি স্থললো, ম্যানেজার বললো, কোম্পানির তরফ থেকে আপনাকে সামান্য উপহার দিচ্ছি, একটা প্যাকেট এঁগিয়ে দিলো সত্যতঃ দিকে। গাড়িটা সমতলা রোড দিয়ে এগোচ্ছে, একটা মস্ত গির্জা, পরিষ্কার, ঝকঝকে, বৃষ্টির পবে জলে ধোওয়া দেওয়ান পবিত্র হয়ে উঠেছে, ক্রস্টা অপূর্ব শোভা পাচ্ছে শাদা মেঘের নিচে। চত্বর বারান্দা নিজন ভায় ভরা, গাছের ছায়ায় নীরব, বাইরে ফুটপাথে ভিথিররা

যাঙ্গা করছে, মলমুত্র ত্যাগ করছে ওদের বাচ্চারা, কেউ ফ্র্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে, যেতে যেতে ছুর্গছে ওরা কুমাল চাপা দিলো। যিন্তর ক্রশ ওপরে ভালছে ওদের মাথার।

মৃত্যো কলে পা দিতেই মজুরেরা চিংকার করতে লাগলো, তাদের কথার মধ্য দিয়ে কি কথা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, আর একটু এগোল, দেখলো একটি লোক চিংকার করে বলছে, ভাড়াটে গুণ্ডার মতো ট্রেড যুনিয়নের ভাড়াটে প্রেসিডেন্ট আমরা চাইনা। আমাদের সমস্ত আমরা বুঝবো। সত্যত্ব হাসলো, এই চেতনা এলে তো ভালোই, কিন্তু তারপর রাগ হলো। এদের জন্তে সব করছে অথচ ওরা সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু সব ব্যাপারে মাথা কি ঢোকাতে পারবে ওরা, বুদ্ধি কতটুকু, আর চাকরি করবে, না—ট্রেড যুনিয়ন করবে, মালিক ছাড়বে কেন, তবু আনন্দ হলো, কিন্তু ভয়ও হলো, ঘোষের ছবি মনে ভেসে এলো তৎক্ষণাৎ। সত্যত্বকে দেখতে পেয়ে ওর পার্টির লোকেরা এগিয়ে এলো, একজন হাত নেড়ে বললো, কমরেড, সামনের সপাহেই আমাদের ধর্মঘট, কিন্তু কোনো আয়োজন নেই। কর্তৃপক্ষ বলেছে আমরা যা মজুরি চাই, তা কখনোই দিতে পারবে না। সত্যত্ব বললো বেশতো। মিছিলের ব্যবস্থা করেছেন? লোকটি বললো, করেছি। সত্যত্ব জিজ্ঞেস করলো, অনুপক্ষের রি-অ্যাকশন্ কি? লোকটি উত্তর দিলো, ওরাও মজুরি বাড়াতে চায়; তবে ধর্মঘট করে নয়, টেবিলে বসে। সত্যত্ব বললো, কর্তৃপক্ষ তো রাজি নয় বাড়াতে, তবে টেবিলে বসবে কি করে? উৎপাদনের সব হিসেব পর, আর ব্যয়ের সব খাতাপত্র ঠিক রেখেছেন? লোকটি জানালো, সব ঠিক আছে। সত্যত্ব বললো, ধর্মঘট ও মিছিল একই সঙ্গে বায় করতে হবে। লোকটি বললো, দরকার হলে আমরা হাজার ষ্ট্রাইক করবো। মজুরি না বাড়ালে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। খেটে যদি খাশার পরশা না জেগে, তাহলে পাটবার কোনো মানে হয় না। সত্যত্ব বললো, বেশ তো। ওদের সকলের সঙ্গেই কথা বললো সে, সকলেই ধর্মঘটে উৎসাহী কিন্তু সে জানে ধর্মঘট হলে সকলেই তাকে গালাগাল দেবে। মিছিল বায় করলে হয়তো সকলে আসবে, রাস্তায় সকলে বেকবে না, বেকলেণ্ড লাটনে ঠিক থাকবে না এবং চরম ঔদাসীন্নে রাজ্জা হাটসে, জল খাবে, পান চিবাবে গলা দিয়ে স্বর বেকবে না। না, তবু আন্দোলন করতে চলে এগুলি চাই, সন্ন্যাসী হতে গেলে যেমন ভেঁক চাই, তা না হলে শিনাদের মন ভালানো

যায় না। মুশকিল হচ্ছে কোনো কোম্পানিতেই একটি কোনো ট্রেড যুনিয়ন নেই, তিন চারটি, এমন কি পাঁচটি পর্যন্ত। সকলেরই দাবি মাইনে বাড়ানো কিন্তু রোগান আলাদা, পথ ভিন্ন, এবং বিরোধিতা না করলে দলের স্বার্থ থাকে না। সত্যতঃ চেষ্টা করলো অল্প ট্রেড যুনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে; একজন ছাড়া কাউকে পেল না। চায়ের দোকানে ঢুকে সত্যতঃ বললো, আমাদের দাবি যখন, আসুন আমরা যুক্ত ইস্তাহার দিই। অল্প নেতা বললো, আমি এখুনি বলতে পারছি না। অল্প সকলের সঙ্গে কথা বলি। এবং আরো একজন আছে, তার কি মত আমাদের জানতে হবে। সত্যতঃ বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু অল্প নেতা রাজি হলো না বুঝতে। বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ স্তন্য পেলে, তাদের সত্যতঃ মাইনি শাশা ছাচড়া। বোনাসের ব্যাপারটা মাইনি কেমন ধরিয়ে দিয়েছে। অল্প একটি লোক বললো, মারবো পৌঁছে এক লাখ, কোন অবস্থায় কি করেছে জানিস? সব লে অফ করলে ভালো হতো, না। অল্পপক্ষের নেতা বললো সত্যতঃকে, কেসটা ট্রাইবুনালে উঠুক, তারপর দেখা যাবে আমরা কি করতে পারি। সত্যতঃ বেরিয়ে এসে আরো লোকের সঙ্গে কথা বললো, যুনিয়নের কাণ্ডের খোঁজ নিল, কাজ কেমন এগোচ্ছে তা জানতে চেষ্টা করলো।

বিকলে একটা পার্টির মিটিং ছিল, সামনে ইলেকশন, কি পথ নিতে হবে, তারি জন্তে পলিসি তৈরি, ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, না করবে না, গণতন্ত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা মানায় না, এবং ওপরে উঠতে গেলে এ একটা সিঁড়ি, একে বাতিল করা যায় না কিছুতেই। পার্টির ইচ্ছে সত্যতঃ কন্টেই কয়ে, সত্যতঃও তাই চায়। কিছু লোক বলছিল মফস্বল থেকে দাঁড়াতে, না, সে কখনোই হতে পারে না, শহরের মজুরেরা কালাস ঠিকই, কিন্তু কেত মজুরেরা যুনিয়নে আছে একবারে, ধাক্কা দিলেও ওঠে না, আর শহর থেকে এই চেতনা নিয়ে যেতে হবে, তাদের ধাক্কা দিয়ে আগাতে হবে ধীরে ধীরে, মাঠের আলের পথ দিয়ে পাকা সড়কে গাড়ি চললেই মনের গাড়ি চলবে; কিন্তু শহরের কয়েক লক্ষ মজুর নিয়ে দেশের কাজ হয় না, কে বলে হয় না, সে একা যদি পাঁচ হাজার লোককে চালাতে পারে, তাহলে এই নীতিতেই চলবে, আর তার পক্ষে গ্রামে যাওয়া সম্ভব নয়, এ জীবনের মোহের পাকে পাকে বাধা পড়ে আছে সে, কিন্তু শহরের ভোটে কি দাঁড়ানো যাবে, তাদের কি এমন কাণ আছে যা দিয়ে তাকে তাদের দলকে দাঁড় করাতে

পারে ? কি জানি, সভাসভার মনে হলো সে বস্তু দেখছে, বস্তুর ঘটনা ঘটছে
 তার মনে, আসল বস্তু দেখছে না : সেকেন্ড ক্লাস ট্রায়ে উঠে বসেছে সে,
 একটা মজুরের বাচ্চা একটা খেলনা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে জোরে; স্বর্ণমান
 টিনের চারপাশে একটা ছোট্ট ছেঁড়া কাগজ ঘোরাও বেগে ঘুরছে বেগে, কখনোই
 পড়ছে না : সভাসভা দেখছিল, দেখে মুখ ফুরিয়ে নিলো, সেকেন্ড ক্লাসে
 ভিড় বেশি, হিন্দুস্তানি বাঙালি ওড়িশার লোক, ঘেঁষাঘেঁষ করে দাঁড়িয়ে,
 ঘামের গন্ধ, পান চিবোচ্ছে, কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ গৈনি দাঁত ও ঠোঁটের
 ফাঁকে রেখে জানালা দিয়ে পিচ ফেলছে, ঘন ঘন, কেউ মন গোয়েছে চুর হয়ে
 আছে নেশায়। গাড়িটা চলছে ময়দানের পাশ দিয়ে; সবুজ ঘাসগুলির মাথা
 পিষে পিষে যাচ্ছে সোজা, লক্ষ হচ্ছে, বিজ্ঞান চমকচ্ছে সহসা, মাথার ওপরে
 ফ্রেন কাঁপছে, ছিঁড়ে যেতেও পারে, না, তবু যাবে না, ওপরে তার ধরে নীচে
 ইম্পাতের লাইন ধরে এগেবে, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবে। সভাসভা ভালোই
 আছে, দেহের ক্ষণ তাকে পেয়ে বসে, ক্ষণ সর্বত্র, মজুরদের দেহের ক্ষণ ও
 চাহিদা বাড়িয়েই ও জিইয়ে বেথেই সে বেঁচে আছে, ওদের চাহিদার সঙ্গে,
 দাবির সঙ্গে সভাসভার চাহিদা এক হয়ে গেছে, সেই বাঁধা লাটনেই এগোচ্ছে,
 এই চাইবার ক্যাপিটালকে জীইয়ে রাখতেই তার কৌশল, যে মুহূর্তে কর্তব্যের
 কথা বলবে, সে মুহূর্তে তার জায়গায় অন্যকে প্রেসিডেন্ট করবে; মালিকের
 পক্ষের লোককে তারা নেতা করতে পারে না, দাবিটাকে টাটার বাড়ির মাথার
 চাপিয়ে এগোতে হবে, ওই বিজ্ঞাপনের ছবিটার মতো, কুড়িতলার বাড়ির
 ছাদে পা ঝুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে এক সুবক আকাশ মাথায় করে উন্নত মস্তকে
 বসে আছে কুড়িতলা বাড়ি ছাড়িয়ে সে উঠছে পোষাকের জোরে, এই
 পোশাকটা চাই, পোশাকের জন্মেই লড়াই এখানে, সভাসভা জানে, সে উপাধান
 করেছে না, তার মূলধন নেই, প্রমত্ত দিচ্ছে না, তবু চাহিদা ও দাবিকে চাপিয়ে
 বেথেই তার জীবনের চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলছে। জীবনটা যখন দাঁড়িয়ে
 আছে শুল্ক, মাঝখানে, আকাশ ও মাটির মাঝখানে, সেখানে কৌশলকে আঁক/ড
 ধরতেই হয় বেশি করে। এই কৌশলের ওপর তার কয়েট বিরাট গর্জন
 করে পৃথিবীর ভেজী পেটল পুড়িয়ে উপাধান শেষ করে নিখান উড়ে চলে।
 সভাসভার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় একদিন প্রমিতকা জেগে উঠলে তার মতো
 ট্রেড যুনিয়নের নেতাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু ট্রায়েও লোকদের
 দেখলে কি মনে হয়, গন্ধের নেশায়, মদের নেশায় অবশেষে ঘুম জড়িয়ে আছে।

না, বড় ক্লান্তি লাগছে। সামনেই একটা বন্ধুর দোকান দেখে নেমে পড়লো সে। ট্রামে সেই বাচ্চাটা তখনো খেলনাটারি খোঁজাচ্ছে বোঁ বোঁ করে। অসংলগ্ন কাগজটা বেগে তারি সঙ্গে ধরছে, পড়ছে না। বাস্তব নেমে হাঁটতে লাগলো। লাইন ও তার ধরে ট্রামটা একে বেকে ট্রিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সত্যজিৎ‌র মনে হলো, তার বড়ো ঘুম পাচ্ছে, চোখ জড়িয়ে আসছে, একটু বিশ্রাম চাই।

বৃষ্টিতে একদিন/ দিনোশচন্দ্র লাহিড়ী

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় পৌঁছবার আগেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ক'দিন থেকেই বা ঝুমট গরম চলছিল তাতে কোন কিছুটা সুস্থিরভাবে করা যাক্ছিল না। সর্বদাই অস্থিতি আর ক্লান্তি। ক্লান্তি আর ঘুম ঘুম ভাব। সুতরাং অস্থিতি সৃষ্টি করলেও আপাততঃ এই বৃষ্টিকে মনে মনে স্বাগত জানাল অঞ্জন। — বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি পড়তেই 'কোথায় দাঁড়ানো যার' এ কথা ভাববার কোন রকম সুযোগ না পেয়ে একটু ছুটে ডানদিকের একটা দোকানের বারান্দায় এসে আশ্রয় নিল সে। সেখানে আগে থেকেই বেশ ক'জন দাঁড়িয়ে। দোকানের ভেতরেও কয়েকটি সুবকের জমজমাট আড্ডা।

আনমনে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে পকেট থেকে কামাল বের করে চোখ মুখ ঘাড় ও হাত মুছল অঞ্জন। তারপর ভাবল, বহুদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। বৃষ্টির জলে স্নান করা হয়নি। এখন এট জলে একদম জবজবে ভিজি বাড়ি ফিরলে কেমন হয়! গায়ের সঙ্গে জামা প্যান্ট গেল্লি কেমন লেপটে থাকবে। গা শিরশির করবে, ছু'একটা হাঁচি পড়বে কিন্তু শরীর জুড়াবে।

মুখল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যেই ড্রেন উপচিয়ে বাস্তব জল দাঁড়াতে শুরু করেছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন। দূরের গাছ-পালা ঘর-বাড়ি গাড়ি-মাল্লস সবই ঝাপসা। অনেকটা বাস-রিলীফ ফটোর মত। বাস্তব ওপাশে এক সারি টিনের ডালা। নানা ধরনের দোকান। প্রতিটি দোকানেই ছু'পাঁচজন করে আটকা-পড়া মাল্লস। বৃষ্টির ছাঁট থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে কি?

অল্পন ডাকিয়ে দেখল তার পায়েৰ দিকটা অনেকখানি ভিলে গেছে । চশমাৰ কাঁচ ছুঁচৌৰ ক্ৰমেই জল-কণা জমছে । এবং একটা লোক গ্ৰাৱ তার গায়ে গা পেঁটে দাঁড়িয়ে আছে ।

একপাশে সৰে দাঁড়াবাব চেটা কবল সে । যে সে লোক গায়ে গা ঘেঁসে দাঁড়াবে এটা কোনকালেই তার পছন্দ নয় । সে বয়হাস্তত করে না । সেই ছোটবেলা থেকেই এ ধৰণেৰ খুঁভুঁতোনি তার । এবং এজন্তেই পাৰতপক্ষে সে বাসে চড়ে না । ভীড় এড়িয়ে চলে । লাইনে দাঁড়িয়ে কোন কিছু করতে হলেই মেজাজ বিগড়ে যায় । বাজাৰে যাবাব কথা সুনলেই ঘা ঘিনঘিন করে ।

পৰিকাৰ ছিপ-ছাপ স্বতন্ত্ৰ থাকতেই ভালবাসে অল্পন । এটা নিতান্তই অভ্যাগ কিংবা কচিৰ ব্যাপাৰ । কিন্তু সব সময়েই নিজের কচি বা ইচ্ছাকৃত্যায়ী সব কিছু ঘটে না । হয় না । আৰ তখনই মনোব মধ্যে একটা ছোট অস্বস্তিৰ কাঁটা বিধে থাকে । যেমন সেবাৰ নৈনিভাল যাবাব সময় কাঠ গুলামে ট্যান্ডিতে ট্রেনেৰ সহযাত্রী সেই স্মাট চেহাৰাৰ ভদ্রলোককে নেওয়া হয়েছিল । অল্পনেৰ ইচ্ছে ছিল সে আৰ বাধা শুধু ছুঁজনে মিলেই ট্যান্ডিতে যায় । কিন্তু বাধা আপত্তি করেছিল । —অনেক ভাড়া লাগবে ।

—তা লাগুক । কিন্তু পাহাড় প্রকৃতি আকাশকে তো সম্পূর্ণ উপভোগ করতে করতে যাওয়া যাবে !

—এখনও এসব ভাল লাগে ?

—কেন লাগবে না স্তনি ? দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে বলে ? না কি অস্ত কিছু ? তুমি তো জান আমি নির্জনতা পছন্দ করি । হৈ হট্টগোল ভাল লাগে না বলেই অত খরচ করে আমি নদীৰ ধায়ে ফাঁকাৰ ওপরে বাড়ি বানিয়েছি । গাড়ি কিনব বলে কোম্পানিৰ কাছে লোন চেয়েছি ।

—ভাল কথা, কিন্তু ও ভদ্রলোককে ট্যান্ডিতে নিতে তোমাৰ এত আপত্তি কিসেৰ ?

—ঐ তো বললাম ।

—গত চক্ৰিশ ঘণ্টাৰ ওপৰ ট্রেনে পাশাপাশি স্ত্রীপাৰে আজ্ঞা মেৰে কাটালে, তাতে অস্ববিধা হল না ?

—সেটা ট্রেন তো

—বাঃ স্বন্দৰ বৃত্তি । আসলে বল তোমাৰ নেচাৰটাই—

—আনলোকাল, কতকটা তাই বটে। তা ভেঁয়ার যদি ভত্ৰলোককে
খুব পছন্দ হয়েই থাকে—

—আহা, এটা আমার কোন ব্যাপারই নয়।

অজ্ঞানই ভত্ৰলোককে ট্যাক্সিতে পাশে বসিয়েছিল। প্রথমে দু'একটি কথাও
বলেছিল। কিন্তু তারপরেই চুপ। কেন—তা সে নিজেও জানে না। যেন
চোখে বাল পড়ায় সাধা বাস্তব পাহাড় কবুগা নদী গাছ দেখতেও তার অসুবিধা
হয়েছিল।

সহযাত্রী সেই ভত্ৰলোকের মুখটাকে মনে কবুবার চেঁচা করল অজ্ঞান।
কিন্তু পারল না।

আনলা-দরজা বন্ধ করে হর্ণ দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি ফ্রুত বাস্তব
জল কেটে বেরিয়ে গেল। সে শব্দে সচকিত হয়ে অজ্ঞান দেখল এই বাস্তব য
লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সামনের দিক থেকে খুবই বৃষ্টির ছাঁট আসছে।
সুতরাং এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া আর উপায় কি?

বাস্তব জল ঠৈ ঠৈ। নোংরা আবর্জনা ভেসে যাচ্ছে। সামনের দোকান-
গুলোর নিচে গুটি-সুটি লোকগুলো দাঁড়িয়ে। কারো মুখ পরিস্কার দেখা
যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দু'চারটি কথাবার্তা ভেসে আসছে। ঐ চালাটার
পাশে বড় গাছটার ডালে দু'টো কাক চুপচাপ বসে ভিজছে আর কখনও-
সখনও এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। টেলিফোনের তারে অজস্র জলের ফোঁটা
ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে যাচ্ছে। একটা কুকুরকে ধাওয়া করে দু'টো স্ত্রী-টো
ছেলে হি-হি করে হাসতে হাসতে ছুটে গেল। এক ভত্ৰলোক নর্যাসি চাপিয়ে
টুপিতে চোখ ঢেকে সাইকেলে চড়ে চিংকার করে কি বলতে বলতে যেন
দূরে মিলিয়ে গেল। —এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে একটা সিগারেট বের
করে ঠোঁটে চেপে ধরাবার চেষ্টা করল অজ্ঞান। পারল না। দেশলাইটা কেন
সাঁত্যসেঁতে। কাঠি মাঝেই বাকদ খসে যাচ্ছে। তাহলে কি করা যায়?
কায় কাছে আগুন পাওয়া যায়?

এতক্ষণ পরে এই বাস্তবের নিচে প্রতিটি মানুষের দিকে সোজা-সুজি
তাকাল অজ্ঞান। —নাহ্, ভত্ৰলোক বলতে যা বোঝায় তা প্রায় নেই বললেই
চলে। দু'একজন হতে পারে। বাদ-বাকি সবই মনে হচ্ছে পথ-চলতি
বাজারে মানুষ। দোকানের ভেতরের যুবক কয়টি কিন্তু রীতিমত খোদুহস্ত
এবং শিক্ষিত।

অজ্ঞান প্রতিটি মুখকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। প্রথমে দোকানের ভেতরে। একটা রাবণজুলপি, ঝোলাগোঁপ, বাদশা-বাদশাবাড়ি ও ছাগল-দাড়ি গল্পে মত্ত

রাবণজুলপি বলছে,—গন্ধার দেখগাম, দাকণ। একেবারে হলিউডি কায়দা।

ঝোলাগোঁপ,—মোহনবাগানের পাঁচগোল খাওয়াও একমাত্র কারণ প্রেমাররা খেলতে নামার আগে হরলিকস খেতে ভুলে গেছে।

বাদশাবাড়ি,—শরৎ চাটুজ্জ্ঞ অনেক হিন্দী ফিল্মের কাহিনী লিখেছে কিন্তু। খুশবুটাও চাটুজ্জ্ঞ মশাইএর লেখা।

ছাগলদাড়ি, রেখে দে তোর খুশবু, হেমামালিনীর বেডরুমের দাম কত জানিস ?

ঝোলাগোঁপ,—পুরনো খবর আর কণচাপ না।

রাবণজুলপি,—তার চাইতে বল দেখি কিশোরকুমারের চারনখর বউ কে ?

বাদশাবাড়ি,—এটা একটা কোশ্চেন বটে !

ওরা সবাই হাসতে লাগল।

ওদের হাসিতে অজ্ঞান মনে মনে রেগে গেল ! ছেলে ক'টি অভিজ্ঞ বটে। কি আক্কেল ওদের। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর ওরা আজড়া মাংছে। ভেতরে একবার বসতেও বলছে না। আমি হয়ত বসতাম না। কিন্তু ওরা তো বলতে পারত ! ল্যাক অফ কালচার। কতকণ থেকে একটা ভক্তলোক দাঁড়িয়ে আর সৈদিকে ওদের কোন ক্রম্পট নেই ! এসব ছেলেদের কিম্বা হবে না। আজড়া যেরেই জীবন কাটবে। না - লিগারেট ধরবার জন্তে ওদের কারো কাছে আগুন চাওয়া চলবে না।

এবারে বারান্দার লোক ক'টিকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল অজ্ঞান। সামনে দু'টো লোক ঝোলা হাতে দাঁড়িয়ে সুযোগ খুঁজছে—বুড়িটা কমলে একটু ফুরসৎ পেলেই তারা পালাবে। মাঝে মাঝে চাপা স্বরে কথা বলছে। ওদের দু'জনের কাছে কি আগুন আছে ? দেশলাই কি পাওয়া যাবে ? কিন্তু চেহারা দেখেই যে দেশলাই চাইতে ইচ্ছে করছে না। তার পাশে একটা চখরা বখরা তাওয়াই শাট গায়ে দেওয়া তরুণ গুণগুণ করে গান গাইছে,—
খুশখুশ প্যার করোগা হাম দোনো।.....

এ—এপাশের লোকটা একদম গায়ের ওপর এসে পড়েছে। কে বাণ্

তুমি ? একটু সরে দাঁড়াও না কেন ? তোমার পিঠে যে বকর দাগড়া-
দাড়া দাগ দেখছি তাতে তোমার যে কোন নিষিদ্ধ রোগ নেই সে কথাটা
বলবে কে ? তোমার কাছে আগুন থাকলেও তো নেব না ।

অঞ্জন আবার কাঠি জালবার চেষ্টা করল । কিন্তু পারল না । মাথা
ঘুরিয়ে আবার সবার দিকে তাকাল । দেয়াল সঁটে একটা লোক চোখ বুঁজে
একমনে বিড়ি টানছে । ওর কাছ থেকে আগুনটা নিলে কেমন হয় ? —নাহ্,
বিড়ি থেকে সিগারেট ধরানো ঠিক নয় । যদি কেউ দেখে ফেলে ! তখন ?
যাধা যদি এখন এখানে থাকত এবং এ দৃষ্ট দেখত তাহলে নিশ্চয়ই ও মুখ
টিপে হাসত । কি-বা হয়ত বলত—দেখে করুণা হচ্ছে ।

—আহ্ ধাকা দিচ্ছেন কেন মশাই ?

—বুড়ির ছাট আসছে যে !

—তা বলে আমাকে ছেঁটে দেবেন নাকি ?

—এবারে পূজা আর ঈদ একই সঙ্গে ।

—লোহার দাম অনেক কম । একশ' আলি টাকা কুইটাল ।

—খুন্সম খুন্সম প্যার করেগা হাম দোনো.....

আবার সব চূপ-চাপ । অঞ্জন ডান দিকে একটু সরে দাঁড়াল । কি
বোটকা গন্ধ বে বাবা । এ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব ভুল হয়েছে । ভ্রাষ্টি ।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অঞ্জন । একটা হাই তুলে ভাবল—
আজ ক্লাবে বিলিয়ার্ডের আসর মোটেই জমবে না ।

হঠাৎ বুড়িটা একটু ধরে এল ।

আর কয়েকজন সেই সুযোগে রাস্তায় নেমে পড়ল ।

অঞ্জন ইতস্ততঃ করল । কেননা এ বুড়িতে বণ্ডনা হলে একেবারেই ভিজ্ঞে
যেতে হবে ।

এমন সময় পাশ থেকে একজন একটা দেশলাই বাড়িয়ে ধরে বলল,—
বাবু আগুন ।

অঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে লোকটার দিকে তাকাতাই চমকে উঠল ! —ঘরের
আজ্জায় হঠাৎই হাসির হসরা ছুটল ।

কাণো কুচকুচে একটা লোক । মাথার চুল ছোট ছোট । খালি পায়ে
একরাশ কাপা । হাঁটুর ওপর ময়লা নোংরা ধুতি । গায়ে একটা হাওয়াই
শাট । আর সেই শাটটা—

অঙ্কন ভীষণ অবাক হল ! তার গায়ে যে কাপড়ের যে প্রিন্টের হাওরাই শার্ট—ঐ লোকটাও হুবহু সেই শার্ট পরে। এটা কি করে সম্ভব ? ঐ লোকটার গায়ে একরকম দামী কাপড়ের শার্ট এল কোথা থেকে ? —না, কোন ভুল নেই। একই কাপড়ের শার্ট। কিন্তু ও লোকটা এখানে এল কেন ? ও তো অন্য কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে পারত। অন্য জামা পরে থাকতে পারত। ঐ জামাটা প'রে এখানে আসার কি দরকার ছিল ?

অঙ্কন অবস্থি অমুভব করল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। বোধহয় ভেতরের হুবক ক'টি আড্ডা খামিয়ে তাকে এবং লোকটিকে দেখছে। কিসকিস করে যেন কি বলাবলি করছে। তবে কি ওরা এই জামার প্রসঙ্গেই কথা বলছে ?

ঠিক এই মুহূর্তে রাধার ওপর ভীষণ রাগ হল তার। কেননা ক'মল আগে রাধাই এ কাপড়টা বাজার খুঁজে তার জন্তো নিয়ে এসেছিল। এক গাল হেসে বলেছিল, রেয়ার প্রিন্ট। কারো গায়ে দেখতে পাবে না। কি চমৎকার বল তো !

চমৎকার না ছাই। একেবারে যাচ্ছেতাই। কিন্তু ও লোকটা এখনও নড়ছে না কেন ? যাচ্ছে না কেন ? বুটী তো কমেই এসেছে, তবুও দাঁড়িয়ে আছে কেন ? ইন্ডিয়ট ননসেন্স ওয়ার্ল্ডলেস।

অবস্থি আর বিরক্তিতে ডুক দু'টো আপনা-আপনিই কুঁচকে উঠল। সোজাহুজ্জ তাকাতে পারল না অঙ্কন। লোকটার নড়বার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। অস্বস্তি হানতান দেখে তাই মনে হচ্ছে। হুতরাং এখানে আর মোটেই অপেক্ষা করা চলে না। ঘরের হুবক ক'টি এখন আর কোন কথা-বার্তাই বলছে না। কেন বলছে না ? তবে কি ওরা শুধু তাদের ছ'জনেকেই লক্ষ্য করছে ? কেন করছে ? একরকম জামা যদি হয়েই থাকে তাতে ভেদের কি ? এটা তো স্বাভাবিকই—কাপড়ের কল তো আর শুধু তার জন্তেই বানায় নি। যে কেউ পরতে পারে। তুমিও পর না কে তোমাকে বারণ করেছে ? লোকটা পরেছে বেশ করেছে। —না করে নি। এ জামা পরার কোন অধিকার ওর নেই।

থাকলেও এখানে দাঁড়াবার কোন সম্ভব কারণ নেই। ও ভুল করেছে। অন্ত্রায় করেছে। এক্ষুণি ওর চলে যাওয়া উচিত। এক্ষুণি এই মুহূর্তেই।

কিন্তু ও যাচ্ছে না কেন ?

অঙ্কন অব্যবহৃত হয়ে উঠল। মাঝার মধ্যে কেমন টনটন করতে লাগল।
মনে হল সারা শরীরে ক্ষুধা বসন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু কেন?

সেই লোকটা হঠাৎ একটু হেসে বলল,—বাবু আপনার সিগারেট নিতে
গেছে। আগুন দেব?

—না—না—। যেন চিংকার করে উঠল অঙ্কন।

সিগারেটটাকে ঘুরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সে। —না,
আর এখানে নয়। এক মিনিটও নয়। লোকটা একটি শয়তান। ওর ছায়া
মাড়ানও পাপ।

বৃষ্টির মধ্যেই ক্ষুধা হাঁটতে লাগল অঙ্কন। জামা-প্যান্ট সব ভিজে গেল।
সে ক্রফেপ করল না। অনেক ঘুর এসে একবার পিছে তাকাল।

আর তাকিয়েই আবার ফেপে গেল।

সেই লোকটা গুটি গুটি পেছনে আসছে।

একটা গলির মধ্যে ঢুকে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল অঙ্কন। কিন্তু সঙ্গে
সঙ্গেই মগজের মধ্যে একটা ভাবনা উঁকি দিল—লোকটা যদি একই জামাপরা
দলবল নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে—তাহলে?

কাল থেকে রাস্তায় শুধু যদি জামিপরা লোকই ঘুরে বেড়ায়—তাহলে?

প্রখ্যাত কবি কথামিশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর

তিনখানি পুঁজা উপহার

সাঁকো প্রায় পেরিয়ে (সাম্প্রতিক কাব্য সংকলন)

কদম্ব কদম্ব (সাম্প্রতিক উপন্যাস)

লড়াই শুধু লড়াই (সাম্প্রতিক কিশোর উপন্যাস)

প্রত্যেকখানির মাত্র পাঁচ টাকা দাম

: প্রাপ্তিস্থান :

৪২ বিধান সরণীস্থিত (কলিকাতা-৬) ডি এম লাইব্রেরী
এবং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটস্থ (কলিকাতা-১২) শৈবা পুস্তকালয়।

পড়ুন বাংলার ক্রুদ্ধ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

১। বাহবা সম্বর তার সার্কাসের খেলা

২। মুগ্ধহীন ধরগুলি আত্মলাদে চিংকার করে

শেষ চিঠি' / স্বর্গত ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

C/O SUPERINTENDENT, CENTRAL JAIL
SRINAGAR, 6th JUNE, 1953

ভাই বোদি ২

সে দিন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠি এল। এক সংগে তোমার আগের লেখা বাংলায় তিনখানা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এই সব চিঠি আমাকে দেওয়া হয়নি হয়ত যিনি বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাল' করতেন তিনি ছিলেন না। আমার সব চিঠি পেন্সেড আশা নরি। আমি মে'টের ওপর ভালই ছিলাম—কিন্তু আবাস দু'দিন ডান পায়ে ব্যথা বেড়েছে—কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সাগাদিন যেন না দাঁড়াই এই বলেন, এমনি তো বেড়াবার উপায় নেই—বাগানেও মধ্যে ছাড়া—তাতে কোন বকম খিদে হয় না তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বলে থাকতে হয় তাহলে আরো মুশকিল। ক'দিন আবাস সন্ধ্যার পর জ্বর হচ্ছে—বেশি নয়, ৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি। খাওয়াও খুব লানখানে থাই। সিন্ধু খাওয়া—তরকারি। মাছ পানুয়া যায় না। দু'দিন এনেছিল। ভোরে দু'ম ভেঙে যায়। তবে লাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘুরি ঘরে বসি সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে—চণ্ডীপাঠ করি। ৭টায় এক কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও কিছু লেখা। লাড়ে আটটায় বাগানে গিয়ে বসি হোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কালি হয়েছে—তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাখি ও তার জল চেয়ার সরাতে সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। তখন ক্রীম ক্রেকার নিস্কট—হাস্তত পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে আপসিন্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি। তারপর সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই এই চলে—বায়োটা অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছতলায় খাই।

একঘণ্টা বিশ্রাম হয় - চিঠি লিখি বা পড়ি । সাড়ে তিনটার সুপারিন্টেন্ডেন্ট
 আসেন - খবরের কাগজ বা ভাক নিয়ে । 'খালি চা-লেবু দিয়ে-ও কল
 (যদি থাকে) খাই । সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সন্ধ । পর্যন্ত আলো থাকে ।
 তারপর ঘরে এসে বসি । বই, কবিতা, গীতা—এইসব চলে তখন - পোনে
 ন'টা পর্যন্ত । তখন বারান্দায় খাওয়া হয় । দুবেলায় খাওয়া একই ।
 একখানা কুটি খাই । সিন্ধু তরকারি কোনদিন মাংস—দই দুবেলাই খাই ।
 মিষ্টি দু-একদিন এনেছিল । রাত দশটা পর্যন্ত জেগে থাকি । তারপর আলো
 নিবিয়ে শুয়ে পড়ি । স্বপ্ন প্রথম রাত ভাল হয় না । তারপর এক স্বপ্নে
 ভোর হয় । হাতে অগাধ সময়—ভাবতে আরম্ভ করলে তার সীমা পাওয়া
 যায় না । শুধু যে দিন বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভাবি না—তার
 স্তিত্বেরও অনেক জিনিস আছে যা দুঃখ ও সুখ মেশান, কাজেই তাদের ভুলব
 কেমন'ক'রে তাই ভাবি সেই সব কথা । তার সংগে বর্তমান সময়ের কথা
 ভাবি মাছুষ ও ঘটনা—ছনির মত মনে আসে--কে কোপায় আছে কি
 করছে, কোন্ ঘটনা কেমন ঘটছে—নানাভাবে এইসব মনে আসে । আবার
 যখন ভাবি অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতের কথা—তখন আর একরকম ভাবে সব
 ভাবনা জেগে ওঠে । অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখি- পরাজয়ের মধ্যে বিজয়
 দেখি—সবার ভাল দেখি । বেশি দেখেছি এট ক দিনে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ
 অথচ কত গবিত ও মদমত্ত আমরা—অচ তা জানি না । বুঝি না যে যন্ত্র-
 চালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও যার রূপায় এই সৃষ্টির জয় বৃদ্ধি ও নাশ হচ্ছে
 তাঁর কথা ভাবি না । জীবনের প্রায় সময় কেটে এল—কি করলাম এর চিত্ত
 জানিনা । কত ছোট ও কত বাজে কপায় ও কাজে সময় কেটে গেছে- ভুল
 ও অশ্রায় কত করেছি তাই ভাবি । বই পড়তে খুব ভাল লাগে, তুমি জান ।
 বই পড়ছি নানা বিষয়ের ওপর—নতুন ও পুরাতন—আর শিখছি কত নতুন
 করে । লিখতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু ঠিক সম্ভব হচ্ছে না বাবাহেজ জীবনী
 একটা লেখা হল না—এট বিশ বৎসর—এর জন্ত দুঃখ হয় । এখনো চেষ্টা
 করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায় 'ক'দিন
 ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই সব লিখতে । নিজের জীবনেও কম অভিজ্ঞতা
 হয়নি—ভাঙ লিখতে মন চায় । ভাবি তোমাদের কথা ছেলেমেয়েদের কথা,
 নাতিনাতনীরা কথা - আর যে হাজার হাজার ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে
 তাদের কথা । কতদিন এভাবে থাকব জানি না । ভবিষ্যতে কাজ কি করব

তাও জানি না। তবে মনে কোন কুংখ বা কুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অকুংখ বিশ্বাস নিজের ওপর রাখতাম, তা এ কদিন রাখতে পেয়েছি—সে অজানা পৰম শক্তির উপর। ঈশ্বরের নির্দেশ বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পারি না। এতে আনন্দ হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক। চিঠি দিও।

তোমার মেজ ঠাকুরপো

- ১। ডঃ শ্রীমতী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই পত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হল। পত্রটি ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অনাশ্রিত আকস্মিক মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীনগর বন্দীশালা থেকে অগ্রজজায়াকে লিখিত।
- ২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা তারা দেবী।
- ৩। মধ্যম কন্যা শ্রীমতী শালি ভট্টাচার্য। ইনি এখন ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর চাকুরিতে আমেরিকায় বাস করেন।
- ৪। বংলার বাঘ স্ত্রীর আন্তরিক মুখোপাধ্যায়।

টেলিগ্রাম

মূল গল্প লেখক : রত্নদেব দেবান

(অম্ম সাইবেরিয়া : ১৯৩৮)

অনুবাদক : মনীষিমোহন রায়

বাতাসের ভোড়ে দরজাটা গুলে গেলে ঘরের কাঠের মেঝেতে একটা কাঁচকুঁচ শব্দ উঠলো। নাস্তা জেগে উঠে নিছানায় বসলো। ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা বেজে দেয়তাল্লিশ মিনিট।

তাড়ঘড়ি করে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠে সে বাড়ির বাইরে এলো। তারপর ঠিকঠাক ভাবে চেপেচুপে বাইরের গেটের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার আর বুকের ভেতরটা কেমন বেদনায় টিপ টিপ করছে। কানখাড়া করে শুধু একবার সে পরখ করে নিল এবং শুনলো, ছোট্ট ভিন্নক

তখনো ঘুমে অচেতন। আলুক্ষেতের শিশু দিয়ে নাস্ত্য তখন আরিশাব
বাড়ির দিকে ছুটে গেল। বাতাসে এঁদো জমি থেকে ভেসে আসছে শুকনো
বাসের সৌধাগন্ধ।

গ্রাম্যপণের আশেপাশের কারগাছগুলো এলোমেলো বাতাসে ছুঁলে ছুঁলে
যেন শিশু দিচ্ছে আর নাস্ত্যার শরীর-মুখ আলতোভাবে স্পর্শ করছে।

ছোট পাহাড়ের ঢালে আরিশাব বাড়ি, যার একটা অংশ উঁচু জায়গার
ওপর বড় বড় খুঁটির ওপর স্থাপিত। তোয়ের কোমল আলো তখনো পুরো-
পুরি ছড়িয়ে পড়েনি চারিদিকে। বাড়ি এবং তার বড় বড় কয়লাকাপো
খুঁটিগুলোর মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের আকাশ, যার মুখে তখনো
লেগে আছে অন্ধকার। নাস্ত্যার চোখ বাড়িটা অহুসরণ করলো। গ্রামের
শেষ বাড়িটার উঠোন অন্ধ হাঙ্ক। কাপড়ের একটানা একটা শিথল রেখার
মতো হাওয়া বইছিল—যেন, একঝাঁক সাদা হাঁস আকাশে ডানা মেলেছে।

নাস্ত্য আরিশাব জানালায় এসে টোকা মারলো। একটা ছায়া কাছে
সবে এলো এবং আরিশাব কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হল, ‘কে ওখানে?’

—‘আমি……তাড়াতাড়ি শোনো, আরশাব!’

জানালাটা খুলে গেল। দীর্ঘকালী আরশাব এলোচলে কাছে এসে ভয়-
চকিত গলায় শুধোলো, ‘কী ব্যাপার?’

নাস্ত্য প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে কেমন ঘোরল গা গলায় বললো,
‘তিমোফি আমায় ডাকছে, আমার মনে হয় তার টেনিট’ স্টেশনে পৌঁছে গেছে।
আরিশাব, আমি না-ফেরা পর্যন্ত ডিমকার ওপর তুমি একটু নজর রেখো।’

—‘দাঁড়াও, তুমি ঠিকটাক পোষাক পরো আগে! গায়ে তোমার কোনো
কোট নেই যে!’ …… আরিশাব ছুটে গিয়ে আলনা থেকে একটা জ্যাকেট
আনতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে সে খুব দ্রুত নিজস্ব হয়েছে। দূরের বাতাসে
ওই পোষাকের শেষ অংশটুকু কোথায় ভূতের মত মিলিয়ে গেলো।

ডিমকা ঘুমিয়ে ছিল। তখনো বেশ জোরে বাতাস বইছে। আরিশাব
দরজাটা বন্ধ করে দিল, ঘরের বাতিটা জ্বালাল এবং তন্ন তন্ন করে একটা
টেলিগ্রাম খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেলো না। আরিশাব ভাবলো, নাস্ত্য
নিশ্চয়ই সেটা সঙ্গে নিয়ে গেছে এবং পরক্ষণেই মনে পড়লো, কোনো টেলিগ্রাম
তো আসে নি! ডাকপিয়ন কাল রাতে তো এসেছিল! কিন্তু তার কাছে

তো নাস্ত্যার জন্ত টেলিগ্রাম ছিল না ! তখন রাত প্রায় দশটা । তারপর
তো সে আর কিরে আসে নি !

ক্রান্তিতে আরিশাব হাঁটু ভেঙ্গে যাচ্ছিলো । একটা অসহ্য বেদনার পূর্বা-
ভাসে যেন তার শিরদাঁড়া বেকে যাচ্ছে । সে ডিমকার খুব কাছাকাছি লবে
বসলো এবং ঘুমন্ত শিশুটার দিকে লজ্জা চোখে করুণভাবে তাকিয়ে বইলো ।

নাস্ত্যা নদীর দিকে দৌড়ছিল । আকাশের মুখে তখনো অন্ধকার,
বাতাসও বইছে প্রচণ্ড বেগে । দ্বিবিদিকহীন ছুটে চলেছে নাস্ত্যা অবলীলায়
দৌড়ে পার হয়ে গেল সে অগভীর নদী । তার গলা শুকিয়ে আসে । জিত
দিয়ে ঘন ঘন ঠোট চাটেছে সে । তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন জলে পুড়ে থাক
হয়ে যাচ্ছে ।

কিন্তু নাস্ত্যা চলেছে কোথায় ? ষ্টেশনে তো টেলিগ্রাম নেই তবু ওর
বিশ্বাস ওখানে হেডকোয়ার্টার থেকে ট্রেন আসছে । তার স্বামী, তার প্রিয়তম
তোমেকি আছে তার ভেতরে - যে ট্রেনটা একটুবাদেই ব্রুকফোর্টের দিকে যাত্রা
করবে ।

ভোরবেলায় এই সময়ই সাধারণতঃ ডিমকা জেগে উঠে কান্নাকাটি করে ।
নাস্ত্যাকেও তাই উঠে পড়তে হয় এবং দুধ খাওয়াতে হয় । কিন্তু আজ সে
যখন জেগে ওঠে তখন নাস্ত্যা খুব স্পষ্টভাবেই তার প্রিয়তমের ডাক শুনে
পেয়েছিল । অথবা এমনো হতে পারে, সেটা হয়তো ছিল তার স্বপ্নের
প্রতিধ্বনি । নাস্ত্যার জন্ম বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ।

নাস্ত্যা ছুটে চলেছে—কণে কণে তার গতি বিস্মিত হচ্ছে পায়ের বাথার
এতকণে আকাশ থেকে ক্রমে একটা নরম গোলাপী আলো সমস্ত চরাচরে
সাবলীল ভাবে বিস্তার পাচ্ছে । ফলে চোখের নজরে এখন চারপাশের সবকিছু
খুটিনাটিই খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । সূর্য জাগছে - দিকে দিকে বৃষ্টি
ঐ ফুটে উঠলো আলোর আলো ।

এখন তুষারপাত হতে পারে, নাস্ত্যা মনে মনে ভাবলো । হয়তো
তুষারপাত হবে আর সমস্ত চরাচর তুষারে ঢেকে যাবে এবং অনেক কিছুই তখন
মুছে যাবে চিরন্তনে । আমি এখানে কেন ! সে যুক্তিরে জগা একথা চিন্তা
করলো - যদি তার অস্তিত্ব সত্যি না হয় ? যে পল সে অতিক্রম করছিল
তা অতিশয় দীর্ঘ মনে হল তার । নিঃসঙ্গ একাকিনী সে নিজেই যেন
হারিয়ে কেললো অগ্নিকের জন্ত । তারপর চকিতে একটি ট্রেনের হুইসিলে

নাট্য। সঞ্চিত ফিরে পেলো। তার সব সন্দেহই হুবে সরে গেল সে সর্বশক্তি দিয়ে আবার দৌড়তে থাকলো !

নাট্য। প্রাটকর্ম পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। যেন ছুরিকাঘাতের মতো গাড়ির বাগগুলো একে একে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। পুরানো কাঠের প্রাটকর্ম জুড়ে সেনাবাহিনী লোকলস্কর গিজ গজ করছিল। সমস্ত কিছুই নাট্য্যার চোখে তখন অবিশ্বাস্য রকমে অর্থহীন সেহ প্রাটকর্ম, লম্বা লম্বা শেকলের শৃঙ্খলে আঁটা মাংসগাড়ির বাগগুলো, সৈনিকদের পোষাকপরিচ্ছদ আর তাদের ভাবলেশহীন মুখগুলি ...সব। আহা! যদি একবার সে নাট্য্যার নাম ধরে ডেকে উঠতো! সে তো এতমধ্যেই খুব কাছে কোথাও আছে—কিন্তু কোথায়? কোথায় আমার প্রিয়?.....

একটুপরেই সেনাবাহিনীকে নিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

তি—মো—ফি! —কে বুঝি ওই ডেকে উঠলো। নাঃ, কেউ না—এ ডাক যে তার বুকের দাঁজর থেকেই বেরিয়ে আসছে। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—ক্রমে গতিশীল হচ্ছে ট্রেনগান। কম্পাটমেন্টগুলি আরো দ্রুত একে একে বলকে উঠছে তার চোখের সামনে।

ইহাৎ এমন সময় নাট্য্যাকে দেখতে পেলো। ‘তিমোফি’ গাড়ির শেষ কম্পাটমেন্টের মেঝের ওপর তারাদিকে পিছন ফিরে বসেছিল। না, বসে নয়, নতজাহু হয়ে তার লংকোটটা বিড়িয়ে শোবার অয়োজন করছিল খুব—একাগ্রচিত্তে। ওই-ই তো তিমোফি, ই্যা, ওই ই তো তিমোফি! চায় ভগবান! আমি কেন সঙ্গেরে তখন চিৎকার করে তাকে ডাকতে পারলাম না। নাট্য্যার চোখে তখন দুনিয়া অন্ধকার। ট্রেনটা তিমোফিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, পেছনে ফেলে গেলো দুঃসহ স্তব্ধতার অস্থচীন অন্ধকার। এবং অহুভব করলো, তার পায়ের নিচে মাটি নেই। ‘প্রিয় তিমোফি আমার!’ বুকফাটা আবেগচাপা গলায় কঁকিয়ে উঠলো সে। তার মনে ক্ষণিকের জ্ঞান প্রশ্ন এলো, ‘কিসের এই পৃথিবী, সে কেন এই নোংরা কাঠের প্রাটকর্মে? কিন্তু পরক্ষণেই ‘প্রিয় আমার, প্রিয় তিমোফি আমার!’ বলে আবার কঁকিয়ে ওঠে বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

বুক ষ্টেশনমাস্টার নাট্য্যার দিকে তাকিয়ে বইল সঙ্কীর্ণ, বাক্যহারা হয়ে। বেদনাদীর্ঘ হৃদয়ে তিনি নাট্য্যাকে কি বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

একটি ছোট কুকুর পাটকর্মের ওপর বসে ছিল নাস্ত্যার দিকে কক্ষণ চোখে কিছু খাবারের আশায় উন্মুখ হয়ে। কিছু একটা পাবার আশায় খুব উৎসুক-ভাবে সে তার লেজ নাড়ছিল।

একমাস পর মুহুর্তের থেকে নাস্ত্যা তার স্বামীকে মৃত্যুসংবাদ পেলো। ডাকপিয়ন টেলিগ্রামটা নিয়ে খুব ইতস্তত করলো, তার হাতটা হয়তো কেঁপে উঠলো। ডেলিভারি দিয়ে সে খুব নিঃশব্দে ফিরে গেল।

স্তব্ধ নিম্প্রাণ বাড়ি। ডাকপিয়ন জানলার বাইরে থেকে শুধু শুনে পেলো একটা আলাপের ডির টিক টিক শব্দ এবং কি যেন ভেবে সে আবার দরজার কাছে ফিরে এলো।

—আগে কিছু? —খুব শাস্ত্রগলায় নাস্ত্যা জিজ্ঞেস করলো।

—না, না আমি ভেবেছিলাম আপনি আমায় ডেকেছেন।

—‘না, না তো’

তখন সে চলে গেলো খুব নিঃশব্দে, নতমুখে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব—কান গথে ?

“নমুনা প্রদর্শাবলী” (ইংরাজী)

সত্যেন সাহা

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একাংশ শ্রেণীপাঠক্রমের অবসান ঘটানো হয়েছে। আর তার স্থলে পুনর্প্রচলন করা হল দশ-শ্রেণীর পাঠক্রম। একে বলা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর। নতুনই নিশ্চয়ই আছে। মাধ্যমিক স্তরে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটা নতুন সংযোজনা। পাঠক্রমরচনাকারীদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কর্মশিক্ষা প্রচলন। শিক্ষা যদি সমগ্র সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার অবিচ্ছিন্ন স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা নিশ্চয়ই অদর্শস্থানীয় নয়। গত শতকের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তানায়করা শিক্ষাকে উৎপাদন যুগী করবার দাবী উত্থাপন করেন। শিক্ষা দার্শনিকেরা এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং শিক্ষা-প্রশাসকবৃন্দ এই দাবীকে

আজকাল করে তুলেছেন একটা ফাশন।* জুঁর বড় দটাস্ত হল পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোর কর্মশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা। মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার কি হাল হবে বা কর্মশিক্ষার পরীক্ষা কি রূপ নেবে সে সম্পর্কে এখনই আমরা কিছু বলতে পারছি নে। আশাবিত্ত হবার খুব কারণ নেই। আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট সম্ভব ভিত্তি আছে।

কিন্তু এখনই যে বিষয়ে আমরা চমকে গেছি তা হল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের পত্রিকা 'পর্ষদবার্তার' গত কয়েকসংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Enestions)। বিস্ময় যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা হল প্রশ্নভগতে। এ প্রশ্নে কিছু বলবার আগে জানিয়ে রাখা ভাল যে ১৯৭৫ সালে যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়েছে সেই পাঠ্যক্রমের উপর আদর্শ প্রশ্নাবলী বিদ্যালয়গুলোতে এল ১৯৭৫ এর জুন, জুলাই, আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে। অর্থাৎ আগামী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যবস্তু পঠন পাঠনের প্রায় শেষ পর্ষায়ে এসে নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রগুলো প্রথম চোখে দেখতে পেল। এই সব প্রশ্নসম্পর্কে শিক্ষক মশায়রা সম্প্রতি আলোচনা শুরু করেছেন। পত্রপত্রিকাতে কিছু সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সাধারণভাবে আদর্শ প্রশ্নাবলী সংক্ষেপে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। বর্তমান লেখকের পেটা উদ্বেগেও নয়। ইংরাজীর আদর্শ প্রশ্ন সম্পর্কে দু'একটা বিষয়ের কেবল অবতারণা করা হবে।

প্রথমেই স্মরণ রাখা ভাল নতুন শিক্ষা কাঠামোর ইংরাজী তার কোর্সটি হারিয়েছে। তৃতীয় ভাষা হিসেবে ইংরাজী হবে ১০০ নম্বরের একটি মাত্র পত্র। একাদশ শ্রেণী পাঠ্যক্রমে ইংরাজী ছিল ২০০ নম্বরের দুটি পত্র। পূর্বের ফুল ফাইন্সালেও ছিল দুটি পত্র। তার পূর্ববর্তী অর্থাৎ অবশ্য ইংরাজী ছিল ২৫০ নম্বরের ৩টি পত্র। সুতরাং ইংরাজীকে যখন ১০০ নম্বরের ১টি মাত্র পত্রে নামিয়ে নিয়ে আসা হল তখনই সে হল জাতচ্যুত। নিঃসন্দেহে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই বৈপ্লবিক উত্তেজনায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসকবর্গ যখন ঘোষণা করলেন যে এই পর্ষায়ে ইংরাজী হবে একটা ত্রৈভিক বিষয় তখন আমাদের বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে আমরা এক নতুন শিক্ষা-জগতের সিংহদ্বার এসে উপস্থিত হয়েছি। পর্ষদ নির্দেশ দিয়েছে যে, ইংরাজীর সমগ্র পাঠ্যক্রম শেষ করবার পক্ষে সম্ভ্যাহে ৪০টি পিরিয়ডই যথেষ্ট। সুতরাং নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকরী করবার প্রাথমিক পর্ষায়ে শিক্ষক মশায়রা

ভেবেছিলেন ইংরাজীর প্রশ্নের মান নিচুই খুব উচু হবে না।

‘পৰ্বদ্বার্তা’র এ বছরের জুলাই মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হল ইংরাজীর আদর্শ প্রশ্নাবলী। সুদীর্ঘ তাক্কব। একি ব্যাপার! প্রথমতই তাঁরা হতভম্ব হলেন প্রশ্নের বহর দেখে। পরে পাঁচটা ‘বিষয় অঞ্চল’ (Content area) গল্প, পড়, ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা ও বোধগম্যতার পরীক্ষা। সম্পূর্ণ প্রশ্ন-পত্রখানা একবার পড়া শেষ করতেই একটা সাধারণ স্তরের ছেলের যথেষ্ট সময় লাগবে। তারপরে তো তার উত্তর লেখা। কমবেশী ১২০ শব্দের একটা অনুচ্ছেদ লিখতে হবে, ৬০-৭০ শব্দের মধ্যে একখানা চিঠি লিখতে হবে। অজানা একটা রচনার সাহায্য লিখতে হবে আর একটা রচনাংশের ওপর ছোট ছোট কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। দুটো নাতীর্ঘ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করতে হবে ইংরাজীতে। এর পরে আসছে প্রশ্নপত্রের ব্যাকরণের দীর্ঘ অংশ। গুণ্যমান প্রবণ আছে, ছেদচিহ্ন নির্দেশ করতে হবে, বাক্যের নির্দিষ্ট রূপান্তর সাধন আছে, উল্লেখবিবর্তন আছে, আর আছে ইংরাজীর বিশিষ্টাত্মক বাগ্‌দারার ব্যবহার। আদর্শ প্রশ্নাবলীর ব্যাকরণ বিভাগের প্রশ্নগুলো যে দুর্ভেদ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু তার বহুটো অস্বাভাবিক। সবচেয়ে তাক লাগাবার প্রশ্নগুলো আছে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় এলাকায়। প্রশ্নগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—সহজ মাঝারি কঠিন। স্তর পদক্ষেপ। প্রবর্তন করা হয়েছে নৈব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর, একাদশ-শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সূচনায় নৈব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা বর্জন করা হয়েছিল। কেন বর্জন করা হয়েছিল সে কথা বর্তমানের শিক্ষা-প্রশাসকবর্গের বিম্বিত হবার কথা নয়। নৈব্যক্তিক প্রশ্নাবলীতে সম্ভাব্য অন্তত দিকটার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন কি? অন্ততঃ এখন পর্যন্ত তার কোন আভাস আমরা পাইনি। আদর্শ প্রশ্নাবলীর প্রথম প্রশ্নে নির্দিষ্ট শব্দের বিপরীতার্থক বা সমার্থক শব্দে নির্বাচন করতে বলা হচ্ছে কয়েকটা শব্দের মধ্য থেকে। নির্দিষ্ট শব্দগুলো পাঠ্যবস্তুভুক্ত। সুতরাং সেগুলো পরীক্ষার্থীর জ্ঞাত শব্দকোষভুক্ত। কিন্তু যে শব্দগুলো থেকে সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ নির্বাচন করতে বলা হচ্ছে সেগুলো সাধারণভাবে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত। সুতরাং এই শব্দগুলো পরীক্ষার্থীর অজ্ঞাত। যে শব্দপুঞ্জ থেকে নির্বাচন করতে হবে সে শব্দগুলোর অর্থও প্রায় সমর্থ। সুতরাং উল্লেখ্য শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনটা নিশ্চিতভাবে সমার্থক বা

বিপরীতার্থক তা স্থির করার যোগ্যতা পরীক্ষার্থীর কাছে আশা করা অসম্ভব । প্রশ্নকর্তারা অনুমান করছেন পাঠ্যবিষয়ের প্রতিটি শব্দের সার্বিক ব্যবহার পঠনপাঠনস্তরে সমাপন করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আবার স্বরণ করিয়ে দেওয়া ভাল ইংরাজীৰ জ্ঞাত নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক পিরিয়ড হল চারটি । তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় উপরোক্ত অর্থে পঠনপাঠন সমাপ্ত হয়েছে তবুও শব্দপঞ্জী পরীক্ষার্থীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে, যেহেতু একটা শব্দের সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ অনেকগুলো হতে পারে । সুতরাং অজ্ঞাত শব্দসমূহের মধ্যে নিবাচন অনেকটা Cross Word puzzle-এর মত । একটা নমুনা দেখুন, পর্ষদবার্তায় প্রকাশিত ইংরাজী আদর্শ প্রশ্নাবলীর ১নং প্রশ্নের বিতীয়াংশে আছে :

“He then highly praised the wisdom and ingenuity of the young counsellor.”

“Which of the words—knowledge, presence of mind and cleverness—is nearest in meaning to ‘ingenuity’ ?”

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর কাছে আশা যে exactitude দাবী করছি তার যথার্থতা বিচার করতে হবে ইংরাজী পঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে । প্রথম উদ্দেশ্য হল ছাত্রকে কাজ চালাবার গোছের ইংরাজী জ্ঞান দান । কিন্তু তার স্তরে যে কি সে কথা উদ্দেশ্য-প্রণয়নকারীরা নিজেরাই ব্যাখ্যা করতে অপারগ । সুতরাং কাজ চালাবার মত জ্ঞান থেকে গেল অস্পষ্ট । অতিরিক্ত আর যেটুকু তাঁরা চলেছেন তার শেষ কথা হল ছাত্রকে ইংরাজী পড়তে শিখতে হবে, ইংরাজী বললে বুঝতে হবে, ইংরাজী বলতে হবে আর ইংরাজী লিখতে হবে । অর্থাৎ ইংরাজী হল একটা Skill Subject । ইংরাজীকে শেখাতে হবে সাহিত্য হিসেবে নয়, ভাষা হিসেবে । সুতরাং অনুমান পর্যায়ের যে প্রশ্ন গুলো করা হয়েছে আর পাঠ্যপুস্তক পর্যায়ে সহজ ও মাঝারি স্তরে যে প্রশ্ন গুলো করা হয়েছে সেইগুলোই সঙ্গত ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে । আভিধানিক সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ নিবাচন আর কঠিন পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রশ্ন উক্ত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ।

উদ্দেশ্যকে সাধারণ স্তরে সীমিত রেখে পরীক্ষার প্রশ্ন এমন অসাধারণ স্তরে কেন উন্নীত করা হচ্ছে ? এই অসঙ্গতি কিসের ফলশ্রুতি ? উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হল শিক্ষাব্যবস্থার ইংরাজীৰ ভূমিকা সম্পর্কে প্রশাসকবর্গের

অব্যবস্থিতিতা এবং এর মূলে আছে ইংরাজী সম্পর্কে দেশে বিভিন্নশক্তির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ববিবোধ। ইংরাজ শাসনকালে আমরা কয়েকপুরুষ ইংরাজী শিখেছি। তার পরিণাম বিষয়ময় হয়েছে এমন কথা উগ্র কোন ইংরাজী-বিষেবীও আজ বলছেন না। কিন্তু ইংরাজ শাসনের অবসানে দেশে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর ভাষাবিবোধ। উত্তর ভারত থেকে বগলকর শোনা গেল ‘অংরেজী হটাও’। ইংরাজী-বিষেবী এই সংগ্রামে সামিল হলেন ছোট বড় অনেক বাম-ডান মার্কী নেতা। অংরেজী অপসারিত হলে সেই শূন্যস্থান যে পূর্ণ করবে হিন্দী এটা হিন্দীপ্রেমিক ও হিন্দীবিষেবী উভয়গোষ্ঠিই বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং হিন্দী প্রেমিকরা চান ইংরাজীকে নিবাসিত করতে, আর তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দীবিষেবীরা চাইলেন ইংরাজীর অব্যাহত উপস্থিতি দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান কি হবে সেটা হয়ে উঠল স্বার্থসংগঠিত পক্ষের একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। এমনভাবেই উদ্ভাপনীন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এই বাপা’রে তাহ অর্থাৎ দুঃভ।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে যে প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে তা কখনও স্পষ্ট ও বিতর্কাত্মক হতে পারে না। এইজন্যই চলছে ইংরাজীকে নিয়ে একটা অশোভন ছিনিমিনি খেলা। এমন অস্থির পরিবেশে লাভবান হন একশ্রেণীর নীতিহীন মানুষ যাদেরকে আমরা বলি শিক্ষাব্যবসায়ী। এঁদের মধ্যে একদল প্রকাশক তো রয়েইছেন, তাঁদের সঙ্গে আছেন প্রশাসনের উচ্চস্তরের কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দেশে কয়েকটা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রগুলোতে পণ্ডিতব্যক্তি অনেকেই আছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক জিনিষ আর পণ্ডিতস্বত্ত্ব আর এক জিনিষ। গবেষকদের অনেকেই থাকেন গজদস্তমিনারে, মাটির লসে তাঁদের কোন যোগই থাকে না। অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে আদর্শ প্রত্নাবলী এই সমস্ত গবেষণা-কেন্দ্রে রচিত হয়েছে। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে গবেষণাকেন্দ্রের গবেষক ও পরিচালকবর্গের অনেকেই কাছে কেন্দ্রগুলো তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির একটা সোপানমাত্র। বাস্তবতাবোধসম্পন্ন উচ্চাভিলাষী পণ্ডিত মহল যা রচনা করবেন তা কখনও দেশের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

‘চেতনিকের’ ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে সম্পাদক মহাশয় শিক্ষাকেন্দ্রে চিন্তাসমৃদ্ধকৃত বানস্থা পরিবর্তনের কি ভয়ংকর পরিণাম হতে পারে সে সম্পর্কে কতকগুলো মূল্যবান উক্তি করেছেন। ভিজ্যুয়াল পাঠক উক্ত সম্পাদকীয় পাঠ

পাঠ করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। স্বতরাং দেশের বৈষয়িক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে ভাল বেথে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কখনও অকাম্য হতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তন যদি কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালপুণী চরিত্রার্থ করার বা সংকীর্ণ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনের তাগিদে করা হয় তা'হলে মহা সর্বনাশ হবেই। এক্ষেত্রে তাই হতে চলেছে। স্টেটেই চিন্তাস্থার কারণ। আদর্শ প্রজ্ঞাবলীর মৌলিক সংশোধন অপরিহার্য। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা'হল দেশের শিক্ষাকাঠামোর ইংরাজী স্বান কি হবে সে সম্পর্কে শিক্ষাক্ষেত্রগী প্রশ্নাবলীর সম্পূর্ণ ধারণা। এটা ধারণা স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট হলে পাঠাপুস্তক কি হবে আর পরীক্ষার প্রশ্ন কি রকম হবে সে সম্পর্কে বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোন অসুবিধেই হবে না।

জনতার আদালত

মূল গল্প লেখক : লেনার্ড মেরিক

অনুবাদক : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয়—সালের (তারিখে কিছু এসে যায় না) গ্রীষ্মকালে রবিকন্ আর কুইনক্যার্ট্‌ দুজনেই শ্রীমতী ক্রেয়েং-এর কাছে বে'র প্রস্তাব পাড়লে। শ্রীমতী ক্রেয়েং ছিলো চারুদর্শনা অভিনেত্রী। রবিকন্ আর কুইনক্যার্ট্‌ হান্তসাময়িক ভূমিকার সেবা বঙ্গ রসিক এবং এরা তিনজনেই বিয়েটার সুপ্রীম-এর সদস্য।

রবিকন্ জনসাধারণের কাছে এত আদরবীয় যে স্বীয় ভূমিকার আদি শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বেই তারা উঠতো হেসে আর কুইনক্যার্ট্‌-এর জনপ্রিয়তা এত বেশি যে তার নীরবতায় প্রোভূর্ণ উৎকট তালিতে পড়তো গড়িয়ে।

পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বতার কথা বাদ দিলে এরা'জন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদিও অবিভক্তি একই মহিলার পানিপ্ৰার্থী এরা। আর তার কারণটাও নিশ্চয় এটি যে অমিতোজা: রবিকনের প্রতি মহিলাটির যে প্রশরভতা রূপকার কুইনক্যার্ট্‌-এর চোঁতে তা এতে'টুকুও বেশি নয়। দুজনের সঙ্গেই সে সমান ফটিনটি করতে। আর পছন্দও করতে দুজনকে সমান। অবশেষে যখন লঙ্ঘন অতিবিক্ত বিরক্ত

করতে লাগল এরা তখন একটু কষ্ট ভাবেই সে অঙ্গীকার করলে উভয়ের মধ্যে যে সেবা অভিনেতা তাকেই সে বে' করবে।

কাগজানা দেখ : মকের কোনো নটী কি কাগজের কোনো সমালোচকই কে যে সেবা অভিনেতা—সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারতো না। এমন উদ্ভট বিভ্রমনার কথা এক স্থান ক্রয়েই পারতো বলতে।

কিন্তু হুসান ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কী করে? —আমতা আমতা আমতা করে বললে বাবকন্ হতাশভাবে।—কার সিদ্ধান্ত তুমি স্বীকার নেবে?

এ সমস্তার মীমাংসা হবে কী করে? - বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করলে কুইনকুয়ার্ট্। —কে হবে এর বিচারক?

বিচারক হবে পাণ্ডী, হুসান জানাল। জনসাধারণের সেবক আমরা। জনসাধারণের কণাই নেবো আমি মেনে।

সে ছিলো ছবির মতোই সুন্দর, নইলে আর এমন আদিথোতাটা করতে পারতো না।

বেচারি কুইনকুয়ার্ট্, বিদায় নিলে গভীর চিন্তায় ডুব দিয়ে : বাবকনেরও জেঁ একই দশা। কুইনকুয়ার্ট্, ভাবলে, সীমিতী রাসিকতা করেছে তাদের সঙ্গে। বাবকনেরও সেট একই মত। সর্বসাধারণ দুজনেরই স্বাতিতে মুগ্ধ। দাক্ষিণ্যও যা দেখিয়েছে কারো চেয়ে কাউকে কম নয়। - পারীর সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করা ব্যাপারটাকে অনিদিষ্টকালের জন্তে মূলতুর্বা বাথারই সামিল। কুইনকুয়ার্ট্, কোন পথ দেখতে পেলে না। বাবকন্ও পারলে না কোন কিনারা করতে।

সম্বাসনিক অবকাশের দুয়েক দিন আগে এরা বসেছিলো এদের প্রিয় কাকের চাতলে। বাবকন্ বলে : দোস্ত্, ব্যাপারটা নিয়ে আপোষে আলোচনা করা যাক। একটা সিগারেট নাও। তুমি একজন অভিনেতা, কাজেই তুমি নিজেকে আমার চাইতে বেশি ক্ষমতাবান্ বলে মনে কর। আমিও একজন অভিনেতা। সুতরাং তোমায় আমি আমার চাইতে ঢের কম কুশলী মনে করি। শিল্পী হিসেবে পরস্পরের চোখে এট তো দাঁড়াচ্ছে অনস্বাটা। কিন্তু আমরাও তো পৃথিবীর মানুষ। আমাদের বুঝতে হবে যে ভাঁড়ামীর চূড়ান্ত করে মৃত্যু শয্যায় পৌঁছলেও আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা যাবে না। ব্যাস্, এখন একমাত্র ভরসা আমাদের বিত্তিয়মুখী প্রতিভায়। বিজেতাকে কোন গভীর ভূমিকায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে। — প্রসন্নভাবে চাইলে সে কুইকুয়ার্ট্-এর পানে। কারণ প্রকৃতির অতিসম্মিলিত কদাকার

কুইনকুয়ার্ট্‌ নিদ্রাধক হঠাৎ জেগে উঠে।

ঠিক ঠিক ব'লে কুইনকুয়ার্ট্‌ তুঙ্গির* সঙ্গে চাইলে সহকর্মীর দিকে।
কাৰণ বপুস্বৰ্ণ্য ববিকনকে বিষাদাত্মক ভূমিকায় কল্পনা করা অসম্ভব।

একটা বিষয়ের কিস্তি গোল থেকে যাচ্ছে : — ববিকন ব'লে চলে
কৰ্ণপক্ষ কিছুতেই আমাদের সুযোগ দিতে রাজি হবে না। বজালয়ে সবসময়
এরকমটাট হয় না কি? কেউ একবার কোন এক বিশেষ ভূমিকায় কৃতিত্ব
দেখান—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে সেই ধরণের ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট
থাকতে হবে। যদি আমার প্রথমতম কৃতিত্ব হতো কোনো উদ্ভেজনাপূর্ণ
নাটকে তদ্রূপ ভূমিকায় তাহলে সকলের ধারণা হতো এমনি ছুয়াত্মক
ভূমিকাতেই আমার যোগ্যতা সীমাবদ্ধ। দৈবাৎ বিদ্রব্যক হিসেবেই আমি
কৃতিত্ব দেখিয়ে ফেলেছিলাম, আর সেই জন্তেই কেউ বিশ্বাস করবে না ভাড়াটি
ছাড়া অস্ত্রকিছুতেই আমার যোগ্যতা রয়েছে।

ঠিক তাই— কুইনকুয়ার্ট্‌-ও একমত। আচ্ছা, তাহলে তুমি কি মতলব
ঠাউরেচো?

ববিকন একটু ভেবে নিলে। -- মঞ্চে যখন আমরা আমাদের ক্ষমতা
জাহির করার সুযোগ পাচ্চি তখন বাইরেই কোথাও স্তব্ধে দেখতে হবে।

ঘরোয়া অভিনয়ে? তা বেশ! কিন্তু স্বতন্ত্র প্রদর্শনী-ই হলো যদি
তাহলে পাণী কি করে বিচারক হচ্ছে?

ধোং—গজগজিয়ে বললে ববিকন,— এ এক মোক্ষম গেষো।

বিষয়ভাবে মদের পেয়ালায় চুমুক দিলে তাহা। অনেকগুলো মাথা
ওদের ছোট্ট টেবিলটার দিকে ঘুরলো। ঐ যে কুইনকুয়ার্ট্‌ আর ববিকন
আচ্ছা বগুড়ে কিস্তি ওরা সবসময়, পঞ্চাঙ্গীরা বলছিলো। বগুড়া জুজনের
অস্ত্রের উৎসেগ ওরা ধারণাই করতে পারে না।

কিং কর্তব্য? — একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে শেষে কুইনকুয়ার্ট্‌ ভুক
কুঁচকে, বিশাল স্বল্পে শ্রাগ্ করলে একটা ববিকন।

এমন চিন্তামগ্ন ছিলো এরা যে একটা বিষয় এদের নজর এড়িয়ে গেল।
একজন পঞ্চাঙ্গী এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তখনো সে সন্ধিগতভাবে
চেয়ে চেয়ে দেখছে। বেশ লম্বা চওড়া, ময়লা ছেড়া পোষাক। পরক্ষণে
একটু সাহস সঞ্চয় করে সে এগিয়ে এসে বললে :

—মশাইবা, আমার বেরাদবি মাপ করবেন। প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি

আপনাদের পেশাদারী পরামর্শ চাইছি। মোটামুটি দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য আমার হয়েছে। আমার বক্তব্য নিবেদন করতে অসুম্মত দেবেন কি ?

মশাই - উত্তর করলে সবিকন্, - আমাদের অধুনাতন ভূমিকার বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তায় মগ্ন আমরা। অল্প কোন সময় সানক্ষে আমরা আপনার বক্তব্য শুনবো।

আহাঃ নবাগন্তক নাছোড়বান্দা—সময় বড় অল্প আমার হাতে। আমিও যে ভাবছি আমার সাম্প্রাতক ভূমিকার কথা। আর এটাই হবে আমার জীবনের একমাত্র সবাক ভূমিকা, যাঁদও আজ বংশ বছর ধরে আমি মঞ্চে আবিষ্কৃত হচ্ছি।

কী ? আপনি বিশবছর ধরে ঢুচ্ছ ঢুচ্ছ ভূমিকায় নাবছেন ? মুখভংগি করে বললে কুহনকুয়াঁত।

না, মশাই—কঠিন স্তরে জবাব দিলে আগন্তক। আমি সবকারী জন্মাদ, চাকরিতে আমি ইচ্ছাশীল দস্য, এই পদের ভয়াবহতার বিষয়ে আমি বক্তৃতা করবো।

বিদ্রূপক ছুঁচন হার পানেনঃ করে চেয়ে রইলো। ব্রৌহ্মোজ্জ্বল সেতু চাকালের 'পরে মনে হ'লো যেন গিলোটিনের কক্ষচ্ছায়া এসে পড়েছে।

জাকুস ক আমার নাম লোকটা বলে চলো। আগামী তপ্তায় আপেল-ভিলা-র বোয়ার মঞ্চে আমি এ বিষয়ে আন্দোলন করে দেবো। আপনারা যাকে বলেন মঞ্চাতক এত হয়েচে আমার সেই আমার যে স্নায়ুপীড়া কি জ্বলনস আগে বখনো জানতো না। আজব ঠেকছে না ? যখনই আমি মঞ্চের দিকে অগ্রসর তপ্তয়ার মহড়া দি' তখনই হাংলাগুলো গুব বেশি করে অজুতব করি—বুঝতে পারিনে এদের নিয়ে কি করবো। আগেতো নিজের হাতপার কথা কিছুই মনে হতো না। আবিষ্কৃত হ'ল আমার মনোযোগ নিবন্ধ থাকতো অল্প লোকের মাপের 'পরে। 'ত' আমার মনে হ'লো 'আচরণ সম্পর্কে দুয়েকটি নির্দেশ দিতে হয়তো বাঁজি ততে পাবেন আপনারা। সম্ভবত একটিই যথেষ্ট হবে।

- বক্তৃতা বক্তৃতা সবিকন্ বললে চাকরিতে আপনি ইচ্ছাশীল দিলেন কেন ?

—কারণ সত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞানচক্রে পুলে গেল, ক জবাব করলে।
- দুতাদণ্ডে আমার আর অত্মমোদন নেই। এ পাপ প্রথা পুলে দেহগা উঁচিঁত।

—বিবেকদংশন বলুন, নয় কি ?

—ঠিক ।

তোমা, রবিকন্ নল্ল, কী সব নাটকীয় উক্তি ই না দেয়া যেতে পারে এই ভাবে ! তা কি কি থাকছে এতে ?

—এতে থাকবে আমার জীবনবিত্তাস আমার যৌবন, আমার দাঁড়ি, জল্লাদ হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আর আমার পশ্চাত্তাপ ।

মাশাজ্জা ! রবিকন্ বললো — আপনার বলির প্রোতাপ্তারা মঞ্চ পর্যন্ত অগ্রসর করেছে আপনাকে । মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না । চোখটো আঁতকে গেলে বেরুচ্ছে কপাল থেকে । ইঁফাতে ইঁফাতে আপনি কমা প্রার্থনা করছেন । —কল্পনা বাঁচিয়ে দিয়েচে গাট শোণিতে আপনার প্রসারিত হাত দুটোকে । শ্রোত্রমণ্ডলী উঠেছে শিউরে, মুর্ছা যাচ্ছে মহিলাবা সমর্থ লোক যারা তারা উদ্বেগে কপকপ, —অকস্মাৎ সে তার বিরাট মুষ্টি দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করলে টোবলে । খর্বাকৃত কুট্টনকুয়ার্থ চেয়ার থেকে প্রায় স্থানচ্যুত হয়েছিল আর কি ! কারণ সে তার প্রাতঃস্মৃতির শক্তি আনন্ড করলে । —তখন ! —রবিকন্ চম্কার করে উঠলো, আপনি কি আপোঁজকা-হ-বোয়া-তে পরিচিত ?

—আমার নাম শুধানে জানে ।

—দোং ! আমি বলছি আপনি কি সেখানে দাক্ষগতভাবে পরিচিত ?

—নাঃ । কিন্তু বাপার কা ?

—আপনাকে সনাক্ত করতে পারে এমন কেউ নেই সেখানে ?

—এরজম জায়গায় না থাকই সম্ভব ।

—আপনি কত মুনাফা পাবেন আশা করেন ?

—হলটা তো খুব ছোটো । প্রবেশমূল্যও সামান্য । হয়তো শো আউট ফ্রা হবে ।

আর আপনি ভীত হয়ে পড়েছেন । অভিনয়ে আপনার এই ভীতবৃত্তিও পাল্লা থেকে নিষ্কার দেতে চান ?

—এতে আর পছন্দোঁর কি থাকতে পারে ? আমি রাজি আছি । কিন্তু তা—এ কথা উঠছে কেন ?

—কারণটা বলছি—আপনাকে পাঁচশো ফ্রা দিচ্ছি আমি । পরিবর্তে আপনার কাজটি আমার করতে দিতে হবে । —মশাই, শর্তটা কি মনে

মতো হয়েছে আপনার ?

— আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না ।

— আমার খেয়াল হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নাওতে । পনের দিন আপনি বলবেন টেটেন্‌ মিস্‌ কণ্ঠছিলেন— কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এমন কতো গণ্ডা গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন ; কেবল আমি যে আপনার ছদ্মবেশে অভিনয় করোঁচ তা আপনার জানার কথা নয়, তার জন্তে যা দায়িত্ব সে আমার— । কি বলেন ?

—এর জন্তে যিগুণ পাওয়া উচিত । —আপাত্ত তুললে লোকটা ।

আদৌ না ! সমগ্র সংবাদপত্র আমার এট তামাসার কাহিনী প্রচারে মুখর হয়ে উঠবে । আমি, এই রবিকন্‌, জ্যাক্স ক্লর পরিচয়ে বক্তৃতা ক'রে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর রক্ত হিম করে 'দট্যচ— একথা যখন প্রকাশ পাবে, সমগ্র পারী স্কক হয়ে যাবে । লাখ্‌ লাখ্‌ লোক আপনার আভ্যন্তরীণ বক্তৃতা সম্পর্কে আলোচনা করবে যারা অগ্রপায় কর্ম্মনক'লেও এ কথা জানতে পারেনো না । এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর নিজাপন আর হতে পারে না আপনার । তাছাড়া এ বাবদ মূল্য-ও হবে 'দাচ্চ । আর সেই সঙ্গে নিখরচায় মঞ্চ'চার সম্পর্কেও তালিম 'দয়ে দেবে । বার্জি অ'ছেন ?

—টা মশাট, রা'জ আমি । বলে ক' ।

ও, কুইনকুয়ার্ট্‌ এর কী উদ্দেশ্য ! রবিকনকে হার'য় কা'ব সাধি, যদি অভিনয় তার আশাতরুপ হয় ? জে'লয়ে সেই সঙ্কোয় বিমগ্ন মনে কুইনকুয়ার্ট্‌ স্তম'নকে অত্যাগমন করে মঞ্চসম্মিত হ'বে এসে পৌঁছুলো । পরিদানে তার ভাড়ের পো'সাক, ক'ন্‌ নিজে'কে ভাবছিল সে যোমি'য় বলে । জনতা তার ছাগনুভোর ভূমণী প্রশংসা ক'রলে বটে কিন্তু মাজে'টা বহের পবচলার আড়ালে তার মনে যে বদময় বিচির সব অভিল্য'ব জাগছিলো সে-সম্পর্কে 'তার' একটুও সন্দেহ করতে পারলে না, জীবনে এই প্রথম ক'তজ্ঞ বোধ করলে নাট্যকারের কাছে সে, যেহেতু এর চাইতে বেশি কিছু করার তার দেয়া হয়নি তাকে ।

আর রবিকনের কী উদ্দেশ্যনা ! তার সমগ্র শ'কর প্রচণ্ড পরীক্ষা । আর সে যা আশা করেছে কল্য'কল য'দ সেই রকম হয় তাহলে কুইনকুয়ার্ট্‌-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা করার কিছুই হইবে না স্তম'নকে য'ন সে গণিত ভাবে তার অভ্য'প্রায়ে'র কথা জানালে, তখন সে মজাটা দেখতে চাচ্ছে বলে ইচ্ছে প্রকাশ ক'রলে কুইনকুয়ার্ট্‌-ও দেখ'নে উপস্থিত থাকবে কথা দিলে ।

রবিকন্ গোটা স্বাস্থ্যবট জেগে কাটিয়ে দিলে হৃৎকৃত্য প্রস্তুত করতে ।

আপনার যদি জানতে চান রবিকন্‌র জয়ের আশার স্থান উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলো কি না, ইতিহাস সে বিষয়ে নিঃসংশয় নয় । তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন কুইন্‌কুয়ার্ট্‌ অত্যন্ত যুঝড়ে পড়ায় এ সময়টা তার, দিকেই একটু বেশি ঢং পে পড়েছিলো সে ।

এখন তারা তিনজনেই গেল আপেলিলা সু-বোয়া-তে ।

ঘাতকটার চেহারা সব মনোহর হবার কারণে পরিচয় ছিল না । তবু মনে রাখতে হবে অভিনেতাকে চেনবার লোকের অভাব ছিলো না সেখানে । রবিকন্‌ যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে কন্‌-র ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো । সেই অজ্ঞাতগোষ্ঠী হলে পৌঁছুলে ইজারাদার তাকে অভ্যর্থনা করলে ! শুনলে এক ভালো শ্রোতৃগোষ্ঠী আশা করা যাচ্ছে শ্রোতারা এসে উপস্থিত হতে নিতে সে বিভ্রামকক্ষে বসে একটা সিগারেট খেলে ।

আটটার সময় ইজারাদার আবার দেখা দিলে ।

—সব প্রস্তুত, মিসিয়েন্‌ ।

রবিকন্‌ উঠে দাঁড়ালো ।

স্থান আর কুইন্‌কুয়ার্ট্‌কে সে দেখলে তৃতীয় সারিতে ।

তাদের দিকে একবার চোখ মারার লোভ হচ্ছিল তার ।

—ভয়মহিলা ও ভয়মহোদয়গণ —

স্বক করতেই হাজার হাজার চোখ তার ওপর নিবন্ধ হ'লো ; ঘাতকের কণ্ঠস্বরও জনতার 'পরে এক অস্বস্তিকর আড়ম্ব্রভাব বিস্তার করলে । পুরুষেরা সপ্রশংসভাবে কচুই-এর ঠেলা মারতে লাগলো পাশের লোককে, মেয়েরা— অর্ধভীতি অর্ধমুগ্ধা একদৃষ্টে চেয়ে রইলে তার পানে ।

অভিভাষণের গৌরচন্দ্রিকাটি বেশ প্রশস্ত, বিনম্র আর যেখানে সে তার বালোর কাল্পনিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলো সেখানে আবার একটা হাস্য-বসান্নক উপাদানও ছিলো । সকলে মুখ চেপে হাসতে লাগলো । তারপর অপ্রতিভ হয়ে পরস্পরের মুখের পানে চাইতে লাগলো, যেন তাদের আয়োদ দিতে এমন এক পিশাচের এই স্পর্শ তার স্তম্ভিত হয়ে গেছে । স্থান ফিস্‌ ফিস্‌ করে বসে কুইন্‌কুয়ার্ট্‌কে, বড কাহিল দেখাচি ; সুরটা মোটেই তুলতে পারেনি ও । বিবস কণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ করে জবাব দিলে কুইন্‌কুয়ার্ট্‌ : যোসো , ও হয়তো বিষম বল (Contrast)-সৃষ্টির ফন্দি আঁটে ।

কুইনকুয়ার্ট্-এর ধারণাই যথার্থ। বকায় কর্তব্যের হর্ষের ভাবটা ক্রমশঃ অস্ত হ'য়ে গেলো। সেই সবল ঘটনাগুলি তলিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর, কুৎসিত হয়ে উঠলো উপাখ্যান। শিউরে উঠলো লাগা হল, বিলম্বিত হ'লো অসংখ্য গ্রীষ্ম। নির্বাক ভক্ত মুখমণ্ডলে শেখীগুলো লুপ্ত হ'য়ে গেলো। সে দক্ষিণের যন্ত্রণার বিষয়ে বললে। অপকর্মের বিস্তৃত বিবরণ দিলে। গিলেটিনের খড়-পতনের পূর্বতন শেষ মুহূর্তগুলি প্রতিফলিত করে তুললে। অল্পতাপানলে ক্ষয়বিধারী মনস্তাপে সে চিংকার করে উঠলো—আমি নরহত্যা, আমি খুনী। ধোঁপাতে লাগল সে। আর হলের মধ্যে তখন সূচীপাতের শব্দ শোনা যেতো।

শেষ যখন হ'লো প্রশংসার কোনো বাণী উচ্চারিত হ'লো না। এ তার সাকল্যেরই নিশ্চিত লক্ষণ। জমাট স্বকৃত্যের মধ্যে নত মস্তকে অপস্থত হয়ে গেল সে। তবু কেউ একটু নড়লে না। শেষে প্রেস প্রতিনিধিরা জ্যাকস্ কর অতুলনীর সাকল্যের বিষয় ঘোষণা করতে ছোটোপুটি করে এসে জুটলো।

রবিকনের জর জয়কার! কুইনকুয়ার্ট্-এর অভিনন্দন কী আন্তরিক, কী সুমিষ্ট তারিক সপ্রশংসা সুসানের! এ ছাড়া আরো একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছিল তার অন্তে—যে-সে কথা নয়, মার্কু'ইল স্ত থেবেনিনের কাছ চলে একটি কার্ড। তাতে তাঁর বাড়িতে রবিকনের দর্শন কামনা করা হয়েছে।

বা বা, উল্লাসে রবিকন্ চিংকার করে উঠলো একজন রাজা রাজবার নেমস্তর। বোঝা যাচ্ছে কী কাণ্ডটাই করেছে, তাই না?

—কে হে লোকটা? জিজ্ঞেস করলে কুইনকুয়ার্ট্,—মার্কু'ইল স্ত থেবেনিনের কথাতো শুনিনি কখনো!

তোমার শোনা-না-শোনার কিছু এসে যায় না, রবিকন্ উত্তর করলে। —ইনি একজন মার্কু'ইল। আমার সঙ্গে কথা বলতে চান! এই গৌরব লবধা গ্রাহ্য। আমি নিশ্চয়ই যাবো।

একটু ফোতোবাবু ধরণের সে, তাই দৃষ্টান্তে একটা কেয়টি গাড়ি নিলে সংগে।

পথ অল্পই। গাড়ি যখন এসে-থামলো, জমিদার গৃহের সাধা সিঁথে আকার মেখে বিস্তৃত হল সে। একটা সাধারণ বাসগৃহের অতিরিক্ত কিছুই নয়। একটা চাষাডে লোক ভেতরে একত্রে নিয়ে গেল ওকে। সে ঘরে

অতিথি-আপ্যায়নের ক্ষেত্রে একঝোড়া বাতি আর একটি লাঙ্গল রাখীত আর কিছুই নেই। বাতিদানিটি কিন্তু বেশ তাঁরি আর চৌপ্যাবিহিত। অতঃপর জানানো হ'লো ম'সিয়ে ল্য মার্ক্‌ ইন্‌ চিকিৎসককে আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছেন। আর সে ক্ষেত্রে কয়েক মিনিটের মতো ম'সিয়ে ক'ব বৈধ তিকা করেছেন।

রবিকন্‌ বাত্যাধারটির আন্তরিক গ্রন্থাঙ্গা করলে। তবু ভাবতে লাগলো স্থানান্তর সঙ্গে নৈশ ভোজে যোগ দেয়াটা আরো আবশ্যিক হ'তো।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। মার্ক্‌ ইন্‌ ড় বেবেলিন একজন স্ত্রী — এতো স্ত্রীর যে যখন তিনি টলতে টলতে এগিয়ে আসছিলেন মনে হচ্ছিলো বুঝি মাটিতে পড়ে পড়িয়ে যাবেন। গাঢ়চর্ম হরিত্রাবর্ণ, লোল। মুখ গেছে বসে। মস্তক ধূসর। বিবলকেশ। আর এই আজব মুখ থেকে উকি বাগছে দুটো চোখ। যেন উন্মাদের চোখ।

ম'সিয়ে, আমার বিলম্বের ক্ষেত্রে বাব্বার ক্ষমা চাইছি। — নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। — আজ সকালে যে উত্তেজনা হয়েছিল অন্তঃকালের দক্ষণ ভাঙে বড় অবসর হয়ে পড়িছি। হল থেকে ফিরে চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন মনে হ'লো। চমৎকার হয়েছিলো আপনার বক্তৃতা, ম'সিয়ে ক—অতীত হৃদয়গ্রাহী এবং জ্ঞানগ্রন্থ; কখনো বিস্মৃত হব না আমি।

রবিকন্‌ মাথা নত করে এ-সম্মান গ্রহণ করলে। — বহু ম'সিয়ে ক, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! একটু মদ দিই আপনাকে। আমার মস্তকর্ণ নিবিড়। আমি হতভাগ্য অতিথিসেবক। কিন্তু বয়েসের কথা বিবেচনা ক'বে ক্ষমা করতে হচ্ছে আমার।

ম'সিয়ে ল্য মার্ক্‌ ইন্‌ এর অতিথি,—অল্পকালের বললে রবিকন্‌, ক'তো বড়ো শৌভাগ্য, কতো বড়ো সম্মান যা — মানে—। আহ্— কষ্টে একটা নিশ্বাস ফেললেন মার্ক্‌ ইন্‌। অতি শীঘ্রই আমি সেই গাজো দাস্তি, যেখানে লক্ষ্য জীবই যথার্থ সমস্যাগাঙ্গাম্ব, ক্রিস্টিয়টেরাই যেখানে একমাত্র সত্যস্বর। আপনাকে এখানে আহ্বান করেছি আপনার দুর্ভাগ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা—বিশেষতঃ সেই একটি অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে। আপনি বক্তৃতার ভিত্তর দেখিয়ে বলে একজনের প্রাণবন্তের বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। সে প্রাণপণে লড়াই ক'বে হয়েছিলো, তাই না?

—এমন সহস্র প্রশ্ন যবের দোরে আর কখনো পাঠাইনি আমি!—

জাহিরে জাহিরে বারগীতির আখ্যায় নিতে নিতে বললে রবিকন্ ।

—হা ! এতোটুকু ঢকল হয়নি ? বাহুবের মতোই এগিয়ে গৈছিল সে
সিলোটিবের দিকে— ?

—বীরের মতো বলুন ! —রবিকন্ বলে কেললে, 'কিছা না' জেনেই ।

—এইতো চাই—মাকু'ইল বললেন, 'বা' হওয়া উচিত তা'ই হয়েছে !
আর কোনো বন্দীকে এমন বীরত্বের সঙ্গে মরতে দেখেননি ? —কর্তব্যের তাঁর
হৃদয়ট গর্বের পরিচয় ছিলো ।

তার বীরত্বের কথা আমি 'সর্বদা প্রকার' সঙ্গে শ্রবণ করবো,—বললে
রবিকন্ । ব্যাপারটা তার কাছে ইয়াদি ঠেকলো ।

—সে সময় আপনি এর সম্মান দিয়েছিলেন ?

—বুঝলেম না, ম'সিয়ে লা মাকু'ইল ?

—আমি জানতে চাই আপনি সে-সময় এই শৌর্যের যোগ্য সম্মান দিয়ে-
ছিলেন কিনা, আপনি কি তাকে সকল প্রকার অযথা যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি
দিয়েছিলেন ?

—যন্ত্রণাতো কিছু নেই,—বললে রবিকন্ । —খাঁড়াটা এতো ক্ষিপ্রগতিতে
পড়ে যায় যে,—আমন্ত্রক একটা অসহিষ্ণুতার ভগ্নি প্রকাশ করলেন । আমি
বলছি মানসিক যন্ত্রণার কথা । আপনি কি বোঝেন না 'স্থপিত' জঘন্য মৃত্যুর
হওজাপ্রাপ্ত একজন নির্দোষ লোকের মনের অবস্থা ?

—নির্দোষ ! তা যদি বললেন, শু বকম ওয়া সবাই বলে ।

—সন্দেহ করচিনে । ভিক্তর কিত সত্যই বলেছিলো । আমি জানি ।
আমার ছেলে সে ।

—আপনার ছেলে ? খতমত খেলে রবিকন্, তরে বিহ্বল হয়ে পড়লো ।

—আমার একমাত্র পুত্র ঐ একমাত্র জীবন পৃথিবীতে থাকে আমি ভালো
বাসতেম, হা সে নির্দোষ-ই বটে ।

—ব'নিরে ক, আর আপনি তাকে হত্যা করেছেন, আপনাবই হাতে
প্রাণ হারিয়েচে সে ।

আমি—আমি আটনের গোলায় মৃত, রবিকন্ ভোতিলাভে লাগলো ।—
আমি নিজে বন্দী নই তার গুর্ভাগোধ জন্তে ।

আপনি স্বকলভার সঙ্গে চমৎকার এক বক্তৃতা করেছেন, ব'নিরে ক,—
চিন্তারময় হয়ে বললেন মাকু'ইল,—আপনি যা যা বলছেন সব আমি বিশ্বাস

করি -‘আপনিই তার হতা।’ আশা করি, সবটা আপনার কঠিনমত, হ’লিবে
ক ? ওটা অহেলা কৰবেন না !

—স্বপ্ন ? —অভিনেতা ইচ্ছাতে লাগলো। কাপতে কাপতে উঠে
দাড়ালো। বুকেচে সে।

—ওতে বিব মেশানো আছে,—নিবিকার ভাবে বললে বুদ্ধ ঘণ্টা
থানেকের মধ্যেই আপনার ইহলীলা খতম।

—হা ভগবান ! রবিকন্ কেঁদে ফেলে। আগেই সে কেমন কেমন
বোধ করছিলো। বক্তৃতি হয়ে গেছে। সমস্ত অবসর তারি হয়ে এসেচে,
চোখের সামনে সে প্রভচ্ছায়া দেখতে লাগলো।

—ঈ, আপনাকে ভয় করার কিছু নেই। — বলে চললেন তিনি,
—আমি দুর্বল, কীণজীবী, আত্মবিক্ষা কণার ক্ষমতা নেই আমার; কিন্তু বল
প্রকাশে কিছুই ফল হবেনা আপনার। বুদ্ধই করুন আর মুছাই যান, যা’
খুলি কখন, কাল আপনার ঘনিয়ে এসেচে।

কয়েক মুহূর্ত তারা বিমুঢ়ের মতো চেয়ে রইলো পরস্পরের পানে -
অভিনেতা ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আমন্ত্রকের ওষ্ঠে উন্মাদের হালি। তারপর
সেই উন্মাদ দাঁত থেকে ধীরে ধীরে মলমলিত পটির আবরণ উন্মোচিত করলে,
তারপর ফেলে দিলে মুখের আবরণ আর মাথা থেকে তুলে নিলে পরচূলাটা।

যখন গোটা কাহিনীটি প্রকাশ পেলো, উৎকল পাঠী অভিযমত হয়ে
হয়ে কুইনকুয়ার্ট্কে দান করলে বিজয়চিহ্ন, কারণ রবিকন্ যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীকে
বোকা বানিয়েচে, কুইনকুয়ার্ট্ বোকা দিয়েছে স্বয়ং রবিকন্কেই।

রবিকন্ যৌপানিমিত্ত সেই দীপধারাটি কিনে আনলে যা সেদিনের
ঘটনার জন্তে ভাড়া নেয়া হয়েছিলো—এবং কুইনকুয়ার্ট্ আর স্থানকে তাদের
বে’র দিন সেটি উপঢৌকন দিলে।

একটি সর্বজনীন উৎসব/সাধনা বন্দোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মের মূলে আছে বিভিন্ন প্রকারের আনন্দ, বাস্তু ও সমষ্টিগতভাবে।
এই ধর্মের মূল এবং একমাত্র উপাদানও আনন্দই। হিন্দুমতেই জানে তার
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আনন্দেই। ‘আনন্দাৎ’ সে জাত, আনন্দেই সে জীবিত,
আবার আনন্দেই তার লয়। আনন্দই তার অন্তরের অঙ্গভূতি। তার অন্তর-
নয়ন

কাপটুংগ ও পেনাটাতে তার বিভিন্নপ্রকার আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আর আনন্দ এমনই এক জিনিষ যা একা উপভোগ করা যায় না। বিভাজনেই হয় তার প্রকৃত উপলব্ধি। ব্যক্তির থেকে সামাজিক আনন্দ তাই সত্যরূপে তৃপ্তি দেয় বেশি। আমাদের বিভিন্ন প্রকার উৎসব এই আনন্দেরই প্রতীক।

পারিবারিক আনন্দ আরও তৃপ্তিকর হয় সর্বজনীন আনন্দে তা বিদ্যুত হ'লে। তাই দুগ দুগ ধরে ভারতবর্ষে সর্বজনীন উৎসব চলে আসছে। আমরা দেখি শুধু ভারতবর্ষ বা নেপালের হিন্দুদের মধ্যেই নয় সূর্য ও অতীতে একদিন যেখানে যেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার লাভ করেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার, যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার, কালের এবং ধর্মের পরিবর্তন হলেও আজও পরিবর্তন হয় নি সামাজিক সর্বজনীন উৎসবের। কঠোর ইসলামধর্মী বা বৌদ্ধ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রামলীলা উৎসবই আজও সবচেয়ে বড় উৎসব।

শুধু বাংলা দেশেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আজও ছড়িয়ে আছে বার মাসে তের পার্বণ। প্রদেশ বা তিথি অনুযায়ী হয়ত একই ধর্মীয় উৎসবে সময় ভেদ হয়েচে কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু নীতিগত পার্থক্য কোথাও দেখা যায়নি। শুধু একটি উৎসব সমস্ত ভারতবর্ষে একই দিনে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং তা হল 'বিজয়াদশমী' বা 'দশেরা'। বাংলাদেশের 'দশহরা' নয়, তা গঙ্গাপূজা। দেবী দুর্গার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। উত্তর বাংলার বিজয়াদশমী মূলতঃ বিসর্জনের উৎসব। কিন্তু ধ্বংসের মাঝেই তো সৃষ্টির বীজ নিহিত। তাই আমাদের বিজয়াদশমী বিসর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ঘাষিত হ'লেও তারই মধ্যে রয়ে গেছে মিলনের সূত্র।

সত্যই এতবড় সামাজিক মিলনোৎসব বাংলাদেশে আর নেই। কি শত্রু কি মিত্র পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যেন উপনিষদের শাস্ত বাণী—সর্ব-ধর্মিং ব্রহ্ম—প্রমাণ করে এ-উৎসব। অবশ্য খড়্গপুরে রাবণবধের উৎসব বা পূর্ববাংলার 'বাইচ' প্রতিযোগিতা কিছুটা বীরত্ব প্রকাশেরও আভাস দেয়।

খড়্গপুরের রাবণপূজার অবশ্য অল্প প্রদেশের ভাবধারার সংস্পর্শও আছে। স্বাভাবিক ও, কারণ খড়্গপুরে বাঙালির থেকে অবাঙালিদের সংখ্যাধিক্য। শুধু তাইই নয়, বাংলার বাইরে যেখানেই রয়ে গেছে বাঙালি সম্প্রদায় সেখানেই বিজয়াদশমীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'বিজয়া সন্মিলন' উৎসব। মূল উৎসব রয়ে গেছে গৌণ হিসাবেই।

‘উৎসব প্রিয়ারি মহাযাত্রা’। মাহুয় ম্যাজেই উৎসব ভালবাসে। - বৈকদিন
জীবনের গভীরত্বকে বেকে উদ্ধার পেতে মাহুয় উৎসবের আয়োজন করে।
কিন্তু ভারতের কৃষ্টিই হ’ল দিবে আর নিবে, মিলাবে মিথিবে যাবে না কিরে।’
অর্থাৎ এক সফর সভ্যতাই ভারতের সভ্যতা। তাই প্রদেশভেদে একই
উৎসবে, এমন কি এই বিজয়া দশমীরও বহু রূপভেদ দেখা গেছে। স্নান, কাণ
পাত্র এবং আকলিক কৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

উত্তর ভারতে এইদিন খড়্গাপুষের মতই রামের হাতে রামণের মৃত্যুকে
উপলক্ষ্য করে হয় রাবণবধ উৎসব। দক্ষিণ কেরালার হয় চূর্ণার নয় সরস্বতীর
পূজা। আর তামিলনাড়ুতে মুকগানের পা মুরগের বা কাতিকের পূজা।
প্রথম ও তৃতীয় ক্ষেত্রে মূলে আছে শাস্তি নয় মুক্তির প্রেরণা। স্বাভাবিক ও।
মূলতঃ রামায়ণ মহাকাব্যের ভিত্তি ও আর্থ ও অনার্থের সংঘাত। এখানে
অনার্য কথাটার অর্থ এই নয় যে তাঁরা আর্থদের থেকে কোন অংশে হীন
ছিলেন, কথাটার অর্থ হল যারা আর্থ নন। উত্তর প্রদেশ ছিল আর্থদের
বাসস্থান আর তামিলনাড়ু আব্রিড়দের। সেই অতীত মুহুর্তে স্মরণ করেই
আজও তাঁরা উৎসব করে চলেছেন।

রামায়ণ রচনাকারী মহর্ষি বায়ীকি ছিলেন আর্থ বংশোদ্ভব। তাই
আব্রিড়দের তিনি সুনজরে দেখেন নি, যেমন, অন্ন, বস্ত্র, কলিজ এবং প্রাণ-
জ্যোতিষপুষের মাহুয়দের। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারদের মত তাঁদের চিত্রিত
করেছেন আর্থদের প্রেরণ প্রমাণ করতে। আজ এতদিন পর হয়তো তাঁরাই
প্রত্যুত্তরে তামিনাড়ুতে ঠিক এইদিনে রাবণবধের পরিবর্তে রামবধের উৎসব শুরু
হয়েছে। ভিতরের নীতি বা উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, উৎসব কিন্তু ঠিক
সমান ভাবেই চলে আসছে।

এই উৎসবের সমারোহ সবচেয়ে বেশি হয় উত্তর প্রদেশ। নেতৃত্ব অবশ্য
করেন নারীরাই বেশি। মন্দিরাস্থিত্রথে যে শোভামাত্রা যায় তারও পুরোতাগে
থাকে নারীরাই। তারা মাথায় জল ভরতি কলসি ও কিছু যবের শিশুকে
নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে মন্দিরের দিকে, পেছনে থাকে পুরুষের দল।
মন্দিরে ঠিক চোকবার আগেই পুরুষেরা নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করে সঙ্গে
নিয়ে যাওয়া লোহার শেকল দিয়ে। এ অনেকটা আমাদের খিবেয় সাজনের
মত। এ দিনের শেষের অহুস্তান আরও দেখতে পাই মধ্যপ্রদেশের কিছু
অংশে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম উড়িষ্যাতেও।

অযোধ্যা কাশী ও কানপুরে এই উৎসবের সমারোহ হয় প্রবচনে ত্রৈণি । সবে সবে দেখান হয় বাবণবধও । বুদ্ধেলখণ্ড ও মহাকোশলে আত্মদেব কৃষ্ণকে অঙ্করণে নিষ্ঠুর চিত্তেরও অবতারণা করা হয় । এমন কি বিপকুট জিন্দ-ও বাবহার করা হয় ওষ্ঠভেদের জন্ত । এই দিনই ওখানে গুয়ের হোপণ উৎসবও অর্হতিও হয় । যথাশ্রদেশের বহু অকলে এই বিজয়া দশমীর দিনে যুয় দেখবার জন্ত ঠেলাঠেলি পড়ে যায় । ওখানকার লোকদের ধারণা এদিন যুয় দেখলে নাকি সাগাবছড়াই ভাল চলে ।

যথাশ্রদেশের গোণ্ডরা (Gonds) সীতাকে দুর্গা বাখেরমাই হিসেবে গণ্য করে । তাদের মতে রাম সীতাকে ত্যাগ করেন দুমুখের কথা শুনে ময় রামচন্দ্রের বোন শান্তার জন্তে । শান্তা নাকি একদিন সীতাকে বার বার অহুরোধ কবে বাবণ কেনন তা ছবিতে এঁকে দেখাতে । প্রথমে সীতা রাজি হননি । কিন্তু বার বার বলাতে গোবর দিয়ে বাবণের ছবি আঁকা শুরু করেন । ঠিক সেই মুহূর্তেই রাম সেখানে এসে পেঁছোন । সীতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাকে ঢাকতে কিন্তু পাবেন না । এবং তাও শান্তার জন্তেই । কষ্ট রাম সীতাকে সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাসনে পাঠাবার আজ্ঞা দেন লক্ষ্মণকে ।

গভীর অরণ্যে অবসর গর্ভবতী সীতাও যখন নিজাতক হয় তখন দেখেন তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট বাঘ । হঠাৎ ভয় পেয়ে যাবার ফলে জন্ম হয় লব আর কুশের । এমন সময় দুজন গোণ্ড সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁরাই সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন । সীতার অহুরোধেই লবকুশের জন্ম, রামকে ভানান হয় না ।

অনেক গোণ্ড আবার বাবণকে দুগা কথা তো ছুঁবের কথা পূজো করে । তাদের ধারণা, তাদের আদিপুরুষ বাবণ । মান্দালা আর বালাঘাট অকলে এমনি অনেক গোণ্ড দেখা যায়, যেমন দেখা যায় অন্য অকলে অনেক গোণ্ড, যারা রামকে মহাদেব বা অবতার হিসেবে পূজো করে । দু'রকম গোণ্ডই কিন্তু এইদিনে সীতার পূজো করে দেবী দুর্গা হিসেবে ।

রাজস্থানের অধিবাসীরা বিশেষ করে ভীলরা বিজয়া দশমীর দিনে আহেব্রিয়া উৎসব পালন করে । অথচ অস্তান্ত জায়গার আদিবাসীরা ঠিক এই পূজোই করে মকর সংক্রান্তির দিনে । এই আহেব্রিয়া উৎসবের প্রধান অংগ হল যুগয়া । তাদের ধারণা শিকার ব্যর্থ হলে সমস্ত বছরটাই ব্যর্থ হবে । কিছু সংখ্যক মোষকে সাঝা বছর ধরে জিলাপি ও ছুধ খাইয়ে তাদের বলিষ্ঠ করে

তোলা হয়। তারপর তাদের দ্বিধে লড়াই করার রাজপুত্র আর কীলগা।
 মেয়েরা সমস্ত দিন উপবাস করে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ভৈরী করে এবং
 সন্ধ্যার সময় এই সমস্ত মূর্তির পূজা করে।

মহারাষ্ট্রে এই দিনের উৎসবের নাম 'শিলংনগণ' বা 'শিমোলঘন'। এ
 উৎসবের বিশেষত্ব হল জোর করে অস্ত্রের জমি দখল করা। বলি দেওয়া
 হয় ঘোষ ও ছাগল, আর নিহত পশুর দেহ দিয়েই প্রস্তুত হয় সীমানা রেখা।
 রাজস্থানেও, কোথাও কোথাও এ উৎসব হয়। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের অধি-
 বাসীরা এইদিন শরীরক্লেশ পূজা করে। তবে শুধু শরী নয় থাকে টিলি,
 জোয়ার আর মাল্যের পাতা। সেই পাতাতেই আবার প্রস্তুত হয় মালাও,
 আর সেই মালা দিয়েই পূজা হয় গণপতিবর। তারপর দুর্গার।

দক্ষিণের সবশ্রেষ্ঠ উৎসবই হল এইদিন। সেখানেই উৎসবের নাম
 'হুসেরা'। হুগ হুগ ধরে এর সমারোহেরও শেষ নেই। কিছুদিন আগেও
 স্বয়ং মহীশূর অধিপতি রাজহস্তীতে চড়ে বিশাল শোভাযাত্রা পরিচালনা করতেন।
 শোভাযাত্রা মন্দিরে পৌঁছলে প্রথম পূজাও দিতেন তিনি। শোভাযাত্রার সঙ্গে
 সঙ্গে চলতো দুর্গালীলাও। পৃথিবীর বহু জায়গা থেকেই অগুরু শোভাযাত্রা
 দেখবার জন্য অসংখ্য রকমের ভীড় হতো।

এমন কি মুসলিম হুগেও। অর্থাৎ হারদার আলীর সময়ও এই উৎসব
 ঠিক এমন সমারোহেই হতো। স্বয়ং হারদার আলী নিজেই পরিচালনা করতেন
 শোভাযাত্রা এবং মন্দিরে পৌঁছে দেবী মূর্তির কাছে প্রার্থনা করতেন নিজের
 এবং বাজার মজলের জন্যে। বিভিন্ন স্থান থেকে আসতো বিভিন্ন মজবীররা
 তাদের নৈপুণ্য দেখাতে। পারিতোষিকও দেওয়া হতো মুক্ত হস্তে।

বাস্তাবে এইদিন পূজা হয় দণ্ডেশ্বরী দেবীর; এখানে প্রবাদ আছে যে
 একদিন ঐরাবতের রাজার ছোট ভাই অনারদেবের সঙ্গে রাজার ঝগড়া হয়।
 অনারদেবের কাছে নাকি ছিল একটা পরশপাথর বহরাজাই তারজন্তে অনার-
 দেবকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। তিনি ঠিক করেন বাস্তাবে চলে যাবেন।
 আসার পথে, ভয় পেয়ে গোদাবরী ও ইন্দ্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে পরশপাথকে
 ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দেবী দণ্ডেশ্বরীর আবির্ভাব হয়। তিনি
 অনারদেবকে বলেন এগিয়ে যেতে এবং নিষেধ করেন পিছনে তাকাতে।
 এও জানান তিনি অনারদেবের পেছনে পেছনে যাবেন।

অনারদেব ঠিকই চলতে থাকেন। বগাবরই জনতেও পান পিছনে এক

নদীর উপর শব্দ । কিন্তু তাঁর ছুঁতাকা থাকনী ও থাকনী নদীর মোহনা পার হওয়ার সময় ছুঁতাক শব্দ খেঁষে যায় । বাধা হয়েই তিনি পেছনে তাকান কি কারণ দেখবার জন্তে । দেবী তখন অন্যমনস্কভাবে জানান যে তিনি সেই-খানেই থাকবেন । তবে দশহরা নবমীতে রাজা বা তাঁর বংশধররা যেন তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যান । আজও তাই এখানে পূজা হওয়ার পর দত্তেশ্বরীর মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় রাজপ্রাসাদের মন্দিরে । তারপর মহাসমারোহে দশেরা উৎসব পালিত হয় বাস্তব রাজপ্রাসাদে ।

মাস্রাজেও এইদিন মহাসমারোহে পূজা হয় প্রভু মুকগানের বা মুকগের । তাঁর অস্ত্র হল তাঁর ধনুক এবং বাহন ময়ূর, অনেকটা আমাদের কাঙিকের মত । তাঁকে পুশি করবার জন্তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও রূপোর তাঁর দ্বিগে ওঠে তেদ করে নাচতে নাচতে মন্দিরে যায় পূজা দিতে ।

এইদিনেই আবার অকুণ্ঠিত হয় শবরোৎসব । শবর ও অস্ত্রান্ত অনার্য যথা দস্তা, ক্লিয়র, ববর ইত্যাদির পূজা । এ পূজার অকুণ্ঠকবলীর অস্ত্র হল অস্ত্রকে অশ্রাব্য ভাস্বর গালাগাল করা । এ পূজার বৈশিষ্ট্য হল গায়ে কাছা মাথা এবং পাতার দেহাবরণ ব্যবহার করা । এ অঙ্গগুলি নিশ্চয়ই আর্থ-কৃষ্টির পরিচয় নয় ।

মাই হোক এককবার আসমুহ্র তিমাচলে একই দিনে এবং একই তিথিতে এইরকম সবজনীন অকুণ্ঠান অতীতের বৈভবের মধ্যে ঐক্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । ঠিক এইরকম অকুণ্ঠান আর নেই । ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে এই অকুণ্ঠান পালিত হলেও সময় এবং তিথির এই অপূর্ব সামঞ্জস্য অস্ত্র হিন্দু পূজাপার্বণের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না ।



বাউলা ও বাউলীর
সেরা উৎসবের দিনগুলি
আবার ফিরে এসেছে ।
এ কটি দিন সবার
জীবনে আনন্দ আনন্দের
মূর্তি । যাঁরা যাঁরা
— তাঁদের যাত্রা হোক
নির্বির । প্রবাসের
দিনগুলি হোক মধুময় ।



পূর্ব রেজাওয়ে

অন্ধরের যুধোন

(Bertolt Brecht-এর The Mask of Evil-এর অনুবাদ)

অনুবাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার দেয়ালে ঝুলছে

জাপান দেশের সোনার জলে

খোদাই করা

এক অন্ধরের যুধোন ।

আমি গভীর সহাতভূতির সঙ্গে

লক্ষ্য করি

তার কপালের ফুলে ওঠা শিরা-উপশিরাগুলিকে,

যা স্পষ্টই জানিয়ে দেয়

খাটি অন্ধর হ'তে হ'লে কী পরিমাণ অায়ুর চাপ

একজনকে সহ করতে হয় ।

দু'টি অলিখিত গান

(ক্যামেরোলাইন বীপল - মাইক্রোনেশিয়ার আদিম লোক সংগীত)

সংগ্রহ ও অনুবাদ : লখাই কিস্কু

১। বন্ধু আমার হুম দিও না ভেঙে

হুমের নেশায় হুঁদ হয়েছি, দেখ ।

রূপমতী সাগর থেকে আমি

এসেছিলাম ; এই মিনতি শুধু—

লক্ষী আমার এখন ফিরে যাও ;

তুনবো ভোরে পাখ-পাখালির গান ।

২। ইয়া গো ইয়া, সেই সে জোয়ান ছেলে,

আমাদেরই জাতির ।

তার কাছেই লুটিয়ে দিলাম

আমার ভালোবাসা ;

মন যে আমার ওকেই বাসে ভালো ।

যে দিন ওকে প্রথম আমি দেখি—

সে দিন হাফুৎ বুকে আমার বাধা ।

এখন শুধু ইচ্ছে আগে মনে—

চাঁদের মত সুখ থেকে তার —

জল করে নিই পান —

কিন্তু, না গো না —

কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি না ।

কাবণ, আমার দুটি চোখের জল

যাচ্ছে মিশে সমুদ্রের তল ।

শব্দের জটিল ভাঙ্গকারে

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

এক একটা শব্দের মধ্যে খুঁজে পাই নিজের সত্যকে

আবার নূতন ক'রে, যেমন 'নির্জন' এই কথা

নিরে যায় দিগন্তকে অতিক্রান্ত পেরিয়ে আমাকে

কী এক শব্দের মধ্যে যেখানে শুধুই নীরবতা ।

হৃদয়ের উপকূলে তখন 'সৈকত' এই ধ্বনি

আমাকে ফিরিয়ে আনে মৌনের অন্তঃস্পর্শ থেকে

উমিল সমুদ্রবুকে কোলাহল ওঠে অহরনি

ময়ূরপঙ্খী ভাসে, বলে আর যাবি তোরা কে কে ।

সহসা 'নারিক' এসে মারপথে বলে, দেখ চেয়ে

ভ্রমোগ ছেয়েছে দিগ্‌দিগন্তের সৈকত নির্জন,

তোমার ময়ূরপঙ্খী কঙ্কায় কেলেছে দেখ চেয়ে,

বল যদি ফিরে যাউ যেখানে তোমার অন্তরন ।

আমার নিজের সৃষ্টি শব্দের জটিল অঙ্ককারে

চেনা অচেনার অশ্রু চলি আর খামি বায়ে বায়ে ।

অমাজিত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পূরাণো চিঠি ছিঁড়তে গিয়ে কান্না বাজে,
অথচ ঘর ক্রমেই কুলাকার,
শেষে একটা ভালোবাসার চিঠি হঠাৎ
ভেবে পায় লাগি মেরে ঘরের বাইরে অ'মায়
ছুঁড়ে দিল । আমি আবার ঘরের মধ্যে যাবার
স্বযোগ খুঁজছি । যাকে আমি ভালোবাসি না তাকে একশাইন
ভালোবাসার চিঠি লিখলে আবার আমি ঘরের কাছে
গৃহীত হবো ? একটি চিঠি আছে আমার বৃকের জামায় ॥

মানুষ এখনো বেঁচে আছে
বলরাম রায়চৌধুরী

পৃথিবীতে মাতৃষের অগণিত রক্তাক্ত ঝাঁচ
তবুও পৃথিবী আলো প্রভাষের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর,—
তবুও পৃথিবী অমলিন
এখনও ভূমিট হয় এইখানে মাতৃষের আশ্রয় স্থান ।
যজ্ঞগার হৃদ ছেড়ে উঠে আসি সেই এক আলোকিত হৃদয় সকালে,
পাখিদের গান শুনি, ফুলফোটা দেখি চেয়ে
আন্দোলিত সব ডালে ডালে,

চোখ মেলে চেয়ে দেখি সব,
বাসের নবম বৃকে আবর্তিত পৃথিবীর কান্দিহীন কড়র উৎসব,
চলে, যাই পায় পায় মাতৃষের অবিস্মৃত কাছে
মনে হয় পৃথিবীতে মাতৃষ এখনো বেঁচে আছে ।
কারা আসে হুগে হুগে পুরাতন এই পৃথিবীতে
মাতৃষের যজ্ঞগার সব রক্তস্রোত মুছে দিতে,
জেলে রেখে যায় কারা বিশ্বাসের অনিবার্য আলো অন্ধকারে
বিপর্যস্ত মাতৃষের পথের দু'ধারে

মাহুৰ

কবিরুল ইসলাম

মাহুৰ অজানা থাকে ঘৰে পৰে দুস্তৰ প্ৰবাসে
মাহুৰ অচেনা থাকে গাছতলাৰ বিকল বাতাসে :
এট বাগধান শুধু স্নিগ্ধ হ'য় জ্যোৎস্নাৰ আবেশে
স্নিগ্ধতা অথবা তাৰ শাস্ত্ৰীৰ জিনয়নে জেগে ।

ঘৰে পৰে গাছতলাৰ ডুয়োবৰ্শনে
মাহুৰে মাহুৰে চেনা বয়স্ক বয়নে ।

ফুলেৰ দৌৰাশ্বো ভৱে দেয় ৰাভেৰ প্ৰহৰ
ব্ৰজগোপাল ৰায়

কিছু কিছু শব্দ আছে কখনো কখনো যা প্ৰনিয়ম
কিছু কিছু স্মৃতি হ'য়ে যায় ঠিততাল
সময় সময় ।

কিছু কিছু মুহূৰ্ত আশে
কখনো কখনো হঠাৎ...হঠাৎ —
এক অবাচীন প্ৰতিযোগী ধৌড়ে হাঁপিয়ে
অৰ্ধচ সীমাৰ পৰ্যাপ্তিশেষে
সমাস্তৰাল দুৰত থেকে যায় এগিয়ে পিছিয়ে ,
অবলীলাক্ৰমে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে
হেঁচট লাগে মনেৰ বুড়ো আঙুলে
বুকেৰ অৰ্গল বুলে হুড়মুড় খ'লে পড়ে
আকাশ । ...সপ্নালু জোছনায় নড়ে চড়ে
শেষ ৰাভেৰ একাকিনী টান ।

এবং অকস্মাৎ

চৌকাঠ ভিকিয়ে ঘণ্টা বেজে শুঠে প্ৰাৰ্থনাৰ
অধীক নিখিল হাতেৰ কেটে মুহুৰ্ত মুহুৰ্ত ,
একদিন কিছু সে-ই অস্ফুট সিঁড়ি বেয়ে

শাহীদ চেডনিক, ১৫৯৯

মাস্ত : পদ্মা : বিস্তৃত

সনাতন মিত্র

এমন অনেক বাহুব বাবা ঝোলে আহ্নেৰ অৰলেনে
বইছে হাওয়া বধন ঘেমন বলেন কথা সেই মত
হাতায়াতি মশের প্রতি অহুবাগের কম হলেনে
গাল ফুলিয়ে মধুর বাণী বেড়েই যাবেন মশ মত ।
ভাবখানা ঠিক এমনিধারা আগুন যদি লাগে চালেও
নিজের গায়ে আঁচ না লেগে ছড়ায় যদি ছড়াক ভে
প্রতিবেশীর ঘরের চালে ঐ শিখা লকলকালেও
ভাবনা কিসের নিজের গায়ে ছড়াচ্ছে না তার মত ।

প্রতিবেশীর আত্মীয়তা ভুলেই যে যান একবারে
ওনারই ঘর দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবেশীর ছায়ায় যে
খোকাখুকু দুই উঠোনে বুবে বেড়ায় আল্লাহে
সত্যি যদি লাগে আগুন ঐ বাড়ি দুটিনিম্ন বাদে
বাঁচবে কি তার বাড়ি, খোকা ? আগুন ছোটো হাওয়ার যে
আগুনটাকে কথতে হ'লে সহযোগেই বল বাড়ে ।

একটি ঢুকী কবিতা

আমাদের কচিকাচাদের প্রতি

মূল কবি : নাজির হিকমেত্

(জন্ম তুরস্কে ১৯০২ : মৃত্যু মস্কোতে ১৯৬৩)

অনুবাদক : দীপক চট্টোপাধ্যায়

পাজি হও, খুব ভালো দেটা ।

খাড়া পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও,

উঠে যাও ইয়া বড়া গাছগুলো বেয়ে

স্বাহ কাপ্তানের মতো হাতছুটো তোমার

বেধে দি'ক তোমার বাইসিক্লেব গতিপথ ;

আর মোজাশাহেবের কাছ ন-আঁকা পেঙ্গিনটা দিয়ে
 বসিয়ে দাও কোরাণের পাতাগুলো
 তোমাকে রপ্ত করতেই হবে এই কালা মাটিকে
 তোমার নিজের বেহেস্ত বানানোর কারখানা
 তোমার ভূমিতার কেতাব দিয়ে তোমাকে বামিয়ে দিতেই হবে
 সেই লোকটাকে যে তোমাকে তালিম দেয় :

সৃষ্টির সূর্য আদমকে দিয়ে ।

তোমাকে স্বীকার করতেই হবে
 পৃথিবীটা দুবই জকরি
 তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে
 পৃথিবীটা অক্ষর অমর
 তোমার অনরিজী আর জননী পৃথিবীর মধ্যে
 পার্থক্য কৰো না
 তোমাকে ভালোবাসতেই হবে তাঁকে
 যতোটা বাসো তোমার মাকে ।

একটি নিম্নো কবিতা

আমার জাতি গোষ্ঠী

মূল কবি : ল্যাকটিন হিউজ (১৯০২—'৬৭)

অনুবাদক : ডাবলু মুখোপাধ্যায়

রাজি হৃদয়

তেমনি হৃদয় আমার জাতিগোষ্ঠীর মুখগুলি ।

হৃদয় নক্ষত্রেরা

তেমনি হৃদয় আমার জাতিগোষ্ঠীর চোখগুলি ।

স্বপ্ন হৃদয়

হৃদয় আমার জাতিগোষ্ঠীর আত্মগুলিও ।

একশো আট

শাশবীর চেতনিক, ১৩৮২

সকাল

রামপ্রসাদ মল্লিক

বাস্তব হবার সময় এটা

অকস্মিক নিভায়াজী কেবানি দেবেন বাবু

কাকচান, ছ'চারটে নাকেমুখে গোঁজা

এবং তারপরেই ন'নব্বয় বালে

পাছানিতে একচিটি স্থান

কোনোক্রমে দখল শেলেই ইহকাল খস হুয়

তেন ন আছেকটা সকাল এসে দাঁড়ালো দেবেনবাবুও সামনে ।

একটা তুফান কাক

সুপ্রভাত জানিয়ে উড়ে গেল

ঘ'ড়ে ঠোঁট ভূবিধে ঠায় ব'সে আছে

একটা শালিখ বিবল পাঁচিলে

কানিসে লেগেছে বোদ

পুঁইল শ আশ্চর্য সোহাগিনী

অপ্রতিভ দেবেনবাবু

অ-চিনি চায়ের পাত্র

শশবাস্তে ভুলে নেন তাতে

ঘ'ড়র শব্দ শ্রান

রাগাঘরে টুং টাং শব্দ

শব্দ মূর্খর হতে থাকে ।

মানুষের অবিস্মৃত বুকের শিকড়ে

চন্দ্রশেখর ঘোষ

মরে যাবো একদিন, তবু

এ বিশ্বাস সাথে নিয়ে যাবো :

যতোদিন বেঁচে গেছি, বিস্তৃত জগৎ নিয়ে

পথৰ যত আৰ ভালোবাসা নিয়ে

একটি শিক্ত গাছ বাঁচাতে চেয়েছিঁ

তুকিয়ে গেলেও সে-গাছ ক্ষতি নেই

বাঁচাবাৰ বাসনাটো আজও বেঁচে আছে।

তাই আজও পথ হাঁটি আমি

শান্ত হয়ে তোমাদের অনাস্ত হৃদয় মাঠ চিহ্নে ;

ধীৰে ধীৰে পাৰ হই সন্দেহ ও বিশ্বাসের চড়াই উত্তরাই

জানি আমি সব বাধা ছত্রাণ ক'রে

বিশুদ্ধ ফুলের মতো বেঁচে থাকবে অমল হৃদয়

মাহুৰেরই অবিচলিত বৃক্কের শিকড়ে ।

খুব কাছে থেকে

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব কাছে থেকে দেখাটা দেখা নয়

তুমি চোখ রাখা

চোখের মুখের কিংবা বৃক্কের ওপৰ

ওপৰ থেকে দেখা যায় তুমি জলাশয়

আৰ তরংগের অস্থির ললাটেরেখা

কিন্তু সেই ললাটপটেরও ওপায়ে আছে অভিশয়

নিভল তুল

আৰ সেখানে আছে এক বিশাল চিত্তল

বিশুদ্ধ হইলে একশো গজ শক্ত পুতোর

নিঃশেষ বৈধব্য

একটি নিঃশব্দ চাতাল

একটি বিশুদ্ধ মাতাল মনের বড়পি ।

একশো বর্ষ

শাৰদীয় চেতনিক ১৩৮২

ভারতবর্ষের বহু উত্থান পতনের সাক্ষী
ঐতিহ্যবাহী মুশিদাবাদের রেশম বস্ত্র
আজও মর্যাদার উচ্চ শিখরে—



প্রাপ্তিস্থান :

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি জমিতি

(খাদি ও গ্রামোন্মোচন কমিশন প্রমাণিত)

বাগড়া ও বহরমপুর • জেলা: মুশিদাবাদ

ফোন : বি-এইচ-বি ২০৮

ফোন নং : বি-এইচ-বি ১৪২

শারদীয় অভিনন্দন জানাই

স্কুল কলেজের বাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ

সময়ে সরবরাহ করি

ডুজর হুযণ কুঙ্ক এও সন্ন

বাগড়া • মুশিদাবাদ

সরকারী বিজ্ঞাপন লাভের 'উপগত' যোগ্যতা সম্ভবত চেতনিক-এর সেই।
 বেসরকারী বিজ্ঞাপনস্বত্বাধারের দাবিদায়েও প্রায়শ্চিত্ত আশ্রয়। এমন অকুশল
 পত্রিকাকে যিনি থেকে একশো টাকা দিয়ে পুজোর সঙ্গে সাজতে সাহায্য
 করতে এগিয়ে আসেন সেই অসাধারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিটি হলেন অরুণাচল
 ত্রিঅঙ্গুতোষ চক্রবর্তী। আমরা তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আর অন্য
 সমর্থ সঙ্গমর ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত জানাই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যে কোনো
 সং প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। —স, চে.

চেতনিক-এর পরবর্তী ৩য় বর্ষ ৩য় (জ্যানিউয়ারি) সংখ্যায় লিখছেন

প্রবন্ধ : অন্নদাশংকর রায়/নারায়ণ চৌধুরী/ডঃ সুধীর নন্দী ডঃ সুধীর করণ/
 ডঃ শিশির সিংহ প্রভৃতি

গল্প : বোমানা বিশ্বনাথম/বাণিক রায়

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/লখাই কিশু/কবিকল ইসলাম
 প্রভৃতি।

● 'চেতনিক' এর হয় বছরে মোট চারবার বার্ষিক গ্রাহক টাকা দল
 টাকা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। বার্ষিক গ্রাহকেরা একটি মাত্র ^{পূর্ণসংখ্যা} সংখ্যাসহ
 মোট চারটি পৃথক সংখ্যা পাবার অধিকারী। জুলাই-এ বহাও। যে
 কোনো সংখ্যা থেকে বার্ষিক গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণ সংখ্যার দাম দুটাকা
 পঁচিশ পরস। পূজা সংখ্যা চার টাকা।

- 'রিভিউ-এর জন্মে ছ' কপি বই বা পত্রিকা পাঠাবেন।
- 'আমন্ত্রিত রচনাগুলি যথাসম্ভব ছ' মাস পূর্বে এনে ভাল হয়
 অন্তিম পত্রিকা প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- উপযুক্ত কমিশনে এজেন্টরা যোগাযোগ করতে পারেন।

অধ্যাপক ডঃ সুবীর কল্লণ : 'চেতনিক' দু'টি (২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ) সংখ্যায়ই পৌঁছেছি।আপনি অন্যায় লেখন করেছেন। আপনার সম্পাদকীয় আনন্দকে পড়িয়েছি।

সুনি সানুজি : সাহিত্যে সফট বডিফরম কংগবর্শন প্রকাশ করার একশো বছর ধরে সেই এক-ই সত্যবী শব্দ থেকে 'চেতনিক' নামের দু'তম ঔপন্যাসিক পত্রিকাটির আবির্ভাব কোন বিজ্ঞান ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব ঘটেছে।আজ উদ্বারগামী সাহিত্যিক ও কবিদের অবশ্যেও যেচেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই 'চেতনিক'। সম্পাদকের এই সংগ্রহণ, তাঁর নিজের কথায়, 'অশ্লঃস্কৃতিরূপ হিবন্যকশিণ্ডর দাপাদাপির বিরুদ্ধে এতটা কিছু করা'—সার্থক হোক।

ডঃ সরোজমোহন মিত্র : 'সারদীর চেতনিক' (১৩৮১) পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। সূচিপত্রের ওপর একবার চুটি দিলেই বোকা হার আশ্রয়দেয় এই সংখ্যাটি কতো সুন্দর এবং মনোজ্ঞ হয়েছে।

ডঃ সুশীল রায় : (সারদীর চেতনিক সম্পর্কে ১৩৮০) 'রকঃশলে বলে এ ধরণের পত্রিকা বের করা সম্ভব কথায় নয়।'

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : 'দেশ পত্রিকার বাইরে এমনি একটি নির্ভীক পত্রিকার অভাব বোধ করছিলাম আরম্ভা অনেকদিন থেকে।'

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জালিক সরকার : রকঃশল শব্দে এতো উচ্চাংগের পত্রিকা অভাবনীয়!'

অধ্যাপক সুজয় পাল : ভালকাল সাহিত্যটা দু'খাত কলকাতাকেন্দ্রিক। যা যা করেন তাঁদের যদিও অনেকেই পরীক্ষা, তবু তাঁরা প্রায়ই এই উদ্বাসনিক চিন্তার ভোগেন যে কলকাতা ছাড়া বাংলার আর কোনো চিন্তনকেন্দ্র নেই, কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও তাত্ত্বিক সাহস নেই। আপনার পত্রিকা পড়লে এই উদ্বাসনিকেরা দ্বিতীয় চিন্তায় নিজে হবেন। 'চেতনিক' আপনার প্রচেষ্টার পরীবাংলা চিন্তন আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'চেতনিক' ক্রমশঃই আমাদের প্রত্যাপা বাড়িয়ে চলেছে।'

কবিজ্ঞান ইন্সলান : আপনার পত্রিকা আমি প্রথম মলাট থেকে আঙুলে ক'রে চতুর্থ মলাট পর্যন্ত পড়ে থাকি। আমি জানি আরো অনেকেই তা-ই করে থাকেন। আপনার সম্পাদকীয়গুলি অভিনব, সাহসী এবং অসাধারণ হচ্ছে।

ডঃ অমলেন্দু মিত্র : (সারদীর ১৩৮১ সম্পর্কে) : 'চরৎকার! রকঃশল থেকে এমন চেহারা, গাভবর্শ ও সৌভদ আশা করা যায় না।'

বার্নিক রায় : 'চেতনিক' দিন দিনই ভাল হচ্ছে।

ডঃ শিল্পিকুমার সিংহ : আমাদের পত্রিকার খুব সুনাম হয়েছে, তমতে পাঞ্জি বিভিন্ন মহল থেকে।

পুর্নিকাবাসেন গবর (বহুবপূর) : রকঃশল বাংলায় এই বলিষ্ঠ পত্রিকাটি সমস্ত বাংলায় জেলে এক আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত।'

CHETANIK (Progressive Lit. Qty.) SARDIYA 1382 (Year 3 Nos 1 and 2)
 Edited & Published by ATUL CHANDRA BANERJEE from P. O. & DIST.
 MURSHIDABAD, WEST BENGAL & Printed by him from Cygnus printing
 Co-operative Society Ltd. Berhampore, West Bengal.

‘চেতনিক’ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য ও আন্তরিক প্রত্যাশা :

দেলিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন)

‘.....এরকম কীপকার পত্রপত্রিকা মাঝে মাঝে পাই। তাই একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই পাতাগুলি উল্টোতে শুরু করি। কিন্তু হু’খণ্ডের (২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যার) সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মফঃসল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা বের হতে পারে ... ।’

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : তোমার এই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অভিযান সার্থক হয়ে উঠুক।’

ডঃ অমির চক্রবর্তী (ছা পল্জ) : ‘চেতনিক’ সৃষ্টিশীল প্রাণের রচনার সমৃদ্ধ হোক।

অজ্ঞানানন্দকর রায় : ‘চেতনিক’ বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায়ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই।আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকপটে নিজের বক্তব্য বলে যান। মা ফলের কথা চেন।

নারায়ণ চৌধুরী : এবারকার (২য় বর্ষ ৪র্থ) সংখ্যার আপনার সম্পাদকীয়টি চমৎকার। ছাত্রবিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে খুব-ই সময়োচিত স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে লেখাটিতে। নানাবিধ সমস্যার ওপর আলোকপাতকারী এরকম সম্পাদকীয়ই কামা।ডঃ সুবীর্ষকুমার করণের ভাষার কোথাগার একটি অনবদ্য রচনা। তাঁকে এ-জাতীয় প্রবন্ধ আরো লিখতে বলবেন।

কবি হীরালাল দাশগুপ্ত : ‘এবারের (২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার) সম্পাদকীয়টি একটি প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধ।

অর্পিত নরেন্দ্রনাথ মিত্র : ‘... ..আপনি মফঃসল শহর থেকে একটি কচিসম্মত পত্রিকা বের করে যাচ্ছেন.....এ যে কত কঠিন কাজ তা অজ্ঞান করতে পারি।‘চেতনিক’-এর একটি সংখ্যা থেকে অন্নদাশঙ্কর দায়ের লেখাটি পড়লাম। ভালো লাগলো।আপনার পত্রিকার ভিতরের বাইরের পরিচ্ছন্নতা দেখে খুশি হয়েছি।যাই হোক প্রজ্ঞার সময় একটি গল্প আপনাকে পাঠাবো।’ -আকস্মিক মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত এই দ্বিত্ব দুভয় বাস্তবটির একটি স্থানান্তরিত গল্প থেকে চেতনিককে বঞ্চিত করলো। [এর কভাবে দেখুন]

তীয় বর্ষ
তীয় সংখ্যা

চেতনিক



অনুলিপি বঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে ‘অস্বাভ-
বী’ স্থিতি বিকৃত রুচি ও চোকাবুত,

স্ববোধভাব বিকৃত অস্বাভ সংগ্রাহক
বৈশাখিক সাহিত্যপত্র ।

প্রকাশকাল : জুলাই/পূজা/জানিউয়ারি/
এপ্রিল ।

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

চেতনিক

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

◆ স্থায়ী পত্রাঘর্ষ পরিষদ ◆

সভাপতি : শ্রীঅরুণাচল রায় (কলিকাতা ৬৮)

সহ সভাপতি

ডঃ হুবোপচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ অমির চক্রবর্তী (চাপলম) অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ সান্দাল
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক তিমোক্তবিরল মজুমদার, অধ্যাপক হুবোপ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীকৃষ্ণাচার্য বসু, ডঃ সুধীর নন্দী, অধ্যাপক ডঃ সুধীর করণ ।

বিশিষ্ট সদস্যবর্গ

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজয়বিহারী পুরকার্যক,
(২৭/এটস কাঁকুলিয়া রোড কলিকাতা ২২), অধ্যাপক সুময় পাল শ্রীমণিক রায়,
ডঃ শিশিরকুমার সিংহ (আত্মারক), শ্রীসত্যেন নাচা, অধ্যাপক সৌমেন গুপ্ত,
শ্রীস্বপ্নপ্রসাদ পাল, শ্রীবিধনাথ রায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীঅরুণ মজুমদার,
ডাঃ সুশীল মজিত ।

সহযোগিতা করে থাকেন

শ্রীপুলকেশ্ব সিংহ (পাটখুনি), শ্রীঅরুণোপাল রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রীদীপক
চট্টোপাধ্যায় (পি. নি. সি. ডি. তুর্গাপুর ইন্সপাত প্রকল্প), অনীত কুমার চট্টোপাধ্যায়
(নিউটাউন, বার্ণপুৰ)

প্রচ্ছদ শিল্পী—শ্রীপকানন চক্রবর্তী

‘চেতনিক’ ৩য় বর্ষ ৪র্থ (এপ্রিল) সংখ্যায় লিখছেন

প্রবন্ধ : নারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক বিজয়বিহারী পুরকার্যক, অধ্যাপক সুময় পাল,
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প : বোম্বা বিধনাথম্ ও বার্মিক রায়

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত, পরমানন্দ সরস্বতী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ
মুখোপাধ্যায়, লখাট কিঙ্ক, কবিকল ইসলাম প্রভৃতি ।

“চেতনিক” পূজা সংখ্যাসহ মোট চারটি পৃথক সংখ্যায় জন্মে বার্ষিক টাকা ১০
টাকা । আকবায় বতর । সাধারণ ডাকে বাড়তি ২ টাকা । পোস্টার্ড ডাকে
বাড়তি ১০ টাকা । উপস্থিত কবিশনে এজেন্টরা যোগাযোগ করতে পারেন ।

চেভনিক

তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (১৯৭৫-৭৬)

প্রগতিশীল হৈমাসি সাহিত্যপত্র

প্রকাশকাল :

ছায়া/পূজা/অ্যানিউয়ারি/এপ্রিল

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পো: ও জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

সূচি

বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি সম্পাদকীয় ।

প্রবন্ধ : অন্নদাশংকর রায় / নাওয়ায় চৌধুরী / ড: শশির কুমার সিংহ / পুলকেন্দ্র
সিংহ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

গল্প : বোম্বানা বিশ্বনাথম বাণিক রায়

কবিতা : জীবলাল দাশগুপ্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/সাগর চক্রবর্তী/লখাই কিস্কু
কবিকুল ঈদলাম/বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়/সুনীল নন্দী/অনীল ঘটক/ব্রজ-
গোপাল রায় ।

সাত্তে পাঁচ : ভাস্কর শর্মা

বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি

সম্পাদকীয়

স্বরে আ স্বরে আ ।

আ সরে আ সরে সরে না শুধু মা ।

না মা, বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি । বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি পারে না ।
বদ্রিন্দাস কখনও বাঘ মারে নি পারে নি । ইতার পূর্বে বলিতে চাহিরাছিলাম
বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি । অনেকগুলি বাঘ মারে নি । ইতারে নগরকোঠাল
আমার কর্ণা কর্ণ করিয়া কহিলেন : বেগুফ, তুমি একি বগড় করিচাছ ?
এতো বড় মিথ্যা কথ্য উৎকর্ষ করিয়া আনিয়াছ কেন ? তুমি কি জানো না
বদ্রিন্দাস বাঘ মারে নি ? সে ঝনহাংই গোবেচারা দুহুপোয়া কুকাখোটক ।
কেনো সাত্তে পাঁচ থাকে না । বাঘ মারার কথা সে ভাবিতেও পারে না ।

তুমি তাকে দিয়া এতগুলি বাছ মাগাইলে কেন? আমি বললাম, সে কি মহাশয়, তবে যে স্ত্রীয়াছিলাম বদরীদাস^১ বাছ মারিতে পারে। এমন কি মারিয়াছেও! এবং সে খবরট শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিতে হইবে। যে যতো স্তম্ভর করিয়া শিলালিপি প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিবে তাহাকে ততো বেশি করিয়া ভালবাসা পিতরণ করা হইবে। এবং বড়োই পিরিতি যে সে বাণায় নহে। চাটকি একটা অ'লু পাছা'ডও দান করা হইতে পারে।

নগরকোটাল কহিলেন : ঠা ঠা, কহিতো বা'হু খা, জরুর জরুর। লেकिन উও তিন বোজ পহ'লে কা নারমান পা। কালসে বিলকুল সংকুহু পালাট্ গিয়া। কালসে মহ'ল'জ স্তম্নন বাহাত্তর সি'কা সমাজমে আগয়া কি বা'হুহতিয়া বহে'তু খারাব কাম হ'য়া। ইস'লয়ে আজ সে হোম'লো'গো'কো কর্ত'নিয়াতি পালাট্ গিয়া।

এব সেট নয়া ইস্তাহারমো'তাবেক আমি নতুন করিয়া বর্ণপরিচয় করিতেছি :

সরে অ সরে আ।

অ সরে আ সরে সরে না শুধু মা।

অতএব পূবে শিলাফলকে যাতা উৎকীর্ণ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। যাতা নির্জলা পাতা তাতা চটতেছে এইরূপ :

বদরীদাস ঘোর বৈষ্ণব। সে বৈষ্ণব। তাহার পিতা বৈষ্ণব, তাহার মাতা বৈষ্ণব। তাহার পিতামহ বৈষ্ণব, তাহার মাতামহ বৈষ্ণব। সে এবং বাহু ভজনা করে। দক্ষিণ হায়ের একান'দ ভক্ত সে। মাঝে মধ্যে সে স্তম্ভরবন ভ্রমণ করিতে আসিবে। স্তম্ভরবন তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে! স্তম্ভরবনের স্তম্ভর স্তম্ভর লোমশ অ'দবাসীবাও তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছে। ইহাতে সে বড়ই অভিভূত হইয়াছে।

আচার্য বাহেমুস্তফার বলিতেন, বড়া বড় গজীব। দেখো পাতেব উপর গাল ফুলাইয়া বড়া কেমন গজীব হইয়া বসিয়া আছে। আমি বলি শুধু বড়া ই নহে, বাড়ও কম গজীব নহে। বড়ার মতো, বাড়ির মত সমস্ত স্তম্ভরবনও যেমন বা'ল'পতা বজ্রন করিয়া, প্রগল্ভতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত গজীব হইয় উঠিবে সেট বিশেষ দিনটির প্রত্যাশায় আমি উৎসাহী হইয়া অপেক্ষা করিয়া নুতন কা'য়া নুতন হুগের উপহৃত বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি :

সরে অ সরে আ।

অ সরে আ সরে সরে না শুধু মা।

কৰ্তা ক্ৰিয়া কৃত্য/হীৰালাল দাশগুপ্ত

নিরাসক্ত স্বত্বহীন সন্তানসমবায়
আল্লেকেৰে বিল্লেকেৰে আৰু স্বন্দসমবয়ে
শবলিত তোৰে ওঠে দৰ্শকের পাত্ৰ্য চৃষ্টিতে ।
আবাটের মেঘ আৰু নিৰ্বাসিত নিবহী ক্লময়
তুখু নয় ! আকাশের চাঁদ আৰু পৃথিবীর সমুদ্রের মন
ছই বীধা এক সূত্রে বচস্তুধুসৰ । কেনো ?
কেনো এই ভবজিত সন্তান কৰ্তাহীন ক্ৰিয়মানভায়
পাতাড় দাঁড়িয়ে থাকে
স্বয় ওঠে তাগা ফোটে ফুল বৰে যায় !

অৰ্ধহীন অন্ধ বেগে পৃথিবীটা ঘোরে ।
সুতৰাং, মাতৃবৈৰ মাথাটাও ঘোরে । অতএব,
প্রতিদিন প্রতিরাত প্রতিটি মুহূর্ত এই পাকা
আৰু পাকা, এই বিজ্ঞমানতাকে মনে হয় যেন
বৈচে আছি । আমার উচ্ছ্বাস আমি, এই আমি
প্রতিটি মুহূর্ত বৈচে 'আছি' । সে কাৰণে,
অৰ্ণাৎ অকাৰণে, প্রতি রাতে দ্বৰজা বন্ধ কোবে
অন্ধকাৰের মশাৰি খাটানো । তার পর,
সেই জয়
সেই মৃত্যু
সেই অসংবৃত ক্লিন্ন অবসাদ !

আবার সূৰ্য ওঠে !
আবার শহর সত্যকে ঢাকা দেয় বিচিত্র পোষাকে ।
ট্রাক্টিকের অট্টরোল হট্টগোল তুচ্ছ হোয়ে যায়
ট্রামবাসলড়িট্রেনখড়কুটোখোয়াইটুপ্লোবালিকাদাঙ্গল

পোয়ার পোয়ার পায়ে পায়ে গায়ে গায়ে যত ভ্রষ্ট নীড়
 বিমূঢ় অন্ধির নহনাবী
 দলে দলে কাতারে কাতারে
 কোন রসাতল থেকে উঠে আসে আর
 ছুটে চলে কোন প্রতলোকে
 অন্ধ গেগে কবজের মতো !
 ট্রাফিক পুলিশ তার খবর রাখে না !

রাত্রি আসে ।
 পাখিরা শু ক্রান্ত ডানা স্রাস্ত হতাশায়
 মাটির বাসায় ফিরে আসে ।
 পাখির মতোই মন উড়ে যায় নক্ষত্রের নীলাস্ত পেরিয়ে
 সেখানে কি শূন্যে নীলে নীলে কিছু খুঁজে পায় ?
 সেইতোসে ফিরে আসা ভাড়া ঘরে ছেঁড়া বিছানায় ।
 আকাশে বেরিয়ে এসে কাকগুলো বসে থাকে শুয়োবেব পটে ।

তথাপি হৃদয় !
 শরীরের অবরুদ্ধ অঙ্গকার অদৃশ্য গুহায়
 নিঃসঙ্গ হৃদয় কাঁদে !
 শরীরের সাথে কেনো মনের বিচ্ছেদ ?
 কেনো এত কাল-শর্ত-কল্প অবক্ষয় ?
 হৃদয় কি কোনোদিন হৃদয় পাবে না ?
 আকাশ
 গাছ
 নক্ষত্র
 জল !
 নিকন্তু !

ছোটো ছোটো টিক-টিক বড়ো বড়ো ঘটনা হোয়ে ঢং ঢং বাজে
 লোনাম্বা দেয়ালের চাপ্‌চাপ্‌ আস্তর খোসে খোসে পড়ে !

মাহুশ-মারা / একটি নবম শতাব্দীর চীনা কবিতা
যুদ্ধের বিরুদ্ধে / অরবাদক : বীহেন্স চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধে তাসছে দেশ, নদী, পাহাড়, চারদিকে শুধু ম'হুশ-মারা শড়াই !

কী ক'রে খেটে খেওয়া ম'হুশ কাঠ কাটতে যাবে ?

জালালী কু'ড়য়ে আনবে ?

গেঁ সাইজী ! বড় গলায় খ্যাতি মান, সম্মানের কথা এখন যাক !

একজন যুদ্ধবাজ সেনাপতির সম্মান বাড়তে দশহাজার সৈন্যই

জবাই হ'য়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু তাঁদের পোকা-খাওয়া হাড়গুলি !

TS'AO SUNG-এর 'written in the year

Chi-hai (879), । কবিতার অন্তর্ভুক্ত

হয় . 'The Penguin Book of CHINESE

VERSE.'

প্রিমিথিসের প্রতি/সাগর চক্রবর্তী

তুমি আগুন ছুঁয়েছিলে

তোমাকে তার মূল্য দিতে হবে !

তুমি আমার ওপরে টেনে এনেছো

স্বর্গের রাজার অভিলাষ

তুমি নিবলিত হয়েছো : শত্রুর গ্রাম থেকে দূরে

পাহাড়ে, তুমি একা হয়ে গা'ছো.....

আর মহান দেবতা

তৈরি রেখেছেন তাঁর প্রিয় শত্ৰু

প্রতিদিন তোমার লিভার টুকরে টুকরে খাবার জন্ত

তুমি অপেক্ষা করো

একদিন হারকিউলিস এসে তোমার পায়ের শেকল

ভাঙ্গবেন ; ধ্বংস করবেন
দেবতার আদীর্ষাঙ্গলিত শকুনকে।

তুমি মুক্ত হবে !

চারটি অলিখিত গান / লখাই কিস্কু

সাঁওতালী থেকে -

- ১। বনের ময়ূরী যেমন সাঙ্গে
তেমনি সেজেছি।
তার মধ্যে সবার দেয়া
সুন্দরীকে দেখে—
বাছাই করেছ।
কিন্তু জেনো,—
বাছাই করা জোড়ান মোটা চাই,—
ধারালো আর তীক্ষ্ণ যেন
ঝকঝকে নল্লম।

- ২। পাকা ধানের শিস্ যেন
তোমার মাহুয, দ্বিধি,—
একটুখানি ভাগ বসাতে দাও

বাসনকোসন আধেক দেব, বোন,
মনের মাহুয পাখি নাকো, শোন।

- ৩। ও ময়ূরী—
পাহাড়-বনের কোণে
ব'সে কেন চোখের জল ফেল।

ইচ্ছে আমার, দেখেও ভোঁহা
 হাওয়ার পেখর মেলা ;
 সেই মনোরম মাটির উপর
 পায়ের ছাঁদে চলা ।

৪ । ও ছুঁড়িয়া, ছুটে পালা—
 সিঁড়ির নিরে ছোঁড়াবা ঐ আসে,
 মাঝার বেবে ঘবে ।

ও ছোঁড়াবা ছুটে পালা
 আমার কথা শোন ।
 কাঁটা হাতে ঐ ছুঁড়িয়া আসে
 নিঠে দেবে কলে ।

ভিন্নটি চিন্তা/কবিকল ইসলাম

১ । বরষে পোড়ায় লুপ্ত আশাবসন্তক
 চৈতন্য ইন্দ্রক
 যেমন গরমে গলে পাঁচ
 বোঁজের কিরিচ
 বললে ওঠে মুরগির তন্দুরী
 প্রকান্তে পুঙ্খ চূরি
 হয়ে গেলে কিছুই বলার আর থাকে না বরং
 বেগে টং
 প্রাক্তন জোড়দার

হে আমার
 অলৌকিক জীবনী

এসো, হৃদয় করি ।

২ । বন্ধুক বাইকেল

ছিনতাই হচ্ছিল বোঝ । বাইজীর মাইকেল
সুট হচ্ছে রাতছপুরে

ঘাতক হুড়ুবে।

৩। ইন্সুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে
কেউ নিরাপদ নয়, ভয়ে

পরীক্ষা অর্থাৎ টুকলিকাই
কিংবা তারও বেশি হচ্ছে তাই

এলো, হাত ধরাধরি বনে চলে যাই ।

এইভাবে শেকড়-বাকড় ভালপালা/বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন ।

যাওয়ার কথা নয়,

কিন্তু মন বলছে—

‘যাই ?’

মাথায় হাজার ভাবনার সুরি নাগছে

আর খাধা মাঠ জুড়ে

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যাচ্ছে

ছ’হাতের শুকনো শেকড় বাকড়.....

ভালপালা.....

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন !

যাওয়ার কথাই নয়

ঐ মন বলছে—

‘যাই, ?’

আমি একজন ব্যক্তি। ব্যক্তি হিসাবেই ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ব্যক্তি হিসাবেই পাশপুণ্য। স্বর্গনরক। জন্মান্তর। মুক্তি বা নির্বাণ। কর্ম ও কর্মফল। সুতরাং আমার ব্যক্তিসত্তাকে আমি মহামূল্য জ্ঞান করি। আমি যখন মানুষ ছিলাম না তখনও ব্যক্তি ছিলাম। যখন মানুষ থাকব না তখনও ব্যক্তি থাকব। সামাজিক মানুষ হতে গিয়ে আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে পারিনে। একে খর্ব করতেও পারিনে। সমাজের কাছে আমি বহুভাবে ক্ষণী। অংশোধ করতে আমি ধর্মভ বাধা। সামাজিক বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমিও তো সমাজের একটি ইউনিট। আমি না থাকলে সমাজও কি থাকে? সমাজেরও কি আমার প্রতি কর্তব্য নেই? ব্যক্তির মূল্য কি সমাজ অস্বীকার করতে পারে? জোটের জোরে বা ভোটের জোরে বা গাঁয়েও জোরে বা দানাপানি বন্ধ করে সমাজ আমাকে জব্দ করতে পারে বইকি। কিন্তু তা দিয়ে সমাজের নৈতিক অধিকার প্রমাণিত হয় না। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে স্মার্টা ব্যক্তির দিকেই হতে পারে, অস্মার্টা সমাজের দিকেই হতে পারে। ব্যক্তিকে ক্রমে কোলানো চলে, আগুনে পোড়ানো চলে, নিবাসনে পাঠানো চলে, কিন্তু জ্বিন্ হবেন ব্যক্তিরই, যদি স্মার্ট থাকে ব্যক্তির দিকে। সমাজ না রাষ্ট্র নিয়ে আজকের দিনে যে মাতামাণিটা চলছে আমি এর মধ্যে হারিয়ে যেতে ভয় পাট। যেসব মতবাদ সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে ব্যস্তির বিনষ্টি প্রের মনে করে সেসব মতবাদ আমাকে ভীত করে। নির্ভয়ে আমি কিছু ভাবতে পারব না, বলতে পারব না, লিখতে পারব না, বিশ্বাস করতে পারব না, একপক্ষে সতে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। ব্যক্তিকে কীটপতনের স্তরে নামিয়ে এনে সমাজের বা প্রাণীর উন্নতি সাধন করা হয়তো মেটিরিয়াল অর্থে সম্ভব। কিন্তু স্পিরিচুয়াল অর্থে নয়। মেটিরিয়ালকে আমি খাটো করতে চাইনে। তা বলে অর্থেই পরমার্থ নয়। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন হোক। শ্রমিক তার শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাক। শোষণ দূর হোক। এসব আমারও কাম্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার কাম্য যে জ্ঞানী শ্রমী, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপর যেন করমাস খাটানো না চয়। আমার লেখা যদি লোকের ভালো না লাগে লোকে পড়বে না। সেইভাবে আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। আমি রাজী। কিন্তু

পরের ইচ্ছামতো লিখতে হবে, নহতো লিখতেই দেওয়া হবে না, এটা এক প্রকার মৃত্যুদণ্ড। এতে আমার আপত্তি। ডিক্টেটরশাসিত রাষ্ট্রে আমার স্থান নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও যে আমি ইচ্ছামতো লিখতে পাব তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেজরিটি আমাকে খামিয়ে দিতে পারে। তা হলেও এরকম রাষ্ট্রে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। আমি প্রতিরোধ করতে পারি। ডিক্টেটর তো আমাকে প্রতিরোধ করতেও দেবে না। লেখা বন্ধ করে হয়তো নিস্তার পাব, কিন্তু তা হলে আবার লেখক হিসাবে বার্ষ বা বন্ধা হব। মার্কসবাদী রাষ্ট্র যে প্রোলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপশাসিত একথা জানার পর তাকে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কেমন করে স্বীকার করব? অন্ত্যস্ত ডিক্টেটরশাসনের চেয়ে সেটা হয়ত উত্তম, কিন্তু সেটাই কি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? আমার মতে প্রাচীন আ্যাক্সেসের গণতন্ত্রই ছিল উৎকৃষ্টতর। যদিও দাসপ্রথাও দূর দূরিত।

গণতন্ত্র ও মনতন্ত্র একার্থক নয়। একদিন মনতন্ত্রের অবসান হবে। কিন্তু তার স্থান পূরণ করবে কে? সমাজতন্ত্র না অন্য কোনো তন্ত্র? এর উত্তর এখনো আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমি শুধু এটুকুই বুঝি যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা দরকার। এর থেকে মনে হতে পারে যে আমি গণতন্ত্রের অন্ধ সমর্থক। না, আমি গণতান্ত্রিক জবরদস্তির বিপক্ষে। কোনোখানেই গণতন্ত্র দৈন্য পুলিশ কারাগার বিনা কাজ করতে পারে না। আদালতও দবর এমনি একটি অঙ্গ। আইনসভাও আর একটি। এইসব ক্ষমতার অধঃস্থপাতের হাতের না পড়ে অপরাধ বা দুপাতের হাতে পড়লে মানুষ ত্রাণ ত্রাহি করে। গণতন্ত্রের উপর তার অনাস্থা জন্মে যায়। অথচ সে নিজেই এদের হাতে ক্ষমতা মাপে দেবার জগে দায়ী। নিবাচনে সে নিজেই ভুল করে। নিবাচন যাতে নিবৃত্ত হয় এটাও তার দায়িত্বের সামিল। নিবাচনের পূর্বেও তাকে সবকণ সজাগ থাকতে হবে। সাধারণ নাগরিকের পক্ষে গণতন্ত্রের দৈনন্দিন পরিচালনার যৌজ্যবব রাখা সহজ নয়। সে তার জীবিকার খান্দায় বাস্ত। কিন্তু তার প্রতিনিধিদেরও এটা অবশ্যকর্তব্য। তাঁরা যদি নিজেদের কোলে ঝোল টানার তাগে থাকেন তা হলে পরিণাম ভয়াবহ। প্রতিনিধিরাই গণতন্ত্রের রক্ষক। তাঁরাই যদি ভক্ষক হন তবে সাধারণ একদিন বিপ্লবের উপর বরাত দিয়ে একটা দৈব সমাধান খুঁজবে। দৈবে একটা বিপ্লব ঘটেও যেতে পারে। তার পিঠ পিঠ প্রতিবিপ্লব। কোনটা শেষপর্যন্ত জয়ী হবে তা অনিশ্চিত। যারা গান্ধীজীকে কাছে শিকালো করেছেন

ভীষণ বিপ্লবের উপর বরাত না দিয়ে সত্যগ্রহের অন্ত প্রস্তুত হবেন। সত্যগ্রহ ছেলেখেলা নয়। তাতে দীর্ঘ দুর্ভোগ। হয়তো মৃত্যু। আমার তো ধারণা ছিল ভারত প্রয়োগের সময় সত্যগ্রহের পষা ধরবে। কিন্তু গান্ধীভক্তবাও আজকাল মার্কসভক্ত হয়ে বিপ্লবের কথা বলছেন। আমার ধারণা ছিল যে ভারতের জনগণ গান্ধীর শিক্ষা ভুলবে না। কিন্তু কবে ভুলে বসে আছে।

গান্ধীজী যে অর্থে নৈরাজ্যবাদী আমিও সেই অর্থে নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসা যেখানে প্রবল সেখানে রাষ্ট্র নামক একটা সংস্থা না থাকলে নয়। সেইটেই মন্দের ভালো। কী করা যায়! এ জগতে নির্জলা ভালো কোথায়। কিন্তু মানুষ চিরকাল নির্জলা ভালোর স্বপ্ন দেখেছে। তাকেই সে বলে ইউটোপিয়া। যেদিন সে অহিংসার মূলা বুঝবে সেদিন নৈরাজ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেবে। নৈরাজ্য কিন্তু অসম্ভব নয়। সেটা হিংসার পথ। সে পথে গেলে রাষ্ট্র কয়েম হবে। আর রাষ্ট্র কখনো সৈন্ত পুলিশ প্রভৃতি বাদ দিয়ে চলতে পারে না। গান্ধীজীর "অহিংস রাষ্ট্র" একটা সোনার পাথরবাটি। রাষ্ট্রহীন সমাজ সম্ভব। কিনা দৈন্ত-পুলিশহীন রাষ্ট্র সম্ভব নয়। তবে সৈন্ত-দলের সমান্তরাল ভাবে একদল সত্যগ্রহী যদি থাকেন তবে তাঁদের প্রভাবেও শাস্তিরক্ষা সম্ভবপর। শাস্তিসেনা, শাস্তি পুলিশ এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। গান্ধীজী একাজ পদবীর্গীদের জন্তে রেখে গেছেন। ভারতে তথা সব দেশে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি মার্কসের শিষ্য হয় ও বিপ্লব চায় অ'ম বাসা দেবার কে! একটাই তো মোটে আমার ভোট। আমি নিবস্ত। তবে আমার লেখনী কখনো রক্তপাত সমর্থন করবে না। একাজ আমার মূলনীতিবিক্ষেপ।

সতেরো আঠারো বছর বয়সে আমি গান্ধীজীর প্রভাবে আসি। কিন্তু মূলনীতি হিসাবে অহিংসা ও সত্য মেনে নিলেও ব্রহ্মচর্য মেনে নিতে পারিনি। ম'ত্বকে প্রকৃতি যেমন ক্ষুধা দিচ্ছে তেমনি দিচ্ছে অপর এক অগ্নি। কামাগ্নি। তাকে দমন করতে গেলে সে ন'নাভাবে প্রতিশোধ নেয়। কায়িক ও মানসিক বিকাশ ও বাধা ডেকে আনে। তার সাবনিয়মণ সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। তার উপর জন্তে সামাজিক ও অসামাজিক উভয়বিধ আচার আবর্তমান কাল প্রচলিত আছে। আমি তাকে প্রেমের সঙ্গে সমন্বিত করার পক্ষপাতী। সম্ভব হলে পরিণয়ের সঙ্গে। প্রেম ও কাম পরিণয় ও আমার দ্বয়ী পরিণয় সম্ভব না হলে প্রেম ও কাম আমার দ্বয়ী। কাম সম্ভব না হলে প্রেমই আমার কাছে

শ্রম। প্রেমহীন কাম ভরাবহ। তবে হৃদয়ের ইচ্ছা থাকলে কমায়েগা।

প্রায় প্রত্যেকটি পুণ্যতন সমাজে জাত কুল সম্পত্তি প্রভৃতি মিলে পরিণয় নিয়ন্ত্রণ করে। কাম সেখানে গোপন। সম্মানমূল্যেই তার মূল্য। আর প্রেম সেখানে উপেক্ষিত বা অবজ্ঞিত। প্রকৃতি এর প্রতিশোধ নেয়। হৃদয় তিলে তিলে দগ্ধ হয়। মধ্যযুগের মাতুল এর প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে চর বৈরাগী হয়ে যায়, নয় বেস্তার সঙ্গে মিলিত হয়, নয় রক্ষিতা গ্রহণ করে, নয় পরকীয়ার শরণ নেয়। আধুনিক যুগের মাতুল এর নতুন একটা নিষ্পত্তি চায়। দুই তিন শতক ধরে পশ্চিমে এ নিয়ে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এখনো তার শেষ হয়নি। কবে হবে তাও কেউ বলতে পারে না। নারীজাগরণ সমাপ্ত না হলে নারীর ইচ্ছা সমান প্রবল হবে না। অবলাব উপর সবলের ইচ্ছা চা পিয়ে দিয়ে সত্যিকারের কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। প্রেমকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে, যদিও সে বহুক্ষেত্রে অপাবে বা কুপায়ের স্তম্ভ। কামকে তার থেকে নিষুক্ত করতে যাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধতা, যদিও বহুক্ষেত্রে অনিষ্টের আশঙ্কা। পরিণয় যদি ভুল জনের সঙ্গে হয়ে থাকে তবে ভুল সংশোধনের পথঘাট খোলা রাখতে হবে। যদি ঠিক জনের সঙ্গে হয়ে থাকে তা হলেও একবয়সে যে ঠিক আরেক বয়সে সে হয়তো ঠিক নয়। পরিবর্তনের প্রয়োজন বিনা স্বন্দে মেনে নিতে হবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটলে সমাজ সামলে নিতে পারবে, সে শক্তি তার আছে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার ভয়ে পরিবর্তনে বাধা দিলে শত শত নরনারীর জীবন ব্যর্থ হবে। সেই ব্যর্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শৃঙ্খলা তার নির্মমতা তাদের চিরকাল সঙ্গ হবে না! সমাজকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। ধীরে ধীরে নতুন এক শৃঙ্খলার বিবর্তন হবে! প্রেম ও কামকে তাদের যথাযোগ্য স্থান দিলে পরিণয়কেই মাতুল শ্রম মনে করবে। বৈরাগী, বেস্তা, রক্ষিতা, পরকীয়া প্রভৃতির প্রয়োজন কম পাবে।

পরিণয়ের সঙ্গে প্রেম ও কামের সমন্বয় ঘটলে তার অপরিহার্য মর্ত পর-স্পরের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসভঞ্জে পরিণাম পরিণয় ভঙ্গ! বিশ্বাসভঙ্গ কোনো যুগে কোনো দেশেই সমর্থনযোগ্য নয়! সেটা যদি অপর পক্ষের অগোচরে ঘটে থাকে বা অসংযত যুহুর্হু ঘটে থাকে তবে তার জন্তে অহুতাপ করতে হবে, কমা প্রার্থনা করতে হবে, আত্মসংশোধন করতে হবে। নয়তো তাড়া হৃদয় জোড়া লাগবে না। সম্পর্কও ভিতরে ভিতরে কেটে যাবে। ট্র্যাংজেডিও ঘটতে পারে।

স্বামীৰ বা স্ত্ৰীৰ সম্মতি নিয়ে ঘিচাৰিতা বা বহুচাৰিতা স্বাক্ষৰৰ বিভিন্ন ইতিহাসে অজ্ঞাত নহ'। মহাত্মায়তেই এৰ নজিৰ রয়েছে। পুৰুষৰ বহুবিবাহ এই সেদিনও হিন্দুসমাজে স্বীকৃত ছিল। এখনো আইন লঙ্ঘন কৰে বহুকেজে ঘটে। নাগীৰ বহুবিবাহও ভাৰতেৰ কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো প্রচলিত। আধুনিক ও আধুনিকীয়া বলবেন, এৰ চেয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনৰ্বিবাহ ভালো। প্রাচীনপন্থীয়া বলবেন যাৰা বিবাহবিচ্ছেদ চায় না কেন তাহেৰ বাধা কহতে যাওয়া? যাহেৰ পুনৰ্বিবাহেৰ উচ্ছা নেই কেন তাহেৰ প্রয়োচনা দেওয়া? স্বামী স্ত্ৰী ও অপৰ একজন নাগী বা পুৰুষ মিলে জয়ী যচনা কৰেছে প্যাবিসেৰ শিল্পীদেৰ মধ্যে এৰ ব্যাপকতা লক্ষ কৰে টলষ্টয় এমন আঘাত পান যে অচিৰে প্যাবিস ত্যাগ কৰেন। ফৰাসীদেৰ আইনেও সেটা দণ্ডনীয় অপৰাধ। কিন্তু বিবাহেৰ পূৰ্বে যুগলেও একত্ৰবাস তেমন নিষ্পন্নীয় নহ'। এ বীতি এখন দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। এ সেট গাৰ্জব বিবাহ।

নাগট্টাও বাসেল অপকটে যেদব তথা স্বীকাৰ কৰেছেন অজ্ঞেয়া গোপন কৰেছেন বলেই বাসেলকে মনে হজে জ্ঞানতপস্বীদেৰ মধ্যে একটি ব্যতিক্রম। হিন্দু ও গ্রীক পুৰাণে দেবতা ও মুনিঋষিদেৰ দুৰ্বলতাৰ বহু উদাহৰণ আছে। প্রকৃতি সাধুসমূহেৰ চেয়েও বলবান। সোভিয়েট রাশিয়াৰ বিপ্লবী নায়ক-নায়িকাদেৰ ইতিহাসও আমি জানি। যেটা সৰ্বদেশেৰ সৰ্বকালেৰ মানবপ্রকৃতি সেটা বিপ্লব ঘটলেই বললে যায় না। অমিক হলেই কেউ অভিমানব হয় না। অমিকশ্ৰেণীৰ সঙ্গেও আমাৰ বালাবধি পরিচয়। সোভিয়েট দুটি মহৎ কৰ্ম কৰেছে। বৈজ্ঞানিক উচ্ছেদ কৰেছে। অনৈম সম্ভানদেৰও সমান বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এইভাবে নাগীও ও মাতৃকে সোভিয়েত যে মৰ্যাদা দিয়েছে এৰ অস্তে আমি তাকে প্রগতিৰ অগ্রদূত বলে প্রকাৰ সঙ্গে অভিমানব কৰি। শূন্যশক্তি ও নাগীশক্তি মিলে সোভিয়েটকে অজেয় কৰেছে তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা বলে পান্চাত্য দেশগুলিও ছেয় নহ'। পৰাও অজেয়। ওদব দেশেও বামশক্তি ও বামশক্তি ক্রমবৰ্ধমান। বিবৰ্তন যদি বাহত না হয় তা হলে বিবৰ্তনেৰ নীট কল ও বিপ্লবেৰ নীট কল একট। পশ্চিমেৰ লোক পরিবৰ্তনবিষোধী নহ', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেৰ পৰ থেকে পরিবৰ্তনেৰ বেগ আৰোহিত। তবে বহু শতাব্দী ধৰে যেদব মহামূল্য সামগ্ৰী তাৰা লক্ষ্য কৰেছে সেদব তাৰা 'অভিজাত' বা 'বুৰ্জোয়া' বলে হেলায় হাৰাবে না। যেনেসাঁস এনলাইটেনমেন্ট, লিবাৰলিজম, ডেমোক্রাসী, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিচাৰেৰ অধিকাৰ

প্রভৃতি শ্রমিক-কৃষক ও নরনারী নিরীশেবে, সুলভের উত্তরাধিকার। তারা এসব প্রাণে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। ধরবে তাদেরই শ্রেণীর রাশিয়ান বা চীনাঙ্গের বিরুদ্ধে, যদি এসব প্রাণে বিরোধ বাধে ও স্বকীয় উত্তরাধিকার হারাবার ভয় থাকে। এমন একদিন আসবে যেদিন কণদেপের শ্রমিকরাও তাদের শ্রেণীনিরপেক্ষ ইউরোপীয় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমদিকে তাকাবে। আপাতত প্রতিবিপ্লবের ভয়ে তারা ওদিকে তাকাতে চায় না। বিপ্লব যখন সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ হবে, প্রতিবিপ্লব যখন সূচুরপরাহত হবে তখন আজকের এই দ্বৈতীকৃত কালকের আঁতাত হয়ে উঠবে। বীসিস ও অ্যান্টিবীসিস থেকে একদিন সীনথেলিস উঠে আসবে। এটা তো মার্কসেরই ভবিষ্যদ্বাণী।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ভারতবর্ষকে ছিথুড়িত করেছে। উর্দু বাংলায় হিন্দু পাকিস্তানকে করেছে অবশুড়িত। এর পরে যদি শ্রেণীসংগ্রাম বাধে তবে দেশ হবে গৃহযুদ্ধে নিপন্ন ও বিনীত। একে আমি নিয়তির লিখন বলে গ্রহণ করতে পারব না। পারি তো নিবারণ করব। নয়তো আমার আপনায় শিল্পকর্মের মধ্যে আপনাকে নিবদ্ধ রাখব! বিপ্লব যে ঘটবেই এমন কোনো অবশ্যস্বাবিতা নেই। ঘটবে না যে, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। কিফটি কিফটি। ঘটলেও হিংসা ও রক্তপাত যেন অস্ত্রের উপর দিয়ে যায়।

৯ নভেম্বর ১৯৭৭

১১ পৃষ্ঠায় ২৯ লাইনে পড়তে হবে :

প্রেম, কাম ও পরিণয় আমার জয়ী।

মানুষের মন

নারায়ণ চৌধুরী

প্রত্যেক মানুষ তার নাকল্য বা বার্ষভার কারণ নিজের স্বভাবের মধ্যেই বহন করে সে নিজেই তার নিজের ভাগ্যের ভারক। এই কথাটি অস্বার্থ মনে হয় না, এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং লোকসমাজের গতিপ্রবাহ লক্ষ্য করলে এটিকে একটি সাবলভ্য মর্মান্বিতা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আমরা স্বাধীনতঃ, ব্যক্তি-বিশেষের আগোহিত্ব বা ভাগ্যাবনতির জন্ত তার পারি-
 পার্থক্যকে স্বীকার করে থাকি, বলি যে পরিবেশের আত্মকুল্যের জন্তই সে বড়
 হয়েছে, অথবা পরিবেশের প্রতিকূলতাও জন্তই সে বড় হতে পারেনি। অর্থাৎ
 কারণে জীবনের সাক্ষ্য বা ব্যর্থতাটা তার পারিপার্শ্বিকের ভাল-মন্দেই কারণেই
 মূলতঃ সংঘটিত হয়ে থাকে। যে লোক ধনীও ঘরে জন্মিয়েছে সে সেই ঘটনার
 কারণেই অল্প অনেক লোকের উপর দিয়ে প্রাথমিক সুবিধাটুকু বিনাক্ষেপে লাভ
 করে। পক্ষান্তরে গরিবের ঘরে যার জন্ম, তাকে একটা মৌলিক অসুবিধা
 নিয়েই জীবনযাত্রা করতে হয়—অনেক বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করতে করতে
 তাকে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। সে যদি ধনীও ঘরে জন্মাতো তো অর্থ-
 রুদ্ধতাজনিত নানাবিধ পরিহার্য বাধা সম্ভবতঃ তার প্রতিবন্ধকতা করতে পারতো
 না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক বা প্রতিবেশের বাধা একটা মূলগত সত্য, একে এক
 কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু আরও একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে পরি-
 বেশের উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা বোধহয় উচিত হবে না। কেননা
 বহিঃক বিচারে একথা সত্য হলেও অন্তঃক বিচারে বোধকরি ততটা সত্য নয়।
 আজকাল বহিঃক বিচারেরই যুগ, বিশেষতঃ একালীন বান্দিক জড়বাদী দর্শনের
 ব্যাপক প্রচারের দরুন পরিবেশ বা environmentকে সর্বোদার মনে করার
 একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে। পরিবেশের প্রভাব নিশ্চয়ই স্বীকার্য, তবে
 তার চেয়েও বড় প্রভাব বোধকরি মাণুষ্যের মন। আমাদের মনই আমাদের
 সবচেয়ে বড় বন্ধু অথবা বড় শত্রু। ইচ্ছা করলে তা আমাদের চরম আত্মকুল্য
 করতে পারে, ইচ্ছা করলে চরম শত্রুতাচরণ করতে পারে। শত্রুতাচরণের
 প্রসঙ্গে বলতে হয়, বাইরের বাধা অপেক্ষা বহুগুন প্রবলতর বাধা আমাদের মনের
 মধ্যেই লুকিয়ে আছে এবং তা আমাদের চূড়ান্ত কৃতিসামান করে থাকে। মনই
 সর্বশেষ বিচারে মাত্তবের সাক্ষ্য বা ব্যর্থতার জন্ত মূলতঃ দায়ী—প্রতিবেশকে
 এজন্ত দায়ী করা বুঝা।

ধনী বা দরিদ্রের রূপকটি নেওয়া যাক। কেউ ধনীও ঘরে জন্মিয়ে হাজারো
 সুবিধার মধ্যে বড় হয়েও জীবনে কিছু করতে পারে না, তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে
 যায়। পক্ষান্তরে, গরিবের ছেলে শ্রেষ্ঠ বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে, কোন কিছু
 অর্থাৎ নিষ্ফল না হয়ে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন ঘটনাসমূহও অত্যাব-
 নেই সংসারে। একজন ধাপে ধাপে নেবে গেছে, প্রাথমিক সুবিধাটা তার

কোন কাজেই লাগেনি ; আর একজন ধাপে ধাপে উঠেছে, প্রাথমিক অস্থি-
 গুলি তাকে মোটেই দমাতে পাবেনি । ব্যক্তিভেদে সাফল্য বা ব্যর্থতার এই
 যে ছক—এটা কিসের কারণে হয় ? মনের কারণে এক এক জন মানুষের
 এক এক ধরনের মনের বিশেষ গড়নের কারণেই এই বকমটা হয় । অতএব
 বলতে হয়, চূড়ান্ত বিচারে মনই মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার আসল হেতু ।
 পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই হেতু সন্ধান করতে গেলে বিফল হতে হবে ।

যদি বলেন মনের কোন আলোচ্য অস্তিত্ব নেই, মন মাটার বা বস্তুর বকম-
 কের মাত্র, আর সেই মাটার নিয়ন্ত্রিত হয় পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার
 দ্বারা ; তার উত্তরে বলব, একবার যখন মাটার মনে রূপান্তরিত হয় (যদি
 স্বীকার করেই নেওয়া যায় যে, এই বকমটাই হয়) তখন তার গোত্রবদল হয়,
 মন তখন তার নিজস্ব নীতি নিয়মের দ্বারা চালিত হয়, সে আর তখন পারি-
 পার্শ্বিকের অগ্রগত বা বাধা থাকে না । মনের সর্ব বিচার করলে দেখা যায়
 মনের অদ্ব্যুত ধারা । তার সবই কেমন যেন কিস্তি ও হেঁয়ালির পাখা । মনের
 কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই নির্দিষ্ট সূত্রাদির চক্রে ফেলে রাখা করা যায় না,
 বাধ্যা করলেও সে বাধ্যা সন্তোষজনক না হওয়ারই কথা । অপার বচস্কের
 খনি এই মানুষের মন । সে যে কখন কী মুড় বা মজির অধীন হয়ে চলবে বা
 কোন ধরনের ব্যবহার করবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না । এমনকি
 সংশ্লিষ্ট মনের অধিকারী ব্যক্তিটির পক্ষেও তার খাত বুঝে উঠা কঠিন । মন কখন
 কী মেজাজে থাকবে তা অনুমান করতে পারলে মানুষের এক দুর্গতি
 হতো না ।

লোকে বলে স্ট্রীচারিজ দুজের, মানুষের পক্ষে তো বটেই, দেবতাদের
 পক্ষেও স্ট্রীচারিজ অনুমান করা নাকি কঠিন । এটি একটি পক্ষপাতমূলক উক্তি ।
 মেয়েদের অশ্রুচোয় প্রতিপন্ন করবার জন্য পুরুষের রচিত এই উক্তি । আসলে
 সব চরিত্রই সমান দুজের, এর আর স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই । স্ত্রী হোক পুরুষ
 হোক, সব মানুষেই মনের অধিষ্ঠান, আর এই মনই হোলা যত নষ্টের গোড়া ।
 সে যে মানুষের জীবনের চলার পথে কত ছলনার জাল নিপুণ হাতে পেতে
 রেখেছে তার লেখাজোখা নেই । আর এইজন্য মানুষের দুর্ভোগেরও
 শেষ নেই ।

অবাধ্য এক মন নিয়ে মানুষকে নিভা চলতে হয়—এমন এক মন, যে তার
 মালিকের আদৌ বেশ নয়, সে তার আপন খেয়াল-খুশী অহুয়ারী চলতেই গা-

সর্বদা অভ্যস্ত, মালিককে ভোরাকা করায় প্রয়োজন যে বিস্ময়াত্র অকৃতব করে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা split personality-র কথা বলে থাকেন শিল্পী সাহিত্যিক কবিরা এই আপনাত্তে-আপনি-বিত্তক দ্বৈত ব্যক্তিত্বের নাম দিয়েছেন 'the double'. শেক্সপীয়ারে নাটকে গোটেব কাবো, ভল্টেরত্‌স্‌কির উপস্থানে এই তথাকথিত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিত্রণের ছড়াছড়ি। মনই এই ব্যক্তিত্বের বিভাজনের মূলে। মাতৃব করতে চায় এক, তাকে দিয়ে কে যেন আবেক কাজ করিয়ে নেয়। সে ভাবতে চায় এক ভাবনা, কে যেন অদৃষ্টে থেকে তাকে দিয়ে জোর করে অন্য ভাবনা, এমনকি বিপরীত ভাবনা, ভাবিয়ে নেয়। সে যো-চিন্তাটাকে অবাকুণীর জ্ঞানে মন থেকে লজ্জায়ে ঝেড়ে ফেলতে চায় সেই চিন্তাটা সেই কারণেই যেন আরও বেশি করে তার মনের উপর জাঁকিয়ে বলে। এ মনের এক নিচিন্তা স্বভাব যে, যে ভাবনাটাকে দূর করবার জন্য প্রযত্নের অন্ত নেই, সেই অবাকুণিত ভাবনাটা সেই প্রযত্নের কারণেই যেন বেশ করে মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসতে চায়। এ একম কেন হয় বলা কঠিন কিন্তু এট একমটাই হয়, এ-ই মাতৃবের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেড মনের এই অদৃষ্ট ব্যবহারের একটা কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনের সকল প্রকার অসজ্জিত, বৈসঙ্গত্ব স্বত্বাবিধোথের কারণ শৈশবের যৌনতার সংস্কারের মধ্যে অচলসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ব্যবহারের তবৎ অদৃষ্টেরই মীমাংসা পুঁজিছেন তিনি যৌনতার মধ্যে। ফ্রেডের নিজান মনের তত্ত্ব তথা স্বপ্নতত্ত্ব এই বিচােরেই ফল। (প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, আজকাল আর এই মত পূর্বের মত নিবিধোপে অপর্য তেমন ব্যাপকভাবে গৃহীত নয়। ফ্রেডীয় নিজানের তত্ত্বকে খণ্ডন করে দেখা দিয়েছে ওয়াটসন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ব্যবহারবাদ এবং পাতলও প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের Conditioned Reflex তত্ত্ব। কিন্তু এই শেষোক্ত দুই মতেরই কোঁক পরিবেশের প্রাধান্যের প্রতি মাতৃবের মনের উপর সামাজিক অবস্থা-ব্যবহার প্রভাব যে অতিশয় চূড়ান্তক্রমা ও সবিশেষ, সেই ভাবটাই এট দুই মতের ভিত্তর সমধিক সঞ্চারিতা লাভ করেছে।)

নিজানে বা স্বপ্নে মন আপনাব মজি মাক্ষিক চলে, তা যেন হলে, কিন্তু নিজানে আর স্বপ্নেই কি শুধু মনের এই অদৃষ্ট ব্যবহার? সম্পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থায়ও কি মন মনের মালিকের ইচ্ছার বিকলচারণ করে না? হামেশাই করে থাকে। প্রত্যেকেই যে যার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং অন্তঃস্বদের

সাক্ষাৎ থেকে, শিল্প-সাহিত্যের নজির থেকে, এবং ভূমিকূট প্রকাশ্য দাপিল করতে পারেন। মন কখনও কোন সন্দেশই মাতৃবের পূর্ণ বশ নয়—তার ভিত্তিকরকটি-বৃত্তি মজাগত, সে সর্বদাই দোলিচল, অস্থিরস্থাব : এক জাগরণ-বেশিকণ ছিব হয়ে থাকে মনের ধর্ম নয়, ছোটোছোট করে বেড়াবেই। যোগীদেব কথা অবশ্য আলাদা, মন তাঁদের পরিপূর্ণ স্ব-বশ এইরূপ শুনে থাকি ; কিন্তু সাংসারিক মাতৃবের মন অহুত্ব ছটকট করে বেড়াচ্ছে। আর শুধু ছটকট করা নয়, নিজেই নিজের বিশরীতাচরণ করছে।

হৃষ্ট-অরূপ, আগ্রহ অবস্থায় মানবীয় মনের করেকটি অকৃত বাহ্যবের নয়না লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। নয়নাগুলি প্রণালীবদ্ধ ভাবে সাজানো নয়, এখান থেকে সেখান থেকে নেওয়া, ইতস্ততঃ-বিকল্প আচরণের উদাহরণ রূপে গৃহীত।

যখন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে এক নিভৃত স্থানে মিলিত হয়েছে। প্রেম নিবেদনের আবেগঘন মুহূর্তে প্রেমিক প্রেমিকাকে জড়িয়ে তার ওঠে চুম্বনওঁথা অমন করতে উদ্যত। প্রেমিক উদ্বেজনায় কাঁপছে, প্রেমিকায় দেহলতা বিস্মৃত ও শিথিল—প্রেমিক যেমনি ভালবাসার আবেশে প্রেমিকায় পরমর-করা ঠোটে চুমু খেতে যাবে, অমনি তার চোখে ভেসে উঠল মেয়েটির ঠোঁটের ওপকার স্থপতি গৌফের রেখা, আর তার আবেগ একটা মন্ত বড দাকা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে চাইল। প্রেমিক যতট মেয়েটির গৌফের রেখার দিকে না তাকিয়ে ওঠ-মিলনে আপ্রত হতে চাইলো ততই সজ্ঞান ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার চোখ নাও নাও সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে তার আবেশকে মাটি করে দেবার উপক্রম করলে। ছেগেটি সেদিকে চাইবে না বলে যতই বহুপরিকর হয় ততই তার দৃষ্টি সেদিকে তীব্রের মত ধরে যেতে থাকে। কলে মধুর অমৃতবের সঙ্গে বিশরূপ অমৃতবের সংঘাতে আবেগ ফিকে হয়ে যায়, চুমু থাওয়া আর হয়ে ওঠে না, হলেও তাতে কোন বশ থাকে না। বসকলহীন অবস্থায় দেহালিঙ্গন পোডাকাঠকে জড়িয়ে ধরার অমৃতব বয়ে আনে।

কিংবা ধরা যাক, মা সন্তমুদে বালক সন্তানের শোকে উদ্ভ্রাঙ্ক, হিংস্রা—আলুখাল বেশে খুলোয় লটিয়ে কাঁদছে। কেউ তাকে ধরে বাধতে পারছে না, শোকের প্রবল উৎক্ষেপে বার বার তার মুড়া যাবার উপক্রম হচ্ছে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে দরদর ধারে জলের ধারা। খুলোয় কাদার ভেজা কপণ্ড আর ভেজা চুলে মিশিয়ে সে এক অপরূপ যুগ্মমানা মাতৃবৃত্তি।

অবস্থার ছেলের গুণ-গ্রামের কিরিস্তি একে একে হাথিল করে চলছে পাঁচালীর
 হয়ে। কিন্তু হঠাৎ কেন জানিনা কী কারণে মায়ের মনে পড়লো—আর এই
 মনে পড়াটাই মনের অবাধ্যতার নিদর্শন—ছেলে তার আচার খেতে খুব ভাল-
 বাসতো। আচারের জন্ত মাকে কতদিন জ্বালাতন করেছে তার ইয়ত্তা নেই।
 মায়ের এই জ্বাটির প্রতি কিছু বিশেষ দুর্বলতা ছিল—সব মেয়েদেরই থাকে—
 সুতরাং ছেলের ইচ্ছা আর মায়ের ইচ্ছার পূর্ণ সমীকরণে এই বিশেষ জ্বাটির
 ক্ষেত্র ছেলের আয়তনের পুরণে কখনও বাধা হয়নি। কিন্তু এই গভীর শোকের
 মুহূর্তেও সে কথা মনে হয় কেন? আর মনে যদি হলো তো সন্তান হারানোর
 বেদনার অপরিণীম কাকণোর মধ্যেই মায়ের জিতে লাল্যাকরণ হয় কেন? শোক-
 ব্যাকুলতার আভিপ্রায়ে চোখে অঝোরধারে জল ঝরাটাই নিয়ম, কিন্তু জিতে
 জল ঝরবে কেন? আর ঝরলোই যদি তো দুটো জল একই সঙ্গে
 ঝরলো কেন?

কিন্তু পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা এট যে, কখনও কখনও দুটোই এক সঙ্গে ঝরে।
 মনের অবাধ্যতার জন্তই এ রকমটা হয়। দুটো বিসম্বল অবস্থার সহাবস্থানের
 কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই—সেটা সম্পূর্ণ মনের খেয়ালের উপর নির্ভর করে।
 আর মনের খেয়ালিপরায় যে অস্থ নেই তা আমরা নিতাই আমাদের জীবনে
 প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু দয়া যাক, অতি মজাগত সংস্কার জীবনেও কখনও কখনও
 নিজের অজান্তে, অথবা নিজের আগ্রহ ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে, চৌর্য ভাবনা
 জাগে। ঠাট্টা নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্মের একজন
 খ্যাতনামা লেখক পাতলভ ইনস্টিটিউটের আয়োজিত 'বিকল্পিতা' বিষয়ক এক
 আলোচনা-চক্রে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর জীবনে একবার এক
 বিশেষ পরিস্থিতিতে এই অনিচ্ছাকৃত চৌর্য ভাবনার উদয় হয়েছিল কিন্তু উদয়
 হতেই তা আবার প্রবলনে মিলিয়ে যায়। লেখকের এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর
 অকপটতাই তুমি স্মৃতিচয়নি তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠতাও স্মৃতিচয় হয়েছে। তাঁর
 জন্ত তাঁকে আমার সন্তোষজন জানাই। এটা তুমি তাঁরই একাধিক অভিজ্ঞতা
 মনে করবার কোন কারণ নেই, পতানিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য
 করেন চৌর্য ভাবনা অবাধ্য মনের একটা স্বভাববিশেষ এবং আগ্রহ মনের
 সং-ইচ্ছাকে বিরুদ্ধ করার জন্ত নিজস্ব মনের সূত্র এক কোণল। কিন্তু সং-
 ইচ্ছার বেলায় সেটা তুমি ভাবনাতেই পর্যবসিত, কাজে রূপান্তরিত করার কোন

প্রশ্নই ওঠে না।

৯

আমাকে যদি কোন নাভালকের অঙ্ককূলে অনেক টাকার অছি নিযুক্ত করা হয় আর সেই টাকার বিলি-বাবস্বাধ আমিই একমাত্র নিয়ামক হই। সেই ক্ষেত্রে আমার আগ্রহ ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে খেরালী মন আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে এই বকম একটা অসাধু প্রস্তাব রাখতে পারে যে টাকাটা আত্মসাৎ করলে কে আর দেখতে, সুতরাং কেনই না টাকাটা আত্মসাৎ করি। কিন্তু সত্যি সত্যি এরূপ অবস্থায় টাকাটা আপনি বা আমি আত্মসাৎ করি না, শুধু ওই চিন্তাটা ক্ষণিকের জন্য একটা 'ড্রেন-ওয়েভ' রূপে দেখা দিয়েই পরক্ষণে মিলিয়ে যায়। ভাবনা আর ভাবনার রূপায়ণের মধ্যে লহস্র যোজনের পার্থক্য। আর এই পার্থক্যের দ্বারাটী সাধু আর পাপীর পার্থক্য নিরূপিত হয়। নয়তো চিন্তার জগতে সাধু আর ক্রিমিনালে কণামাত্র তফাৎ।

এট যে ড্রেন-ওয়েভের কথা বললাম এটা কি দুই মনের কারসাজি? দুই'ল মনের কুমন্ত্রণা। আমি কিস্ত এই মনের ক্রিয়াকে দুই'ও বলব না, দুই'লও বলব না; বলব মনের এই বঙ্গমেবই স্বভাব। দোলাচলবৃত্তি তার মজার নিহিত। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত মাসুকের মন একবার ভাবনার এই প্রাস্তে দোল খাচ্ছে তো পর মুহূর্তে ওই প্রাস্তে দোল খাচ্ছে। স্থিরতা তার অন্যায়। সামাজিক পরিবেশের জন্য মনের এই স্বভাব নয়, তবে সামাজিক পরিবেশের জন্য মানসিক অস্থিরতা বাড়ে, সে কথা স্বীকার্য। যে ব্যক্তি মনের এই স্বভাবগর্ভ অবগত হয়ে তাকে বশ করতে সক্ষম হয়, সেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। আর যে ব্যক্তি মনের এই খেয়ালপনার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে এগোবার চেষ্টা করে তার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্কলতা বা দারিদ্র্যের প্রভাব অবাস্তব। বাটবের পরিবেশের দ্বারা জয় পরাজয় নিয়ন্ত্রিত হয় না, জয়-পরাজয় মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বভাবের ভিতরের বাধা জয় করার শক্তির তারতম্যের দ্বারা। মনকে জয় করার শক্তিতেই মাসুকের জয়।

এইজন্যই আমাদের দেশের ঋষিগণ মনজয়ের উপর এত জোর দিয়েছেন। একালীন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তো মনকে স্থিতির করবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কত যে লিখেছেন তার আর ইচ্ছা নেই। সর্ববিশ্বায় মনকে অবিকল ও শান্ত রাখ - এই শ্রীঅরবিন্দের বাণী। আমরা একালীন মাসুকেরা সামুতিক দর্শনের প্রভাবের বশে প্রায়ই সমষ্টির উন্নয়নের কথা বলি, কিন্তু তার আগে

ব্যক্তি মনের যে উন্নয়ন স্বকায়, শোধন স্বকায়—সে কথাটা ভেমন জোর দিয়ে বলি না। ব্যক্তি মনকে চকল ও লবণ-অশাস্ত বেখে সমষ্টির কল্যাণের চেষ্টা ঘোড়ার আগে পাড়ি জোড়ার চেষ্টার মতই অকার্যকর হতে বাধ্য।

মনের দোলাচল স্বভাব নানা ছন্দবেশ ধরে মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। তার চলনার অন্ত নেই। ই, এম, ফষ্টার তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'A Passenger to India'তে দেখিয়েছেন কেমন করে মন চলনার জাল বিস্তার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কখনও কখনও এই চলনাকে echo বা প্রতি-ধ্বনির আকার ধারণ করতে দেখা যায়। মিসেস মুর ও মিস কোয়েস্টেড (অ্যাডেলা) 'সারাবার গুহাবলী'তে বেড়াতে গিয়ে এই প্রতিধ্বনির কূহকে পড়েছিলেন। তার ফলে একজনায় ঘটলো মৃত্যু, অন্যজনায় চরম বিপর্যয়। আসলে এই প্রতিধ্বনি মনের বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। সেটা বইটিতে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে।

শেক্সপীয়ার বলেছেন, 'The fault is not in our stars but in ourselves' কথাটা সর্বৈব সত্য। আমরা যে আমাদের নিয়তি আমাদের নিজেদের মধ্যে বহন করি, বাইরের পারিপার্শ্বিক বা গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ আমাদের নিয়তির বিধায়ক নয়—এট ভাবটি সবচেয়ে সার্বকভাবে প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক 'নেমেসিস' ভেবে। প্রাচীন গ্রীক নাটক প্রায়শঃ ট্রাজিডিই মূল-কথা হলো—নাট্যবর্ণিত নায়ক বা নায়িকা তার নিজ জীবনের বার্ষতার বীজ তার নিজের মধ্যেই বহন করছে। অর্থাৎ মাতৃস্বের মনট মাতৃস্বের লক্ষ্য বা বার্ষতার প্রকৃত লীলাভূমি।

জন্মরাটী গল্প

আরও নেশা কর

রচনা—ইন্দ্রবসাবড়া

অনুবাদ—বোম্বানা বিশ্বনাথম্

পোখুলিবেলার লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে। সেট ধরণের লাল রঙই ছিল মোড়ার চোখেও। মদের নেশায় মত্ত হয়ে এলোপাতাড়ি পা ফেলতে

ফেলতে চলেছে নে। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ব্রীক উপর ভোটপাট ফেলেতে
তক করে। ‘এই গাথা!’

‘কি হল?’ কটি বানাতে বামাতে নে বলে।

‘বলি হারামজাদি শুনতে পাচ্ছিল কি না? বলি কানে কি আওয়াল
তুলো গুঁজেছিল নাকি? আরে এই কালা মাগি?’

‘অত চোঁচাচ্ছ কেন, বাবু শুনতে পাবে যে।’

‘চুলোয় যাক তোম বাবু! তোম বাবুই সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? নে
বিছানাটা পাত।’

‘একটু জিরিয়ে নাও না, তারপর.....’

‘জিরোবে তোম বাবা। তাড়াতাড়ি যা বলছি তাই কর। না হলে হাড়
গুঁড়ো করে দেব।’

‘কি সব যা-তা কথা বলছ।’

‘যা-তা আবার কিসের যে হারামজাদী,’ কথাটা শেষ না করেই মোত্যা
বউকে এক লাগি মায়ে। ঠিক সেই ঠিক সেই মুহূর্তে মোত্যার ছেলে লালী
ঘরে ঢুকে চিংকার করে বলে, ‘বাবা!’

‘কি?’

‘বাবু ডাকছেন।’

‘বোন বাবুরে?’ মোত্যা মধের নেশায় বলে। ‘শালি বাবাকে বুকু
বানাজ্জিল। যা যা শালি এখন থেকে।’ বলে মোত্যা দু চাবটে চড়-চাপড়
কষিয়ে দেয় লালীর গালে।

এদিকে তার বউ চিংকার করে ডাক দিচ্ছে, ‘ওগো কে আছে গো!
আমার ছেলেটাকে মিনমেটা মেয়ে ফেলল গো!’

‘শালি হারামজাদী, আবার চেঁচাচ্ছিল। চাবদিক থেকে লোক তেকে
জমাতে চান। নে ডাক এবার তোম লোকজনদের।’ আরো চটে গিয়ে
একের পর এক গালাগাল দিতে দিতে ভেতরে গিয়ে একটা পুরোনো তলোয়ার
পেড়ে আনে। বউএর সামনে গিয়ে বলে, ‘মেয়ে ফেলব হারামজাদীকে, ই্যা!
সাক সাক বলে দিচ্ছি!’

ঠিক সেই সময় ঘরের বাইরে থেকে ডাক আসে, ‘মোত্যা, আরে ও
মোত্যা!’

‘আজ্ঞে বাবু’ বলে মোত্যা তলোয়ার হাতে নিয়েই বাইরে আসে। কিন্তু

বাবুকে কেঁপে মୋড়ায় এককথায় 'ব' মেহে যায়। তার নেখা যেন উবে
গেল।

‘আ-জ্ঞে-বাবু’ বলার সময় তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়।

‘শালা তুরোয়ের বাজা’ মদ খেয়ে যবে বদমাইনী করছিল !’

তখনই মোতাদ্দার জমাদার এগিয়ে এসে বলে, ‘বাবু বাটাকে লাগাব
নাকি—দু’চার জুতো ?’

‘লাগা !’ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জমাদারের পায়ের জুতো মোতাদ্দার
গায়ে সমানে বসিত হয়।

মোতাদ্দা ‘আজ্ঞে হজুর’ বলতে বলতে জুতো খেতে থাকে।

ভাড়াচোরা খাটিয়ার তলার মোতাদ্দার বউ মেথী গর্জমুনায় কাতবাজে।
মা-গো-বাবা-গো বলে সেও এক নাগাতে চিলিয়ে যাচ্ছে। বাইরে নিম গাছের
ডায়ার বসে সে বাঁশ কাটছিল। কিছুক্ষণ পরে বলে, ‘শালী ঢং করছে ঢং।
আবে এই, মিছি মিছি চেলাছিল কেন ?’

এই কথায় মেথীর মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল না, সে
কাতবাজে ট।

মোতাদ্দার মন বাঁশ কাটার নিবিট ছিল না। সে তাবছে মদ খায়নি কত
দিন হয়ে গেল। আজ অনেকদিন ধরে দু’চার ফোঁটাও মদ মুখে পড়েনি।
সেই বাতের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছি। ... না, এখন আর না খেলে চলবে
না ! মনের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণ সংগ্রাম করা যায় ! সেদিন জমাদার মাঝার
চোটে আধমগা করে তুলেছিল তাকে। তার ভয়েই তো মদ খাই না। কিন্তু
আর থাকা যাচ্ছে না। ও রকম বোকামী আর করব না। মদ খাব তো
লোকে জানবে কি করে ? দু’চার ফোঁটা মদ খাব’ কেউ জানতে পারবে না।
আজ মাইনে পেলে কয়েক গুণ পরসার মদ তো খাবোই।

‘মোতাদ্দা’ ?

‘আজ্ঞে !’

‘আবে বাঁশ কেটেছিল ?’

‘আজ্ঞে ঠ্যা বাবু !’

‘কটা বাঁশ কেটেছিল ?’

‘আজ্ঞে একশোটা বাবু !’

‘তুই একশোটা ! গাধা কোথায়? তোকে ছ’শোটা বাঁশ কেটে আনতে বলছি না ?’

‘আ-জ্ঞে হজুর !’

‘শালা তোর কোথাকার। খালি হজুর হজুর করবে। যা এতুনি। বাকী বাঁশগুলো কেটে নিয়ে আয়। নৈলে মাইনে কানাকড়িও পাবি না।’

‘আজ্ঞে এতুনি যাচ্ছি হজুর।’ বলে মোত্যা ঘরের ভিতরে ঢোকে।

‘আরে ঐ !’ বউকে ডাক দেয়।

‘মা গো !’

‘গুণা আটেক পরসাদ দে তো !’

‘আট গুণা পরসাদ ! কোথায় পাব ?’

‘জাহান্নাম থেকে পাবি ; আমাকে কি জিজ্ঞেস করছিল। কৈ দিবি কি না ?’

‘ওঃ মা গো। অত পরসাদ নিয়ে কি করবে ?’

‘নিলাজ কোথাকার। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না।’

‘চাইছ দিচ্ছি। তবে দেখ দয়া করে মদ-টদ খেয়ো না।’

‘ঢের হয়েছে। বুঝেছি। দে-তাড়াতাড়ি দে পরসাদ।’

‘ঐ কোণে একটি ছোট তাঁড় আছে। তাতেই আছে পরসাদগুলো, নিয়ে নাও…………আর দেখ বেশি দেবি কণো না………… আমার অবস্থা কিত্ত খুব খারাপ।’

‘অত ঢং করে আর বলতে হবে না। যাব আর আসব। চলেছে ?’

কথা শেষ করেই আধুলিটা নিয়ে মাথায় ছেঁড়া একটা পাগড়ি জড়িয়ে, গায়ে একটা তাপ্লি দেওয়া জামা পরে পেয়াজের পুঁটলি এবং একটা কুড়োল নিয়ে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নদীর ধারে ভেলু কালালের (মদ বা তাড়ি বিক্রতার পদবী) হল কালাল) দোকান ছিল। মোত্যাকে দেখেই সে ডাক দিয়ে বলে, ‘নকসার মোত্যা তাই, কি ব্যাপার ? আরে এসোনা এদিকে একবার!’

‘নকসার, ভালতো ?’

‘আরে যাচ্ছে কোথায় ?’

‘যাচ্ছি কোথায় ? যাচ্ছি বাবুর জন্তে বাঁশ কাটতে।’

‘যাচ্ছই যখন একটু মদ-টদ খেয়ে যাও।’

‘না-ও ভাই, মদ ছেড়ে দিয়েছি। মদ আর খাব না।’

‘ওসব চঃ ছাড়। আমার দ্বিবি চলে এস।’

‘কিস্ত ভাই, আমার এখন পরস-টরসা নেই বলে দিচ্ছি।’

‘আরে তুই কি আমার পরসা মেয়ে দিয়ে পালাবি।’

ভেলু একটা জংঘা মগে কবে কিছুটা মদ মোতাককে দেয়।

মোতাক খেয়ে নেয়।

‘আরও খা মোতাক!’

‘বাঃ বেশ লাগছে তো!’ মোতাক ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে।

‘লাগবে না—এটা যে খাটি মদ।’

‘তা দে-না এক বোতল ভরে।’

‘এক বোতল কেন? বল না দু’বোতল দিচ্ছি।’

‘না না দুটো নয়। একটাই পাক আপাতত।’

‘নাও।’

মদের বোতল পুঁটলিতে বেখে মোতাক গাঁ থেকে দু’মাইল দূরের এক
নাশ ঝাড়ের দিকে এগেয়।

শীতের দিন। ঠাণ্ডা পড়ছে। সাড়ে নটা হয়ে আসছে সকাল।
শোনালী আলোকছুটা পড়ছে গমের শীশে। চারদিকে সবুজের মেলা দেখে
মোতাক মন আনন্দে নেচে ওঠে। পথ চলতে চলতে চিন্তা করে অতীতের
একটি দিনের কথা। গ্রীষ্মের একটি জ্যোৎস্না রাত! মোতাক পাড়ায় বসে
আছে। পাড়ার লোক চন্দ্রের বিয়ের প্রমথ্যে ব্যস্ত। এক কোণে মেয়েরা
নাচছে। কেউ কেউ আবার গান গাইছে, ঢোল বাজছে। তাদের ঢাক
ঢোল বাজছে আর কয়েকজন মদ খেতে খেতে মজা দেখছে।

মোতাক দৃষ্টি পড়ে তাদের মতো একটি মেয়ের উপর। তাকে দেখার
সঙ্গে সঙ্গে তার মন চকণ হয়ে ওঠে। তার নিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।
তার লোকদর্শকে আকর্ষণ পান করার ইচ্ছা নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
অনেকক্ষণ চোখে চোখ পড়ার পর মোতাক দিকে ঈর্ষিতপূর্ণ ভাবে অজুলি
নির্দেশ করে নাচতে থাকে ঐ মেয়েটি। নাম মেথী।

মথী গায়ে বিয়ের সব কাজ শেষ করে গেছে। নিষ্কলতা বিবাহ করছে
তিন পেট সময় ঈর্ষিতপূর্ণ একটা দৃষ্টি ছেনে একটা ছোট পাখর মেথীর উপর
হেঁদে। মেথী খেবোয়। দু’জনে নিলে দুবে চলে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

ভাৰণ্য।তাদেৱ দুজনৰ মধ্য বহুবাৰ দেখাশোকাং হৈছে। অহুৰে একটা বাগিচা ছিল। মোত্যা সেটা পৰিষ্কাৰ কৰতে গিয়েছিল। বাবু বিশেষ কৰে এ কাজ তাৰ ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। দুপুৰে কাজ শেষ কৰে সে ফিৰছিল। সেই সময় পেছনেৰ খেকে কে যেন এলে তাৰ চোখ বুজিয়ে দেয়। 'কে?' বলে জিজ্ঞাসা কৰতে সে হেসে ফেলে। সে আৰ কেউ নয়, মেথী। মোত্যা তাকে জড়িয়ে ধৰে জিজ্ঞাসা কৰেছিল 'মেথী?'

'কি?'

'আমাকে নিয়ে করনি?'

'নলব?' মেথী জিজ্ঞাসা কৰে।

'কি?'

'নিয়ে কৰতে পা'ব। তবো তুটো শৰ্তে।'

'নল।'

'পরত্নীকে মায়েৰ সমান মনে করনি। আৰ মদ খাবি না।'

'বেশ, রাজি।'

ভাৰণ্যৰ সোদেৰ নিয়ে হয়।

বিয়েৰ পৰ আট বছৰ পৰ্যন্ত সে মদেৰ নাম কৰেনি। কিন্তু সেদিন নবু চৌধুৰীৰ বৰমাত্ৰীতে বন্ধ বান্ধবেৰা জোৰ কৰে তাকে মদ খাটুয়ে দেয়। আৰ সেদিন খেকেই আবার পুরোন অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দিনেৰ পৰ দিন সে মদ খেতে লাগল। দিন কয়েক মেথীকে জানতে দেয়নি। কিন্তু কত দিন আৰ এ সব বউবেৰ কাঁছে নু'কোন যায়। মেথী যেদিন পেকে জনতে পাৰে সে দিন পেকে সুখী পৰিবাৰে বিসৰ্গকেৰ বীজ ৰোপিত হয়। প্রত্যেকদিন প্ৰেম বিনিময়েৰ পৰিবৰ্তে হত ঝগড়াঝাঁটি।

বাত্ৰে মোত্যা মদ খেয়ে ধৰে ফিৰতো। প্রত্যেকদিন বউ তাকে উপদেশ দেওয়াৰ চেষ্টা কৰত। তাৰ শৰ্তেৰ কথা শ্ৰৱণ কৰত। আৰ প্রত্যেকদিন মোত্যা ক্ষমা চাইত। মেজাজ বিগড়ে থাকলে মাৰত। কিন্তু পৰেৰ দিনই আবার ভেলুৰ দোকানে ছুটে যেত। আগেৰ বাত্ৰেৰ সব কথা ভুলে যেত। সব প্রীতশ্রুতি ভঙ্গ কৰত।

দিন কয়েক চল ঘৰেৰ আসছে না ঠিক মতো। অনেক বাতে চলতে আসে।

পৰ চলতে চলতে এই সব দৃষ্ট মোত্যাৰ চোখেৰ সামনে আসতে লাগল।

এখন সে বাঁশ কাড়ের নীচে বসে বোতলের ছিপি খুলে ছ'চার টোঁক মিলে আবার ছিপি এঁটে বেধে বাঁশ কাটেতে শুরু করে। তিন ঘণ্টা বাঁশ কাটার পর আবার পুঁটলি খুলে পিয়াজ বেব করে খেতে খেতে বোতলের বাকি মদ শেষ করে।

কিছুকণ বিশ্রাম করে সে আবার বাঁশ কাটেতে শুরু করে। একশ'টা বাঁশ কাটা চাট্টিখানি কথা নয়। বাবুত অর্ডার দিয়েই খালাস। নিজেকে তে আর একটাও কাটেতে হয় না। কাটেতে হলে বুঝত কত শানে কত চাল হয়। বাস। একবার ঘরে বসে হকুম করে দিল 'মোত্যা, একশো বাঁশ কেটে আন।' মালিক এসেছেন বাঁশ কেটে নিয়ে যেতে হবে।

বিকেল পাঁচটা বাজে। তার মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু সেদিকে তার ক্রক্ষেপও নেই। মাথায় বাঁশের বোঝা চাপিয়ে গায়ের দিকে এগোয়। ভেলুর দোকানের সামনে আসতেই আবার 'গর মন চকল হয়ে রুঠে। বাঁশের বোঝা নীচে ফেলে বিড় বিড় করে বলে, 'ওঃ! দম বেরিয়ে গেছে। বাটা'রা নিজেরা পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে আর আমাদের জানোয়ারের মত খাটায়। ভকুম চালায় এটা কর,ওটা একুনি করবাটা'রা নিবংশ তোকা।'

'মোত্যা যে?'

'নমস্কার, ভেলুভাই।'

'বাঁশ কেটে এনেছ যে?'

'হ্যাঁ এনেছি।'

'চলবে নাকি কিছুটা। গায়ের বাবা কমে য়েত।'

'আরে সেই জন্তেইতো ভগবান ঈট মদ সৃষ্টি করেছেন।'

'কিন্তু, মোত্যা ভাই, আগেওও কিছু পরসাদ পান। মনে আছে তো?'

'আমার বেশ মনে আছে। দেখ ভেলু, আমার নাম মোত্যা। হোর কানাকড়িও কোনদিন মারব না।' মাটির বগুড়ি আমার মেদীর দি'বা।

হোর সব পরসাদ কড়ায় গড়ায় চুকিয়ে দেব।'

'নে নে, ধর। এর অক্সে আমার বউয়ের নামে দি'বা খেতে হবে না।'

'তা হলে দে ভাই। শুভ কাজে দেবি করতে নেই।'

'কতটা দেব, এখন পকেটে কিছু আছে?'

'নে না আট আনা। তুই টাকা পরসাদ কর। কি জিজ্ঞেস করছিল। টাকা

পরসার অভাব কিসের। নে ভরে দে বোতলটা।' বোতল নিয়ে মোত্যা ঢক ঢক করে পেয়ে নেয়। বেশ রাত হয়েছে।* ঠুঙাও পড়েছে।

‘বাঁশ কার জন্ত নিয়ে যাচ্ছিল?’

‘আরে তুই অত বাঁশ বাঁশ করছিল?’ চড়া স্বরে বলে ওঠে, ‘কটা বাঁশ চাস তাই বল না। নিয়ে যা যে কটা চাস। যা নিয়ে যা।’

‘কিন্তু তোর মালিক কে?’ ...

‘আরে ধুংতোর মালিকের নিকুচি করেছে। নিয়ে যা না যে কটা দরকার। যা নিয়ে যা।’ বাঁশগুলোকে ঐ থানেই ফেলে দিয়ে মোত্যা বক বক করতে ঘবেব দিকে এগোয়। রাত নটা বাজে। টলতে টলতে সে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকতেই দেখে অন্ধকার। প্রদীপ তখনও ধরান হয়নি! উনোনেও আগুন নেই। যেদী ভাড়া খাটিয়ার স্তরে চেরাচ্ছে। নেশার বোরে মোত্যা মনে করে বউ নিশ্চয় চা: করেছে। মনে মনে বলে, আজ এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে চা: ভুলে যায়।

‘আরে এটী!’

‘মা গো।’

‘আবার মাগো কিসের! দেখতে পাচ্ছিল না। এখন আর স্তনতে পাবে কেন! কোই ওঠ - আমার গুব ফিদে পেয়েছে।’

‘ফিদে আর ফিদে, বলি চোখ কি তোমার আছে না গেছে। দেখতে পাচ্ছ না আমার অবস্থা?..... আজও আমার মদ পেয়ে আসা হয়েছে, দেখছি -।’

‘মদ? ইাঁ, মদ তো পেয়েছি। মদ আমি আলবৎ পেয়েছি! আরো মদ খাব। তোর যা ঠেছে করতে পারিস। কোণাকার কে এসেছে আমাকে উপদেশ দিতে। মদ..... ইাঁ, মদ আমি নিশ্চয় খাব। তুই বাধা দেবার কে! নে ওঠ কোই উঠছিল কি না।’

‘ও মাগো! আমার যে ওঠার কোন শক্তি নেই।’

‘শক্তি নেই। দাঁড়াও এখন দেখাচ্ছি তোমার শক্তি আছে কি না!’

কথাটা শেষ করতে না করতেই বউয়ের খাটের কাছে গিয়ে তার চূণের খুঁটি ধরে টানে।

‘ও মাগো—ওগো তোমার পায়ে পড়ি—।’

‘কোই উঠবি কিনা স্তনতে চাউ?’

‘মো-মো !’

‘দেখ তবে ।’ বলেই মোত্যা তার পেটে টেনে করেকটি লাগি মাঝে আর বলে, ‘কোই উঠবি, না আর একটা লাগাতে হবে ?’

লাগি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্দনাদ করে সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায় ।

‘বাবা !’ ঠিক সেই সময় তার ছেলে লালী ছুটে ঘরে ঢুকে বলে, ‘বাবা মার পরীর খাবার । অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি ।’

‘ও ! বাটা আর মার পক্ষে ওকালতি করতে এসেছে । হারামজাদা । বেবো এখন থেকে । বেবো আমার ঘর থেকে ।’ বলেই মোত্যা নিজের পুত্রের তলোয়ার তুলে তাকে তাড়া করে । লালী ভীষণ ভয় পেয়ে বাবারে মাঝে চিংকার করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে লোক জমা করতে ।

এদিকে মোত্যা তলোয়ার উঁচিয়ে বউএর দিকে দ্রুত আর অল্পদিকে লালী বাবুর কাছে গিয়ে বলে, ‘বাবু বাঁচান, মরে যাব । সবাই মরে যাব । বাবা…… ।’

‘কি হয়েছে ?’ বাবু জিজ্ঞাসা করেন ।

‘ছুটে আছেন । ছুটে আছেন বাবু । বাবা তলোয়ার দিয়ে মাকে মারছে —মাকে একেবারে শেষ করে ফেলল, বাবু ।’ বলে হাউ মাউ করে কঁদে ফেলল ।

এদিকে মোত্যা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে চারদিকে দ্রুত আর বিড় বিড় করে বলছে, ‘একুনি কেটে ফেলব হারামজাদীকে । শালী আমার সঙ্গে ঢং করছে, ঢং । বেটা জানে না আমি কে । আমাকে এখনো চিনতে পারেনি । আজ পারবে ।’

ইতিমধ্যে বাবুর ডাক শুনতে পায়, ‘মোত্যা, আবে এই মোত্যা ।’ এই ডাক তার বুকে যেন তীব্র মত বিন্দলো । তলোয়ার হাতে নিয়েই সে বেরিয়ে এসে বলে, ‘আজ্ঞে হজুর...হজুর... ।’

‘সদমাইশ’ কথাটি বলেই তার শিঠে সমানে বেত চালাতে থাকে । শেষ পর্যন্ত বাবু ক্লান্ত হয়ে পড়লে হৈকে বললেন, ‘অমদায়, ডাক পুলিশকে । তুলে দি বাটাকে পুলিশের হাতে । বাটাচ্ছেলে জেলের ভাত খেয়ে আনুক একবার ।’

এই নির্দেশ দিয়ে বাবু চলে গেলেন । এবং পুলিশ নাম শুনে মোত্যা কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় । বেশ কিছুক্ষণ ইা করে দাঁড়িয়ে থেকেশেষে মোত্যা ছুটেদেয় ।

চোবের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মোত্যা ঘরে চোকে রাজির অঙ্ককারে। বেশা অনেককিণ্ণ, আরেই ভেঙে গেছে। এক অস্তর্বেদনা তার মনকে পীড়িত, মণ্ডিত করছিল। কোন এক মানসিক ভয় এবং আশঙ্কার তার মন জবীভূত, আত্মনার উঠেই সে বলে ওঠে—

‘লালী ও লালী।’

কিন্তু কেউ জবাব দেয়নি। ভয় এবং আশঙ্কার এদিক ওদিক তাকায়, তারপর বউকে ডাক দেয়, ‘আরে ও বউ, তুমি পাচ্ছিস কি না!’ কিন্তু কোন জবাব আসেনি।

অনেক কটে সে দেশলাই পুঁজে বের করে প্রদীপটা ধরায়। প্রদীপটি নিয়ে সে খাটের কাছে আসে।

একি! মেথীর কি হয়েছে! মেথীর ভয়ঙ্কর বিকৃত মুখ দেখে মোত্যা পাগল হয়ে যায়। কাতর আত্মনাথে ফেটে পড়ে।

ধপ করে তার হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে যায়। এদিক ওদিক পাগলের মত তাকিয়ে ছুটে বেঁটেরে যায় ঘর থেকে। পরক্ষণেই মনে পড়ে পুলিশ! হত্যা! সেইতো হত্যা করেছে! পুলিশের কথা মনে পড়তেই সে এক দৌড়ে পালিয়ে যায় সেই কালো রাজির বুক চিরে।

মোত্যা ছুটছে। জোরে ছুটে পালাচ্ছে। তাকে যেন কোন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস গর্জন করতে করতে তার টুঁটি টিপে ধরার জন্য ধাওয়া করেছে। ছুটে ছুটে কোথায় যাচ্ছে খোয়াল নেই। পারের তলায় কি পড়ছে সেদিকে তার জ্ঞান নেই। ছুটছে তো ছুটছেই।

বন ঝাড় খোঁপ কাঁটা সব কিছুর উপর দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। পারে কাঁটা ফুটছে। রক্ত ঝরছে কিন্তু তবু সেদিকে লক্ষ্য নেই। অকক রক্ত। হোক ক্ষতবিক্ষত তার শরীর, তবু সে এ ছোট্টা শেষ করবে না।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়।

কে! কে সে!! রাক্ষস নয়ত!! ভয়ঙ্কর আকৃতির কি সেটা চিংকার করে বলছে, ‘আরও মদ খাও মোত্যা, আরও মদ খাও’……ধপ্ করে সে মাটিতে বসে কাঁদতে শুরু করে। মোত্যা পাগলের মত ছুটছিল। ঘামে পাত্তিজে গেছে। বুক ফুলছে, ইপাচ্ছে। না! আর ছোট্টা যাবে না। কিন্তু মোত্যা কোন কিছুই ভোয়ালনা করবে না। আর দূর নেই, আশান ঘাটও কাছে এসে গেছে। পা আর টানতে পারছে না। বসে পড়ে সেই-

থাকেই। স্মৃতিতে লুটিয়ে পড়ে। ঐ স্থান থেকে তার প্রত্যেক জাতকই যেন চিৎকার করে বলছে, 'আবে ও ঝোড়ো। তুই এ কি করলি ?'

'মায়া !' লাজী ডাক দেয়।

কিন্তু ঝোড়ো একটি কথাও বলেনি।

চিটা হাউ হাউ করে জলছে। সেটা কার।

মেথীর নয়ত ?

জগমজের ডায়েরি

বার্ষিক রায়

১২৭৫, ৩০ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা চ'টা।

আমি দেখছি কিন্তু কিছুই দেখছি না। আমার দেখার সঙ্গে জগতের অস্তিত্ব কতোখানি সত্য আমি জানি না, জানি না বলা ঠিক নয়, আমি জানতে পারি না। আমার মতো করে বস্তু দেখি, এবং বস্তু যখন ভাবি, যখন স্বরূপ জানতে চেষ্টা করি, তখনও স্বরূপ জানি না, আমি কতগুলি গুণ দিয়ে জগৎকে বস্তুকে দেখতে চেষ্টা করি, সত্য বলি বটে, কিন্তু সত্য কি, মাতৃস্ব জানে না এই সত্যে ব্রহ্মাও কম্পিত, কল্পনার সত্যে আনন্দ ও সান্দ্রনা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। এইভাবে দেখলে জগৎকে মায়া বলা চাড়া উপায় নেই, মায়া তৈরি করছে আমার ইন্দ্রিয়, অথচ এই ইন্দ্রিয়কে আমি ত্যাগ করতে পারি না। হুতরাং জগৎকে দেখছি আমি মায়ায়। এট মায়ায় জগতের অস্তিত্ব যে ভাবে আছে আমি সেইভাবেই দেখি। একে ত্যাগও করতে পারি না, আমার এই সত্যরূপ গ্রহণ করতেও অক্ষম। পৃথিবীর সঙ্গে তাই যোগ আমার একাত্ম নয়, যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন একাত্ম হতে পারবো না, মৃত্যুর পর আমার দেহ ভস্মীভূত হলে, পঞ্চভূতে মিশে গেলে এক হবে কিন্তু সেই এক হওয়ার সঙ্গে একাত্মবোধ তো আমি পাই না, একাত্মবোধ তৈরি করে আমার চেতনা, কিন্তু চেতনাই আমার বিরোধ জানে। বিরোধ জানে বলেই একাত্ম হতে চায়, চায় বলেই পার

না। যতোদিন মানুষ জীবিত থাকবে ততোদিন সে পৃথিবী থেকে আলাদা হয়েই বেঁচে থাকবে। অথচ পৃথিবী তাকেসংবাদ পাঠাচ্ছে, কিন্তু এই সংবাদ নিয়ে পৃথিবীর বৃক্কের গভীরে আমি এক হয়ে বসতে পারি না। আমি ব্রহ্ম বুঝি না, জ্ঞানি না। আমার কাছে পৃথিবী আছে। আমি পৃথিবীর বৃক্কের স্তনের রস টেনে নিয়ে তার গহ্বররে শিশুর মতো বাস করতে চাই। এতেই আমার মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি আমি পাই না কেন।

আমি হুবে মুগ্ধ হই, কিন্তু হু আমাকে কতোদূর নিয়ে যায়। তারপরও আরো দূর আছে, আরো দূর আছে। সেই দূরে আমি যেতে পারি না। বিস্তৃত আত্মার বোধ কি, দেহের মাংসের মধ্যে যে রক্ত, স্নায়ুতে যে জল, তাকে তো আমি শুকিয়ে ফেলতে পারি না; পারি না বলেই পৃথিবী থেকে নেওয়া সংবাদ আমাকে নানারকম দৃষ্ট দেখায় স্বপ্নে ও আগ্রত অবস্থায়, এই দৃষ্ট কখনো বৈকটুরে যায় কখনো আনন্দ আগায় কিন্তু কখনোই সত্য দেখায় না। আমি সত্য চাই।

আমি ভালোবেসে ছিলাম সেই ভালবাসা চারিরেছি, হাবিরে বৃক্কি, ভালোবেসেও আমার হুখ নেই, না ভালোবেসেও আমি থাকতে পারি না। যে নারীকে আমি ভালোবেসেছিলাম পৃথিবীর মতোই সেই নারীকে আমি পাইনি। বোধহয় কোনো নারীকেই কোনো পুরুষ এই পৃথিবীতে পায়নি, কল্পনা করেছে পেয়েছে, কিন্তু পায়নি। এটা তার সত্যনা কিন্তু এই সত্যনা বৃক্ক নিয়ে বেঁচে থাকলে কোথাও রক্তের অঙ্ককার থাকেই, সেই শূন্য অঙ্ককার থেকে কল্পনার কাগজ নানা-ভাবে বেরিয়ে পড়ে, কখনো আনন্দে কখনো বীভৎসভাবে। না, এই কাগজ আমি আনন্দ পাইনি, আমি চেয়েছিলাম গভীরে যেতে, আমি প্রার্থনা করেছিলাম সম্পূর্ণ করে পেতে। কিন্তু অস্ত্রের মধ্যে গভীরতা ও সম্পূর্ণতা কখনো আসে না, কেউ দিতে পারে না, এটা যখন আমি বুঝলাম, বিব্রঙ্কিতে আমার মন ভরে গেল, আমি আমার নারীর কাছ থেকে সরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাইলেও তো পারা যায় না। বন্ধন আমাকে পীড়ন করলো গভীরভাবে। রক্তের বন্ধন মাংসের বন্ধন স্নায়ুর বন্ধন পৃথিবী থেকে পেয়েছি, সে পীড়ন করলো আমার সমগ্র সত্তাকে, সেই সত্তা কুঁকড়ে যেতে লাগলো দিনরাত। মনে হলো পালিয়ে যাই। কিন্তু কোথায় পালাবো! যেখানেই যাই পৃথিবী আমাকে আঁকড়ে ধরে অথচ দেখা দেয় না। তার সত্য কি শুধু নিম্নত জিজ্ঞাসা করেছি, সে মুখ হুবিরে নিয়েছে। কখনো বিকট হয়ে দাঁত দেখিয়ে পা

হাশিয়েছে, আমি ভয় পেয়েছি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, না, না চিরকালের জন্য এই পৃথিবী থেকে আমি হুবে মরে যাবো।

নদীর তীরের নৌকোর কখনো আমার নাটকে নিয়ে হুবেতে বেড়িয়েছি, নন্দা। নেমে এসেছে অন্ধকার মাথায় করে, আলোর ফুলকি অন্ধকারের বেহ ভেদ করে, গাঢ় অন্ধকারেও নক্ষত্রের আলো ভেদ করতে পারে। শান্ত জলে চেউ নেই গঙ্গার, তবুও মাঝে মাঝে পাড়ে জল ঢলছে, আছড়ে পড়ছে তীরে, পাড়ের নরম মাটি ভাঙছে। যে জায়গার জল ছুঁয়ে আছে সেই জলের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক দেখতে দেখতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার পাশে পলি আছে, পলি আমাকে দেখছিল না, তাই বকে, সে দুগুনি অশ্রুভব করছিল, দেখছিল তার মাথার চুলের কালোর সঙ্গে ব্যস্তির কালো, কতখানি গভীর চোখ হুরিয়ে দেখছিল জল কতদূর ক্রান্তি ও আনন্দ আনতে পারে, বোধহয় ভাবছিল এই ক্রান্তিময় অসীম জলে সে যদি ডোবে তাহলে কেমন করে সাঁতরে পেরোবে, হাশি পাচ্ছিল কেউ কি সাঁতরে শেকতে পারে। আমি সাঁতরাচ্ছি, পলিকে দিয়ে এবং পলির মশো, তাই বিবস্ত্রি ও ক্রান্তি আমাকে কইয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আমার জীবনের সম্পত্তি খুঁইয়ে যাচ্ছে।

পাড়ের ছোঁয়া জলে মাটির স্পর্শের ঘোলাটে আবির্ভাব, মাটিতে জলের আলিঙ্গন, অথচ পূর্ণ জল নেই। এমনি নেই-আছে মিলিত্রেই কেমন একটা মিশ্র ঘণা জাগছে সেখানে। আমি যখন পলির সঙ্গে মিশেছি, তখন এমনি ঘোলাটে আবির্ভাব আমাকে ক্রম করে তোলে। আমি শুদ্ধতার গিয়ে পৌঁছতে চেরেছি, কিন্তু তা কি আমি পাবো। আমি মাংসের ও বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ আমার বুদ্ধিও সেখানে জড়, আমার অন্তঃকরণ, অর্থাৎ মন প্রাণ সবই অচেতন। কিন্তু যাকে চেতন বলি সে তো এটলব জড়কে বুকে নিয়েই আছে, তাকে কিতাবে বাদ দিতে পারি। জড়কে বাদ দিলে চেতনাও থাকে। নন্দা আছে বলেই বস্তুর ভেতরে অগুতম শক্তির প্রচণ্ড খেলা, যা চৈতন্তেরই নামান্তর দেখতে পাই। শক্তিকে ও বস্তুকে আলাদা করলে কি পাওয়া যায়। ঘোবনের ধারণা ছিল বিস্তৃত পৌঁছনো, সেট খেলায় কল্পনা করেছি নিজেকে নিয়ে, কিন্তু কোথাও পাইনি।

পলি চলে যাবার পর, আমি শুধু সময় মুহূর্ত, স্থির, গতি, মাটি, জল আকাশ ও পৃথিবীর কথা ভাবছি, কিন্তু এই ভাবনার করি কি লাভ, আমারও লাভ নেই, তবু ভাবছি, হয়তো ভাবতে ভারতেই মরবো, কারণ এই ভাবনাই

মাহুষের, মাহুষের ভাবনাই মাহুষের আনন্দ ও মৃত্যুর বীজ। জল গ্রাণ দেয় মৃত্যুও আনে। কিন্তু আমি মৃত্যুর কাছাকাছি।, সমুদ্র থেকে চেউ ওঠে, সেই চেউ সমুদ্রে মরে যায়, কিন্তু চেউ সমুদ্রকে পায় না। শুধু মরে যায়।

এমন কি আমি কথা বলতেই চাই না। কথা বলতেও আমার কষ্ট হয়, কথার ধ্বনির মধ্যে যে অর্থ, সেই অর্থ অপরে কেউ বোঝে না, বোঝে না এই কারণে আমার দেওয়া অর্থ সে বুঝতে পারে না। এই অর্থের সঙ্গে সে অভ্যস্ত নয়, হয়তো তার কথাও আমি বুঝতে পারি না কারণ আমার অভ্যাসে ও কল্পনার জগতে আমি বদ্ধ। আমি মনে মনে কথা দিয়ে হুগ শুনে যে ভাব পরিধি তৈরি করি, সেই পরিধি থেকে বেরুতে পারি না, সেই পরিধি দিয়ে জগৎকে দেখি। আমি জানি নারীকে এইভাবে দেখতে হয়, নারীর শূন্যে মধু আছে কিন্তু তার ন্তন হুগলে স্নায়ুও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নেই, তবু সেই স্নায়ুকে আমি জানি না।

আমার মাথার ওপর কালো আকাশ আরো কালো হয়ে উঠছে, সেই কৃষ্ণ অন্ধকার পেরিয়ে তারার আলো পিসাক্ত বাতাসের ছোঁয়ার ঝাপসা ও কলুষিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, শব্দনের পাখায় ভর করে ভীষণ কলুষ একাধিপত্য নিয়ে নামছে। আমার বুকের ভাষা এমনকি আমার বায়ু পর্যন্ত নিঃশেষিত, কৃষ্ণ তারার ভ্যাপসা গরম আমার চারপাশে পাহাড় তৈরি করছে, তাই কোনো-দিকেই যেতে পারি না। এই অন্ধভাবে বসে বসে আমি ধ্যান করবো, কিন্তু সে ধ্যান কিসের। পূর্ণবীকে বর্জন করে, আমার রক্ত মাংসকে ভেদ করে শুধু মাত্র আত্মায় আমি প্রতিষ্ঠিত হবো, সেই আত্মা কি সব কিছু থেকে মুক্ত, নাকি কল্পনায় তাকে আমি ভরে তুলবো, এই কল্পনাও পৃথিবীর। পলি তুমি যোণেনই যাও, তুমি আছো।

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫, রাত্রি

পলি চেয়েছিল নিজেকে, নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের সত্তা মানে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে, সেই স্বাতন্ত্র্যের কাছে আমার অস্তিত্ব গোপ, অর্থাৎ আমাকে উপলব্ধ করে সে গম্মী হতে চেয়েছিল, যেমন পিকাসোর কাছে নারী হয়ে উঠেছিল ওঁর শিল্পের উপাদান, নারীকে ব্যবহার করেছিলেন শিল্পকে গড়ে তুলবার জন্তে। এই স্বতন্ত্র সত্তা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন খেলার, উৎসাহে, স্বেচ্ছাচারে- স্বাধীন জীবনযাপনে, সে বেহ দ্বিত না, বেহ নিত।

কিন্তু আমি তার হয়ে বেঁচে থাকতে পারি না, আমার মনের মধ্যেও

গোপনে বাসনা ছিল সে আমার। তবু আমি উদাসীন হয়েছিলাম বহুদিন, আর উদাসীন হয়ে থাকতে থাকতে মাহু ব্লীষ হয়ে যায় আর যদি ব্লীষ না হয়, তাহলে সে তরুণতা করে। কিন্তু আমি তরুণতা যুগ্ম করি মনে প্রাণে। আমি স্বাবলম্বী হতে চাইলাম, আমার ব্যক্তিত্বে পলির সঙ্গে বিরোধ বাধলো দিনে দিনে। স্বাবলম্বী পুরুষের ব্যক্তিত্বের কাছে মন বড়ো হয়ে উঠলো ধীরে। এই মন শেষ পর্যন্ত বস্তু হারালো, এতোদিন উদাসীন হয়ে আমি ভুলে ছিলাম, সচেতন হয়ে ওর সব দোষ আমার চোখে প্রকট হতে লাগলো, আমি সঙ্গে এলুম ঠুঠ কাছ থেকে।

পলি নিয়তই ভালোবাসার কথা বলতো, স্বামীর ভালোবাসা অনাবিল হলে স্ত্রীর আর কোনো ভাব থাকে না। কিন্তু এই ভালোবাসা কি! ভালো-বাসা কি আত্মসমর্পণ, যাতে নিজের কোনো বোধ থাকে না, না ভালোবাসা কি সব নিয়ে পূর্ণ। আমি জানি, আত্মসমর্পণ বা সব নিয়ে পূর্ণ কোনোটাই জীবনে সার্থক নয়, আপেক্ষিক মাত্র। আমি আত্মসমর্পণ করে দেখেছি, পলির স্বেচ্ছাচারের নিকার পাহাড়ের চূড়ার ওঠে, পাহাড়ের চূড়া ধপাস করে মাটিতে পড়ে, লোক মাঝে, চূড়া চূর্ণ হয়, সেখানেও অবস্থার মূর্তি বিকট। আমি যে জগৎকে নিয়ে পূর্ণ থাকতে চাই, সেই পূর্ণ জগতের রূপ কি পলির মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আর পলিই কি আমার মধ্যে তার জগৎ পূর্ণ করে পেয়ে-ছিল। না, পলি কখনোই পারনি, পারনি বলেই তো তার বিকার এমন মূলিয়ে ওঠে, আমি পলিকে নিয়েই শাস্ত থাকতে চেয়েছিলাম, আমরা জগতে নানান বস্তু আছে নানান বস্তুর মধ্যে পলিও একটি বস্তু, সেই বস্তুকে আমি মনে দেহে পেতে চেয়েছি, কিন্তু তাকে কখনোই বলতে পারি না, সে আমার জগৎ, কেননা আমার জগৎ তো নিরন্তর সবে সবে বড়ো হচ্ছে অনন্তে, সেখানে পলি আমাকে নিয়ে যেতে পারে না, আর সঙ্গে গেলে শুঁ তার হয়, তবু তাকে আমার দয়াকর, যেমন বেঁচে থাকতে গেলে শরীরের সব অঙ্গ প্রয়োজন। পলি আমাকে গ্রাস করতে চাইলো, আমার ভাই বোন আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকল থেকে। আমি গ্রাসিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পলিও মরে গেল, আমার আপন জগতে এখন পলি নাচে।

মৃত্যুর ও পৌরুষের মধ্যে সহযমিতা কতোখানি, মৃত্যুর নিয়ত পৌরুষকে এড়াতে চায়, পৌরুষ মৃত্যুবকে দলিত করে। পৌরুষের দাবি বেশি, অন্তত পলির কাছে ছিল, তাই পলি পৌরুষের কাছে মুক্ত ছিল, কিন্তু আমার মনের

ভেতরে কোণার একটা উদানীন ভাবে হৃদয় লুকিয়ে থাকত চায় এই হৃদয় বন্ধ করতে চায় তার সব পীড়ন অত্যাচার ি জ্বালাকে মনে করলো ভীক। আমার পৌকব তখন ভীক হয়ে গেল, এই ভীকতা আমার পক্ষে অসম্ভব, ভীকতাই আমাকে চাপিয়ে দিল, আমাকে সরিয়ে দিল ওর কাছ থেকে। আমার ব্যক্তিত্ব ও পৌকব জেগে উঠলো। মেয়েরা হৃদয় থাকতে চায় আসলে ওদের শরীরে গর্ভে কালো ক্রেনের অঙ্ককার ওদের সর্বত্র রূপ কালো এই কালো থেকেই পুরুষের মনে ও দেহে আনন্দ উদ্ভাবিত হয়। পীড়নে অত্যাচারে শোষণে কালো দিনরাত মথিত হয়, মথিত হয় বলেই পীড়ন করতে ভালোবাসে। এমনিভাবে ওদের দেহে মনে পীড়ন আটপুঠে লেপ্টে আছে তাকেই ওরা প্রসারিত করতে চায়, পুরুষ যদি তাকে সহ করে এগোতে পারে, তাহলে সুখী। যদি না পারে তাহলে বিরোধ অবশ্যস্বাবী। আমি পলির কাছে হেরে গেছি হেরে গেছি বলেই আমি বহুদূরে সরে গেছি ওর কাছ থেকে। সেখানে আমিও যুক্ত, পলিও ছিন্নছাড়া। আমার মনের আকাশে পাখির উড়াল, সে পাখি শুধু উমাও হতে চায় পলি মাটিতে ধূরে বেড়াতে চায়, ধূতে ধূতে শীতের ছাঁট গাদায় হুমিয়ে পড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে, যখন ঘুম ছেড়ে ওঠে তখন সারা গায়ে ছাঁট, এই ছাঁট থেকে অদ্ভুত চূর্ণধুম ওড়ে, তারি রূপে জগৎ বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির মধ্যেই আনন্দ! তাকে নিয়ে থাকা যায় না, বাইরে অসুস্থ করা যায়।

আমি সত্যি ভাবি, পুরুষ কি অমিতবীৰ্য হতে পারে, সৌন্দর্য কি অমিতবীৰ্য পুরুষের মধ্যে একই সঙ্গে থাকে নাকি অমিতবীৰ্য পুরুষ সৌন্দর্যকে খোঁজে নারীর মধ্যে। নারীর মধ্যে খোঁজে বলেই সে পায় না। কবিতা বলেন সৌন্দর্য প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেম। তাহলে তো আমার কথাই সত্যি। সৌন্দর্যকে পাওয়া যায় না নিজের মধ্যে ও নারীর মধ্যে। তাকে দূর থেকে উপলব্ধি করা যায়। নরনারীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা বীৰ্যের, শক্তি ও পুরুষের। সেখানে জয়ী হতে পারে সে, যে বীৰ্যের সাধনা করেছে। প্রেমের মধ্যে অনন্যকে খোঁজা মানে প্রেমকে অস্বীকার করা। আসলে কালো গহ্বরের অঙ্ককার মানুষকে নিয়ত মাটির নীচে খনির অঙ্ককারে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে দম আটকে মরতে পারে, মরে না বলেই খনির সম্পদ মাঝে মাঝে বাইরে আনে তার বীৰ্যকে বীৰ্যন্তর করবার জন্তে। কিন্তু একদিন খনির অঙ্ককারে তাকে মরতেই হয়, জল উপচে পড়ে, গুড়ো করলো ধুলো মাটিতে অঙ্ককার তার দেহকে আবৃত করে

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তবু পুরুষ বেঁচে আছে, এটা সমগ্র পৃথিবীর কাছে অসম্ভব ঘটনা। আমার চোখের সামনে অনিল ঘরে গেল, মনোভোষ মর খাচ্ছে, আর আমি দেখছি।

আ মরি বাংলা ভাষা

ডঃ শিশিরকুমার সিংহ

কবি গেয়েছেন : ‘মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা !’ সত্যি, আমরা আমাদের মাতৃভাষার জন্তু সব করতে পারি। এমন মধুর এবং ভাব প্রকাশের এমন উপযোগী তথা শক্তিশালী ভাষা পৃথিবীতে পুর কমই আছে। সেই হাজার বছর আগের চর্যাগীতের বাংলা ভাষাকে আজকের বাংলা ভাষায় উন্নীত করার জন্তু আমরা অনেকের কাছেই ঋণী। গ্রামীণ বাংলা ভাষাকে উন্নত করে যাঁরা মধ্যান্তরে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস ও ভারতচন্দ্রের কথা। আর মধ্যান্তর থেকে যাঁরা আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কেবী, মৃত্যুন্ময়, বাসুমোহন, নিত্যানাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ। পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার ব্যবহার লুপ্তমাত্র সাহিত্য-চর্চা, চিঠিপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী কাজকর্ম চলত মূলতঃ ইংরেজিতে এবং কিছু কিছু আরবি ফার্সীতে। যদিও আদালতে বাংলার জজ পণ্ডিত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, তবুও তার দ্বারা যে বাংলা ভাষার বিশেষ উপকার সাধিত হত তা মনে হয়না।

বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষে চৌদ্দটি ভাষা সরকারী অচ্যুতমোদন লাভ করেছে। প্রত্যেক প্রদেশই তাঁদের নিজের নিজের প্রাদেশিকভাষাকে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে হিন্দীও কথ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। হিন্দী কেবলমাত্র বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের সরকারী ভাষাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আনুক্রম্যে বর্তমানে হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের

সরকারী কাজকর্মের ভাবাবেগে মর্যাদা লাভের পথে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। তবে এপথে দৃঢ় প্রতিবন্ধক হল দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলো—বিশেষ করে তামিল, —বাংলা নয়। স্পষ্ট কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মাদ্রাজীরাই এপথের প্রতিবন্ধক,—বাঙালিরা নয়। মাদ্রাজীদের অর্থাৎ তামিলভাষীদের মাতৃভাষা-প্রীতি আজ ইতিহাসস্বীকৃত। এমনকি, বাংলাদেশের বাঙালিদের মাতৃভাষা-প্রীতির মত তারাও মাতৃভাষার জন্য যে কোন ধরনের সংগ্রামে ও ত্যাগে প্রস্তুত। আর এই কারণেই তামিলনাড়ু সরকার হিন্দীকে সমস্ত স্তর থেকে প্রায় উচ্ছেদ করে দিয়েছে (এমনকি, বর্তমানে ইন্সলেও বার্ড ল্যান্ডুয়েজ হিসেবেও পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে)। শুধু তাই নয়, তামিলভাষার জন্য রীতিমত গবেষণাও বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ইন্টার-ক্লাশক্লাল তামিল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের কথা। এখানে রয়েছে ল্যান্ডুয়েজ ল্যাবরেটরি। একসঙ্গে দশজন শিক্ষার্থী এই গবেষণাগারে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করতে পারেন। ধ্বনিবিজ্ঞানের জটিল সমস্তার সমাপনের জন্য এই ল্যাবরেটরির সাহায্যগ্রহণ অপরিহার্য। তাছাড়া ইতিমধ্যেই তামিল ভাষার তিন তিনবার—প্যারিস, মাদ্রাজ ও কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষকরা যোগদান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হিন্দীর আন্তর্জাতিক সম্মিলনের কথা। এইতো মাত্র সেরদিন হিন্দীর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মিলন হল।

তামিলভাষা ভারতের অগ্রতম প্রাচীন বা প্রাচীনতম ভাষা। এই ভাষাটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। আনুমানিক প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই ভাষাটি উদ্ভূত হয়। ভারতের আদি অধিবাসীদের ভাষাই হল এই ভাষা। আর এজন্তেই তামিল ভাষাভাষীরা গর্ববোধ করেন। তবে তাঁদের এই গর্ববোধ কেবল মাত্র মৌখিক নয়, আন্তরিক।

আর এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে বাংলা ভাষার কথা। আমরাও এই ভাষার জন্য গর্ববোধ করি! কিন্তু তা কতটা আন্তরিক? আমরা আমাদের ভাষার জন্য কি করেছি বা কি করছি? কেবল মাত্র সরকারী ঘোষণা বা ফাঁকাবুলি ছাড়া কাজকর্মে কতটুকু বাংলাভাষার ব্যবহার হচ্ছে? বাংলাভাষার জন্য কেন কোন ল্যান্ডুয়েজ ল্যাবরেটরি নেই (—যা কলকাতায় আছে তাও ইংরেজির জন্য)? তামিল বা কানাড়ীর মত 'ইন্টারক্লাশক্লাল বেসলি রিসার্চ ইন্সটিটিউট' নেই কেন? বা কোন আন্তর্জাতিক সম্মিলন আজ পর্যন্ত

সম্ভব হল না কেন ?! এর জন্য দায়ী আমরা—বাংলা ভাষাভাষীরা ।
 আমাদের মাতৃভাষার জন্য আন্তরিক দৃষ্টি নেই । তমিলীদের মত মাতৃভাষার
 জন্য আমরা ক'জন আত্মত্যাগে (আত্মবলিতে বলাই উচিত) প্রস্তুত ?
 গড্ডালিকা শ্রোতে গা তালান ছাড়া আমরা আর কিছু করতে পারি
 কি ? ওদের সব ধেঁধেঁতনে নিজেদের কথা ভেবে দুঃখ হয় আর আমাদের
 সমস্ত গর্ব ধুলোর লুটিয়ে পড়ে । আর মনে পড়ে যায় এক তমিল কবির মাতৃ-
 ভাষাপ্রীতির একটি অপূর্ব কবিতা (বা গান), যার ভাবটি হল :

কবি তাঁর প্রিয়তমাকে বলছেন—

ওগো প্রিয়মতা !

আমি যখন হতাশায় ভেঙে পড়ি

যখন বাথার ব্যথিত হই

যখন শোকে অভিজুত হয়ে পড়ি

যখন দুঃখে আমি কাতর হয়ে পড়ি —

তখন কি তুমি আমাকে

আমার মধুর মাতৃভাষার গান গেয়ে

আমার দুঃখ দূর করবে না,

আমাকে আনন্দ দেবে না,

আমাকে উৎসাহ দেবে না !

চেনা গোলাপ

(দ্বিতীয় কিস্তি) .

তান-সম্রাট/মাজু সাহেব

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৩ সাল । কলকাতায় সেই ৮৫ নং পার্ক ষ্ট্রীটে মুর্শিদাবাদ নবাবের
 প্রাসাদ । নবাব ওরফিস আলি মির্জার ঘরে মাহ-মুখা বেগমের সঙ্গে মাজু
 সাহেবের তাই ইজাহ-আলির বিয়ে । সেই উপলক্ষে স্ত্রীর ওরফিসের সামনে

এক জমিট জলনা বলেছে। উপস্থিত হয়েছেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বাদাল খাঁ, ওস্তাদ জামিরুদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ খুরশিদ মির্জা, মাজু সাহেব, ইন্দুবালা প্রভৃতি। প্রথমে একথানা খেরাল ও পরে রুঁড়রি গাইলেন ফৈয়াজ খাঁ। সারোগিতে সংগত করলেন ওস্তাদ বাদাল খাঁ। আর হারমোনিয়াম বাজালেন ভারতের শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়াম শিল্পী ভাইরাজির অতিপ্রিয় শিষ্য ও সংপূজ খুরশিদ মির্জা। অবশ্য সুপরিচিত সংগীতগুরু ফৈয়াজ খাঁর কৃতিত্বের কথা আমরা এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য রাখতে চাই। তাঁর গান শেষ হওয়ার পর একথানা তৈরবী রুঁড়রি ধরলেন জামিরুদ্দিন খাঁ আর তাঁর শিষ্যা ইন্দুবালা। প্রোতাদের সাগ্রহ অকুরোধ সবেও প্রথমদিকে মাজু সাহেব যোগ দিলেন না ওঁদের সংগে। ওঁরা তখন গাইছেন :

লাগাতা কারাজোয়ামে চোট্,

ফুলা গেঁদোয়া না মারো মাটকা

লাগাতা কারাজোয়ামে চোট্ ॥

[অর্থাৎ : আমার বুকে চোট্ লাগে। ফুলের তোড়া ছুড়ে মেরো না গো আমাকে। বুকে আমার ফুলের তোড়ার চোট্ লাগে।] আড়াই ঘণ্টা ধরে গেয়ে চলেছেন কণ্ঠশিল্পের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। উনি ছাড়েন তো উনি ধরেন আর উনি ছাড়েন তো ধরেন ইনি। স্তবলহরীর পনিময় গঞ্জে মম করছে তখন গোটা হল টা। মাজু সাহেব তখনো যোগ দেননি, আগেই বলেছি। শেষে 'স্মার ওয়াশিক কয়েকবার সাগ্রহ ইশারা করলেই হঠাৎ একসময় যুগ্ম স্থলেই বিরল বিচিত্র তানবর্গি ডি বেয়েউঠে গেলেন তিনি তাঁর সেট বিষয়কর উচ্চতায় যেখানে তাঁকে দেখতে হ'লে সব খুরশিদীকেই হতে হ'তো অত্রমুখী, যেখানে আর সবাইই পেকে, তিনি পৃথক, যেখানে শুধু মাজু সাহেবই পারতেন উঠতে। ওস্তাদজামিরুদ্দিন খাঁ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। 'আহাঃ! আয়সা অওয়ার কাতি নেহি স্তনেজে।' ব'লেই ছুহাতে তুলে ছুম্ করে ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে ফেললেন তিনি তাঁর অতি প্রিয় হারমোনিয়ামটি যার দাম ছিলো তখনকার রাজারেই বারো শো টাকা। বললেন, 'আগার তোমহায়ে তারে হামারা গালা হোতা তো তামাম্ হিন্দো-স্তান্ মে মেরা কৈ বারাবার নেহি হো সাক্তা।'

'গ্রীসীয় মর্মর চিত্তান্ত্রাধার'-শীর্ষক ওড্-এক্সট্রালিইর সেই বহু-উদ্ধৃত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় : 'Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter.' কিন্তু আজ যাঁর কথা আমি

আলোচনা করতে বসেছি তাঁর কর্তৃনিঃসৃত অলৌকিক স্বরধারার সংগে যাদের প্রত্যেক পরিচয় হয়েছিল কোনোদিন তাঁরা ~~কিউ~~ এই অক্লান্ত যথার্থ মন্তব্য সমর্থন করার আগে নিশ্চয় দুবার চিন্তা করবেন। মাজু সাহেবের চাতে তৈরি স্বরসানিক্সা শ্রীমতী বাখাণীীর সংগে কথা হাজল গত নভেম্বর মাসে একদিন তাঁর সংগীতশ্রুতকর সম্পর্কে। তত্ক্ষিণে চিন্তে তিনি বললেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বললেন: "গুস্তাদজীর গান কী যে ছিলো। তিনি যখন বেহাগ বিলাপল খাওয়াজ মজার প্রভৃতি রাগে খেয়াল কি গাজাল কি টুটুটি গাইতেন তখন আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতো! বড় বড় গুস্তাদ শ্রোতাগণ পাগোল হয়ে উঠতেন।"

'চেনা গোলাপ'-এর প্রথম কিস্তিতে বলেছি মাজু সাহেবের পোশাকী নাম ছিলো সৈয়দ আনওয়ার আলি মির্জা। জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারে। নবাব নাজিম ফিরাইউন ঝার চতুর্থ পুত্র বাকার আলি মির্জা ছিলেন তাঁর বাবা আর মা ছিলেন আরেক মেহেদি খাতুন। শিক্ষা নবাব বাহাদুরজ্ ইন্সটিটিউশনে। দরবারি সংগীতের জুলুজ আনচাওয়ার কেটেছিলো তাঁর শৈশব কৈশোর যৌবন। সেট কথাতাই আসছি।

নবাবরা নাচগানের পৃষ্ঠপোষক হলেও নাচগান সম্পর্কে তাঁদের সংস্কারগত ধারণাটা ছিলো পুণ্ডি নিচু। তাই তাঁদের বশে কেউ গায়ক হবে এটা তাঁরা কেউ ভাবতে পারতেন না। স্বভাবতই মাজু সাহেবের পূর্বে নিজামত পরিবারে কেউ কখনো গান শেখার সুযোগ বা উৎসাহ পাননি। এদিকে নবাব নাজিম ফিরাউন ঝা এবং তাঁর পুত্রেরা, বিশেষতঃ হোসেন আলি মির্জা ও বাকার আলি মির্জা এবং পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র হোসেন আলির পুত্র নবাব স্যার ওয়াশিফ আলি মির্জা গান বাজনা পছন্দ করতেন পুণ্ডি। ফলে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেবা গুস্তাদ আর বাউজিদের সমাবেশ হতো মুর্শিদাবাদে। দিল্লি থেকে আগত তবলাব আতুরর গুস্তাদ আতা হোসেনের মতো অনেক গুস্তাদ গাঠিয়ে বাজিয়ে যেমন নবাবীকৃতি পেয়ে মুর্শিদাবাদেই থেকে যেতেন তেমনি এছাড়াও বউজি মিঠাট লক্ষ্মী, হারদাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে এসে কেউ কেউ স্থায়ী আশ্রয় পেতেন নবাবদের অক্ষরমহলে। এমনভাবে এসে থেকে গেছিলেন বিজানবাঈ নবাব বাকার আলি মির্জার চাচায়ে। তাই সম্পর্কে মাজু সাহেবের বিমাতা ছিলেন তিনি। পরিবারের কর্তৃস্থানীয় পুরুষসন্তদের আগেও মাজু সাহেব ধীরে ধীরে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিমাতা বিজানবাঈ ছিলেন ফিরদী-

কণ্ঠের অধিকারিনী । আর ঠুঙুরি তো আসলে মেয়েদেরই গাইবার জিনিশ । এই বিজ্ঞানবাস্তবের কাছ থেকে তিনি ঠুঙুরি আর গাজাল গাইবার মূল বহুত্বটি যেমন পরিপূর্ণভাবে আরও ক'রে নেন তেমনই তাঁর মাতৃহস্ত সযত পরিচর্যা ও অঙ্কিত-ভাবকল্পে তাঁর অতুলনও হয় অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিখুঁত । এর পর জাদানবাস্তি, কাকানবাস্তি, গাচারজান বাস্টি, জোহরা বাস্টি প্রভৃতি অস্পষ্ট বাইজি-দেও সমেহ প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তিনি । সবার ওপর তিনি নিজেও ছিলেন দেবদূত হুয়েলা কণ্ঠের অধিকারী । সুতরাং তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য যদিওই হয়েছে কোনোদিন তাঁদের মনে চিরভাষ্য হয়ে আছে সেই অপাখিব আনন্দরূপ অমৃতস্বাদের স্মৃতি । কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে এই সব কিরুরকী বাস্টিজিদের সযত প্রশিক্ষণে শেখেন তিনি ঠুঙুরি গাজাল দাদরা । এরপর বিশ-একুশ বছর বয়সে তিনি খেরাল শিখতে শুরু করেন কাশিমবাজার রাজ নিযুক্ত সংগীতগুরু রাধিকা গোস্বামীর কাছে । শোনা যায় গোস্বামী মশাই মাল্লু সাহেবের গান শুনেতে খুব ভালবাসতেন । তবে খেরালের বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃত তাস্তিক শিক্ষালাভ করেন তিনি রাধিকা গোস্বামীর মৃত্যুর পর ওস্তাদ কাদের বক্সের কাছে । এরও পরে তিনি গুরু হিসেবে পান বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক ওস্তাদ খুরশিদ মির্জাকে । লক্ষ্মীয়ে নবাব ওয়াজেদ আলির পৌত্র অথবা দৌহিত্র এবং ভাইয়াজির প্রিয় শিষ্য এই 'মির্জা সাহেব'-এর কাছে মাল্লু সাহেব আবার তালিম নেন ঠুঙুরি গাজাল দাদরায় । এবং এঁরই মেয়ে আশ্‌মাত্‌ আরা বেগমের সংগে হয় তাঁর বিয়ে ।

ম'ল্লু সাহেবের সংগে তবলায় সংগত করতেন তাঁর গুরু ওস্তাদ কাদের বক্স, স্থানীয় অহুষ্ঠানে কখনো কখনো স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ বর্ধন ; আর হারমোনিয়ামে সংগত করতেন সুদক্ষ স্ত্রীটি হারমোনিয়ামবাদক ইউসুফ আলি আর কলকাতার তাঁর শ্রুত 'মির্জা সাহেব' । কাদের বক্স সাহেবের মুখে একটি ঘটনার বিবরণ শুনেছিলেন অনেকদিন আগে । ঘটনাস্থল সম্ভবত উত্তর প্রদেশ বা রাজস্থানের অন্তর্গত জাঁউয়া (অথবা জামুয়া ?) নামে একটি স্টেইটের মহারাজার জলসাঘর । মহারাজার মাননীয় অতিথি হ'য়ে সেখানে গান করতে গেছেন ম'ল্লু সাহেব । সংগে গেছেন ওস্তাদজী তবলটি হিসেবে আর ইউসুফ আলি হারমোনিয়ামে সংগত করতেন । জলসা বসেছে অনেক প্রাচীন দরবারি গাইয়ে বাজিরের সমাবেশে । অদূরে চারদিকের চিকের আড়ালে বসেছেন রানীসাহেবা তাঁর আত্মীয়দের সংগে নিয়ে । খাবাজ বাগে ঠুঙুরি ধরলেন

মাকু সাহেব :

মাঝি বাবুছি চিত্তপুৰাণেনে পালাট্‌কাৰ

এক বাবুছি মোহে খিঁচ্‌কাৰ মাঝি

ছুজে বাবুছি মোহে লাগি তিহুছি ॥

[অৰ্থাৎ : তীৰন্দাজ হুৱে দাঁড়িয়ে তুন খেকে টেনে নিয়ে চোখেৰ) তীৰ
ছুড়ে বেধে দিলো একটা তীৰ এসে লগাশৰি বিধলো আমাকে । দ্বিতীয়
তীৰ এসে লাগলো আমাকে তেৰুজাভাবে ।]

ছিপ্‌ছিপে দীৰ্ঘকায় মাকু সাহেবৰ বাঁ চোখটি ছিলো সামান্য একটু টাৱা ।
কিন্তু গান গাইবায় সময় সেই টাৱা চোখেৰ অশাংগ দৃষ্টিপাত গায়কেৰ সুন্দৰ
কণ্ঠেৰ চেয়েও যেন শতগুন বাস্তব হয়ে উঠতো । সামান্য ক'টি কণাকে মন্ত্ৰেৰ
মতো ব্যবহাৰ ক'ৰে তিনি প্রত্যেকটি শ্রোতাৰ হৃদয় নিয়ে অবলীলায় লোফালুফি
খেলতে লাগলেন । সংগীতশাস্ত্ৰে সুপণ্ডিত ও নামী গাইয়ে শ্রোতাৰাও পাগোল
হ'য়ে উঠলেন । ক্ৰমে মাঝৰাতে সেই গানেৰ আবেদন এমন তীব্ৰ হ'য়ে উঠলো
যে বাণীগাহকেনেৰা চিক্‌ ছিন্নভিন্ন কৰে ফেললেন । ওস্তাদজীৰ ভাষাতেই বলি :
“ক্যা বোলেছে বাবা, উনকা গালেমে জাহু হায় । গানেমে আয়সা আশাব
হুয়া কি বানীওনে চাবোতাৱাক্‌সে আপ্‌না চিল্‌মিল্‌ হোড্‌ দিয়া ।” এই
ছিলেন আমাদেৰ মাকু সাহেব ।

আবো একটা ঘটনাৰ কথা শুনেছিলেন মাকু সাহেবৰ বন্ধু ও প্ৰবীণ
উকিল স্বৰ্গত মনোমোহন ৱায়েৰ মুখে । সেটা ১৯৩৫ কি ৩৬ সাল। কচবিহাৰেৰ
মহাৰাজাৰ আমন্ত্ৰণে গৈছেন সেখানে মাকু সাহেব, ওস্তাদ কাদেৰ বন্ধু, টউম্বুক
আলি আৰ ৱায় মশায় নিজে । একমাস সেখানে তাঁরা বাস কৰিছিলেন ৰাজ
অভিধি হয়ে । জলসা বসেছে । তখন বৰ্ষাকাল নৱ । বাটৰে মেঘবৃষ্ণ নীল
আকাশ বল্‌মল্‌ ক'ৰে হাসছে ? উৎসুক শ্রোতাৰেৰ ফুৰমায়েশে ধবলেন মাকু
সাহেব মল্লৰ বাগে একটি গান । ক্ৰমে ঈপ্সিত আবহাৱ গড়ে উঠলো ।
প্ৰত্যাশা-উন্মুখ শ্রোতবৰ্গেৰ উদ্দীপিত অশ্রুভূতিতে ধৰা দিলো নব জলদয়েৰ
অস্তিত্ব । এক সময় গান শেষ হওৱাৰ মুখে, নেমে এলো অঝোৰ ধাৱায়
বৃষ্টি । মুক্ত শ্রোতাৰা বিষয়ে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন । হয়তো এই বৃষ্টিৰ সংগে
তাঁৰ গানেৰ বিজ্ঞানসম্মত কোনো সম্পৰ্কটো ছিলো না । কিন্তু একটা জিনিশ
বুঝতে কষ্ট হয়নি আমাৰ । তিনি তাঁৰ কণ্ঠেৰ জাহু এমনভাবেই প্ৰয়োগ কৰতে
সমৰ্থ হৈছিলোঁ তাঁৰ শ্রোতবৰ্গেৰ মন ও বুদ্ধিৰ ওপৰ যে তাঁৰা বিশ্বাস কৰতে

বাধা হয়েছিলেন তাঁর গানের টানেই নেমে এসেছে এই বৃষ্টি। এবশর তাঁরা যতোদিন সেখানে ছিলেন মাঝু সাহেবকে পথে দেখলেই লোকে বলে উঠতো ‘ওই যে মজারী।’

এরকম আরো অনেক বিষয়জনক ঘটনার কাহিনী শোনা যেতো মাঝু সাহেবের সম্পর্কে বিশ পঁচিশ বছর আগেও। কিন্তু আজকের মতকণ মুশিদাবাদ তাঁর নাম ই জানে না হয়তো। অথচ কৈয়াজ খাঁও মতো সংগীতের জাহুকরও তারিফ করেছিলেন তাঁর কণ্ঠের সুস্বাদুসুন্দর কাক কাছের।

রাধাগানী বলছিলেন সেদিন : ‘আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ তখন ১৯২৭ কি ২৮ সালে ‘মুশিদাবাদ এসে যুদ্ধ হন কাজি নজরুল ইসলাম আর দিলীপ রায় মাঝু সাহেবের গান শুনে।’ এ-সম্পর্কে স্বর্গত গিরিজাপুর চক্রবর্তীর নিকট-আত্মীয় প্রত্যক্ষদর্শী স্বর্গত সুধান্ত চৌধুরী মশাইকে গল্প করতে স্তনভেদন অনেকে। একটি আসরে গাইবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে এসেছেন অক্ষয় দিলীপকুমার রায়। এসেছেন গিরিজাবাবুও। কিন্তু মাঝু সাহেব পর পর কয়েকটি গান গাইবার পর উদগ্রীব শ্রোতাদের পুনঃপুনঃ অত্যাধিকার সত্ত্বেও দিলীপ রায় গাইতে রাজি হলেন না কিছুতেই। বাস্তবিকই মাঝু সাহেবের গানের পর একই আসরে গেয়ে শ্রোতার মনোবল্লন করা ছিলো প্রায় অসম্ভব। এখনো জীবিত কিছু কিছু শ্রোতার মনে গানের আসরে, বিশেষ করে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলোজে, কাশিমবাজারে মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী ও রাজা কমলারঞ্জনর রাজপ্রাসাদে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, কি গোরাবাজারে ধর্মশালায় প্রতিবছর সরস্বতী পূজায় অচলিত গানের জনসময় দেখা একটি দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাঝু সাহেব যখন তানপুরার কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারগুলি টিক করতেন তখন পাশে উপবিষ্ট প্রখ্যাত সংগীতসাদক গিরিজাবাবু সেই তান-পুরার একটি কান উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শিখিল ক’বে দিতেন একটি তার। সহস্রা মুখ তুলে চাইতেন মাঝু সাহেব। চক্রবর্তী মশাই হেসে বলে উঠতেন : ‘আরে ভাই মাঝু সাহাব, তুমিরা গানাকা বাদ মেরা গানা কোন্ তনেগা? পহলে মুঝ্‌কো গা লেনে দো। বাদ্‌মে তুম্‌ গানা।’

সেবার অক্ষয় দিলীপ রায় আর কাজি নজরুল তাঁকে কলকাতার নিরে গেলেন। তিনি মেগাফোন আর মেনোলা কম্পানিতে প্রশিক্ষক (ট্রেনার) নিযুক্ত হলেন। আকাশবাণীতেও তিনি স্থায়ী ট্রেনার এবং নিয়মিত গায়ক হিসেবে যোগ দিলেন। তিনি যে-দব ছাত্র-ছাত্রীকে গান শেখাতেন তাদের কাছ থেকে

একটি পরমাণু গ্রহণ করতেন না পান্ডিত্যময় স্বরূপ। এমন কি কখনো কখনো তাদের বাড়িতেও চলে যেতেন এবং চার পাঁচ ঘণ্টা অভ্যস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দিয়ে অনুশীলন করতেন। খাগডার তাঁর স্নেহময় অগম্য হাসের বাড়িতে তো তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন ক'রে থেকে যেতেন। বাধাধাণী বলছিলেন সেদিন : “তখনকার দিনে স্কোলা চান্স হয়নি এখানে। ঘোড়াগাড়ি আর বাস ছিলো যাতায়াতের সাধারণ উপায়। ওস্তাদজি অনেকদিন বাসে করে চলে আসতেন জিয়াগঞ্জে আমাদের আগেকার বাড়ি। একনাগাড়ে চার পাঁচ ঘণ্টা তালিম দিতেন। প্রত্যেক শব্দের নিভুল উচ্চারণ শেখাতেন। কোনো কোনো শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখে নিতে অনেকটা সময় লাগতো। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তিনি আমাদের যা শিখিয়েছিলেন তা অল্পকাল শিখতে অসম্ভব দশ বছরের কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন চতো। “আমাদের মনে রাখা দরকার তখন নিজামত পরিবারভূক্ত লোকদের স্থানীয় জনসমাজে বিশেষ কদর ছিলো। এবং তাঁরা বাইরের কারো সংগে অপ্রয়োজনীয় বড় একটা যোগাযোগ রাখতেন না। কাজেই জনসমাজে রীতিমতো সমীহ ও ভ্রমের পাত্র মাজু সাহেবের পক্ষে জিয়াগঞ্জ বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের অনভিজাত অতি সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বাড়ি গিয়ে মুকতে তাদের তালিম দিয়ে আসাটা অনশুট বিশেষ মহত্বের পরিচায়ক। নবাবী পেনশন-ই ছিলো এতোদিন তাঁর জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কলকাতা এসে এট প্রথম তিনি সংগীতকে উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি কিছু দাবি বা গ্রহণ করেননি।

তাঁর প্রিয় ঝুঁড়ি আর গান্ধালগুলি তাঁর দুট প্রিয় ছাত্রছাত্রী মৈরুদ আলি মির্জা মুশিদাবাদে আমাদের বাড়িতে আর শ্রীমতী বাধাধাণী জিয়াগঞ্জে তাঁর গৃহে আমার অচরণে গিয়ে শোনালেন। খুব তৃপ্তিও সংগে উপলব্ধি করলেন যে মজু সাহেব তাঁর যোগ্য ছাত্রছাত্রীই রেখে গেছেন। ওঁরা কিন্তু দুজনেই নিজেদের দীনতা স্বীকার করলেন। বাধাধাণী বললেন : “গান গাটবার সময় ওস্তাদজীকে কোনোরকম চেষ্টা করতে হতো না। স্বর্ণার ধারার মতো স্বরের ধারা যেন আপন ভাগিদেই বেরিয়ে আসতো তাঁর কর্ণ থেকে। মুখ হয়ে চেয়ে থাকতেম তাঁর মুখেও দিকে অবাক বিষয়ে।” আলি মির্জা সাহেব বললেন, “আমার গান শুনে আদরিলোক তারিফ করে। আমার হাসি লাগে। এরা

তো আমার মালু ভাইয়ার গান শোনেনি।” প্রকৃতির অনতিক্রমা বিধানে সেই মল্লকপুংগব যন মাতানো অলৌকিক তানসমৃদ্ধীসুবিহার আজ শুরু। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রশিক্ষণে লালিতমণ্ডিত দুই সুযোগ্য ভাবসম্মান সৈয়দ আলি মির্জা আর শ্রীমতী রাধাবাণীর সমাহিত কর্ত্তে এখনো আমরা যে গানগুলি শুনে মুগ্ধচিন্তে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি সেগুলির কথা এখানে উদ্ধৃত ক’রে দিচ্ছি উৎসুক পাঠকদের উদ্দেশ্যে। রাধাবাণীকে আমি সেদিন ব’লে এসেছিলেম : ‘গুরুব প্রতি আপনার যে গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করলেম তাইই দোহাই দিয়ে আপনাকে অহরোধ করছি আবার আপনি ঠুঁড়ি আর গাজাল গাইতে শুরু করেন। আত্ম-বিস্মৃত সংগীতবসিক বাড়লার অবখ্যায়ামমাজকে জানিয়ে দিন আপনার এই বহুদক্ষসম্বিত কর্ত্তসম্পন্ন আপনি যাঁও কাছ থেকে অভ্যর্জন ক’রেছিলেন তিনি কতো উচ্চস্তরের শিল্পী ছিলেন। আর এই ভাবেই শোধ করেন যেটা সম্ভব সেই নিলোভ গুরুব শ্রবণ।”

১। ঠুঁড়ি (রাগ : ভৈরবী/তাল : দাদরা)

বাস্কে ভাবে তোরে নয়ান
সাঁবারিয়া বাস্কে ভাবে তোরে নয়ান
আও সাঁবারিয়া গাব্বে লাগালু
নাতি পাডে মোছে চায়েন্ বে সাঁবারিয়া
বাস্কে ভাবে তোরে নয়ান ॥

[অর্থঃ : অপরূপ রূপের বসে পূর্ণ তোমার চোখ দু’টি। ওগো প্রিয় চোখ যে তোমার অপরূপ রূপসুধায় পূর্ণ। এসো প্রিয় তোমাকে আমার কর্ত্তে চেপে আলিঙ্গন করি। তোমার বিহনে আমার যে কিছু ভাল লাগে না। তাই এসো তোমাকে আমার কর্ত্তে চেপে ধরি। রূপসুধায় কানায় কানায় ভ’বে আছে তোমার চোখ দু’টি।]

২। ঠুঁড়ি (রাগ : খায়াজ/তাল : দাদরা)

মাঝি বাবুছি চিরেওয়ারেনে পালাট্ কাব.....

(পূর্বে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩। ঠুঁড়ি (তিলং রাগ/খায়াজ ঠাট/তাল : তেতাল)

সাজানা তোমা কাহেকো নেহা লাগায়ে
এরি মেখো সাখি, পিয়া কদা রাহে
কৌ যারে উন্হে লায়ে মানায়ে ॥

[অর্থীঃ : লজনি, তুমি কেন আমাকে প্রেম করলে ? আরে লবি, দেখো দেখো প্রিয় আমার মান করেছে। তোমরা কেউ যাও ওকে বুঝিয়ে হুজিরে নিয়ে এসো।]

৪। হুজুরি (বাগ : ভৈরবী / তাল : আটমাত্রা যত).....

লাগাতা কারাজোয়ারে চোট.....

(পূর্বে চল্লিশ পুঠায় হ্রঃ)

৫। গাজাল (বাগ : বিলাওল/তাল : কাওয়ারি ঠেকা)

খালে জুল্ ফে আনা কাব্ হামারে দিল্লে নিক্লেগা

ইয়ে কাঁটা ইয়া ইলাহি কাব্ তানে বিশ্ মিলসে নিক্লেগা

না নিক্লা হায় না নিক্লেগা মোরা আরমানে দিল ইয়ারাব্

যো নিক্লেগা তো একদিন খান্জারে কাভল্লে নিক্লেগা

ইয়ার কাভল্লে কাম্‌নি হায় উদায় শঙ্ক শাহাদাত্ হায়

আমা মায় হ্ মেরা দাম্‌তি বহত্ মুশ্ কিল্লে নিক্লেগা।।

[অর্থীঃ : আমার হৃদয় থেকে কবে বিদায় নেবে প্রিয়ার চুলের চিহ্ন ? কামনার এট কাঁটা, হে ভগবান, কবে আমার আহত দেহ থেকে নির্গত হবে ? হায় ভগবান, হৃদয় থেকে এট কামনার কাঁটা বেধ হচ্ছে না, বেধ হবেও না কোনোদিন। এ আকাংক্ষার শেষ হবে তখনই যখন প্রেমিকার চিন্তায় চিন্তায় একদিন সেট ঘাতিকার ছুরিতেই খান্জারে) আমার প্রাণ বেধিয়ে যাবে। একদিকে সেই নিষ্ঠুর ঘাতিকা, অন্যদিকে আবেকজন স্বৈচ্ছায় চায় শহিদ হ'তে। আমার বরস হয়েছে বেশ। তাই আমার প্রাণবায়ু অনেক কষ্টেই হবে নির্গত।]

প্রসংগক্রমে বলে রাখি নজরুলের অনেক গাজালেই মাজু সাহেবের গাজালের স্বরের ছাপ দেখা যায়। দৃষ্টান্তরূপে 'বাগিচায় বুলবুল তুই ফুল-শাখাতে দিসনে আজি দোল' - এই গানটিতে তো

মাতাকাত বাড্ দেয়াতি হায় দিল্ যাব্ দিল্লে মিল্‌তা হায়

মাগাব মুশ্ কিল হো ইয়ে হায় দিল্ বাডে মুশ্ কিল্‌সে মিল্‌তা হায়।

—তাঁর এট উর্দু গানটির স্বরের প্রভাব অতি স্পষ্ট। শোনা যায় নজরুল ইসলামের বাংলা গাজালের অনেকগুলিতে মাজু সাহেবের স্বর দিয়েছিলেন। নজরুলের কতকগুলি বাংলা গাজাল এবং বঙ্গনীকান্ত ও অতুল-প্রসাদেবও দুয়েকটি বাংলা গান তিনি গাইতেন। একটি গানের কথা

কয়েকদিন আগে আলি মিৰ্জা সাহেবের সন্তান বছর বছর বড়ি জাদুলা
বেগম সন্তানভাবে উচ্চারণ করে বলে গেলেন যদিও তিনি বাংলা ভাষা জানেন
না মোটেই। গানটির কয়েকটি লাইন যেমন তাঁর মুখ থেকে শুনেছি তেমনি
নিখে দিচ্ছি :

স্বপনে ভাঙারে কুড়ায়ে পেয়েছি

রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া।

স্বপনে ভাঙারি মু'খানি নিবখি

স্বপনে কুঠেলি মাখিয়া।

৬। দাদু (বাগ : নাট মজার/তাল : দাদু)

মোয়ে নায়না লাগি গুঁইয়া

জিয়া চাতে সো করে।

[অর্থাৎ : ওগো প্রিয়, চোখ আমার বন্দী তোমার মুখের কাঁচাগারে। এখন
তোমার যেমন পুশি তেমনি করো আমাকে নিয়ে।]

খেয়াল :

পূব আশ্চর্যের কথা মুশিদাবাদে যে ক'জন আজও মাজু সাহেবের নাম মনে
রেখেছেন তাঁদের কয়েকজনকে বলতে শুনেছি তিনি নাকি টুংরি আর গাজালের
মতো ভাঙা গানই গাইতেন। কি ক'রে হ'দের এই দাবণী চল বলতে পারি-
নে। তাঁদের শুধু আবেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্বগৃহের চৌহদ্দির
বাইরে প্রথমটায় তিনি বামিকা গো'স্বামী মশায়ের কাছে খেয়ালের অন্তর্দীপন
করেন। পরে দীর্ঘকাল তিনি ওস্তাদ কাদের বকসের কাছে বিস্মৃতভাবে
খেয়ালচর্চা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর দশবছর বছর পর বড় গোলাম
আলি খাঁ তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বলে গেছেন, Munjhu Shahab
was famous for Thumri and Khyal. তাঁর গাওয়া কয়েকটি খেয়ালের
উল্লেখ করছি এখানে :

৭। খেয়াল (বাগ : নাট মজার/তাল : তেতাল)

আস্বায়ী

ঘানা নানা বাবাবে ঘোরা বাহারিয়া

আয়সো সামায়ে পিয়া নাহি ঘামামে

আস্ব'রা

চামাকে বিজুরি উঁধা লাগে

হ'তো আকেলি প্রাণা ভরোয়ি।।

[অর্থাৎ : অকোষকরণ কৃষ্টি হচ্ছে। মেঘ করেছে ঘোর হয়ে। এমন সময়
প্রিয় আমার ঘরে নেই। বিজুলি চমকচ্ছে। তর (উঁধা) করেছে আমার।
আমি একাকিনী। তাই প্রাণে আমার জাগছে তর।]

৮। খেরাল (রাগ : বাগেশ্রী/তাল : দ্রুত্ একতাল
কথা ও হর : ওস্তাদ কাদের বক্স।)

আস্থায়ী

কাবলে মানা রামানামা
নিশাদিনা ঘাড়ি পালাপালা ছানা
আস্থ্‌মে এত আয়ে কামা।

আস্থ্‌রা

জোয়ি জোয়ি পাবাতা
ইচ্ছা ফালা পাবাতা
সুয়ারাতা নিতা কাদারা তেরো
রামানামা আষ্টা যামা
কাবলে মানা রামানামা ॥

[অর্থাৎ : মন, তুই রামনাম জপ ক'বে নে। পলে পলে সারাদিনরাত ঘ'রে
পালিয়ে গেলো ঘন্টাগুলো। অস্থিমে শুধু এই রামনাম-ই আসবে কাজে। যে
যেমন ধ্যান করে অভীষ্ট ফল লাভ হয় সেই বক্স তার। কাদের ভোয়ার নাম
জপে অতুফল। মন, তুই রামনাম জপ করে যা।]

৮। খেরাল (রাগ : মালকোশ/তাল : দ্রুত্ একতাল
কথা ও হর : ওস্তাদ কাদের বক্স।)

আস্থায়ী

বান্‌লি বাজে জামা কি ঘানা
এ মোরি সাজানি ও দেখো বানামে
বান্‌লি বাজে জামা কি ঘানা।

আস্থ্‌রা

আয়িলো টোনে কিনি আজ
ছুট্‌ যাত বারাকি কাজ
দারশানা দো বারজাকে রাজ
কাদারকে বিনা দাহে তানা মানা
বান্‌লি বাজে জামা কি ঘানা ॥

[অর্থাৎ : শ্রামের বাশি বাজছে ঘন ঘন ! হুে আমার সঙ্গনি, ওই দেখো বনে বাশি বাজছে ঘন ঘন শ্রামের । এই বাশি এমনই কি জাত করছে আজ যাতে ঘরগেহস্থালির কাজকর্মের বন্ধন ছুটে যাচ্ছে সব ! হে ব্রহ্মবাজ, তুমি দেখা দাও । কাদের-বিবাহে দেহমন জলে পুড়ে গেলো ।]

মাকু সাহেবের প্রায়ণ গান্ধীরা আরো গান তুলে দেওয়া সম্ভব । তাঁর জীবনের আরো কিছু কীর্তির কথাও উল্লেখ করতে পারি । ভবিষ্যতে উপযুক্ত সুযোগ পেলে সে চেষ্টা করা যেতে পারে । কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সব চাইতে যে-বিষয়টা নিশ্চয়কর, সুখের বিষয় সেটা শুধু আমাকেই বিমুগ্ধ করেনি, ‘চেনা গোলাপের’ প্রথম কিস্তির রচনায় তাঁর প্রসংগে যেটুকু উল্লেখ করেছিলেন তাও ফলে বেশ কিছু শিল্পবসিক পাঠকও ভাবিত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন : এতো বড় গায়ক যাঁকে তাঁর সময়ের বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে ঘোষণা করেছিলেন দিলীপ রায়, যাঁর কণ্ঠকীর্তির তারিফ করেছিলেন সংগীত সম্রাট ফৈয়াজ খাঁ, যাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রবণ করতেন জাতশিল্পী বড়ে গোলাম আলি খাঁ, যাঁর মতো কণ্ঠ পেলে তামাম হিন্দুস্তান জয় ক’রে কেপতেন ব’লেছিলেন জামিরুদ্দিন খাঁ—সেই অলোকসামান্য কণ্ঠশিল্পীর গাওয়া কোনো রেকর্ড আছে কিনা । আমি সাপামতো সন্ধান নিয়ে জানতে পেয়েছি মেগাফোন কম্পানি তাঁর গানের দুটি রেকর্ড গ্রহণ করেছিলো । তাদের একটির একপিঠে ছিলো ‘কারেলে মানা রামানাম’—বাগেশ্রী রাগের এই খেয়ালটি, অঙ্গ পিঠে ছিলো একটি গাজাল । তবে এই গাজালের ‘কথা’ যে কী ছিলো তা এখনো জানতে পারিনি । এই রেকর্ডটি ভাল না হওয়ায় তিনি আর দ্বিতীয় কোনো রেকর্ড করাননি । রাধাগোপীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন : ‘গুস্তাদজীর কোনো রেকর্ড আছে বলে আমি জানিনে । তবে যদি আদৌ কোনো রেকর্ড করানো হয়ে থাকে আর তা যদি খারাপ হয়ে থাকে তা হ’লে আমি নিশ্চিত যে রেকর্ডটা তাঁর প্রথম স্ট্রোক হওয়ার পর হয়েছিলো ।’ কিন্তু আলি মির্জা সাহেব বললেন অঙ্গ কথা । গ্রামে’ফোন যন্ত্রে সকলের গলা ভাল ধরা দেয় না । বেডিঙতে মাকু ভাইয়ার গান যদিও খুব ভালো শোনাতো তবু রেকর্ডটা স্বাভাবিক কাণেই ভাল ওঠেনি । তিনি আরো বললেন প্রায় একই সময় (সেটা মহৎমের সময়) মেগাফোন কম্পানি একটি সোজখানির রেকর্ডও গ্রহণ করে । তার একপিঠে গেয়েছিলেন মাকু সাহেব অঙ্গপিঠে তাঁর ছোট ভাই ।

কলকাতায় গিয়ে তিনি স্বাধীভাবে নারকেল ডাঙার বাসা বাধেন । তাঁর

দুই ছেলে নাসির আর মনহুসের মধ্যে নাসির গান বাজনা নিয়েই আছেন।
 এখন সম্ভবত কবচিঁতে থাকেন। মনহুস কলকাতায়। কলকাতা বাসের
 কিছুকালের মধ্যে বেগম আশ্‌মাৎ আবার এতেকাল হয়। নিঃসঙ্গ শিল্পী কিছু
 কাল পর এক হিন্দু রমণীকে বাকি জীবনের সংগিনী করে নেন। এই সময়
 মাঝে মাঝে তিনি মুর্শিদাবাদ আসতেন লালবাগ ট্রেনারি থেকে নিজামত্ পেঞ্জন
 নেবার জন্তে। আগেই বলেছি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তিনি কোনো দক্ষিণা
 গ্রহণ করতেন না। শেষের দিকে তিনি খুব অর্থকষ্টে পড়েন। হয়তো
 রাধাবাণীকথিত স্ট্রোকজনিত অসুস্থতা এর কারণ। রাধাবাণী সম্পর্কে তাঁর
 মনে একটা ক্ষোভ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। সেকথা পরবর্তী কোনো এক অধ্যায়ে
 আলোচনা করবো। ১৯৪৬ সালে মুহুর দিড়মাস আগে তিনি তাঁর হিন্দু স্ত্রীকে
 সংগে নিয়ে জিয়াগঞ্জে রাধাবাণীর সংগে দেখা করতে যান। রাধাবাণী
 বললেন, “গুস্তাদজীকে দেখে খুব কষ্ট হল তাঁর আগে দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হয়ে
 গেছে তাঁর। মনে পড়লো কতো যত্নের সংগে তিনি আমাকে গাইতে শিখিয়ে-
 ছিলেন। আজ সারা দেশে আমার যেটুকু কদর সেতো তাঁরই দান। কোনো
 দিন তাঁকে টাকা দিতে যাওয়ার মতো দৃষ্টতা হয়নি আমার। কিন্তু সেদিন
 গুস্তাদজীর অগোচরে ওই ভদ্রমহিলার হাতে আমি সুধামতো কিছু অর্থ দিয়ে
 ছিলাম তাঁর শুশ্রূষার জন্তে।” সে বছরের সেট কুণ্যাত সম্প্রদায়িক দাংগায়
 মাস ত্রয়েক আগে এই অসম্প্রদায়িক উদারহৃদয় মহৎ শিল্পী তৃতীয়বার স্ট্রোকের
 ফলে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

স্তন্যে পাই আজকাল নাকি একেকজন নারীদামী গায়ক একেকটা
 অগুণ্ঠানে দুতিনটি গান গেয়ে শোনান দু’তিন হাজার টাকা গুনে নিয়ে। তাঁদের
 সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করতে চাইনে। কিন্তু এট সব ভাগ্যবান সংগীতগণকেরা কি
 ভাবতে পারবেন তাঁদেরই সমগোত্র এক অভিজাত বংশোদ্ভূত মতাপ্রাণ ব্যক্তি—
 যিনি গানকে নিজের প্রাণ থেকে অস্তিত্ব ভাবতেন, যার গান শুনে এষ্ট শুল্ক-
 প্রকৃতি বিংশ শতাব্দীতেও অসম্ভব প্রোতা অঝোরাধার অক্ষপাত করতো,
 কখনো উদ্ধীপিত হয়ে উঠতো, কখনো বা ভাবাবেগে উন্মাদ হয়ে উঠতো—
 সেই পুত্রশিল্পহোমাগ্নিপরিতপ্ত নিলোভ মজুতাবী প্রকৃত ব্রহ্মপুলা ব্যক্তিত্ব
 আমাদের অপরিসীম অর্থপালসাকে বাংগ ক’রে, যশ ও প্রতিষ্ঠালিপ্সাকে লুকুটী
 বিষ্ঠাবৎ জ্ঞান ক’রে, বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় লোকচক্ষুর অস্ত্রবলে
 জীর্ণবাসের মতো এট পাখির নখরতন্তু ত্যাগ করে চলে গেছেন আজ থেকে

তিরিশ বছর আগে ? তবু, ভূয়োদর্শী কবি যথার্থই বলে গেছেন : “এ জগতে
হার কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় ভাসে যতো চোক অবহেলা।” নইলে
এতো বছর পর আবার মতো একজন অতি নগ্ন নাক্তির এতো বড়ো স্পর্ধা হয়
কী ক’রে যাতে সে সব সংকোচ ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে আসতে পারে অমিত
ঐশ্বর্যবান দেউ মহান্ শিরীর স্মৃতিতর্পণ করতে !

মুর্শিদাবাদের চাঁই সম্প্রদায়

পুলকেন্দ্র সিংহ

চাঁই হচ্ছে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে বসবাসকারী কুশি ও মংগ্রজীবী একটি
সম্প্রদায়। এরা অনার্য। এদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

১৯৭২-এর আদমশুমারি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে Chain (চাঁই) সম্প্রদায়ভুক্ত
জনসংখ্যা হচ্ছে ২৬১৩৩। সংখ্যাটা নেচাং উপেক্ষণীয় নয়। এই জেলাতে বেশ
কয়েকটি বড় ও মাঝারি গ্রাম আছে যেখানে শুধু চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরাই
বসবাস করে। এখন অবস্থা সকলেই একই বৃত্তির কাজ করে না। অধিকাংশ
কৃষি শ্রমিক, কৃষিজীবী, তরিতরকারির চাষী ও বিক্রেতা। এদের মেয়েরা
নিকটবর্তী বাজারেই তরিতরকারি বিক্রি করে। এদের বলা হচ্ছে Semi-Hin-
duized aborigines। এদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—“This is pro-
bably a lower caste and so far as Bengal is concerned is
only found in any numbers in the Districts of Murshidabad
and Malda. They are cultivators and labourers

এদের সকলেই যে অশিক্ষিত তা নয়। আজকাল অনেকেই শিক্ষাদীক্ষায়
অগ্রণী। বিশিষ্ট আলকাপওয়ালা ধনদ্রয় মণ্ডল ওরফে ঝাকস্থ চাঁই সম্প্রদায়-
ভুক্ত। এদের মধ্যে অনেকে আবার বড়জোতের মালিক ও অর্থশালীও
আছেন। জোতজমি, গরু বাছুর, পাকাবাড়ি, টাকা পরগনাওয়ালা চাঁই মণ্ডলেরও
সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। জকীপুর, বহরমপুর, লালবাগ মহকুমাতে সাধারণতঃ

দ্বিয়ার বা চর এলাকাতে বা গঙ্গাভীরবর্তী - বা পদ্মাভীরবর্তী অঞ্চলে এরা বাস করে।

মুর্শিদাবাদে অনেক গ্রামেই চাঁটাই বাস করে। তাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রামের নাম মনে পড়ছে, যেমন 'আলোর উপর' কালীডাঙ্গা, কালীডালা, দ্বিয়ার, মানকরা, হালালপুর, গোসাঁইডুব, নিবাদবাগ গোবিন্দপুর, মুক্তারপুর, পাখা-পাড়া, বাজারপাড়া, বাধাবঘাট, রাণীনগর, সন্তানীডাঙ্গা, লালবাগ, জাকদাগর খোসবাগ, বদানিয়া, গণেশপুর, জিলাগঞ্জ, ঠেঁকুলিচর হরিনগর, পরিপাড়া, ডুবুপাড়া, খুচুপাড়া, কাতলামারী, নিস্তার, চাওরা, গুরাইপুর, ভোমকল, আসরিয়া দহ, লালগোলা, শাহচর প্রভৃতি গঙ্গাভীরবর্তী গ্রামগুলিতে এরা বসবাস করে।

বহরমপুর থানার চরিদাসমাটি অঞ্চলেও অঙ্গরগত কলাবেদিয়া গ্রামে ১২৪ ঘর চাঁটাই বাস করে। এই গ্রামের একটি চাঁটাই পরিবারের কিছু বিবরণ দিচ্ছি। এর থেকে চাঁটাইদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারা যাবে। এই গ্রামে বেশ কয়েক ঘর চাঁটাই বাস করে। অধিকাংশ বাড়ি পাটকাঠির খলপা দিয়ে তৈরি, মাথার খড়ের চাল। এদের গৃহপ্রধানের নাম তিত্ত মণ্ডল। চাঁটাই বলে চাঁটাই মণ্ডল। পিতা কান্তিক মণ্ডল। স্ত্রী স্নতত্ৰা। তিন মেয়ে-মিনতি সরি, কল্পনা। চাষ আবাদ করে। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ করে। বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে। প্রতিদিন বহরমপুরে তরকারি বাজারে ছাত্ত, ভাল শাকসবজি, কাঠ, ছুটে বিক্রি করে। গোত্র—কাশী। পূর্ব নিবাস—বিহারের সাহেবগঞ্জের কাছে। ভাষা—বাংলা ও দৈন্যে হিন্দীর মিশ্রণে বিলম্বিত ভংগিতে উচ্চারিত এক মিশ্র বাংলা। এদের ছেলেরা জমে এদের বাড়িতেই। জাতাশৌচ হয়। ১১ দিন জাতাশৌচ। নামকরণ হয় শিশুকালে। পরিবারের লোকেরাই নামকরণ করে। অন্নপ্রাশনের রেষাও আছে। এদের নিজস্ব পুরোহিত আছে। নাম দেওকি পণ্ডিত। পশ্চিমী ব্রাহ্মণ। ইনি বহরমপুরে বাস করেন। সরকারী ভাবে চাঁটাই তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বিয়ে হয় বাম মতে। পূর্বে পাত্রকেপন, মিতে হয়। এখন কন্যা পক্ষকেই বরণণ দিতে হয়। এটা এদের গণ্য পাণ্ডবর্তী হিন্দু সমাজের প্রত্যেক প্রত্যয়ের একটা দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এদের অধিকাংশ খুবই দরিদ্র। জীবনযাত্রার মান অভ্যস্তনিচু। এই গ্রামের অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক। জমি তাগে চাষ করে থাকে অনেকে। তরকারি কেনা-বেচা অনেকেরই পারিবারিক ব্যক্তি। এতে স্ত্রী-

পুরুষ উভয়েই নিরোজিত থাকে। চাষের কাজ করে এরা কিন্তু নিজেদের জমি জায়গা নাই বলেই চলে। লেখাপড়া শতকরা দুর্জন শেখে। আচরণ সাধারণতঃ ভালই। তবে এদের দলবদ্ধ ভীত প্রতিশোধ স্পৃহাও লক্ষণীয়। এরা নেশা ভাঙ করে। তড়ি, বিড়ি, মদ, তামাক, চা, পান, দোস্তা, স্ত্রীপুরুষ নিবিশেষে খায়। এদের মেয়েরা খুব অলঙ্কারপ্রিয়। এদের গায়ে হাকা বাচ্ পাহাচি, নিকরি, চাঁদির কাঁকন, চুড়ি ও গলার হার, নাকে নাকছাবি, পায়ে মল পায়ের আঙুলে চুটকি ইত্যাদি দেখা যায়। গৃহস্থালীর তৈজসপত্র অতি সাধারণ বাসনপত্র পেতল ও আলিউমিনিয়ামের তৈরি। এরা পূর্বে শাঁখা সিঁদুর পরত না, লোহা পরত না। তাই বিয়েতে সিঁদুর দানের ব্যাপারটা এখনো ততোটা আবশ্যিক নয়। তবে বীতি অনুযায়ী শাঁখা সিঁদুর অনেকেই পরছে এখন। আগে বাঁলা বিবাহের প্রচলন ছিল। এখন মেয়েদের বউ হয়ে বিয়ে হচ্ছে। পূর্বে মেয়েরা ঘাঘরা জাতীয় (ঝুলা) পোষাক পরে থাকত। এখন শাড়িই মেয়েদের প্রধান পোষাক। এদের পাল পরবের মধ্যে ছুট পরবই প্রধান। এছাড়া কালী, বাম প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীরও পূজা করে এরা।

বিয়েতে মেয়েরা ঢোলক সংগতের সংগে নাচগান করে। বিয়ে সাধারণতঃ হিন্দু মতে হয়ে থাকে। শব দাহ করা হয়। ১২ দিন অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি হয়ে থাকে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, ছাতু, কুটি, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

টাই সম্প্রদায়ের সংগে মুশিদাবাদ জেলার শিক্ষিত সম্পন্ন সমাজের যোগাযোগ প্রতিদিনের। তাদের প্রাত্যহিক স্থায়ী জীবনযাত্রা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সহজলভ্য শ্রম ও সেবার ওপর। আর সেই জন্যই যাহুব হিগেবে এদের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নই। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে কিছু কিছু সরকারী স্বযোগ সুবিধে প্রচলিত আছে। কিন্তু শিকলোকবদ্ধি এষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে সেট স্বযোগ সুবিধের সামান্যই গিয়ে পৌঁছতে পারে। সমাজসেবীদের সহৃদয় চেষ্টা এই হতাগাদেও ওপর পড়ুক।

সাতো প্যাঁচোভার শৰ্য

এবারে কালীপূজার জোর ধুমধাম, দুর্গাপূজার চেয়েও বেশি। জোয়-জুম্ব নেই, তবু চাঁদা উঠেছে হরহর করে।

অর মা! বঙ্গসংস্কৃতির মুখরক্ষা করেছে। সৰ্বজনীন পূজো, পৰ্বনিবিশেষে রাষ্ট্রকৈয় অষ্টপ্রহর আর ড্রাম-ডগ্গরের সঙ্গে বিলজঁনের মোচড়-মোচড় নাচ—এই নিয়েই না আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি! আর চাঁদার বসিও ত' ভারই ভাঙ্গলজঁ!

* * * *

নর্দমা-পেন্টুল ফুলে-ফেঁপে এখন এলিফ্যান্টো, সাটের কলার ঝুলতে ঝুলতে বিলিতি কুকুরের কান আর মাঝার কুকু চুল এখন কোষর ছুই ছুই।

তুনেই সম্পাদক বললেন :

“চোড়া প্যাঁট ঠোঁড়া হল, জুলফিতে জট,
মিনিরা মাক'স হল, খোঁশা হল মঠ।

* * * *

তুনচি এক আদর্শ কুমীর ব্যাক খোলা হচ্ছে উড়িয়ার।

সাদু সাবধান! কে আনে সমাজের হরকিমিয়ার কুমীরকে একত্রে মার্জ করার উদ্দেশ্যেই এই আর্জ কিনা, বললেন প্রেমদাস শুঁট।

* * * *

সমস্ত জিনিষপত্রের দায় শু এখন লিখে রাখতে হবে, দোকানে এবং প্যাকেটের গারে—সরকারী নির্দেশ।

ত'তে কি হয়েছে? “লোক্যাল ট্যাক্সেস একটু”—অতএব মাইভঃ!
আমরা এগিরে যাবই।

* * * *

নারীবর্ষ শেষ না হয়ে নাকি নারীবর্ষকে ফীতিলাভ করেছে।

আহা, এই ফীতি শতগ্রন্থ হোক—এই প্রার্থনা।

* * * *

ইনক্যামটা্যাকস আর এনকোয়সমেন্ট বিভাগের জরজরকার। কালোটাঁকার

বেচ্ছাঘোষণা, গোপন আর-সম্পদ উদ্ঘাটন আর চোকাচালান বন্ধে নাকসোহ
পথ লাকল্যা !

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, সফল-বাহিনী !

* * * *

পণ দেওয়া-নেওয়া আইনত অপরাধ ।

তাতে কি ? বরষাজীর রাহাখরচ আর আদর-আপ্যায়ন এবং বৌভাতের
অতিথি-নিয়ন্ত্রণ (নিয়ন্ত্রণ নহ) — এ ত' আর পণ নহ । আর বাকি যা দেবেন
তা তো আপনার মেয়েকেই দিচ্ছেন, তাই না বেই মশাই ?

* * * *

আবার আইন—খাচ্ছে ভেজাল দিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ।

আরে ভেজালটা দিচ্ছে কে ? আমাদের সব খাঁটি । উৎকর্ষের খাতিরে
কখনো-সখনো এটা-সেটা মেশাতে হয় বটে কিন্তু আসলে বদ তো আমাদের
পেটটাই । হজম হয় না, তাই বলি বদ-হজম ।

* * * *

এগারো-বাগারো ভাগো আজি,

দশের খেলায় ধোঁকাবাজি ।

পড়ো-না-পড়ো কেয়া পরোয়া,

সাক্ষাই লিখো কাম-ঘরোয়া ।

ফাটো-কেটো কোই না হোগা,

ফেল না করোগা মোটে-কি-রোগা !

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নবভর নিরীক্ষা !

হাসিনাতালে/হুথীর নন্দী

হৃদয়স্নেহে ছন্দপ'ভন ।

মৃত্যুর প্রভাব-লক্ষণ বুঝি ।

ভগবান,

তু'হ মম শ্রাম লমান ,

তুমিই মৃত্যুর স্বরূপ লক্ষণ ।

তবে আবার এই ভটস্ব লক্ষণের

বহুবারস্ত কেন ?

এরা তো কেউই মতা নয় —

জলের বৃন্দবৃন্দের মত,

মকড়মিতে ওয়েসিস,

বর্জ্জুতে যেমন সর্পভ্রম ।

এই ছলনা কেন ?

হৃদয়স্নেহে উপর তলার সঙ্গে

নীচের বাসিন্দাদের মিল হচ্ছে না :

ইসিজি দিচ্ছে খবর ।

তা দিক

ওতে ভয় নেই ।

ভয় তোমাকে নিয়ে ।

তুমি যখন ছলনা কর,

বুঝতে পারি না তোমাকে ।

দেখতে পাইনি তোমাকে ,

যখন দেখি তখন আমার

তুরীর অবস্থা : ভূমার কণ্ঠলগ্ন ।

হাসিতে আমি তখন উদ্ভাসিত চৈতন্ত ,

ওরা কিন্তু কাদে ।

এমনটা কেন হয় বলত ?

পরশুরাম/অনীল ঘটক

নয়নাজোড়ের বাহুমতী

আড়াই কেজি চাল

কোমরে কোঁচড়ে লুকিয়ে

দু একবার হোমগার্ডের হাতে

বেআবু হয়ে

শেয়ালদার অব্যাহিত দাক্ষিণ্যের

সামনে এসে পড়ল।

সে দাক্ষিণ্য নয়নাজোড়ে ফিরতে দিলনা

বাহুমতীকে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে

হারিসন শেয়ালদার মুখে

শেবরাড্রে সে সস্তানের জন্ম দিল

বাণ কে তা ঠিক খেয়াল নেই ওর

কানহা মিয়া, সনাতন ঠাকুর

না গোলাপ মাস্তান।

সস্তান ভূমিষ্ট হয়েই কারা।

উলুধবনি দিচ্ছিল তখন

ময়লা ফেলা গাড়ির আগুয়াজ

প্রথম ট্রামের ঘড়ঘড়ি

মঙ্গল শাখ বাজাচ্ছিল

শেয়ালদার শাণ্ডিৎ ইঞ্জিনের

আর্তনাদ।

জোৎস্না আর প্রথম পূর্বের

আলোর ঘোমটা পরে

বিবাদময়ী কোলকাতা

শাপমুক্তির আশায়

এতদিনের আগলে রাখা কুঠারটা

নবজাতকের হাতে দিয়ে গেল।

আঠার/চেতনিক

তৃতীয় বর্ষ

উত্তরাধিকার রক্তের বিষয়ে/রক্তমোপালন

অথচ আমি কিছুই জানি না.....
প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে জন্মাচ্ছে সে
আমার রক্তে বিষজ্ব লাভ ক'রে
আমার উত্তরাধিকারে ।

অথচ আমি জানলেও কিছু করার নেই ।
তারা তাদের দাবির তুলাংশের একচুল ন্যূন
ছাড়তে চায়না ; আমার স্বাবর অস্বাবর
যা কিছু সবএই উত্তরাধিকার
রক্তেই জন্মাগ ,
উত্তরাধিকার — পূর্বপুরুষে...উত্তর পুরুষেও.....

অথচ আমি কিছু জানবার আগেই
আমার রক্তের রং-এ একাকার হ'য়ে গেলে
আমিই নতুন ক'রে জন্মাই.....।
ওরা সব কেউ কি জাতিশ্বর
অথবা—জাদুকর.....!
অথবা, অনেক অন্ধকার ঘেঁটে ঘুঁটে
চোখ উন্টিয়ে পুরোনো মলিল মেখে নিয়ে
সপ্তস্তর যোণির অন্ধকার থেকে
সপাটে ছুড়ে দেয়—ছাড়পত্র
মোহবাচিত নীলখামে ;

অথচ আমি নিজেই জানি না
ওরা আমারই রক্তে জন্মাগ
বিষজ্ব লাভ করে
আমার উত্তরাধিকারে.....।

বি. টি. মিল্‌স্‌ এবং মনীন্দ্র মিল্‌স্‌-এর পরিচালনায়
বহরমপুরে

বিভিন্ন এন টি সি মিলের কাপড় ও সূতা জায়া-মূল্য
বিক্রয়ের জন্য

এন টি সি এম্পারিয়াম (খোলা) হারোহ

কোন নং : বি. এইচ. বি ১৪২

স্কুল কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ
সময়ে সরবরাহ করি

ভুজঙ্গভূষণ কুণ্ডু এণ্ড সন্স
থাগড়া, মুর্শিদাবাদ

আপনার আমার প্রত্যেকের সেবায়

মুর্শিদাবাদ

হোলজেল কনজুম্যান্স' কোঃ-অগাঃ ষ্টোরজ লিঃ

লালদিঘী : বহরমপুর

মুদি, মনোহারী, কাপড়চোপড়, স্কুটার, টায়ার

ও

এইচ এম টি ঘড়ির পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

পড়ুন : কঙ্ককবি হীরালাল দাশগুপ্তের 'এবং যদিও তথালি কবিতা'

কঙ্ককবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মু'ওহীন খড়্গলি আলসে

চিংকার করে'

বহুভাবাবিধ 'বোম্বানা' বিশ্বনাথের 'হৃদয়ের দর্পণে/টাক্সমন্ত্রী' এবং

'আধুনিক ভারতের কবিতা সঙ্কলন'

শঙ্কু ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবিতা সংকলন "সাতজন"

With best compliments from



M/S NARESH KUMAR & CO

„ **NARESH KUMAR COAL SALES PVT. LTD.**

„ **SIKRI BROTHERS COAL SALES PVT. LTD.**

„ **INDIA'S COAL CENTRE**



UKHRA, DT. BURDWAN

Phone No. : BAHULA—244

With compliments from

M/s. KHEMKA IRON & STEEL CO.

IRON & STEEL MARCHANTS



19, Maharshi Debendra Road

CALCUTTA—700007

'চেতনিক' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য :

'দেব' : '.....খাত-অখাত সকলের লেখার 'চেতনিক' সাহিত্যে নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পেরেছে। খাঁটি সাহিত্যপ্রীতি না থাকলে এমন হয় না।' **'মুখোপাধ্যায়' :** "চেতনিক' একটি সত্যিকারের মাননীয় পত্রিকা।..." **'সত্যজুগ' :** '.....এই পত্রিকার যে-সব রচনা স্থান পেয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশিকোত্তর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন) : '.....একটি অনিচ্ছার সত্ত্বেই পাড়াগাঁ উন্টোতে হুক করি। কিন্তু দু'খণ্ডের সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মক্খল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা' যের হতে পারে....' **অন্নদাশংকর রায় :** " 'চেতনিক' বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকাই হচ্ছে। কলকাতায় ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই।ভাবছি এইসব পত্রিকা টিকে থাকবে কি ক'রে।' **নারায়ণ চৌধুরী :** ".....আপনার এবারকার সম্পাদকীয় (শারদীয় ১৩৮২) একটা বিষয়কর ব্যাপার। আপনার 'চেনা গোলাপ' খুব উৎসাহকর লেখ পড়লাম।নতুন এই সিরিজের লেখাগুলি আমি লাগ্ন্বে পড়বো ও আপনাকে আমার মতামত জানাবো।' **কবি হীরলাল দাশগুপ্ত :** " 'চেতনিক'-এর পর পর প্রতি সংখ্যা আরো ভালো- আরো ভালো হচ্ছে। নিঃসন্দেহে 'চেতনিক' একটি উচ্চ প্রশংসনীয় সাহিত্যপত্রিকা। সফর শিলাহুগা পাঠক মাজেই 'চেনা গোলাপ' পড়ে অভিভূত হবে। 'কন্ঠে দেবার' এবং 'অব খাঙ্গার প্রসঙ্গ' এই দুটি প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে আপনি যে প্রকাশপ্রীতির প্রবর্তন করেছেন তা শুধু অভিনবই নয় — উচ্চতরের শিল্পকৌশলগুণ এবং খুবই কলগ্রন্থ। **অধ্যক্ষ হিমাংশুবিমল বজ্রমল্লার (বিরভবন, শান্তিনিকেতন) :** "..... এই প্রকার উচ্চমানের পত্রিকা সম্পাদনার কাজ দুঃসহ ব্যাপার। তাই তোমাকে অভিনন্দিত করি। প্রবন্ধ নিতে অভি অবশ্য চেষ্টা করব।' **বার্ণিক রায় :** "চেতনিক' সম্প্রতি কলকাতায় যে কোনো পত্রিকার মানকে হার মানাতে পারে। বড় লেখকের গুণে নয়, ভাল লেখার দৌলতেই।" **বোম্বালা বিশ্বনাথ :** "এমন হৃদয় ছিন্নহৃদয় পত্রিকা সুশিদ্ধাবাবে বলে করা যায়! 'চেতনিক' না দেখলে না পড়লে বিলাস হতো না।' **বিশ্বকেন মুখোপাধ্যায় :** ".....প্রবন্ধটি ('চেনা গোলাপ') সত্যিই ভাল হয়েছে! ত্রুট অমিরনাথ সান্ডালের 'স্বভিত্ত অতলে'-র পর এমন রাইকিলি মেজাজ বিশেষ মনে পড়ে না।.....' **কলকাতা দেবগুপ্ত :** " 'চেতনিক' নিঃসন্দেহে উচ্চতরের কামজ হয়েছে। "

চেতনিক



অতুলচন্দ্র বসু

সম্পাদক

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'অধোব-
পন্থী' দুর্নীতি বিকৃত কচি ও চৌকুড়
তুৰ্বোধাতাব বিকৃত অক্লান্ত সংগ্রামবত
জৈমাসিক সাহিত্যপত্র।

প্রকাশকাল : জুলাই/পূজা/জ্যানিউয়ারী/
এপ্রিল।

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩

চেতনিক

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

◆ স্থায়ী পরামর্শ পরিষদ ◆

সভাপতি : শ্রীঅন্নদাশঙ্কর দাস (কলিকাতা - ৬৮)

সহ সভাপতি

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী (দ্যাপলজ), অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ
সান্তাল, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক চিত্তাংশুবিমল মজুমদার, অধ্যাপক সুবোধ
মুখোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ সুধীর নন্দী, ডঃ সুধীর করণ।

বিশিষ্ট সদস্যবর্গ

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজনবিহারী পুরকায়স্থ
(৯৪/এইচ কঁাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-২২), অধ্যাপক মুন্সুর পাল, শ্রীবাণিক দাস,
ডঃ শিশিরকুমার সিংহ (আহ্বায়ক), শ্রীসত্যেন সাহা, অধ্যাপক সৌম্যেন গুপ্ত,
শ্রীরায়প্রসাদ পাল, শ্রীবিষ্ণুনাথ দাস, শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীঅমল মজুমদার,
ডাঃ হুম্মিল মজিত।

সহযোগিতা করে থাকেন

শ্রীপুলকেশ্বর সিংহ (পাচগুনি), শ্রীব্রজগোপাল দাস (মুর্শিদাবাদ), শ্রীদীপক
চট্টোপাধ্যায়, (পি. পি. সি. ডি, দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিক), শ্রীঅনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়
(নিউটাউন, বার্নপুর), বিমানদেব মুখোপাধ্যায় (জেইল রোড, কান্দি)।

প্রচ্ছদ শিল্পী - শ্রীপকানন চক্রবর্তী

‘শারদীয় চেতনিক’ ১৩৮৩-তে লিখছেন

অপ্রকাশিত রচনা : স্ববীজনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ : অন্নদাশঙ্কর দাস/নারায়ণ চৌধুরী/বেজুইন/ডঃ সুধীর নন্দী/ডঃ সুধীর করণ/
কল্পতরু সেনগুপ্ত/ডঃ শিশিরকুমার সিংহ/বিজনবিহারী পুরকায়স্থ প্রভৃতি

কবিতা : ডঃ অমিয় চক্রবর্তী/হীরালাল দাশগুপ্ত/কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত/বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/কবিকল ইসলাম প্রভৃতি

গল্প : স্বর্গত নরেন্দ্র মিত্র/লৈয়ন মুন্ডাক/সিরাজ/বোম্বানা বিষ্ণুনাথম্/গুণময় রায়/
বিবেশ লাহিড়ী প্রভৃতি

“চেতনিক” একটি পূজা সংখ্যাসহ মোট চারটি পৃথক সংখ্যার অন্ত্রে বার্ষিক
টাকা ১০ টাকা। সাধারণ ডাকে বাড়তি ২ টাকা। রেজিস্টার্ড ডাকে বাড়তি
১২ টাকা। উপযুক্ত কবিশ্রমে এজেন্টরা যোগাযোগ করতে পারেন।

দার্জিলিং সর্বাধুনিক আকর্ষণ প্রান্টখেল ইউথ হোস্টেল



তরুণ বন্ধুদের আর ভাবনা নেই। চলুন দার্জিলিং। ছুটির কটা দিন আনন্দ ও হৈ-হুল্লোড়ে স্বপ্নের মতই কেটে যাবে। আর এইজন্যে রয়েছে ইউথ হোস্টেল। ম্যালের খুব কাছে চমৎকার পরিবেশে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সমেত হিমালয়ের অনেক তুষারমৌলী শৃঙ্গ আপনার নজরে আসবে, দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। অথবা পায়ে হেঁটে চলুন সম্ভ্রামকু এবং ফালুট কিংবা যেখানে খুশি।

ইউথ হোস্টেলে কয়েকজনে মিলেমিশে থাকার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। যরওলি রুচিসম্মত ভাবেই সাজানো-গোছানো। আর ভাড়াও নামমাত্র। মরসুমে (এপ্রিল-জুন ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাথা পিছু ৫ টাকা মাত্র এবং অন্যসময়ে মাথা পিছু ৪ টাকা। একা বা দল বেঁধে আসুন—যেমন খুশি। কটা দিন আনন্দে আর আরামে কাটিয়ে যখন ফিরবেন, দেখবেন এ কটা দিনের স্মৃতি আর মন থেকে মুছে চাইছে না।

রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়ার্ডেন,
ইউথ হোস্টেল, দার্জিলিং

ট্রাবল্‌স্‌ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ (স্ট্রিট)
কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন: ২৩-৮২৭১
গ্রাম : TRAVELTIPS

ট্রাবল্‌স্‌ট ইনফরমেশন সেন্টার

শিলিগুড়ি, ফোন : ২১১১৮

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



TCP/TB 165A3/76

উন্নয়ন প্রকল্প সফল কার তুলুন

● পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী

● স্বাস্থ্য-সঞ্চয় কার্যসূচী

● বৃক্ষ রোপণ কার্যসূচী

॥ জাতীয় প্রকল্প রূপায়ণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিন ॥

: নিয়ম :

যে কোন ক্লাব, মহিলা সমিতি, গ্রামীণ পাঠাগার, স্বাক্ষরতা শিক্ষণকেন্দ্র, সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি যৌথ প্রতিষ্ঠান এষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ৩০শে সেপ্টেম্বর '৭১ এর মধ্যে মাসে ১০টি অথবা ৭০টি ভ্যাসেক্টমি ও মাসে দুইটি অথবা ৮টি টিউবেকটমি বিশ হাজার টাকার স্বাস্থ্য-সঞ্চয় (দশ হাজার মেয়াদী লম্বী ও দশ হাজার টাকার সেভিংস্ একাউন্ট) এবং ১০০টি বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা প্রতিযোগিতায় যোগদানের অবশ্য সর্ভ। আগামী ১৫ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিযোগীদের কাজ যাচাই করে দেখা হবে।

পুরস্কারের পরিমাণ

ক্লাব পর্যায় প্রতিযোগিতা :—

প্রথম পুরস্কার— ৭৫ টাকা

দ্বিতীয় " ৫০ "

মহকুমা পর্যায় প্রতিযোগিতা :—

প্রথম পুরস্কার — ১০০ টাকা

দ্বিতীয় " ৭৫ "

জেলা পর্যায় প্রতিযোগিতা :—

প্রথম পুরস্কার— ১০০০ টাকা

দ্বিতীয় " ৭৫০ "

তৃতীয় " ৫০০ "

তুখুমা সফল পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জেলা পর্যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারীকে যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ২০০ টাকা, ও ১০০ টাকা এবং মহকুমা পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানধিকারীকে যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৭৫ টাকা এবং ব্লক পর্যায়ে যথাক্রমে ৭৫ টাকা ও ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে কোন প্রতিযোগী ব্লক ও মহকুমা ও জেলা পর্যায় একাধিক পুরস্কার জয় করিতে পারেন। অবিলম্বে প্রতিযোগিতায় যোগ দিন।

[জেলা তথা ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]

চেতনিক

প্রকাশকাল :

তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (১৯৭৫-৭৬)

জুলাই/পূজা/জানিউয়ারি/এপ্রিল

প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র

সম্পাদক :

অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও জেলা : মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমবঙ্গ

সূচী

ভূমিভিত্তিক (সম্পাদকীয়)

কবিতা : হীরালাল দাশগুপ্ত ৭

প্রবন্ধ : নাথায়ণ চৌধুরী (ডোভিড চেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষতা) ৯ / অধ্যাপক
বিজয়বিহারী পুরকায়স্থ (ডোভিড চেয়ার : একটি মূল্যায়নের প্রয়াস) ১৩/
অধ্যাপক মুন্সিম পাল ('আচা'য় রামেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা) / ১৯
মানিক সরকার (বাংলার ছোট শিল্পীদের আদিক জীবন) ২২ /
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মা নিমাদ) ৩৪

গল্প : বোমনা বিশ্বনাথ ৪৩ / দিব্যোশ লাহিড়ী ৫০

কবিতা : নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / সুদীপকুমার কল্যাণ / শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় /
বৈষ্ণবদেব মুখোপাধ্যায় / ব্রজগোপাল রায় / পুলকেন্দ্র সিংহ ৫৫—৬২

সাহিত্য দার্শনিক : ভাস্কর শর্মা ৬৩

কবিতা : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫

ভূমিভিত্তিক

সম্পাদকীয়

তীব্র আর্জি আর তত্পর আর্জেন্সি নিয়ে বঙ্কিম 'ভূমি থেকে উম্মার্জ' করেছিলো যে ক্লির কেলেকারিটা, কালক্রমে তা মেয়েদের ঈতুপুজোর উপকরণের মতো ধামাচাপা পড়লেও একেবারে নিস্মৃতির অভলে যে তলিয়ে যারনি... সে কথাটা বুঝলেই সেদিন 'চা-ডক মজলিস'-এর রাজাউজিরবাতক রবি-বাসবীর সাক্ষা আসরে। না না, বিরক্ত হবেন না। তাবতেন তো, 'ভূমি আবার একটা বস্তু, তাই নিয়ে এতো নেলেনাপনা, এতো থিটকেল, এতো কেলেকারি! কিন্তু তাই, একবার বাস্তবে নেবে এসে ভেবে দেখুন তো—এই ভূমি নিয়েই কি আমরা অষ্ট শতাব্দী কষ্ট পাচ্ছি নে মনে মনে জনে জনে, কষ্ট দিচ্ছি নে আপস্পরকে ঘরেবাইরে? পরমার্থকে নিয়ে আবার কে কবে কেলেকারিটা করেচে বসুন? কেলেকারি মাঝেই ভূমিকেন্দ্রিক, কখনো অদীর আগ্রহে কেন্দ্রাভিগ, কখনো

বিষিষ্ট বৈরাগ্যো কেম্মাতিগ। ভূবি নিয়েই আমরা খুশি। ভূবি নিয়েই আমরা
 ভূবি একে অপরকে। কখনো-বা সেই অপরের নানিকাগ্র টিপ্ ক'রে ছুড়ি
 হুপি। কখনো বা তাক বুঝে বেবাক এই ভূবি দিয়েই তুবি অক্ষিরে তপা
 দীন হুনিয়াব তাবৎ মালকড়ির মালিককে। শুধু ভূমিজাত মুনাকার মোহেই যে
 মুগ্ধ আমরা তাই নয়, এমনকি অবিশিষ্ট এই ভূষরূপ ঐশ্বৰ্য্যের লালসাই পুৰি আমরা
 অহরহ অন্তরের অন্তস্থলে। আর যদি মতি বহর সপ্তরখীর ভরসা পাই তাহলে
 নরক গুণজার ক'রে ব'লেই ফেলি : বিবজ্জর বিশশতকের আমাদের এই
 'নবাসভাতা' পদার্থটাই হ'লো ভূমিভিত্তিক।

আর শুধু বিশশতকের কথাই-বা বলি কেন ? উন্নত শতকের ছবিটাই-বা
 কী কম ছিলো ভাবন তো। বিশ্বতির অতলে বিলুপ্তপ্রায় গুপ্তকবিও
 মুখরোচক মন্তব্যটা একবার মনে পড়িয়ে দিই তাহলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া'কে
 স্তুতি করার ছলে তাঁরই রাজত্বকালে নীলকরদের অত্যাচারের পশ্চাৎপটে
 বাঙালি চরিত্র কী মনোহর রূপেই না ফুটিয়ে তুলেছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর'-
 সম্পাদক বঙ্কিম-দীনবন্ধু অক্ষয় দত্তের কবিশ্রুত ঈশ্বর গুপ্ত নামে অধুনাস্থপ এই
 যুগাগ্রযায়ী বিচিত্র ব্যক্তিত্ব :

হ'লে ভক্তকেতে বক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ।

কালসাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,

টপাটপ্ অমনি কবে গ্রাস ॥

বাঙালি তোমার কেনা একথা জানে কেনা ?

হয়োড় চরকেলে দাস।

করি শুভ অভিলাষ ॥

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু

শিখিনি শিং ঝাকানো,

কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস ॥

যেন বাড়া আমলা, তুলে মামলা

গামলা ভাঙে না,

আমরা ভূমি পেলেই খুশি হব,

হুপি খেলে বাঁচব না ॥

তাহলে লেহুগেও আমরা, পোষাগরু এই বাঙালি জাতটা, ভূমি পেলেই
 খুশি হতেম! শিং ঝাকাতে তখনকার গরুগুলোও জানতো না! তাই ভূমির

ভয়ে সৰ্বদাই থাকতো তারা তটস্থ, লেজনাড়িয়ে সৰ্বদাই ভূয়ো আত্মসম্বোধের চক্ৰকে কাঁধেহেলটা সময়ে চলতো বাঁচিয়ে। আর গোবামুখ দেখলেই খোড়া 'আকেল আকেল' বলে বুটভলে লুটিয়ে পড়ে আজি জানাতো যেন তাদের ভূমি-ভক্তি গামলাটা সেই বুট ঝেড়ে লক্ষ্যে চ্যুট করে ভেঙে না বসে তারা।

খাগড়া বাজারের অগ্রশস্ত রাজপথে গাঁহি পিপড়ের মতো; বিকথিকে ভিড় ঠেলে এঠে সেদিন সাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ সামনে দেখি বাজ-দারী পতাকাবাচী সারিবদ্ধ বন্যারী চিলকণ্ঠ মিছিল। বল বাহুল্য আহত হলো এমন দৃষ্টে দীর্ঘকাল অনভ্যস্ত পোড়া চোখছ'টো। 'হা ততোহস্মি' বলে ডুক্বে উঠতেই পার্শ্ববর্তী সত্যেনবাবু ঠুক্বে দিয়ে, মানে একটু ধমকে দিয়ে, ব'লে উঠলেন, 'চমকে উঠলেন কেন? এরা চাঁদ চায় না, ভূমি চায়। আর বুকে ওগুলো বাজ নয়, চুঁচকাঠি।' অতএব ভেলেজলে নয়, ভূমিতে আর চুঁচিতেই 'মামুষ' আজ লোকলের সেই দুর্ধৰ বাঙালি। ফলত আমি আশস্ত হয়েই গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হলেম।

তবু আজও খটকা; লেগেই থাকে একটা। ভূমিমালই যদি টইমস্ত হয় রতিশাস্ত্র গুহদেব, তাহ'লে হয়তো কোন্ অসত্যক্ মুহূর্তে সদাসত্যক্ মতি বহুদেব মগুরখীর সাজানো ব্যাহের ঘেবন্দী হয়ে ওদের ফন্দিফিকির লিকির সিকিও কেবামতি দেখতে সক্ষম হবে না। আলুফাঁক ঝিড়েফাঁক পটলফাঁক বেগুন ফাঁক—কোন ফাঁক-ই আর জাঁক ক'বে জয়েব শাঁখ শোনাতে পারবে না ভাবের হাটের এই আপনিমোড়ল গাডলটাকে। ফলে অ-বন্দি গোবন্দি হবে। শেরালের বাপ দেয়াল দেবে। ঘোলা জলে ডিপ ফেলে তথুশংগ ভাসদগ্ধা ঝ'ব মতি বহু অতিঘন গণসমর্থনের শিঙে চেপে হস্ত করে হয় এল এ হবার গোয়াব দেখবে, চাইকি যদি ভাগোনিইন্ত সন্তবতি তবো হয়তো হৃদমুদ পতা-বিভীষণও হবে। বিলিতি বাবের দাকব বোতল বগলদানা ক'বে সংস্কৃতির সংকর শাখামুগের মতো অবলীলায় একলক্ষ আশাবিড়িত অন্নদেবতার স্বকোপরি অ'রোহণ করে ব্যাদস্ত দশনে তাকেই দংশনের পোজপস্চার মারবে। তাই সেই পরম পরিণামের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দন্দ লাগিয়ে দেয়তা বোধ করি মন্দ হবে না ভাবিকালের সুসাজিঝাংসু পুণ্যলোকায় মেহলতাদেব :

দু'নয়ার মাঝে বাবা সব ছায় ফাঁক, বাবা সব ছায় ফাঁক
মনেও গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা জাঁক।
পেয়েছ যে কলেবর দৃষ্ট বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে থাক।

... ..
 চটমা আপায় বশ ভ্রমে চাহে মিছা যশ
 বিষয়বিশেষ বস, নহে পরিপাক ।
 কেবা পুত্র কেবা বধু শুধু বিষ নাই মধু
 মিছা মায়া পুত্রবধু শেষ কুন্তীপাক ।
 দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক ।

[ঈশ্বর গুপ্ত য়ুট্যাটিস্ য়ুট্যান্ডিস্]

হ'লে কী হবে। আমার দমনীতেও তো সেই এক ই-রক্তধারা
 প্রবাহিতা। খালি মনে হয়, দু'শি খেলে বাঁচবো না। বয়ঃ আজীবন
 ভুবি পেলেই ধুশি হবো। শিং থাকিয়ে কী হনে! কে কখন এসে খুঁটিতুচ্ছ
 উপড়ে তুলে হয়তো গোয়াল থেকেই দেবে ধাঁ ক'রে হাঁকিয়ে। বোকার মতো হাঁ
 ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অসহায় আত্মবিভাডনের দ্বিবাচন দর্শন করা চাড়া
 তখন আর হয়তো নাস্তি গতিরগ্রন্থ। তার চাইতে বয়ঃ হেমন্তকন্যাকে ভেকে
 বলি, আর তো মা! তোর সেই প্রাণমাতানো গানখানা গা'তো দেখি
 একবার :

ভূবিমাল ভূবিমাল, তুমি যে আমার
 ভূবিমাল ভূবিমাল, আমিও তোমার ।

— — —

জনতা / শীরালাল দাশগুপ্ত

অ'ণো আর অঙ্ককার বিড'বিত আপাদমস্তক

জনতার শরীষের বোম কূপে কূপে

পর্বে পর্বে চরণে চরণে

ক্ষপার্ত ক্রুদ্ধ গত্ত কবিতার মতো

মুঁড় একুরতা

একাতো-বিহবল ।

মুখে তার ভাস্কর্যের কারুকার্য নেই ।

চোখে নেই স্মরণিত নগ্ন ছায়া স্বপ্ন উবশীর ।

এই মুগ্ধ জনতার মস্তিষ্কের গুড় কোষে কোষে

অপেক্ষাত্রী মননের বিচিত্র অটিল জাল

ম'কড়সা গোনেন না !

জনতা অরণো পেই ক্রৌঞ্চ মিথুন !

জনতার কটকিত কর্ণশ লোমশ আকাশে

বলাকার শাদা স্বপ্ন বিধূনিত পাখাপখ নেই ।

অর্থহীন ধ্বনিতে বাণীতে কিংবা বর্ণব্যঞ্জনায়

ভাষা কেনো ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় আত্মগতি আলেখ্য

অঁকে না ।

গে যালিয়র গড়া-র কথা ভাষা জানেন ।

ভাদের ভূগোলে নেই উজ্জয়িনী প্রাচ্যস্তীর নাম !

বহমান বহুতার

ক্ষীতকার

প্ৰকৃতগত

সংখ্যার পণ্য প্রয়োজনে

সংখ্যা'কীত প্ৰকৃত গুণ

জনতা !

জন নয় । শুধুই জনতা ।

বৃক্ষহীন মগরগা ।

জনহীন মহান জনতা !

কিছু কি গোপন নেই জনতা জীবনে ?
 কংকাল আশ্রয় দিনে
 চিত্তাভ্যস্ত রাতে
 ভুলেয়া কি ভুল কোরে কোনো গুঢ় চক্রান্ত করে না ?
 ঘরে ঘরে মনোমী জীবনী,
 গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পৃথিবী কল্লিত কাহিনী
 সভ্যতার দূর্ত ইতিহাস
 কে শোনায়, কেবা শোনে, জনতার কথা ?
 শুধু ধোঁয়া ?
 ধোঁয়া আর অগণিত সংখ্যার ধোঁয়াটে নিশ্বাস ?

সমুদ্রের বুকে চূপি চূপি চোবেরচর মতো
 রাত্রি আসে !
 অরণ্যের চোখে চূপি চূপি চোবের মতো
 রাত্রি আসে ।
 ঠাণ্ডা—অন্ধকার মাটিতে মাটিতে বীজ বোনে
 চূপি চূপি চোবের মতো বীজ বোনে
 বীজ বোনে সময় মিশ্রণ ! বীজ বোনে !
 চলো ঘাই, রাত্রির শো-কে
 সত্যজিৎ বার-এর সাম্প্রতিক চর্চা
 জন অরণ্য দেখে আসি ।

ডেভিড হেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষতা

নারায়ণ চৌধুরী

মহামতি ডেভিড হেয়ার সাহেবের উদার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর মানসিকতার একটা লক্ষণীয় দিক এখনও যথোচিতরূপে আলোচিত হয়েছে। এ'লে মনে হয় না—তাঁর চিন্তার ধর্মনিরপেক্ষতার দিক। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, অস্বতঃ তাঁর অত্যন্ত শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের আদর্শ অবাধিচারীরূপে অতুলনে করে গেছেন তাঁর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কি ছিলেন না তা আমরা জানি না। হয়ত তিনি গভীরঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, হয়ত বা ধর্মের মূলতত্ত্বগুলির প্রাতি তাঁর অন্তরে গহনে প্রগাঢ় আস্থা ছিল, এমনকি এ কথাও জানা যেত পারে যে ক্রীষ্টিয়ান ধর্মের সকল মত তাঁর গ্রহণীয় না হলেও যীশু খৃষ্টের ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতায় তিনি কোন সময়েই সংশয় প্রকাশ করেননি এবং তাঁর প্রাতি জন্মে মানবিক শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন বরাবর। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে কখনও তাঁর শিক্ষাপ্রসার চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। শিক্ষাকে তিনি আগাগোড়া ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার বাণবার প্রয়ত্ন করেছেন।

হেয়ার সাহেবের এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমি বিশেষ গণনীয় বৈশিষ্ট্য বলে বলে মনে করি আর এই প্রসঙ্গেই আলোচনার জন্য আজ ছ'কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছি।

আমরা আজকাল সেকুলারিজমের কথা খুবই বলে থাকি। শিক্ষানীতিতে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সর্বত্র অতুলন করে চলা উচিত বলে মত প্রকাশ করে থাকি। অবশ্য শিক্ষার এবং রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ মনে চলছি কিনা সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন তবে এ বিষয়ে কোনট সন্দেহ নেই যে, সেকুলারিজম আজকের দিনের প্রগতিশীল চিন্তার মানদণ্ডে খুবই অন্ধের একটি চপ্টভঙ্গী এবং তাকে জনজীবনের বিবিধ ক্রিয়াকর্ম অতুলন করে চললে সমুদ্র লাভ।

আমাদের দেশে এই সেকুলারিজমের আদর্শেই একজন অগ্রচরী ভাব
নায়ক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তিনি তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রদায়িক
ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলতে যে জিনিস আমরা বুঝি তাকে কোন সময়েই
প্রবেশাধিকার দেননি—শিক্ষাকে বরাবর ধর্মের সংস্রব থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা
করেছেন।

আর ঠিক এই কারণেই দেখা যায়, হিন্দু কলেজের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান
শিক্ষক বিদ্রোহী ডাবুক ডিবোজিয়ার নেতৃত্ব চালাত 'ইয়ং বেঙ্গল গোস্বামী
প্রতিভাবান ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে অস্থির মিল ছিল। আর
'ইয়ং বেঙ্গল'ও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গভীরভাবে ভালবাসতেন। এই শ্রদ্ধা
ও প্রীতির মূলে ছিল উভয়পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য। হেয়ার সাহেব নিজে পুন
লেখাপড়া শেখার সুরোগ পাননি জীবনে। স্কটল্যান্ডের এক স্বল্পশিক্ষিত যুবক
ভাগ্যবশত এদেশে এসেছিলেন এবং ঘড়ির ব্যবসায়ের সূত্রে স্বীয় ভাগ্যকে
ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলেন—ঘড়ির ব্যবসাতে প্রচুর অর্থোপার্জন করার সুরোগ
পেয়েছিলেন তিনি। সুতরাং কি বালা কৈশোর-যৌবনের পরিবেশ কি কর্ম-
জীবনের পরিবেশ কোন দিক থেকেই উদার শিক্ষার অংশে তাঁর জীবনে প্রবেশ
করার বিশেষ ফাঁক ছিল না। অথচ কী আশ্চর্য, এই মানুষটিই কিনা এট
যুগের একটি চমৎকার স্মৃতি ও স্মরণ নীতিকে নিজ জীবনের সমসাময়িক ভিতর
কপায়িত করেছিলেন সার্থকভাবে। একদিকে এদেশবাসী বালক বালিকাদের
শিক্ষার প্রসারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে নিজের উচ্চ শিক্ষাসাভের সুরোগস্বরূপ
হেয়ার অতীত ও কোভ দূর করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে 'আধুনিক।
প্রগতিশীল চিন্তাদর্শের ছোঁচে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলবার চেষ্টা
করে ঐকান্তিক যুগচোঁচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির
ইতিহাসে অগ্রসর ভাবনার পদিকরূপে যাঁরা চিহ্নিত ও স্বীকৃত, যেমন রাম-
মোহন, বিজ্ঞানাগর, অক্ষয়কুমার দাস, মাইকেল, 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় প্রমুখ,
তাঁদের সমসাময়িক ডেভিড হেয়ারের নামটিও স্থান পাবার উচিত। হেয়ার
সমুদ্র শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন না, শিক্ষার উদারনীতিরও একজন নিষ্ঠাবান বাহক
ছিলেন।

আমরা সকলেই জানি যে, হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন বাবুর বিভিন্ন
কর্মপ্রয়াসে একজন প্রধান সহকারী ছিলেন। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ
চেষ্টা ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক কর্মপ্রয়াস, সংবাদপত্র চালানোর বিপ্লবে

প্রতিবাদ আন্দোলন, স্কুল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজ স্থাপনা, মেডিকেল শিক্ষা প্রবর্তনা প্রভৃতি অনেক কিছুই হেয়ারর ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং প্রয়োজনে অর্থসাহায্য করে রাজার কর্মপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এক রাজার ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য হয়নি। তিনি স্কুলে ধর্মশিক্ষাদানের বরাবর বিরোধিতা করে এসেছেন। রামমোহন চেয়েছিলেন তাঁর ও হেয়ারের যুক্ত প্রচেষ্টায় যেসব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বা হবে, সেগুলিকে বেদান্ত শিক্ষানের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হোক কিন্তু হেয়ার রামমোহনের এই অভিপ্রায় মেনে নিতে পারেননি। বিদ্যালয়ের চৌহাফর ভিতর তিনি শুধু বেদান্তবিজ্ঞা কেন, কোন ধর্মবিজ্ঞাকেই প্রবেশ করতে দিতে রাজী ছিলেন না। বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও, এ দেশবাসীর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনকেও কোনমতেই খাট করেননি। ইংরাজীর পাশে পাশে মাতৃভাষারও বোধমতে চর্চা চলুক এই ছিল তাঁর অভিমত এবং এই দুই ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাকেই তিনি ছাত্রদের মধ্যে প্রচারে যত্নবান হয়েছেন—ধর্মীয় শিক্ষা নয়। বেদান্ত শিক্ষা বা ‘গঙ্গপেল’-এর শিক্ষা কোন শিক্ষাও তাঁর মনঃপুত ছিল না। ধর্মী ক্রীষ্টিয়ান হয়েও যে তিনি তাঁর শিক্ষার আয়োজনের ভিতর বাইবেলকে স্থান দেননি এটা অসামান্য স্বাধীনচেতা পারচায়ক। মিশনারী শিক্ষা পদ্ধতির তিনি ছিলেন একজন আপসহীন বৈরী।

এই কারণে দেখা যায় মিশনারী শিক্ষার প্রচারকেও হেয়ারের প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন। এঁদের শিরোমণি আলেকজান্ডার ডাক হেয়ারকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। কী করেই বা দেখবেন, তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল একটা অভিজ্ঞতা, এদেশীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের নাম করে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃষ্টধর্মের কুহকের মতো এনে ফেলাটা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ডাক সাহেব এই মতলবী শিক্ষাপ্রচার চেয়ারের মত একজন ‘আধুনিক ভাবদাতার ভাবুক যুক্তিবাদী উদার শিক্ষানেতার অন্বেষণে পাবে না, সে কথা বলানি বাহলা।

চেয়ার যে কীরকম যুক্তিবাদী আর সকল আত্মতানিক ধর্মের প্রতি কী রকম সমান অগ্রসর ছিলেন তার দু’একটা উদাহরণ দিই।

কক্ষমে হন বন্দোপাধ্যায় চেয়ার স্কুলের একজন প্রতিভাবান অগ্রগণ্য রূপ পরিগণিত তন। কক্ষমোচন যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বৃত্ত তন চেয়ার তখন

সেই সংবাদ পেয়ে তাঁর গৃহে যান এবং তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণমোহনের ধর্মাস্ত্র গ্রহণ চেষ্টাকে তিনি এক কুসংস্কার থেকে অস্ত্র কুসংস্কারে রূপ দিয়ে পড়ার সঙ্গে তুলনা করেন এবং এটি যুট পথ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দেন। কৃষ্ণমোহন অবশ্য সে-পরামর্শ গ্রহণ করেননি কিন্তু এর থেকে হেয়ারের মানসিকতার ধাতের অংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সকল আত্মগোষ্ঠানিক তথা সাম্প্রদায়িক ধর্মের সাংঘর্ষ্যভেদেই সান্নিহান ছিলেন।

লালাবিহারী দে ছিলেন ডাক স্কুলের ছাত্র। কিন্তু ডাক স্কুল থেকেও হেয়ারের পটলডালা স্কুলে (এই স্কুলই পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়) ভাল পড়াশুনা হয় খবর পেয়ে লালবিহারী হেয়ার সাহেবের কাছে দরবার করেন তাঁকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করে নিতে। কিন্তু হেয়ার রাজী হননি। এটি যুক্তিতে রাজী হননি যে লালবিহারী ডাক স্কুলের ‘বাইবেল পড়া ছেলে’ এবং ‘আধ্যাত্মগোষ্ঠান ছেলে’। এমন ছাত্রকে তাঁর স্কুলে ভর্তি হওয়ার অসম্মতি দিলে অস্ত্র ছাত্রগোষ্ঠার প্রভাবে পড়ে খুঁটান ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থেকে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্য হেয়ারের এই উদ্দেশ্যে তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় এবং তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী স্বরূপটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। সকলেই অবগত আছেন যে, লালবিহারী দে পরে ডাকের প্ররোচনায় খৃষ্টধর্ম অঙ্গীকার করেন এবং উদ্ভবকালে স্বামী অধ্যাপনা কর্ম গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত খৃষ্টীয় যাজকবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকেন। এই ঘটনায় হেয়ারের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়।

হেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের জন্ম শুধু আলেকজান্ডার ডাকই নয়, তৎকালীন সমগ্র মিশনারী কুল তাঁর উপর নীতবাগ ছিলেন। তাঁকে তাঁরা নিজেদের সমাজপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রায়-একঘরে করে তুলতে চেয়েছিলেন। ভাবখানা এই যে, হেয়ার যেন ক্রীষ্টিয়ান সমাজের কেউ নন, তিনি এদেশীয় বালকবালিকাদের শিক্ষাদানের খেলালে যেতেছেন সম্পূর্ণ আপন মজিতে; তাঁর স্বসম্প্রদায়ের অনুমোদন এর পশ্চাতে নেই। অর্থাৎ কিনা তিনি একজন দলবিচ্যুতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-প্রচারক, মিশনারীদের মূল ধারার ব্যতিক্রম। এক হিসাবে দেখতে গেলে কথটা ঠিক কিন্তু দেখা যায় এই ব্যক্তিভাবক শিক্ষা-প্রচারকটিকেই এদেশের মানুষের মনে প্রভাব মনে রেখেছে, মিশনারীদের স্বত্বিতাদের মনের তলায় হারিয়ে গেছে। বাংলা সচসাহিত্যের আদিপর্বের সংগঠনায় ও বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় কেরী, মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী, ওয়ার্ড প্রমুখ

প্রথম যুগের মিশনারীদের যে-দান তাঁর স্মৃতি নিশ্চয়ই তাঁরা সযত্নে লালন করছে, তবে মিশনারীদের ধর্মাস্তবকরণ চেষ্টার স্মৃতি তাঁদের মনে বতৃষ্ণা ভিন্ন আর কোন মনোভাব জাগ্রত করে না, সে কথা নিশ্চিত।

আসল কথা, ডেভিড হেয়ার এই দেশ এবং এই দেশের কালো মানুষ-গুলিকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। কলকাতা তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সাতষষ্টি বছর আয়ুস্মণ্ডিত জীবনের (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৭৫— ১ জুন ১৮৪২) শেষ বিয়াল্লিশ বছর তিনি এই শহরেই অতিবাহিত করেন এবং এট শহরের মাটিতেই তিনি দেহ রাখেন। কে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী কে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী নয় লোকে সেই কথা মনে রাখেন না, মানুষ দেখে হৃদয় এবং সেই হৃদয়ের প্রসার। ভালোবাসার ওই প্রসার সাধিত হয়। এই মানদণ্ডে হেয়ার বঙ্গবাসীর অশ্রু আপনার জন এবং তাঁদের ঘানঠ আত্মার আত্মীয়দের অমৃতম। দ্বিশত বৎসরের জয়োৎসব উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর গুণাবলীর কীর্তন আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

ডেভিড হেয়ার : একটি মূল্যায়নের প্রয়াস

বিজ্ঞান বিহারী পুরকায়স্থ

১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি ডেভিড হেয়ারের জন্মদিনে হিন্দু কলেজের ৫৮ জন ছাত্র এদেশে শিক্ষাপ্রসাধে তাঁর অবদানের প্রতি অকৃত্ৰু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে দক্ষিণাংকন মুখোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারের উদ্দেশে একটি প্রশস্তিপত্র পাঠ করেছিলেন এবং ডেভিড হেয়ার তাঁর উদ্ভবে একটি সঙ্ক্ষিপ্ত প্রতিবক্তৃতা করেছিলেন। এই ঘটনা এক হিসাবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ। কেন না নব্যশিক্ষা হিসাবে প্রকৃতিতে এটি আধুনিক শিক্ষার প্রথম যুগের প্রেরিত ছাত্ররা তাঁদের অন্তরের কথাই তাঁর মধ্য দিয়ে বলেছিলেন এবং এই নব্যশিক্ষার প্রধাতম উৎসাহদাতার প্রতি তাঁদের যুক্তচিত্তের শ্রদ্ধাভঙ্গিই এতে

অপিত হয়েছিল। আর ডেভিড হেয়ারের প্রতি-বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল মিততাবী হেয়ার সাহেবের একান্ত একটি পরিচয়।

ডেভিড হেয়ারের জন্মের ষাশত বর্ষ পূর্তির এই মুহূর্তে ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণের দাবী রাখে। কারণ হেয়ার সাহেব বলেছিলেন “ the tree of education has already taken root ; the blossoms I see around me , and if it be lett to grow up for ten years more, it will acquire such a strength that it will be impossible to eradicate it ” প্রশাস্ত প্রত্যয়ে স্থির একজন চম্পদ্রষ্টা কর্মীর সম্ভাষ এখানে সহজেই প্রতিভাত। কিন্তু এগিয়ে চলার প্রেরণা প্রদানে হেয়ার সম্পষ্ট : “To maintain and to continue the happy career already begun is entirely left to your own exertions Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors.” সহজ ভাষায় ছাত্রদের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে আশ্রয় স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রকাশ, আর বিশেষভাবে লক্ষণীয় ‘reformer’ আর ‘instructor’ কথা দু’টি। নূতন প্রেরণায়, নবচেতনার তরুণদের উদ্বোধিত করে তোলার স্থির লক্ষ্যই এখানে অভিবাক্ত।

এই সংলাপণময়ী মূল্যবান দলিল দু’টি বার বার অনুশীলন না করে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিচর্চা বহুলাংশে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাপ্রসার আর নব-চেতনার আবাহনে প্রেরণা যোগানোর ক্ষেত্রেই ডেভিড হেয়ার তাঁর নিজের প্রথম পরিচয় রেখে গেছেন। যে ক্ষমিতে ভাববাক্যের তিত গড়ে উঠবে তার অন্ততম স্থপতি ডেভিড হেয়ার —, শিক্ষাভিমাত্রী বিদগ্ধ কোনো ব্যক্তি নন, একজন ‘খয়িওরালা’ হলেন আমাদের নব্যশিক্ষার ঘণাধর অর্ধেক নবযুগের দূত। এই আপাত অবিদ্বান্য ঘটনায় ভাবতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণামের, আপাত অভাবিত পরিণাতরই ছায়া। আর এই সূত্রে বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস তার সকল তাৎপর্য, সকল ঐজ্জ্বল্য ও সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েই অভিবাক্ত। সমাজবিজ্ঞানী আর ইতিহাসবেত্তা বা বিচারশীল যে যাত্রাবের কাছে এই বিচারবার মূল্য প্রায় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মৃতি এবং স্মৃতির মূল্যের যাবার্থ্য নিকূপণে এটা সহজেই প্রাথিত।

ভারতে ইংরাজ শাসন যখন তার সর্বব্যাপ্ত প্রচণ্ডতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সন্ধিলগ্নে, ‘জাত বাবদারীদের বাসভূমি ফটলাও’ থেকে ১৮০০ সালে পঁচিশ

বছরের তফস্বি হুবা ডেভিড হেয়ার 'ঘড়ির বাবসা করার উদ্দেশ্যে' এলেন কলিকাতায়। ১৮২০ সালের ১লা জানুয়ারি ডেভিড হেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘড়ির বাবসা পরিচালনা করেন। কিন্তু তার অন্তত পাঁচ বছর আগে থেকেই হেয়ার শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮১৬ সালের ১৪ই মে স্থানীয় কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্টের বাসভবনে ইংরাজি শিক্ষার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে আধুনিক নব্যশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজের' আদিকল্পক ছিলেন স্বয়ং ডেভিড হেয়ার। কারণতঃ ডেভিড হেয়ারের কলিকাতায় অবস্থানের গোটা সময়ই, অর্থাৎ তার অধিকাংশ সময়টুকু শিক্ষা বিস্তারের কাজে কেটেছে। ১৮৪২ সালের ১লা জুন মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া পর্যন্ত ঐ সময়ের কলিকাতায় সমগ্র শিক্ষাযোজনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ার নানাভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তারমধ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সংক্রান্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে'র সভার কথা এর মাঝেই বলেছি। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী গরানহাটায় ৩০৪ নং চিংপুর বোডে গোবর্দাদ বসাক মশায়ের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ বছরের ৪টা জুলাই 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র পরিকল্পনা করা হল। ১৮২৩ সালে পল্লভাঙ্গায় ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হল। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কলেজ হোয়ারের উত্তর দিকে হেয়ার কর্তৃক 'অল্পমূল্যে প্রদত্ত জ'মতে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন লর্ড অ'মহাস্থি'। ১৮২৮ সালে প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিওর সভা পতিত যে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় ডেভিড হেয়ার তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ সালের জুন মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনায় ডেভিড হেয়ারের অবদান সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

দারাবাহিক কোনো বিবরণ এটা নয়—কিন্তু এটো তর্কাতীত তথ্য থেকে নব্য শিক্ষা, ধর্মীয় উপদলীয় প্রভাবমুক্ত আধুনিক শিক্ষাযোজনের ক্ষেত্রে হেয়ারের অবদান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তা এক কথায় অতুলনীয়। পূর্বে উল্লিখিত হিন্দু কলেজসংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিনন্দন পত্রে তাই বলা হয়েছিল: the man who breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption . . .

বণিকের মানদণ্ড শোহালে শর্বরী রাজসুও হয়ে দেখা দিল, অন্তর্দিকে শাসক ইংরাজ ও মিশনারি ইংরাজেরা একত্রে শিক্ষা বিস্তারও করেছেন; বিদেশী শাসনের বিদেশী শাসকদের সেইসব আভাবিক লুপ্তনে নিন্দীতনে ভাঙনে গড়নে পরিকীর্তি ইতিহাসের সেই দিকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে নেই। কিন্তু ডেভিড হেয়ার প্রসঙ্গে এখানে ক'টি কথা না বললে ইতিহাসের কাছে অপরাধী হতে হবে। ব্যবসায়ী পরিশেষে বদান্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিগল হলেও তুল্য নয়। কিন্তু ব্যবসায়ী ব্যবসা বিসর্জন দিয়ে এমন এক শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করলেন যাতে পাণ্ডুর ঘরে বছরে বছরে শুধু ঘাটিতই জমে এবং যা যথার্থতঃ ধর্মনিরপেক্ষ— এই অসাধারণ পথে চলার অসামান্য মহত্বের স্বীকৃতি সবচেয়ে বেশি করে যাঁর প্রাপ্য তিনি নিঃসন্দেহে ডেভিড হেয়ার। এ সিঁহাবে তিনি এক অনন্ত ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত অর্থেই ডেভিড হেয়ার ছিলেন ‘a time keeper of the then Bengal and India that was yet to be.’ ঘাড়ের ব্যবসায় ডেভিড হেয়ারের পক্ষে বস্তুতঃই ইতিহাসের এক স্থায়ী কৌতুক, অথবহ আপতন। কেন না ঘাড়ের ব্যবসায়ী না হয়ে অত্র কোনো পণ্যের ব্যাপারী হলে হেয়ারের মাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হানি হতো না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণ্যদেশে ভারতে আগমন এবং একত্রে ব্যবসায়িক সাফল্য বা অসাফল্য লাভের শেষে ‘স্বদেশে প্রত্যাবর্তন’ এই রেওয়াজ ডেভিড হেয়ার আশ্চর্য পরলতায় ভেঙে দিলেন নিজের জীবনে। তিনি একটা বিদেশকেই তাঁর নিবাসিত দেশভূমি করে নিলেন—ছাত্রদের আভ্যন্তরীণত্বের এই কণাটি সবিশেষ প্রাণধানযোগ্য।

তৃতীয়তঃ, পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম কালে হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা করার জন্ত যখন ভারতে এলেন তখন তিনি শিক্ষার বিরাট কোনো জাঁক নিয়ে অগ্রসর আলেননি, ‘মিশনারি’ তিনি ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে যাত্রারম্ভে দাঁড়িয়ে নব্য শিক্ষার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সন্দেহ মাত্র নেই, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ (secular) শিক্ষার প্রচলনেই প্রথমাবধি তিনি তৎপর ছিলেন। ছাত্রা হিসাবে হিন্দু স্কুলে যোগদানেচ্ছু যেভাবেও লালবিহারী দেকের তিনি যা বলেছিলেন তাঁর মধ্য দিয়ে ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাদর্শ সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ডাক সাহেবের স্কুলের ছাত্র লালবিহারী বাইবেল পড়েছেন

কিন্তু ডেভিড হেয়ার চাননি বাইবেল-পড়া শিক্ষার অঙ্ক হোক। তাঁর মতে শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা, হবে ধর্মনিরপেক্ষ। এই ঘটনা সম্পর্কে “বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস” নামক তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বিশেষ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন ডঃ স্বপন বসু।

আর ‘এশিয়াটিক’ কলেজায় মুতাব্বরন হেয়ারের জীবনের আরেকটি চরম ঘটনা যাতে ইতিহাসের কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য না করে উপায় নেই।

এই সব কিছু মিলিয়ে বাংলার নবচেতনার ইতিহাসে ডেভিড হেয়ার প্রথম বিদেশীয় স্বদেশী। ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার নিরিখে ডেভিড হেয়ার প্রথম আধুনিক ব্যক্তিত্ব, নিজের কণ্ঠের জগৎ ধর্মীয় গোবন্ধান থেকে দূরে লোকায়িত ভূমি ও নিবাসনে সেই ব্যক্তিত্বেরই চকিত বিভ্রাক্ষিপ্তি। নিরপেক্ষ বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমস্যারসংঘের বিবোধী ‘ডেরোজি-র তুলনায় ডেভিড হেয়ারের চিন্তা অনেক বেশি প্রাগ্রসর বলেই গণ্য হয়।

স্বভাবতঃ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ‘ইয়ং মেন্সেলের’ ধর্মীয় ভাবনাকে ডেভিড হেয়ার প্রভাবিত করেছিলেন। তাছাড়া হেয়ারের সঙ্গে ইয়ং মেন্সেলের সম্পর্ক ছিল একাত্মতায় ভরা, হৃদয়ে অশুভ্রত। তারই জগৎ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিঃসঙ্কোচে হেয়ারের কাছে তাঁদের ঋণের কথা স্বীকার করতে ‘মাতৃস্বস্তা লাগিত সন্তানের’ উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন। চিরকাল নেশপো থেকে কাজ করতেই হেয়ার আগ্রহী ছিলেন। সকল প্রচার থেকে দূরে নীরবে কাজ করার জন্যই হেয়ারের প্রাণ্য ক্ষতিতে অগার সহজেই ভাগ পসাতে পারেন। হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা বাপারে সেট বিডগনাট এক শ্রেণীর গবেষকদের বিভ্রান্ত করেছে মনে হয়। কিন্তু নেশপো থেকে হেয়ার প্রেরণা ও সাহায্য না দিলে রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন ঘোষ বা রামতনু লাহিড়ীর উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগই হুটতো কিনা সন্দেহ। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে হেয়ার তাঁর উদারতা ও চরিত্রমার্গে প্রায় কিংবদন্তী।

অতীত সংকল্প এই পটভূমি থেকে বিচার করলে ডেভিড হেয়ারের বৈশিষ্ট্য, তাঁর চিন্তা, চেতনা ও অবদানের বিশ্লেষণ চোখে না পড়ে পারে না। আর এক হিসাবে দেখতে গেলে এই বিষয়গুলির উপলব্ধির ফলে উনবিংশ শতকের বাংলার ‘নবজাগরণ’ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়, অতি সরলীকৃত খণ্ডিত চিন্তার কবল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা ভারতের নবজাগরণে সীমাবদ্ধতাগুলি ক্রমেই যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ’ল তার উৎসের সন্ধান

করতে হয় এই আদিলগের সমাজবাস্তবের মতোই।

এই বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ডেভিড হেরায়েব অবদান সম্পর্কিত ভাবনার গুরুত্ব অনেক। তাঁর জন্মের দ্বিশতাব্দী পূর্তির অহুষ্ঠানের তাৎপর্য এখানেই।

‘ঐতিহাসের অচেতন হাতিয়ার’ হয়ে যে ব্রিটিশ শাসন ভারতের যুগ যুগ বাহিত গ্রাম-সমাজের ভিত্তিকে লুপ্তভুত করে বাংলা তথা ভারতের সমগ্র জীবনকে শিল্প যুগের সভ্যতার সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিল তার অস্বর্নিহিত ঠাঁত ও নেতিবাচক শক্তিশমূহের মূল্যায়ন ছাড়া এই যুগসঙ্গিকে উপলব্ধির চেষ্ঠা একদেশদর্শী ও খণ্ডিতই থেকে যাবে। আর সামগ্রিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঊনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার বিরাট অবকাশ এখনও রয়ে গেছে একথা সহজেই বলা চলে। ডেভিড হেরার তাঁর সমসাময়িক যুগে দাঁড়িয়েও যে আশ্চর্য প্রাগ্রসব আধুনিক মানসিকতার প্রকাশ দেখিয়ে গেছেন তা এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। এখানেই হেরায়েব জীবনী ও কর্মসাধনার বিচারণার সবিশেষ মুখা।

প্রাসঙ্গিকী :

১। প্যারীচন্দ্র মিত্র রচিত ডেভিড হেরায়েব সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ একতথ্যনি অণাবহাৰ্য্য আকর স্বরূপ। ‘সংগোপিত তৃপ্তাপ্য গ্রন্থমালা’-র তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে তা বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যপূর্ণ সুসম্পাদিত এই গ্রন্থ যে কোনো আগ্রহী পাঠকের কাছে অপরিহার্য বস্তু বলতে গণ্য হবে।

২। “বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস” ডঃ স্বপন বসু; (পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯, মূল্য—২০.০০। এই নাস্প্রতিক গ্রন্থে খ্রীস্ট ১৮২৬ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণের ব্যাপারে তথ্য-নির্ভর, যুক্তিপূর্ণ, নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ‘নবজাগরণের’ নানাদিক নিয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন। অমি ক্ষুদ্র লেখাটির ব্যাপারে অরূপণ ভাবে তাঁর গ্রন্থের থেকে সাহায্য নিয়েছি। এই বইখানি যে কোনো লক্ষ্যনিষ্ঠ বিচারণীল ব্যক্তির কাছেই অত্যন্ত সহায়ক বলে গণ্য হবে—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

৩। “ভাৰতে ব্ৰিটিশ শাসন ও তাৰ পৰিণাম” সম্পৰ্কিত চিন্তাৰ বাণীয়ে আমি কাল্‌ মার্কস-এৰ ভাৱত বিষয়ক প্ৰবন্ধাদিৰ ধেকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰেছি। এ বিষয়ে “Articles on India” শীৰ্ষক R. P. D. সম্পাদিত তুলত সংকলন বা “India’s First War of Independence” শীৰ্ষক কাল্‌ মার্কস-এৰ প্ৰবন্ধ সংগ্ৰহটি অবশ্যই প্ৰেৰণা এবং সম্বন্ধে পাঠ্য।

আচাৰ্য ৰামেন্দ্ৰ সুল্কৰেৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা

ভাষ্যাপক মুন্সয় পাল

ভাৰতেৰ সাবস্বত সাধনাৰ ঠাতহালে আচাৰ্য ৰামেন্দ্ৰসুল্কৰ জিবেদী এক টঙ্কল বাক্তি। ভাৰতীয় ঐতিহ্য সংস্কাৰ ও পাশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানেৰ সমন্বয়েই তাঁৰ বাক্তি পুঠ ও স্কুত হয়েছিল। এই বাক্তিৰেৰ অভিব্যক্তি ও ৰূপায়ণেৰ সাক্ষ্য তাঁৰ জীৱন ও মনন। উনিশ ও বিশ শতকেৰ তৃতীয় দশক পৰ্যন্ত ভাৰতীয় মণীষাৰ এক সাধাৰণ দৰ্শ ছিল অদেশ চেতনা। তা ৰামেন্দ্ৰসুল্কৰেৰ মনোও লক্ষ্য কৰা যায়। তৎকালীন ভাৰতীয় প্ৰেক্ষিতে, অদেশ ছিল দাবণাৰ বিষয়, দাণেৰ ক্ষেত্ৰ, প্ৰেৰণাৰ উৎস ও প্ৰয়োগেৰ কেন্দ্ৰ। আচাৰ্য ৰামেন্দ্ৰসুল্কৰ এ বলেচেন ‘মল’ অদেশাত্ৰবাগেৰ ভিত্তি না থাকিলে, অদেশেৰ উন্নতি চেষ্টা কেনল পণ্ডপ্ৰম। অদেশেৰ ট্ৰেকিৰ ক্ষমতা এদেশে ৰাজনৈতিক আন্দোলন শিল্প শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ, বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ, শিল্প সমিতি স্থাপন প্ৰভৃতি নানা উত্তম দেখা গাটহেছে।’ (টমেশচন্দ বটবাল)

ৰামেন্দ্ৰসুল্কৰেৰ অদেশ-চিন্তনেৰ ৰূপ এ প্ৰকৃতিটি ‘সমসাময়িক মণীষীদেৰ স্বাৰাও গ্ৰাহ্য হয়েছিল। ৰবীন্দ্ৰনাথ লিখেছিলেন: ‘দেশেৰ প্ৰতি তাঁতাৰ (ৰামেন্দ্ৰ সুল্কৰেৰ) প্ৰীতিৰ মনোও তাঁতাৰ নিজেৰ নিশ্চিষ্টতা ছিল, তাঁতা মূলপাঠ্য বিলাতী উত্তিহাস চঠতে টঙ্কত তৎকালীন জনগোষ্ঠ ভোতালাগী কতক টঙ্কাবিত্ত ঐদিবুলিৰ স্বাৰা পুঠি ছিল না। তাঁতাৰ চিন্তেৰ মনো ভাৰতেৰ একটি মানসী মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত ছিল। সেই মণিটি ভাৰতেৰই সনাতন বাণীৰ উপকৰণে নিমিত্ত। সেই বাণীৰ সতিত তাঁতাৰ নিজেৰ মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁতাৰ সেই অদেশ প্ৰীতিৰ মনো ৰাজগেৰ জ্ঞানগাঙ্কীৰ্য ও ক্ষত্ৰিয়েৰ তেজস্বিতা

একত্র সংহত হইয়াছিল।' (রামেন্দ্রসুন্দর/বাল্মীকী) স্বাধীনতার এই অভিমতটি বিশ্লেষণ করলে, রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তাঁর উপলব্ধির স্বকীয়তা, ঐতিহ্যবাদী অনুভূতির সঙ্গে নিজস্ব চেতনায় সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভাবাত্মক দৃষ্টিকোণ। আচার্য জ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : 'তাঁহার ভারত, বাণ্যীকি বুদ্ধের ভারত যে কালের পক্ষে লুপ্তিত হইল, এই যন্ত্রণাতেই তিনি ছট্‌কট্‌ করিতেন। স্বদেশের সেবা তিনি ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার অবস্থা অসুখসেবায় প্রবলী নির্দিষ্ট হইল।' (রামেন্দ্র সুন্দর/বাল্মীকী)

যদিও রামেন্দ্রসুন্দর জীবনের সূচক ধ্যানগভীর চিন্তনভূমিতে বিচরণ কালে পছন্দ করতেন তবু ঐ স্বদেশপ্রাণতার তাগিদেই তিনি সমসাময়িক জীবনের কোলাহল, চাকলা, আবেগ ও উত্তেজনাকে বরণ করিয়াছিলেন। মাহুকের স্বভাবের ছোটো দিক, একটি প্রেরণার, অপরটি প্রয়োজনের। মনীষীচরিতে দেখা যায় যে যুগের প্রয়োজনে, স্বভাবের এই দুই বিপলীত উপাদান এক সংহত ও সমঞ্জস ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের নিঃসন্দেহ জ্ঞানচাষিতার প্রবণতার সঙ্গে যে কর্মযোগের সমন্বয় ঘটেছিল তা এই সূত্রেই বিশ্লেষণ। রামেন্দ্রসুন্দর পরাদীন দেশের পটভূমিতে দেখেছিলেন এক জীবন্ত সমাজ (living society)-কে কারণ রাজনৈতিক অদীনতা; সবেও ঐ সমাজে জীবনের লক্ষণ ও ধর্ম পরিষ্কৃত ছিল। জীবনের কাষপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবের স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করবার চেষ্টা কালে, আর জীব কখন সন্ধি, অথবা বিরোধ অথবা সামঞ্জস্যের দ্বারা আপন স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম করছে। 'এই অবিরাম চেষ্টাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। এই চেষ্টা যাহার যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, জীবনসংগ্রামে সেই ততটা জিতিয়াছে।' (বিচিত্র প্রসঙ্গ) ভারতবর্ষের অভিব্যক্তিবাদের নিরিখে সমসাময়িক সমাজজীবন পর্যালোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও প্রতীকী সংস্কৃতির পারিপার্শ্বিক ভাবত্বের ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবনবাদ ও যুগাকংকার স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করতে অগ্রসর, এবং তা প্রতিহত করে আপন অস্তিত্বের প্রতিরক্ষায় ভারতীয় সমাজ ও সচেতন? অতএব এই জীবন্ত সমাজের জীবনসংগ্রামের মূল ধারাত্রেত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। স্বপ্ন-মনন ও অনুধ্যানের

শাস্ত্র সমাহিত স্বকল্পে অবস্থান করেই যিনি তাঁর অর্জবীক আকাংক্ষার পরিচূড়িত
পেতে পারতেন, একটি যুগধর্মের প্রয়োজন তাঁকে মানতে হোল বলেই, অতঃপর
তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হলেন। জাতীয় আশা আকাংক্ষার পরিণাম
বিধানে এই চিন্তা আনিবার্যও ছিল। এ বাপারে বামেন্দ্রচন্দ্র ও বনীন্দ্রনাথ
একগোত্রীয়, লমকালীন রাজনীতিতে এঁরা সংগঠক নন, ভাবুক, পথে আন্দোল-
ন করা নয়, আন্দোলনের পথ দেখানোই এঁদের কাজ। বাতিক্রম যে
ঘটেনি, তা নয়, যেমন বঙ্গবাবুজ্ঞেদের পর্বে, তবে তা মূল পিছাত্তকেই
প্রমাণ করে।

সমসাময়িক কাল ও অব্যবহিতপূর্ব অতীতের কিছু ঘটনা এই প্রসঙ্গে
স্বরণীয়, কেননা ঘটনা সমাহিত কালখণ্ডই যে কোন চিন্তাশূন্যতার একটি প্রধান
উপাদান। বামেন্দ্রচন্দ্রের জন্মের ঠিক সাত বছর আগে ঘটেছিল শিশাহী
বিদ্রোহ, 'হিন্দু প্যাটিট্রিট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র যুগোপাধ্যায় যাকে বলে-
ছিলেন 'মহাপ্রব'। ১৮৭২-৭৩তে বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহ, আসামে কৃষক
বিদ্রোহ পাজাবে কুকা বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এইসব ঘটনায় ভারত-
বাসী লম্বন্ধ আন্দোলনের মূলা ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন। তদু অসংগঠিত
বিদ্রোহ নয়, অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত মননকে সচেতনভাবে প্রয়োগের জন্তও
ভারতীয় মনীষা সচেত্রে হয়ে উঠলেন। ১৮৬০-এ দানবন্ধু মজুমদার লেখা 'নীল-
দর্পণ' ন্যটকের প্রকাশ, 'হিন্দু প্যাটিট্রিটের' নিষ্ঠীক সাংবাদিকতা, ১৮৬১ তে
মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক 'জাতীয় গোবর্গ সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা,
১৮৬৭ তে নবগোপাল মিত্র, জোতিব্রজনাথ ও গণেশনাথ ঠাকুরের সহায়তায়
কলকাতায় 'হিন্দু মেলা'-র প্রতিষ্ঠা, ১৮৭৫-এ রাজনৈতিক ত্রেকার সন্ধানে
শিলির কুমার ঘোষের স্বারা 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপনা, ১৮৭৫-এ স্বরেন্দ্রনাথ শিবনাথ
ইত্যাদির প্রচেষ্টায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্ম, ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার
আবির্ভাব, ভূদেব-বাক্য প্রমুখের স্বদেশচিন্তার প্রকাশ, এবং সর্বশেষ ১৮৮৫তে
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা মূলত ভারতবাসীর তৎকালীন বৈপ্লবিক
আশা-আকাংক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়
বামেন্দ্রচন্দ্রের বয়স একশ বছর ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয়
কংগ্রেসের উন্মেষযুগ। এট পর্বের কয়েকটি প্রধান ঘটনা, ১৮৯৯-এ ভারত
বিদ্রোহী লর্ড কার্জনের ভারতের শাসনভার গ্রহণ, ১৯০১ এ ইউনিভার্সিটি
কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি বিল প্রণয়ন, ১৯০৩ এ দিল্লীর দরবার, ১৯০৩-এর

৩০৭ ডিসেম্বর কালকটী গেজেটে বঙ্গভঙ্গের স্বীকারী প্রস্তাব প্রকাশ, ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা, ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রচন্দ্রের পরিকল্পনায় যথাক্রমে রাণীবন্ধন অরক্ষন ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাচর্চান, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বয়কটের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ১৯০৬-এ মুশলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন ইত্যাদি। ‘A case for India’ গ্রন্থে উইল ডুরান্ট ঠিকই লিখেছেন ‘It was in 1905, then, that the Indian Revolution began।’ এই পর্বে আরও কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, যেমন ১৯১৪-তে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ২২১২-এ জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ, এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯১৭ তে চম্পারণ-সত্যাগ্রহ। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনাবলি পটভূমিতে রামেন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ বিচার্য, কেননা ১৮৬৪তে তাঁর জন্ম এবং ১৯১৯-এ মৃত্যু।

ভারতবর্ষের জাতীয় চর্চনা ও সর্ববিধ অব্যবস্থার জন্ত যে দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতাই প্রধানত দায়ী, এই বিশ্বাসে রামেন্দ্রচন্দ্রের আস্থাবান ছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের পরাধীনতা কেন এবং অস্বাস্থ্য জাতের তুলনায় ভারতীয় জীবনতন্ত্রের প্রকৃতি পার্থক্য কোথায়, এই প্রশ্নগুলির মীমাংসায় তিনি অংপর হয়েছিলেন। মীমাংসার পথে রামেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চেতনাপুষ্ট। বিশেষ ইতিহাস ও রাজনীতি-এ বৈচিত্র্যিতার সঙ্গে দর্শনের অন্তর্-চারিতার সংযোগ সিদ্ধ হয়েছিল বলে এ-বাংলায় তাঁর মীমাংসায় উপায় ও পারণায় স্বচ্ছ ও গভীর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা যে উ-বেজ্ঞ অ-মলের বহু পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল, তা দর্শে নিয়েই তিনি পরাধীনতার প্রশ্নটির বিচার করেছেন। জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অধোগতি ছাড়া যে পরাধীনতা ঘটে না, তা দুঃখেই সজেই তিনি স্বীকার করেছেন। তবে পরা-ধীনতার কারণ হিসেবে দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের প্রচলিত মতের সঙ্গে তিনি একমত হননি। ব্রাহ্মণ্যই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দশার মূল, এই মতকে খণ্ডন করে তিনি দেখালেন ভারতীয় স্বভাব ও জীবন স্বাতন্ত্র্যই পরাধীনতার মূলে। এই স্বাতন্ত্র্যের তিনটি প্রধান লক্ষণ হোল :

ক ভারতীয় প্রজাণ রাজনৈতিক চেতনার অভাব। ভারতবাসীর কাছে রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা নৈ-নগিক উৎ-পাতের মতো। সম্পূর্ণ দৈব-নির্দিষ্ট ঘটনা। দৈব উৎপাত বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় মানসে যেন এক সিদ্ধ বাপার।

মাতৃষেব পক্ষে তার প্রতিবিধান সম্পূর্ণ অসম্ভব। ‘যাহাকে আধুনিক ভারত-রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারত-বাসীর সেই জীবনটা একেবারে নাই।’ (পরাধীনতা)

খ ভারতীয় দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। সম্ভবত অস্তরঙ্গ জীবনচর্চায় নৃত্তে ভারতবাসী চিরদিনই বহির্জীবন সম্বন্ধে অনাগ্রহী। নানান খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ভারতবাসী আলমুদ্র হিমাচল ভারতভূমিকে রাজনৈতিক অর্থে স্বদেশ বলে প্রাচীন কালে গ্রহণ করতে পারেনি। ‘আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম, আত্মীয়, অস্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই এলয়া বিধর্মী আসিয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙালির মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙালি বিধর্মীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?’ (পরাধীনতা) ভারতগণের ঐশ কোটি মাতৃষেব অধিকাংশই শুধু সেকালে কেন, রামেন্দ্রহৃদয়ের কালেও জানত না যে তারা ভারতবাসী। অবশ্য রামেন্দ্রহৃদয় যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছিলেন ভারতীয় চরিত্রে এই অভাব চারুজগত নয়, জ্ঞানগত।

গ রাষ্ট্রশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে অনৈক্য। অতীত ভারতে রাজা ও প্রজার সম্পর্কটি ছিল লাপেক নয়, নিরপেক্ষ। বহির্শক্তির আক্রমণের সময় দেশীয় রাজশক্তির পিছনে প্রজাশক্তির ব্যাপক সমর্থনের দৃষ্টান্ত অগ্নিদেগের ইতিহাসে থাকলেও, ভারতীয় ইতিহাসে নেই ‘আমাদের দেশের ইতিহাস অগ্নিকণ। এখানে রাজনৈতিক প্রপ্লবের সময় প্রজা নিবিকারচিত্ত’

ঘ পরনির্ভরতা ও অস্বত্বন্দ। এত লক্ষণটি প্রাচীন নয়, সমকালীন ভারতবর্ষের। তাঁর সময়ের ভারতীয় জীবন বিশ্লেষণ করে, রামেন্দ্রহৃদয়ের মনে হয়েছিল ‘আমাদের অস্বা কতকটা হট্‌হাউসের চারার মতো।’ (সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার)। ভারতীয় চারেরের মেট্রিপদগতি তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল, তা হোল, শক্তি, অগ্রগতি, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাবে সব কাজেই বজাতিগ বিকলতা এবং ফলত অস্বত্বন্দ। ‘আমাদের অস্বাশ্রয় গোথলে মহাশয় বিধিবিভক্তি হইয়া রাজ্যের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাতিক্ষা করিলেন, অস্বা তাঁহাকেও কপুরুষতার জগা দিষ্টাব দিলাম, অস্বা প্রত্যেকেই এক-একটা বাগদাদার তিলক।’ (সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার)

ভারতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের এই মূল্যায়নে রামেন্দ্রহৃদয় ইতিহাস ও অভিজ্ঞতানির্ভর, এবং হ্রস্ব অভিনবও নন। কিন্তু অন্তনবহু সেখানেই, যখন

তিনি তাঁর দার্শনিকবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জীবন-তত্ত্বের ভূগনাক্রমে যে, ইউরোপের প্রজা চিরকাল পরাধীন এবং ভারতের প্রজা স্বাধীন। তাঁর যুক্তিটি ছিল : 'পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্য বা মুসলমানের রাজ্য, কি খ্রীষ্টানের রাজ্য বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্য জীবনের কতখানি রাজার অনীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন, জীবনের কতগুলো কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলো কাজেই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে দেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীদের অপেক্ষাও আধিকতর স্বাভাব্য সম্ভোগ করিয়াছে।' (পরাধীনতা)

প্রাচীন ভারতবাসী সম্বন্ধে একথা বলা সম্ভব হলেও সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতরূপ অভিমত পোষণ করা রামেন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ ভারতীয় জীবনতত্ত্বের ভূগাগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করে ছিলেন এবং ভারতীয় আশা আকাংক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্র বাস্তবের কোন মানসিক ঐক্য ছিল না। সুতরাং ভারতীয় সমাজতত্ত্বের অস্তিত্বের জগৎ নতুন রাজ-নৈতিক পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং এজন্যই অগ্ৰান্ত ভারতীয় নেতার মতোই রামেন্দ্রচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন সম্ভবতঃ এরকম : 'What light is to the eyes — what air is to the lungs — what love is to the heart, liberty is to the soul of man.' (Progress/Ingersoll)। কিন্তু মণীষীর স্বপ্ন সবসময় যুক্তিনিষ্ঠ, অস্বাভাব্য ভূমিতে লগ্ন থেকেই তা ভবিষ্যৎ-সম্ভব। তাই যুগকে বুঝেই রামেন্দ্রচন্দ্র যুগধর্মকে চিহ্নিত করলেন।

ধর্ম তথা যুগধর্মের প্রত্যয়ে রামেন্দ্রচন্দ্র একসময়ে বিশ্বাসকেই বিশদ করে-ছিলেন। 'ধর্মো বন্ধতি বন্ধিতঃ'। ধর্ম মানবজীবনকে বন্ধা করে। অতঃপর ধর্ম বান্ধি, বংশ, সমাজ ও দেশজীবনকেও বন্ধা করে। বন্ধিম উপলব্ধি ধর্মের এই অর্থটিকে রামেন্দ্রচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম মানে 'বিলিঙ্কন' নয়। যা ধরে রাখে, তাই ধর্ম। ধর্মের বিশ্ববিশিষ্ট ঐতিহ্য-অমূল্যতা ও যুগসংস্কারের উপাদাননির্ভর। তাই বন্ধিম শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের যুগধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম-বিধায়ক যুক্তিকে। রামেন্দ্রচন্দ্রও বুঝেছিলেন নতুন যুগধর্মকে, যা

জাতীয় আশা-আকাংক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে, জাতিকে ধরে রাখবে, জাতির পুষ্টি ও ক্ষুতির কারণ হবে। তিনি বুঝেছিলেন স্বাধীনতার আকাংক্ষা অক্ষুণ্ণ হলে তা ক্রমশই মহীকুহের রূপ ধরবে। তাই তিনি বললেন রাষ্ট্র ও নেশনই যেহেতু বিশ শতকের যুগধর্ম, অতএব তা ভারতবর্ষেরও যুগধর্ম। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ছাড়া যেহেতু রাষ্ট্র ও নেশন গঠিত হ'তে পারে না, তাই বোকা গেল রামেন্দুসুন্দর চেয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সব উপাদানগুলির পূর্ণতায় ভারত-ভূমিতে রাষ্ট্র ও নেশনের শরীর অভিযুক্ত হোক।

রাষ্ট্র ও নেশন সংক্ষেপে তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের দাবী: সিংহ, কারণ উভয়েই এবিষয়ে একদর্শনের পাতায় আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দুসুন্দর তাঁদের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রেনোঁর অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। রেনোঁর অভিমতকে হুক্তবাক্য হিসাবে গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানসপদার্থ।' (আত্মশক্তি ও সমুচ্চ)। রামেন্দু-সুন্দর গ্রহণ করেছেন শুধু রেনোঁর নয়, অধ্যাপক সিলির একটি অভিমত : 'ভারতবর্ষে নেশন নাই, কিন্তু এমন নীজ ত্বরিত আছে, যাহা হঠাৎ কালে নেশন অক্ষুণ্ণ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে।' (রাষ্ট্র ও নেশন) ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলি এক রাজনৈতিক অধিকারভূক্ত হয়েছিল। ভারতীয় মনে যে রাজনৈতিক একত্বের দাবী: এ-যাবৎকাল অচূপস্থিত ছিল, তাও ক্রমশঃ যে অপসৃত হয়ে রাজনৈতিক বৈকল্য জাতিত্বের রূপ নেবার জন্য অগসর চড়ছিল, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু নেশনের জন্য ক্ষুদ্রত্বপূর্ণ উপাদান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির পারস্পরিক বন্ধনের দৃষ্টিতে, তা ছিল কখনকার ভারতবর্ষে অচূপস্থিত। রামেন্দুসুন্দর 'রাষ্ট্র ও নেশন' প্রবন্ধে এই টঙ্কিত রাখলেন, ভারতবর্ষে নেশনের পূর্ণাবয়ব মুক্তি অবশ্যই সম্ভব হবে।

বিদেশী রাজশক্তি সংস্ক কোন মুক্ত প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। ফলে ১৩১৪ শ্রাবণ মাসে, 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক প্রবন্ধটির সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় উত্তেজনার ব্যাপাওটিকে ঠিক অচুমোদন করিতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল উত্তেজনা আন্দোলনের পথ ভেঙে স্বদেশবাসীর গঠন-মূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করা উচিত। রামেন্দুসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেই লিখেছিলেন : 'উত্তেজনার বশে আমরা ভুট বংশের ধরিয়া উত্তরেজের অচুগ্রহ লইব না, উত্তরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লোকালাপিক

করিয়া আসিতেছি ; এবং ইংরেজ রাজা যখন সেট লাক্ষালাফিতে দৈর্ঘ্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আফালনের নিফলতা দর্শনে বাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—
 ‘ও পথে চলিলে হইবে না। মাতামাতি লাক্ষালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।’ (ব্যাখি ও প্রতিকার) এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রশঙ্করের অভি-
 মত শুদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। প্রথমত তিনি বললেন বস্তুতঃ আন্দোলনের আবেগ-
 উদ্বেগনা নিরর্থক নয়, কেননা এর মাধ্যমে দেশের নেশন হবার আকাংক্ষা
 আভ্যন্তরীণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত ‘কর্ম প্রেরক জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে,
 কর্ম প্রেরণ করে ভাব।’ স্বদেশী আন্দোলন ভাব উদ্বোধনের উপায়। তৃতীয়ত,
 কর্ম শুধু ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, অবস্থাসাপেক্ষও বটে। গঠনমূলক কাজের জন্ত
 প্রয়োজন কাজ করার স্বাধীনতা। দেশের রাজনৈতিক চরিত্র তার অতুল
 ছিল না। তাই তিনি বললেন, যাকে স্বায়ত্বশাসন বলা হয়, আসলে তা
 ইংরেজ রাজার আরও শাসন। সর্বোত্তমভাবে পরিত্রা একটি জাতি কখনও
 স্ব-তন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না। আশুতোষ চৌধুরী নির্দেশিত রাজনীতি
 চর্চার পথ পারটার করে, স্বদেশের হিতকর্ম সাধনের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে
 তিনি প্রশ্ন করলেন ‘যতদিন ইংরেজের বাণিজ্য নীতির পশ্চাতে ইংরেজের
 বেয়নেট থাকবে, ততদিন অনেকে স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু?’
 (ব্যাখি ও প্রতিকার)

স্বদেশচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর জন্ত গতিশীল নেতৃত্ব, গণসংযোগ ও
 কর্মযোগে যে অপরিহার্য, তা রামেন্দ্রশঙ্কর বলেছেন। তিনি মনে করতেন,
 কর্মযোগের মাধ্যমেই ভারতবাসীর মনে স্বদেশ নামক কাল্পনিক বস্তুটি সৃষ্টিপ
 ধারণ করবে। কর্ম কি ধরনের হবে, তা অবশ্য নির্ভর করবে কর্মীর সাধ্য ও
 প্রবণতার উপর। যেমন তিনি নিজে সাহিত্য কর্মক্ষেত্রে দেশ উপলক্ষের উপায়
 হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কর্মের জন্ত আরও প্রয়োজন শক্তিসকল। দেশীয়
 অবস্থার পরিশ্রেক্ষিতে তাঁই তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথাটিকে গ্রহণীয় বলে
 মনে করেছিলেন। ভূদেব বলেছিলেন, দেশজননীর পূজায় নাংলোর জন্ত
 প্রয়োজন কর্মনীতি অবলম্বন। অর্থাৎ যতদিন ভারতীয়েরা দুর্বল, ততদিন
 কাজের খোঁজার মতো পঠ শক্ত করে, সেই খোঁজার আড়ালে ভারতবাসীকে
 শক্ত সক্ষম করতে হবে।

রাজনৈতিক-অর্থে ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে তাঁর বারংবার ‘চল উদ্যম ও

সংস্কারযুক্ত। বঙ্কিমের অংশে প্রভাবের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে স্বাদেশিকতার
 প্রাণরস আকর্ষণ পান করেও তিনি ছিলেন বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক অগ্রসর।
 বঙ্কিম চেয়েছিলেন হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন
 ধর্ম-ভাষা-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তা। ক্রীতি-
 হাসিক সূত্রে প্রয়োগ করে তিনি দেখাছিলেন, মুসলমান এদেশের রাজ
 সিংহাসনে দীর্ঘকাল ধরে আসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা অত্যাচারী
 কিন্তু মোটের উপর তাঁরা হিন্দুর সমাজ-তন্ত্রকে তেমন বিনষ্ট করেননি। ক্রমশ
 মুসলমানের অ-ভারতীয় উপাদান বিনষ্ট হয়েছে। ভারতভূমিকে তাঁরা জননী
 হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজন কেবল রাজনৈতিক ঐক্য ও সংখ্যা, এবং
 তা সম্ভব কারণ, 'ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পুরকে যেমন আপন
 করিতে জানে, তেমন পৃথিবীর আর কোনও জাতি জানে না।' (বাস্তি ও
 প্রতিকার)

সর্বশেষ, রাজনৈতিক উপায় সম্বন্ধে রামেন্দ্র ১৩। সমকালীন রাজনৈতিক
 আন্দোলনের সঙ্গীসাদী দাবিকে রামেন্দ্রসুন্দর সমর্থন করেননি। 'স্বদেশী
 আন্দোলন যখন গুপ্ত নরততার শোভিতে কলুষিত হওয়া গড়ে, তখন তিনি
 বড়ই আক্ষেপের সচিৎ বলিয়াছিলেন : 'এই পাপে আমাদের এই আন্দোলন
 পণ্ড হইবে, গবর্ণমেন্ট কর্তার হস্তে উহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইবে।'
 (রামেন্দ্রসুন্দর/বাজপেয়ী) বঙ্গ বিভাগের সময় রামেন্দ্রসুন্দর যেভাবে আন্দো-
 লনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ রাণীবন্দন, অরক্ষন ও বঙ্গলক্ষ্মীব্রত উদ্-
 যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে, এবং বঙ্গ ব্যবচ্ছেদরোধ করার জন্য বয়কট ও অসহ-
 যোগী পত্রকে যেভাবে তিনি সমর্থন করেছিলেন, তাতে এই দাবিনাট তয় যে,
 গান্ধী প্রবর্তিত ভারতীয় ক্রীতিসমাপ্তি, সংঘত আত্মসাদনার রাজনৈতিক পথটাই
 তাঁর চিন্তার সর্গোদ্ভূত, যদিও অস্বাভাবিক নৈসর্গিক পূর্ণায়ত প্রকাশের পূর্বেই
 রামেন্দ্রসুন্দরের ইচ্ছা ছিল।

[ছোঁনাচ এক ধরনের মুখোশ নৃত্য। Merchant of Venice এ যে MASQUE DANCE-এর উল্লেখ দেখা যায় তা প্রকৃতিতে ও মেজাজে ছোঁ-নাচ থেকে ভিন্ন। তবে Milton-এর COMUS বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও মেজাজের high seriousness-এর জন্তে ছোঁ-নাচের সঙ্গে তুলিত হবার যে গা। বহু যুগ ধরে সীমাস্থ বাংলার, বিশেষত পুন্ডলিয়ায় ও উড়িষ্যার কোনো কোনো অঞ্চলে, প্রদানত আদিবাসীদের মধ্যে এষ্ট অনাড়ম্বর নৃত্যকলার অতুলন ও অতুলন চলে আসছে। 'ছোঁ' শব্দটা 'ছাউনি' (অর্থাৎ সৈন্তাশিবির, থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। 'ছায়া' শব্দ থেকে এসেছে মনে করাটা নেহাৎ ই কষ্টকল্পনা। ছোঁ-নাচ তাই সৈন্তাশিবিরে সৈন্তদের দ্বারা অতুলিত নৃত্য। প্রাচীনকালে রাজাদের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সৈন্তদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে শিবিরে শিবিরে এই বীরবসায়ক নৃত্যের ব্যবস্থা করা হতো। কালক্রমে শিবিরের কাঁটাতার চিঁড়ে এ নাচ জনপদের মূলেয় নেমে এসে জনপদবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেলো। যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির পরিবর্তে এখন থেকে এর লক্ষ্য হলো সারাদিনের পরিশ্রমে অবসর ক্রিয়াজীবী সাধারণ মানুষকে সজ্জা-বেলায় আবার একটু আগিয়ে তোলা, আত্মশক্তিতে উদ্ভূত করা, বিস্তৃত আনন্দ দেওয়া। গ্রামীন এই নাচের উপকরণ সামান্যই ছিলো এতোদিন। স্থানীয় লতাপাতা আর মুখোশ। সম্প্রতি সভ্যতার অনিবার্য আলোকস্পর্শে পোশাকে-আশাকে এবং মুখোশের কারুকাজে বেশ একটু জৌলুশ দেখা দিয়েছে। এর বাজনা পুন সামান্য হলেও যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টিতে এর অবদান অসামান্য। ঝাম্পা, দুটো ঢোল আর সানাই, আর থেকে থেকে সমবেত কর্তার 'কুলকুলি'। রূপায়নের বিষয়বস্তু গ্রামায়ন মতাভারত আর বিভিন্ন পুরাণের খণ্ড খণ্ড উপাখ্যান। আজও এও শুঁ পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করে থাকে। মেয়েদের ভূমিকায় চলায় পুরুষেরাই। অবশ্য শহরের মেয়েরা আজ যখন ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু খেলছে তখন তাদের সংক্রামক প্রভাবের বশে পাবে অল্প ভবিষ্যতে একাদিন আদিবাসী ক্রিয়ক বধূবাও এষ্ট বীর-বসায়ক তাণ্ডব নৃত্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে একে আরও বর্ণাঢ্য করে তুলবে কি না? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্মুখে শুদ্ধস্বায় নববলে বলীয়ান এই নাচের একটি দল কিছুদিন আগে বিজয়ীর মহাদয় লাভান আর আমেরিকা ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সে মর্যাদার আভ্যন্তরীণ উদ্ভাসিত হয় না ওদের দৈনন্দিন জ্ঞান পারম্পরিক জীবন।

সম্প্রতি কান্দি মহকুমা শহরে শ্রীউদয় ভাট্টার উদ্যোগে ও শ্রীমান পুণকেন্দ্র সিংহের প্রশংসনীয় তৎপরতায় আয়োজিত এবং অধ্যাপক সনৎ মিত্তের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীকলেবর কুমারের প্রশিক্ষণায় পুৰুলিয়া থেকে আগত একটি দলের ছো-নাচের দৃষ্ট অগ্রস্থান দেখে এসে 'চেতনিক'-এ এ বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মানিকবাবু কাছ থেকে প্রবন্ধটি এসে পৌঁছলো এবং তাঁরই ইচ্ছাক্রমে এই ভূমিকাটুকু লিখে দিলাম। তবে এটি প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। সেদিন কান্দির অগ্রস্থানে প্রায়ত্তিক বক্তৃতায় অধ্যাপক সনৎ 'মন্ত্রকে বলতে শুনেছি যে: 'অন্তঃকরণে ছো-নাচের আবদ্ধতা।' কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা তা আমার পার্শ্ববর্তী দুইজন বিশিষ্ট দর্শককে দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলাম। আমার বক্তৃতা, ছো-নাচের কথা আমি প্রথম জানতে পারি সম্ভবত ১৩৪৫-৪৬ এর 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হীরেন্দ্রনাথায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মুমূর্ষু পৃথিবী' নামের উপন্যাসে।

-- সম্পাদক চেতনিক]

বাংলার ছো-শিল্পীদের আর্থিক জীবন

মানিক সরকার

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানায় পুৰুলিয়া জেলা। বাধমুণ্ডি এ জেলার অঙ্গতম পান। এ পানার একটি গ্রাম মাঠা। মাঠা গ্রামের পূবে অযোদ্যা পাহাড়, পশ্চিমে উঁচু-নীচু কৃষি ক্ষেত্র, উত্তরে দক্ষিণে ছোট ছোট গ্রাম, তাতে জনবসতি কম। বাধমুণ্ডি, মাঠা ও অযোদ্যা এ তিনটে নামেই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাচীন দারার চিহ্নাংশ রয়েছে। বর্তমানে কেউই আর স্বতন্ত্র নয়, তিনে মিলে যেন এক।

এটা বন'ফল আবার কৃষি অঞ্চলও বটে সভ্যতায় বনচারী এবং কৃষিজীবী দুটি সম্প্রদায়। বহু ক্ষেত্রে এ দুটি পর্বের জীবনচারণ পাশাপাশি হয়ে এসেছে, অস্পষ্টঃ প্রাচ্যের দেশগুলিতে এটা আছে। মাঠার একটি বন, অপরদিকে কৃষি ক্ষেত্র মিলেমিশে আছে। যে ম'তুষ বনে বনে ক'ঠ কাটে, পাতা কুড়ায়, বনের ফলমূল খায়, তা'রাই আবার জমিতে লাঙল চালায়, বীজ ছড়ায় পান

কাটে। এখন আবার এবাই পাকা লড়ক ধরে পুকলিয়া জেলা শহরে আসে। সহাবস্থানের, প্রাচীন ও অর্বাচীন মিলন-বিবোধের এ এক সুন্দর নিদর্শন। কুড়ে ঘরে বাস, জলভাতে উদ্ভব ভর্তি, অস্থখ বিস্থখে তুকতাক জলপড়া, অন্যত্র শীর্ণকার দেহ নিয়ে তাদের কেউ কেউ সিনেমাও দেখে। একদিকে প্রাচীন জীবনের বেশ অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান—সিনেমা, উভয়ই এখানে অবস্থান করছে।

মঠের একটা বাংলা আছে। তারকাটা ঘেঁষা বাংলার মধ্যে ক'বছর ধরে ছৌ-নাচের উৎসব হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতিবিদ্, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, সঙ্গীত-নাটক-একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এ উৎসব হয়। এটা একটা বাৎসরিক অহুষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পুকলিয়ার সংস্কৃতিকরণের এ একটি অমূল্য আশীর্বাদ। ছৌ নাচ বিশ্ব-নগদাবায় উপস্থিত হয়েছে। ছৌ-নাচ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সম্পদ, বাংলার সম্পদ, ভারতের সম্পদ, বিশ্বসম্পদ। এ সম্পদের পুনরুদ্ধারে স্বাধীনতা, অর্জনের অগ্রগতি গঠিত হয়, লোক সংস্কৃতির চর্চাকে অভিনন্দিত করতে হয়, ডঃ ভট্টাচার্যের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক সম্পদ এখনও অজ্ঞাত রয়েছে, বিকৃত হয়েছে নয়তো অবহেলার মতো পড়ে থেকে পলে পলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অবলুপ্ত হয়েছে অথবা অবলুপ্তের পথে চলছে। এগুলি রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুপদম দত্ত, বামেন্দ্রচন্দ্র রিবেদী, সাহিত্য বিশারদ কারিম সাহেব প্রমুখ গুণী ব্যক্তরা একবার দৃষ্টি দিচ্ছেলেন, বড় কিছু উদ্ধার হয়েছিল। তারপর একটা ভাঁটার টান এসেছিল। স্বাধীনতার পর ভাঁটার টান নেই ঠিকই, কিন্তু জোয়ারও নেই। তবে একেবারে যে কিছু হচ্ছে না তা নয়। হচ্ছে, তা আশাহুরূপ নয়। এই তো ছৌয়ের পর নাচনী নাচ, সুম্বর গান, নাটুয়া নাচ ইত্যাদি নিয়ে ব্যক্তিগত উৎসাহে বেশ কিছু কাজ চলছে। যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অনেকেই স্বীকৃতি পাচ্ছেন না, সহায়তা পাচ্ছেন না, বিঘ্নটা ঘটছে এখানেই।

গ্রাম বাংলায় বেশ কিছু কর্মী নিঃসার্থক ভাবেই কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের অনেকের শিক্ষাগুরুত্বাঙ্গের অভাব রয়েছে, তাঁদের কাছে কাজেব-পরিপ্রেক্ষিত অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না, আবার কেউ কেউ কিছু কাজ করেই অর্থের মোহে দেড়ে মরছেন, কেউবা নামের মোহে হস্তে হয়ে উঠছেন,

‘মৌলিকতার’ মোহ কয়েকজনকে পেয়ে বসেছে। কিছু করলেই তাঁরা ‘মৌলিকতার’ দাবি করে বলেন, তার জন্তে আবার ‘মাদুলি’ ধারণ অর্থাৎ পার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে বের হন।

যাক ও সব কথা। ও তো কোভের প্রকাশ, পুস্তকিয়ার ছো-নাচ চৈত্র-সংক্রান্তির পরে আরম্ভ হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির সঙ্গে এর যেন কোথায় একটা যোগসূত্র আছে। ছো নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হচ্ছে, দেশের আলোচকদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্গত বিজ্ঞ দাসগুপ্ত, ডঃ হুমায়ুন কবীর, এই প্রবন্ধকার, ডঃ হুমায়ুন বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎ মিত্র, শ্রীঅজিত মিত্র প্রমুখ রয়েছেন। এ ছাড়াও ডঃ ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ছো শিল্পীদের আর্থিক সামাজিক জীবন নিয়ে কোন মূল্যবান তথ্যনির্ভর আলোচনা এ প্রবন্ধকারের চোখে পড়েনি। অথচ এটার প্রয়োজন আছে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর্থিক বনিয়াদের উপরেই চলমান সমাজটি দাঁড়িয়ে আছে। বনিয়াদ সৌন্দর্যে ধরে রাখা। আমরা সৌন্দর্য, বনিয়াদ লক্ষ্য করনা, এই দেখা অর্থ দেখা, পুঞ্জ নয়।

ছো-নাচের শিল্পীদের আর্থিক জীবনের পরিচয়টা জানা এবং জানান প্রয়োজন। নাচের উন্নতির জগত তাদের আর্থিক জীবনের উন্নত অপরিহার্য। কাজটি বিনামূলি এবং একটি সামগ্রিক ও পরিচালিত কাজের এটি একটি অংশ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অংশ। এই বিশাল কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু ব্যক্তিগত উৎসাহে ১৯৭০ সালে একটা নতুন সমীক্ষার আর্থিক কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম, তাতে একটা চিত্র পেয়েছিলাম, যদিও আংশিক; কিন্তু বেশ ভয়ানক।

সমীক্ষার মধ্যে পুস্তকিয়ার বাধ্যতামূলক অঞ্চলের ১৫টি দল ছিল খাত্ত-অখাত্ত ১৫ জন ‘প্রসাদ’, ১২০ জন নৃত্য শিল্পী, ৭২ জন বাজায়ন্ত্রী।

দেখতে পেয়েছিলাম, শিল্পীদের আর্থিক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন, অনেকে সময় সময় অনাহারে থাকেন, অর্থাহারেরে আছেট। প্রায় সকলেরই খাবারাবে অপুষ্টি, ভয় স্বাস্থ্য। বাসস্থান বলতে গ্রাম অনেকট কুড়ে ঘরে বাস করেন, নাচের শিক্ষাকেন্দ্র গ্রাম বা ডের ট্রানকেই করে থাকেন।

কেউ কেউ চাষবাস, কেউ ছোট ব্যবসা, কেউ জনমজুরী, কেউ পরের বাড়িতে পেটে-ভাতে কাজ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন পুরো

বেকার, তাঁদের কোন আয় নেই।

তাঁদের বিজ্ঞানায়ের শিক্ষাগত মান অতি সামান্য। ২/১ জন বাদে সকলেরই শুণ্ড খাওয়া। পরনের বেশভূষাও সামান্য। অনেকেই জামার পরিবর্তে গেঞ্জি পরেন, কেউ বা তা-ও পান না। ভাল জামাকাপড় কারও পরনে দেখিনি। বিগত সাম্প্রতিক ও ঐপনিবেশিক এবং বর্তমান কালের পনতাত্ত্বিক শোষণের যেন এঁরা এক একটি জীবন্ত নিদর্শন।

তবু এঁরা ভাল নাচতে চান। এ এক অভূতপূর্ব নেশা। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও এ নাচকে গুঁরা ত্যাগ করেননি। অর্থাহায়ে, অনাহায়ে থেকেও নাচের আসরে আসেন, মুহূর্তে তায় শোকাবহ অনটনের মধ্যেও দল গড়েন, বায়না করেন, আসরে নাচেন। অর্থাৎ ছোঁচা এঁদের জীবন-সঙ্গী। সঙ্গী-বিচ্ছেদ গুঁরা পছন্দ করেন না।

এ থেকে কি আমরা কোন শিক্ষা নিতে পারি না? দারিদ্র্যকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া অপরাধ, তার বিক্ষেপে যত্ন করার সার্বিকতা আছে। কিন্তু দারিদ্র্যের দোহাট দিয়ে সাধনাকে পরিভ্রাণ করা চলে না। দারিদ্র্য বড় বিধ্ব। কিন্তু সেট বিধ্বের চেয়ে সাধনা আরও বড়। তাই সাধনা বিশেষ করে সাতিত্য সংস্কার কাজে যাঁরা অর্পের পেছনে ছোটেন, তাঁদের সাধনা ছোট সাধনা। এই ছোট সাধনা আজকাল শতরের অনেক 'বড়রাষ্ট' করে থাকেন। এটা ভাল নয়। নবীনরা এতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কলুষিত হচ্ছেন।

ছোঁ-সমীক্ষায় মোঁচরা পাঁশা গেছে না আঁশক, কিন্তু বড়ই মর্যাদিক। গ্রাম বাংলার দ্রুত আদিক পুনর্গঠন অর্থাৎ ক্রাশবাবস্থার আত্মল সংস্কার করে সামগ্রিক অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি-অর্থনীতির গনতাত্ত্বিক এবং সার্বিক পুনর্জাগরণ না হলে ছোঁ-নাচের অগ্রগতির ভবিষ্যৎ অশুভল বলেই সমাজ বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাংলার ছোঁ তাওবী নাচ। এ নাচে শুভ শক্তির প্রয়োজন, তেজের প্রয়োজন। সেই শক্তির শুভ আগমন হোক। *

* উল্লেখ্য:—‘পশ্চিমবঙ্গ’ ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১, ১২ই মে, ১৯৭২, ‘দর্শক’ ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৪, এবং ‘সামীক’-শিল্প দর্পন সংখ্যা ১৩৮২।

[জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামায়ণ—পূরণে ও বিজ্ঞানে' শীর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি যখন কয়েক মাস আগে সত্যনাথায়ন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কান্দী বান্ধন' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন সেগুলি পাঠকসমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বেশ কিছু স্বনামখ্যাত সুদী ব্যক্তি ও তাঁদের সময়বিমানে কৌতূহলোদ্দীপক মতামত পাঠান। কেউ বলেন অপদার্থ, কেউ বা বলেন অভিনব। পরগুলি ভবিষ্যতে চেতনিক-এ পত্রস্থ করার ইচ্ছা রইলো। আপাতত একটি মাত্র চিঠি তুলে দিচ্ছি। পত্রলেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞানকীর্তি গবেষক লেখক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অধ্যাপক শুচিব্রত সেনের মাধ্যমে এই সিরিজের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে এই পত্রটি পাঠান। তবে তার আগে সম্পাদক হিসেবে আমার মন্তব্যটা এখানেই বলে রাখি : আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। কাজেই এগুলি অপদার্থ বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার স্পর্শ আমার নেই। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে এদের মধ্যে অবশ্যই ভেবে দেখার মতো কিছু পদার্থ আছে। এবং আমরাই আগ্রহে জিতেন্দ্রনাথ, যিনি এ যাবৎ একটি অতুল্যশালী পাঠকপরিষদগুলোর কাছে একজন ক্লাসী ছোট গল্প লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, এত প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখে দিয়েছেন 'মা নিষাদ' নামে ৬৫ গনিকের পাঠকবর্গের জন্তে। সুদীপাঠকবৃন্দের অভিমত পেলে তিনি খুশি হবেন। প্রবন্ধগুলি শিগগির গ্রন্থাকারে বাজারে বের হবে। আগ্রহী পাঠকেরা লেখকের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।—সম্পাদক/চেতনিক

শান্তিনিকেতন

৮, ১১, ৭৫

মাক্তবধেয়,

ত্রিযুক্তশুচিত্রাবর চাতে গত ২২।২ তারিখে আপনার 'বিজ্ঞানময় শারদ চূর্ণা প্রতিমা', 'রামায়ণ—পূরণে ও বিজ্ঞানে' প্রবন্ধগুলি পেয়ে, অতি-নিবেশ সহকারে পড়ে, আপনাকে আমার বিশদ মতামত আপনার নতুন-পাড়া, কান্দীর ঠিকানায় গত ২৪।২ তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। কপি রেখেছিলাম। আপাতত হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাৎপৰ্যব্যাখ্যা অস্বাভাবিক ও যথার্থ। আপনার
রচনা পড়তে পড়তে দানিকৈনের কথা মনে পড়ে। বাঙালা সাহিত্যের
ভাণ্ডারে আপনি নতুন বস্তু দান করছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারির দিকে আমাদের আলোচনার বসলে ভাল হয়।
বর্তমানে বিস্তর কামেলায় আছি।

কুশল সংবাদ সমেত পুস্তকযোগ রাখলে আনন্দিত হবো। ইতি

ভবদীয়

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

[শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করকমলে]

মা নিষাদ

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির মুখনিঃসৃত প্রথম শ্লোক :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্রয়মমঃ শাস্তীঃ সমাঃ ।

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবদীঃ কামমোহিতম্ ॥

ক্রৌঞ্চদৃশ্য অবলোকনের আগে এবং প্রথম শ্লোক উদ্গীত হওয়ার পরে
বাল্মীকির জীবনে আরও দু'টি ঘটনা ঘটেছে, যা তাঁকে স্বামায়ণ রচনার উদ্বুদ্ধ
করেছে।

এই ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নর কে ?—একথা জানবার কৌতুহল জেগেছিল
বাল্মীকির মনে।

মহাবি নারদকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি স্বামকাহিনী ব্যক্ত করলেন।

নারদ বিদায় নিলে বাল্মীকি স্নানের অভিলାষে ‘গঙ্গার অদূরবর্তিনী তম্রস্রা
নদীতীরে উপস্থিত’ হয়ে হৃবিস্তীর্ণ বনের চারদিকে ভ্রমণ করতে করতে
“বিচরণশীল, আধিব্যাধিশূন্য, মনোহর শস্যমান ক্রৌঞ্চমিথুন” দেখতে
পেলেন।

হেনকালে এক নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পু-ক্রৌঞ্চকে নিহত করল।

‘তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্তভাবে স্বরভাসক্ত, বিহ্বতপক্ষ নিভানহচর তাত্রণীৰ্ঘ ঘিৰবর পতির বিয়োগ কাতরা হইয়া এবং তাহাকে নিহিত শোনিভাক্ত ও ভূমিতলে পুনঃ পুনঃ বিলুপ্তিত দেখিয়া করুণাবশে বিলাপ করিতে লাগিল।’

এই দৃশ্য দেখে বাঙ্গালীর হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব হ’ল। পরে তিনি দয়াগ্রন্থক এই কর্মকে পাপকর্ম নিশ্চয় করিয়া বাসকে বললেন, ‘মা নিষাদ’ অর্থাৎ যে নিষাদ! যেহেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্ অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না।’

এই কথা বলার পরমুহুর্তে বাঙ্গালীর মনে হল,—‘আমি এই শকুনের শোকে ক্রুর হইয়া ইহা কি বলিলাম।’

অতঃপর শিবাকে বললেন,—‘এই চতুস্পাদবন্ধ, প্রতি পাদে সমানাকর ও বীণালয়-সমন্বিত বাক্য, শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকট হউক, অন্তথা না হউক।’

অনান্তে আশ্রমে ফিরে যাওয়ার পর সেখানে ব্রজা উপস্থিত হলেন। ব্রজার সম্মুখে হৃদয়ানুগে বাঙ্গালী সেই শ্লোক গান করলে তিনি বললেন,—‘তোমার এই চতুস্পাদবন্ধ বাক্য শ্লোকট হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না...। এরূপ বাক্যেই তুমি ধর্মাত্মা দীপঙ্কি-সম্পন্ন লোকাভিচায়ক রামের সমস্ত বিনয়ণ বর্ণনা কর।’ অনন্তর বাঙ্গালী নিবেচনা করলেন যে সমুদয় রামায়ণ-কাব্য এরূপ করণ বসপূর্ণ শ্লোকে রচনা করবেন।

বাঙ্গালীর রামায়ণ রচনার এই পটভূমিকা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এবং পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন জাগে। যেমন,

প্রাচীন কাব্য-রীতি অনুসারে প্রথমে মঙ্গলাচরণ অবশ্যকর্তব্য। তবে কি প্রথম শ্লোকটি মঙ্গলাচরণ?

রাম-কাব্য রচনা করতে গিয়ে ক্রৌঞ্চমিথুন ঘটনার অবতারণা করার প্রয়োজন কি? সমগ্র কাব্যের করণ রসের প্রাধান্ত সূক্ষ্ম করে তুলবার জন্ত?

বীণা-লয় সমন্বিত বাক্য—এই, বক্তব্য কি সঙ্গীত-শাস্ত্রে প্রতি নির্দেশ করছে?

রাম-কাহিনীর প্রথম বক্তা নাহদ, সম্মতিদাতা ব্রজা, রচনাকর্তা বাঙ্গালী

আর প্রয়োগকর্তা লবকুশ । এতজনের সমাবেশ এটানোর কারণ কি ?

‘মা নিবাদ’ শ্লোকটির অর্থভেদ করলে পূর্বোক্ত তর্জমা ছাড়া ভিন্ন বক্তব্য আছে ।

মা = লক্ষ্মী নিবাদ, নিবদ, নিবদ = নিবাদবরঃ । অতএব নিবাদ = নিবদ অর্থ স্বামী ।

ক্রৌঞ্চ অর্থ বান্ধব বিশেষ ।

সুতরাং শ্লোকটির অর্থ : লক্ষ্মীপতি ! বান্ধব-দম্পতির কামমোহিত পুরুষ-জনকে বধ করে তুমি সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

এই অর্থ অমুসায়ে শ্লোকটিকে রাম-কাব্যের মঙ্গলাচরণ হিসাবে যেনে নেওয়া যায় । লক্ষ্মীপতি রাম এবং বান্ধব-দম্পতির পুরুষজন রাবণ ; কাম-মোহিত সীতার প্রতি । অর্থবোধ সহজ ।

কিন্তু নিগূঢ় অর্থও আছে । এই অর্থভেদের আগে বাল্মীকি প্রমুখ নামগুলির অর্থ জানা দরকার । কে এই বাল্মীকি ?

কুন্তিবাস এবং আশ্বাত্থ-রামায়ণে স্পষ্ট বলা আছে তিনি চাবন-পুত্র ; প্রথম জীবনে ব্রতাকর দহ্মা বলে পরিচিত ছিলেন । পরবর্তীকালে তপস্রা করে ঋষি বাল্মীকি হয়েছেন ।

বাল্মীকিরামায়ণ-এ তাঁকে প্রচেতস-নন্দন বলা হয়েছে ।

চাবন ভৃগু-সুত ; আর ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র । ভৃগু অর্থ পর্বতের সাহুদেশ ।

যা কিছু সহজাত তাকেই ব্রহ্মা বলা হয় । পর্বত পৃথিবীসৃষ্টিকালে প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত । অতএব পর্বতকে বলা হয়েছে ব্রহ্মা এবং তার সাহুদেশ মানসপুত্র ভৃগু ।

চাবন অর্থ ক্ষরণ ।

পর্বতের চাহুদেশ হতে যে জলস্রোত নেমে আসে তাকে বলা হয়েছে ভৃগুপুত্র চাবন । পর্বত ও তার সাহুদেশ চেতনাহীন ; কিন্তু গতিশীল জল-ধারাকে মনে হয় চেতনাসম্পন্ন । সুতরাং একে বলা হয়েছে প্রচেতস—উৎকৃষ্ট চেতনা যার ।

প্রচেতস বা চাবন অর্থাৎ জলস্রোত বহন করে আনে পলিমাটি, বালি ইত্যাদি । এই বাহিত পলিমাটি সাগরসঙ্গমে নদীমুখে নদীপ বা ভূখণ্ড সৃষ্টি করে ।

সমুদ্রের এক নাম বড়াকর; সাগরের জোয়ারভাটাকে বলা হয়েছে
দক্ষতা ।

একদা যা সমুদ্র নামিল, পরবর্তীকালে পলিমাটি জমে তাই ভূখণ্ডে
রূপান্তরিত হয় । বায়বীয় শক্তি বাল্বিক (উইটিবি) শব্দজাত । আবাহযোগা
পাললিক যুক্তকাগঠিত ভূখণ্ডকে বায়বীয় বলা হয়েছে ।

এই জাতীয় ভূখণ্ড চলিতভাবে ক্ষেত্র' বলে পরিচিত ।

ভরত অর্থ ক্ষেত্র ; অতএব ভরত ও বায়বীয় সমার্থক ।

এই ভূ-খণ্ড মূলতঃ মানবজাতির অগ্রগতির ধারক ; যেহেতু কৃষিজগৎ
শুরু এখানে । অতএব মনে করা যেতে পারে যে এই ভূ-খণ্ডের (বায়বীয়)
মানব সভ্যতার কর্ণধার হিসেবে গর্ববোধ ছিল, এবং নারদের কাছে নিজেকে
শ্রেষ্ঠ শক্তি বলি চিনতে চেয়েছিল ।

নারদ নার (জল)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ । যিনি জল দান
করেন ।

অথবা, না (সৃষ্টিকর্তা)+র (সংহারকর্তা)+দ (পালন কর্তা) =
নারদ ।

উভয় ক্ষেত্রেই ভাবার্থে অন্তরীক ।

শ্রেষ্ঠ নর কে— একপার প্রসূকর্তা ভূ-খণ্ড (বায়বীয়)

উল্লেখ্য দক্ষতা অন্তরীক (নারদ)

নর শব্দ দ্বারা সন্দেহের সকল কিছুই বাদ্য করা যায় ।

এই প্রশ্নের উত্তরে বায়-এর প্রস্তাবনা ।

নারদ কাকে নির্দেশ করল বায় শব্দে ?

ভূখণ্ড বক্ষা, প্রজনন-শক্তিহীন ; যদি বৃষ্টিপাত না হয় ।

অতএব মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বৃষ্টিপাত তথা মেঘের মধ্যে ।

কিন্তু এই মেঘ সচলতা লাভ করে বায়ুদ্বারা । এবং শ্রেষ্ঠত্ব মনোহরত্ব
লাভ করে বর্ষাকালে । প্রচণ্ড দাবকাহের পর বর্ষা আনে ধরিজীর বৃকে সজীব
জামলতা ; পৃথিবীর শাস্ত্র মাতৃদ্ব ফুটিয়ে তুলে রূপ নেয় জীবশাক্তীয় ।

যে বায়ু বর্ষাঋতুর সূচনা করে তাকে বর্তমান কালে বলা হয় মৌসুমী
বায়ু ।

আবহমান কাল হতে এই মৌসুমী বায়ুর আসা যাওয়ার উপর ভাবতবর্ধের
বিভিন্ন অঙ্গের বৃষ্টিপাত তথা কৃষিকাজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ।

অবশ্য এই ব্যুৎপত্ত্যাবলম্ব্য পূর্বভারতীয় অঞ্চল এবং ভিক্ত ও চীনের
আবহাওয়ার উপর আধিপত্য করে আংশিকভাবে।

বর্তমানের মৌসুমী বায়ুকে মহাবি নাবদ একদা রাম বলে সম্বোধন
করেছেন। বিশ্বস্ততা ব্রহ্ম নাবদেব, এই বক্তব্যকে সমর্থন করার পর বান্দ্যকি
তখন রামের অয়ন অর্থাৎ চক্র বা অ.স-যাওয়ার গতি প্রকৃতি বিশদভাবে
গীতি কাব্যে রচনা করেন।

ক্রৌঞ্চ অর্থে এক জাতীয় বক দরলে সমগ্র রাম কাহিনীর সঙ্গে প্রথম
শ্লোকটির কোন সম্পর্ক থাকে না। একমাত্র করুণ রসের নির্দেশনা ছাড়া।

কিন্তু শ্লোকটিকে মঙ্গলাচরণ ধরে ক্রৌঞ্চমিথুনের ভাবার্থ হয় স্ত বাপৃথ্বী -
দৌ বা অন্তরীক্ষ পিতা বা পুরুষ এবং পৃথিবী মাতা বা স্ত্রী।

শ্লোকটিতে ক্রৌঞ্চমিথুনের কয়েকটি বিশেষণ আছে;—বিচরণশীল
আধিব্যাধি বিশেষণ; প্রমত্তভাবে স্রুতাসক্ত, বিস্মৃতপক্ষ নিত্যসহচর তাম্র-
শীর্ষ বিজগদয়।

বর্ষার পূর্বে প্রথমে গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক পরিবেশ এই বিশেষণগুলিতে স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে। একটি জলন্ত তাম্রপিণ্ডের মত প্রচণ্ডভাবে তার তেজঃপূর্ণ
ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য বলা হয়েছে প্রমত্তভাবে স্রুতাসক্ত।

হেনকালে কানোমেঘ সূ্যকে আড়াল করে বর্ষা আগমনের ইংগিত দিল।
মেঘকে রূপকার্বে নিবাদ বলা হয়েছে এবং সূ্য আড়াল হওয়া মানে
নিবাদ কর্তৃক পুং ক্রৌঞ্চ নিহত হওয়া।

নিবাদ এবং ক্রৌঞ্চ মিথুন শব্দ দুটি কাল নির্দেশক।

ক্রৌঞ্চমিথুন হয় বর্তমানের ইংরাজি অক্টোবর মে-জুন মাসে।

নিবাদ অর্থ সপ্তম্বরের শেষ স্রু, হস্তী বৃ হিত।

মিথুনকালে পশুপাখীর ডাক স্পষ্টতর হয়।

হস্তীর মিথুনকাল গ্রীষ্ম ঋতু ও বর্ষা সমাগম। স্রুতরং ক্রৌঞ্চ ও হস্তীর
মিথুনকালে সূ্য যখন দক্ষিণায়নাদি বিন্দুর কাছাকাছি;

অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্যায় এবং বর্ষাঋতুর উভয়ভাগ।

প্রচণ্ড সূ্যতাপ জীবাত্মনাশক, এজন্য বলা হয়েছে আধিব্যাধি শূন্ত।

সূ্যরশ্মি তরঙ্গ বিশেষ এবং বিজ্ঞান মতে তরঙ্গ মাত্রই শব্দ সমন্বিত।
প্রমাণিত সত্য যে মহাশূন্ত মনোহর শব্দায়মান।

ক্রৌঞ্চ অর্থ রাজস বিশেষ।

বক্ষ (বক্ষা করা) ধাতু নিম্নরূপ শব্দের অর্থ 'মাহা হইতে (ধনাদি) বক্ষিত হয়, ।

জ্বাৰা পৃথী প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে মেঘ আকর্ষণ করে । ফলে, স্থলভাগ বৰ্ষণ হয়, ফসল উৎপন্ন হয় যা প্রাণীজগতকে বক্ষা করে । অতএব গ্রীষ্ম-কালীন জ্বাৰাপৃথীকে ক্রৌঞ্চামিথুন বলে উল্লেখ করে আগামী দিনের ফসল উৎপাদন কারণে মেঘকে আত্মনো জ্ঞানানো খুবই পছন্দ ।

সুতরাং ক্রৌঞ্চ-মিথুন প্রসঙ্গে অবতারণা করা হয়েছে সমগ্র কাব্যে কক্ষণ বলের প্রাধান্য স্পষ্ট করে তুলবার জন্ত নয় ।

বয়ঃ বয়স্কদের মূল বিষয়বস্তু, মেঘগমাগমে ফসলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা অর্থাৎ কৃষিবিজ্ঞানবক্তব্যের ইংগিত রাখা হয়েছে প্রথম স্লোকে ।

মানব অভিলাষে গঙ্গার অধিবর্তনী তমসা নদীতীর' — এই বাক্যে তমসা শব্দে নদী নয় বরং ভূ-খণ্ডের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে । নদী মানে কেউ গঙ্গা শব্দে সন্ধান করা যায়, যদিও গঙ্গোদ্রীমুখনিঃসৃত জলধারায়ে পূণ্য-সলিলা গঙ্গানদী বলে বর্তমানে ধারণা বদ্ধমূল আছে ।

সরস্বতী নামে বিশেষ এক বা একাধিক নদী থাকলেও যে কোন জল-ধারাকে পূণ্য লাগা গঙ্গানদী বলে বর্তমানে ধারণা বদ্ধমূল আছে ।

সরস্বতী নামে বিশেষ এক বা একাধিক নদী থাকলেও যে কোন জল-স্রোতকে স্র (গমন করা) ধাতু নিম্নরূপ সরস্বতী শব্দে চিহ্নিত করা যায় ।

তমসা তমঃ শব্দজাত । তমঃ অর্থে পঞ্চভূত ।

অতএব তমসা ভাবার্থে পঞ্চভূত দেহ সম্পন্ন ভূ-খণ্ড ।

নদী মুখে পলিমাটি জমে যে ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয় তা'কে তমসা বলে অভিহিত করা হয়েছে । রামায়ণে ভৃগুর আশ্রমে হিমালয়ে এবং চাবনের আশ্রমে যমুনা তীরে উল্লেখ আছে (উত্তর কাণ্ড/৭২: ১৫) ।

কিন্তু বাস্তবিক আশ্রম তমসাতীরে, এই তমসার অবস্থান স্মৃতিদ্বিষ্ট নয় ।

বনবাসকালে রাম গঙ্গা অতিক্রম করে অনেক পথ পরিক্রমণের পর বাস্তবিক আশ্রমে পৌঁছায় । অগচ লক্ষণ গঙ্গা পার হ'য় নীতাকে বাস্তবিক আশ্রমে নির্বাসনে রেখে আসে ।

এই ধরণের অসঙ্গতি বিশ্লেষণ করে মনে হয় তমসা শব্দে কোন নদী ইংগিত না করে যে কোন নদী মুখের ব-দ্বীপ বুঝানো হ'বেছে ।

সামান্যের প্রথম স্তোকে বর্ষাৰ মেঘকে "আজ্ঞান" জানিয়ে কৃষি বিজ্ঞান
বক্তৃতাৰ অন্তৰ্ভাৱণা কৰা হৈছে, তাৰ বহু নজিৰ মহাকাব্যে ছড়িয়ে আছে।

বলা হৈছে সামান্যৰ প্ৰয়োগ কৰ্তা লবকুশ।

কুশ অৰ্থ জল, যোক্ত। লব অৰ্থ অক্লৰ। কুশ বড় বা প্ৰথম; লব
ছোট বা দ্বিতীয়। বীজ হতে প্ৰথম অবিভূত অক্লৰাংশ পৰবৰ্তীকালৰ
শিকড় যাৰ বৈজ্ঞানিক পৰিভাষা Radicle।

দ্বিতীয় অংশৰ নাম ভ্ৰূণ মূল (Plumule), যেটি কণ্ঠে ৰূপান্তৰিত
হয়।

বাৰ্ষিকমাগমে বীজৰ অক্লৰোদগমে মেঘৰ সমাবেশৰ পৰিপূৰ্ণতা
ঘটে।

সুতৰা লবকুশ কৃষিবিজ্ঞানৰ প্ৰতি ইংগিত কৰছে।

সাম সীতাকে নিৰ্বাসনে পাঠালো অস্ত্ৰ কাৰও আছে নয়, বাস্তৱিক
আশ্ৰমে। এবং এমন একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কুলগুৰু বশিষ্ট বা মাতা কৌশল্যৰ
সঙ্গে পৰামৰ্শ না কৰেই।

এই ঘটনায় সীতাৰ পচিচয় দাঁড়ায় বাস্তৱিক আশ্ৰিতা না পালিতা।

কৃষিকাজ কৰা হয় পাললিক যুস্তিকা গঠিত ভূ-খণ্ডে এবং হলকৰ্ষণ দক্ষণ
ভূমিতে হলকৰ্ষণ ফুটে ওঠে।

অন্ত এব লহজেষ্ট বলা যায় বাস্তৱিক আশ্ৰিতা সীতা (হলকৰ্ষণ)।

লক্ষণ বেধে এসেছিল সীতাকে বাস্তৱিক আশ্ৰমে। সীতা তখন গৰ্ভবতী
(উত্তৰকাণ্ড/৫৮: ৮)।

গ্ৰীষ্মকালৰ শেষভাগে হলকৰ্ষিত জহিতে বীজ বপন কৰা হয়। এই
তথা গৰ্ভবতী সীতা শব্দে প্ৰকাশিত।

লক্ষণ=লক্ষণ=চিহ্ন। মেঘৰ আত্মপ্ৰকাশ বৰ্ণনে; এজন্ত নামকৰণ
সামান্য লক্ষণ। পূৰ্বোদ্যমে বৰ্ষা শুকল আগেই বৃষ্টিপাতৰ সঙ্গে পৰিচয় ঘটে,
বিশেষ কৰে বীজ বপনকালে।

এই কাৰণেই আদিকবি লক্ষণৰ সঙ্গে গৰ্ভবতী সীতাকে নিৰ্বাসনে
পাঠিয়েছেন।

ঠিক এমনট লক্ষণীয় যে প্ৰাৰণ মাসে শক্ৰস্বৰ উপস্থিতিতে লবকুশৰ
জন্ম। সূৰ্যৰ দক্ষিণায়ন শুরু হলে বৰ্ষা শুভ ধৰা হয়। সামান্যৰে বৰ্ষাশুভ
প্ৰথম মাস প্ৰাৰণ। শক্ৰ অৰ্থে কীটৰ শক্তি বিশিষ্ট সূৰ্য্যভাণ। ধান চাৰেৰ

অনুবোধগম সময়টি স্বরণ করলে বক্তব্য সহজ হবে।

উদাহরণ না বাড়িয়ে এই দাবি রাখা যায় যে রামায়ণে রূপকধর্মী উপাখ্যান দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঋষিদের অধিগত কুবিবিজ্ঞান তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

অবশ্যই এই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে বর্তমানের প্রচলিত রামায়ণ শুধু মাত্র এই তথ্য বহন করে না ; এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, ধর্ম-তত্ত্ব এবং সমাজবিধি। ফলে মহাকাব্যটি হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বোধ্য, তর্কশূন্য। যেমন প্রথম স্লোকটিকে কেন্দ্র করে আরেকটি তথ্যের ইংগিত পাওয়া যায় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাসে সঙ্গীতবিদ হিসাবে কালাহুসারে ব্রহ্মা, নারদ এবং ভারতের নাম রয়েছে।

বৈদিকসাময়িক প্রচলনের কালে ব্রহ্মা এবং গান্ধারবীতি ও বীণার উদ্ভাবক নারদের পরবর্তীকালে ভারত সঙ্গীতশাস্ত্রকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন।

‘চতুষ্পাদবক্ষ, প্রতিপাদে সমানাক্ষর’ মূলতঃ অচ্যুতেন চন্দ্র।

সঙ্গীত জগতে বৈদিক ও গান্ধার বীতির সংমিশ্রণে পরবর্তীকালের রাগ ও রাগিনী। ‘বীণালয়-সমস্থিত বাক্য’ শব্দ গান্ধারবীতির নির্দেশক।

সঙ্গীত বিশায়ন ভারত প্রাচীন কুবিবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বাল্মীকি (=ভরত) চন্দ্র নামে রামায়ণ রচনা করে ব্রহ্মা ও নারদ প্রাচীন বীতির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি নতুন সঙ্গীত বীতিতে রামায়ণ গীতিকাব্য রচনা করেন। এট কারণে নারদের প্রস্তাবনা এবং ব্রহ্মার সম্মতি।

ভরতরচিত গীতিকাব্যেয় প্রয়োগকর্তা চারুণগণ। বলা যায় নববীতির গীতিকাব্য মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে নাট্যকার ও পরিচালক হলেন অভিনেতাগণ হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

রামায়ণের প্রথম স্লোকটির মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট ইংগিত রয়েছে।

প্রথমতঃ স্লোকটির মেঘ ও মঞ্জার বাগের ধ্যানের সঙ্গে মিল রয়েছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মেঘ নন্দনা করা হয়েছে।

স্লোকটির চন্দ্র সুরারোপ করার উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ স্লোকটির মধ্যে শৃঙ্গার, বোধ এবং করুণ রসের সমাবেশ ঘটনো হয়েছে। এটি তিনটি রসের সঙ্গে ভাব ইত্যাদির সম্পর্ক দাঁড়ায় :

বস	ভাব	বর্ণ	স্বর
শৃঙ্গার	রতি	কৃষ্ণা বা স্তম্ভ	মধ্যম—চতুর্থ পঞ্চম—পঞ্চম
করুণ	শোক	কপোত বা বিচিত্র	গান্ধার—তৃতীয় নিষাদ—সপ্তম
বোভ্র	ক্রোধ	রক্ত	ষড়জ—প্রথম ঋষভ—দ্বিতীয়
বীভৎস	জুগুপ্সা	নীল বা পীত	ধৈবত—ষষ্ঠ

অর্থাৎ মেঘ বা মল্লার রাগে সপ্তস্বরের যে কয়টি স্বরের প্রধান্য প্রোক্তিতে সেই স্বরপ্রকাশক ভাবগুলি বর্তমান। অথবা এমন কি প্রথম শব্দ বা নিষাদ বা নিষাদ (ধা) মনে হয় যেন চারটি স্বরকে প্রস্তুত করেছে।

রামায়ণ পালাগান হিসাবে আবহমান স্বীকৃত। অতএব সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে বিশ্লেষণ করলে নতুন আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা যায়।

যাইহোক, মূল বক্তব্য হোল রামায়ণের রচনাকর্তা কৃষিবিষয়ক তথ্য অবলম্বন করে বর্ণার প্রথম মেঘকে সম্ভাষণ জানিয়ে সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে একটি গীতিকা বা রচনা করেন।

এই গীতিকা বা বৈচিত্র্য তৎকালীন সমাজে ছিল সম্পূর্ণ নতুন।

সে কারণে দেখা যায় লবকুশ প্রথমে রামায়ণ করেন ঋষিসম্মানেশে (অর্থাৎ পণ্ডিতসমাজে), পরে অযোধ্যার রাজপথে (অর্থাৎ জনসমক্ষে), শেষে রামের রাজসভায় (অর্থাৎ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ)

প্রাচীন ভারতে সকল কিছুই স্বীকৃতি যে পদ্ধতিতে দেওয়া হত, রামায়ণের ক্ষেত্রে সেই একই পথ অনুসরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় মেঘ-বন্দনা সূচক প্রথম প্র্লোকে যে বক্তব্যের প্রস্তাবনা, পরবর্তীভাগে বিশেষ করে ইক্ষাকু, কুশ, এবং জনক বংশে তায়ই পূর্ণাঙ্গ বিস্তার। বর্তমান প্রচলিত রামায়ণ হতে কৃষি-বিষয়ক অংশগুলো উদ্ধার করতে বসলেই দেখা যাবে প্রতি অধ্যায়েই প্র্লোকের মর্মে মর্মে পিতৃরাজ্য হতে নির্বাসিত এক রাজকুমারের ইতিবৃত্ত জড়িয়ে রয়েছে।

আপাততঃ এই প্রাচীন ইতিহাসকে পাশে সরিয়ে রাখলে রামায়ণে কৃষিবিজ্ঞান ভগ্নগুলি সুন্দর ফুটে ওঠে।

অন্য হাটে পাওয়া

বোম্বানা বিশ্বনাথম্

কলকাতার প্রতিবেশী। গায়ে হেলান দিয়ে বসবাস অথচ কেউ কারও আত্মীয় নয় - অনাত্মীয়ও নয়। আন্তবাবুকে যোজাই দেখি—তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর সদাসর্বদা কানে এসে আছড়ে পড়ে, কিন্তু মৌখিক একটা আলাপ করাও মতো কোন ঘটনাই ঘটে ওঠে নি।

সেদিন হঠাৎ সরাসরি আমার বসার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। আমাকে ভদ্রতা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োগ না দিয়ে আন্তবাবু আসন গ্রহণ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বাক্য করলেন। কারণটা অবাস্তবীয় কিছু নয়। তিনি তাঁর গ্যারেজ ঘরটার মুদি দোকান খুলছেন। পাড়া প্রতিবাসীদের সমর্থন ও সহায়ত্বপূর্ণ প্রার্থনা করতেই তাঁর আগমন। হঠাৎ মুদি দোকান কেন খুলছেন, তার কারণ জানালেন। মেয়েব নিয়েও সন্তান করার সময় তিনি আবক্ষার করেছেন নিত্য দরকারি এই-চাল, ডাল, তেল-গুন ইত্যাদিতে আমাদের মতো সাধারণ লোক কী আন্দাজ ঠেকে আসছে। দোকানদার জাতটাই নাকি জোচ্চোর। যাতে তিনি নিজে এবং পাড়ার দশঘর সন্তায় ভালো জিনিষ পেতে পারেন তার এই ব্যবস্থা। দোকান চলে 'ভালো, না চললেও জিনিস তো তাঁর আর ফেলা যাচ্ছে না।

গ্যারেজ ঘরটার কী একটা কাণ্ডকারখানা চলছে ক'দিন ধরেই যাওয়া আসার পথে সেটা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ওটা যে মুদিখানা দোকানের জন্ম-পর্বের সূচনা হচ্ছে সেটা বোঝা গেলো এইমাত্র।

বললাম, 'আমি যে ভেবেছিলাম, ওটা বোদহর একটা ক্যানিনেন্ট ফার্মের সূচনা হচ্ছে।'

তলে তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, আন্তবাবু, 'মুদিখানা বলে কি ভাবছেন, নেটাদের মতো স্রাষ্টি কিছু করবো ? এ তবে একদম 'রে মডার্ন' সিস্টেমে—অত্যন্ত আধুনিক কার্যদায়। বাংলাদেশে এমনটি নিশ্চই আজও কোথাও এমনটি দেখেননি মশায়। আহুন না, দেখুন এসে কেমন সব ব্যবস্থা করেছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'আহুন, চলুন, দেখে শুনে বুঝে

নিন। দেখে কিন্তু আমার কাজের তারিফ না করে পারবেন না। তা আমি বলে রাখছি!’

কাজ যেথেকে বাধা হয়ে ভদ্রলোকের সংগে তাঁর আদর্শ মুদিখানার দোকান দেখতে বেরিয়ে আসতে হলো।

খ্রীষ্ট হাসিখুসি ভরা ভদ্রলোক। দেখলেই মনে হয় বেশ শাস্ত্রভেদে আছেন তিনি। দোকানে ঢুকেই সগৌরবে সকল আসবাবগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন তো মুদিখানা বলে মনে হয় কি? মাটিতে শোয়ানো প্রকাণ্ড শো-কেশটা দেখিয়ে বললেন, ‘তিনি ময়দা, ডাল, মশলা সব ঝাড়-পৌচ করে টেলে দেবো এবং খোপে খোপে কাঁচের জাহগায় থাকবে তেল, কলের মুগ খুললেই ব্যাস্। নিট্ ওজন চলে আসবে বোতলে মিটারের দাগে। দেখবেন, মেয়েরা পর্যন্ত লব্ধ করে মাকেটিং করতে আসবে এখানে। বাজারের ঘুরে শাড়ি ব্লাউজ ব্রেসিয়ার কেনে আর তাদের ভাঁড়ারের জিনিস কিনবে না? এই দেখুন, একটা বিলিতি কাঁটা কিনেছি। জিজ্ঞেস করলে তখনই প্রশ্ন করুনো, মটর ডাল? ক’পাউণ্ড বলুন? খুব একটা স্টাইল মেনটেন করা যাবে, কি বলেন? সপ্তম দৃষ্টিতে আমার মুগের দিকে তাকান ভদ্রলোক। তারপর হো হো করে প্রাণভরে হেসে ওঠেন তিনি।

বুঝলাম, অসুবাস্য ব্যবসা করার প্রতিষ্ঠান এটা নয়, এটা তাঁর সৌগিন একটা খেলা। একটা কিছু বলা দরকার। বললাম, ‘ভারি সুন্দর করেছেন কিন্তু দোকানটা। এটা একটা আদর্শ ভাণ্ডার বলা চলবে।’

‘আরে মশায়, সুন্দর কথাটা তো দু’নম্বরে। প্রথম বাপারটা তো ধরলেনই না। এটা করতে খবরের তিসাবটা দেখেছেন? সেটাই তো ক্রেডিট মশাই। ‘টকটক’ করে শেল্ফটার গায়ে টোকা মারলেন। তারপর বললেন চোখ কপালে তুলে, ‘বুঝলেন, এই যে দেখেছেন জিনিসটা, এটা খাঁটি বিলিতি সাহেব বাড়ির মশায়। পয়লা নম্বরের ‘টিক’—বলতে পারেন এর নামটা? না, তবে শুধুন, ‘টু-থারটির’ কম তো নয় কিন্তু আমার পড়েছে কোরিং স্ক্রু মাত্র ‘ফিকটি-টু’ ওলি। সমস্ত কলকতা চষে আসুন, এ দামে জোটাতে পারবেন কি? ইম্পাসবল! ‘ডাম্ চিপে হয়ে গেলো এতোগুলো ফাণিচার, তাইতো এই ‘অদর্শ—ভাণ্ডার’, আমার স্বপ্ন সার্থক রূপনিতে পারছে!’ তিনি তত্ত্বাপোষের ওপর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ে আরও বলতে থাকলেন, জিনিস কেনাটা মস্ত একটা আর্ট মশায়। ওটা

সবায়ের কমতার ফুলের না।

আমি হুজির প্রচেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে আসতেই আন্তবাবুও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। ‘চললেন কোথায় মশায়? হ্যাঁ চলে আসুন আমার ঘরে। আরে পাশের বাড়ির প্রতিবাদী আপনি তো আমার ঘরের লোক মশায়।’ এই বলে সঙ্গেসঙ্গে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে একেবারে উপর তলায় তাঁর শোবার ঘরের নিচানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন।

খুব মনখোলা খেয়ালি মানুষ এই আন্তবাবু। সব সময়ই যেন হাজারখানেক লোকের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি সাজানো গোটা দশেক বড় বড় ষিলের টাংক। পটাপট টেনে টেনে ডালাগুলো খুলে দিলেন। বললেন, ‘বছর তিনেক আগে গিয়েছিলাম, কাশ্মীরে। এ সব গরমের কাপড় ওখান থেকে না নিয়ে পাঠলাম না, এ সব কাপড়ের দাম তখনলে আপনি মশায় বিশ্বাস রাখতে কঁঁউয়েউে করবেন। অল্প মজুরিতে একটা দণ্ডি ধরে ত্রিশটা কমপ্লিট সুট আর একশটা ওভার কোট করেও আটখানা গোটা খান একদম পুরো মাপে পড়ে আছে। এছাড়া ঐ যে দুটো লেদার কেস দেখেছেন, ওর ভেতর লুপু কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান টান টান শোয়ান রয়েছে। বলতে পারেন এগুলো মোট কতটা দামে কিনেছিলাম? মাত্র আড়াই হাজার টাকায়। বিশ্বাস করবেন, মশায়?’

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের আশায় জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কৈ একদিন আছি, কখনো তো আপনাকে ‘সুট’ পরতে দেখিনি?’

‘পরিনা, হয়তো পরবোও না। যা কিনি সবটুকি আমি বা আপনি নিজেই খাচ্ছি?’ অকটা হুজি দেখিয়ে আন্তবাবু আবার একত্রে শুরু করেন, ‘আমর ওয়াইফ ও বলেন, আমি ‘সুট’ পরিনা কেন? আরে মশাই, প্রয়োজনের দিক থেকে নিচাঁব করতে গেলে তো আমাদের সকলকে বাট ভাগ জিনিষই বাচ দিতে হবে। এমন জলের দরে জিনিষগুলো পাচ্ছি, তাহঁড়াটা হয়ে যাবে? মাথা খুঁড়লেও পারবো আর ওদামে ঐ সব জিনিষগুলো জোটাতে? বাবসার বাইরে প্রয়োজন কি লখ ছাড়াও এত সামান্য দরে ওগুলো কি আমার জন্যে অপেক্ষা করেন?’

সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই আমি বুঝেছিলাম, এ লোকটিকে বোঝানো বা উপদেশ দেওয়ার চেয়ে ‘সায়’ দেওয়াটাই বেশি নিরাপদ। এ ছাড়া আমার উপদেশ উনি ‘বশ’ মানবেন এমন ধারণা করা নিতান্ত অর্বাচীনতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। একে একে অনেকগুলি জিনিষ দেখে এবং মালিকের আটের
তারিফ করে এদিনের মতো পরিচয় পৰ্য্য শেষ করে নিজের আস্তানায় ফিরে
আসতে আমার পুরো চারটি ঘণ্টা অভিযাচিত হলো।

পুরাতন দোকানের পাট তুলে দিয়ে আস্তবাবুর দোকানের মালিক
গ্রাহক হলাম। ভালো জিনিস সস্তা দরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিটা তিনিও
যথাসম্ভব রাখতে লাগলেন। অনেকের অপেক্ষা অনেক ফিকির ফন্দিতে
উনি আমাদের অন্ত মাল সংগ্রহ করেন। দেখা হলে তারই সমর্থন গ্রাহক-
দের মুখ থেকে আদায় করে আনন্দ পান।

এমনি করেই কাটছিলো নিশ্চিন্ত আরামে। অকস্মৎ এক রাতে আমার
বাবাদ্দায় আমারই নাম ধরে ডাকতে শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। চিং-
কার করে আমাকে আকর্ষণ করলেন, ‘নেমে আসুন মশায়, দেখে যান, কি
কাণ্ড করেছে –’

আস্তবাবুর পিছনে একটা ভারি বিরাট বস্ত্র মাথায় নিয়ে ছয় সাতজন
কুলি। নেমে আসতেই গলা একটু খাটো করে বললেন, ‘জার্মান পিয়ানো
টিপটপ কণ্ঠশন। নিউ প্রাইজ, সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম মাত্র দু’শ
পঁচাত্তর টাকায় খরিদ করলাম।’ খুসি প্রাবল্যে কাঁধে হাত চাপিয়ে টেনে
নিয়ে চললেন। তারপর বাইরের ঘরের একপাশে ঐ বিরাট পিয়ানো বস্তুটা
ধরাধরি করে বসালেন। আমাকেও বসতে হলো। তিনি নিজে এসেছেন
বিস্মাতে। বিজ্ঞাওয়ালার সংগে বিতণ্ডা লাগালেন মায় এক আনা হেরফের
নিয়ে। অবশেষে ‘নেহি’ দেয়া বলে দপ করে আমারই পাশে বসে পড়লেন।
বিজ্ঞাওয়ালা ওদের দেশওয়ালী ভাষায় গজরাতে গজরাতে বিদায় হলো কিন্তু আস্ত
বাবু ঐ এক আনা পরশা যে সঠিক ভাড়ার চেয়ে কম দিতে পেয়েছেন তাওট
জয়ের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলেন। ‘আমার সংগে চালাকি? যিথো বলে এক
আনা পরশা আমার কাছ থেকে আদায় করার মতলব? কত ডজন ধুষ্ট
বাবসায়া আমার হাতে বলে কিনা কাছিল, আর—’

অকস্মৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বলেন,
ও মশায়, আমার ছাতাটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা তো বিকসায় চেড়াতে বাঁধাবো
ছিলো?

ছাতা নেই, বুঝতে পারলাম ওটা বিজ্ঞাওয়ালার এক আনা পরশা লুবিরে
দেওয়ার অন্তই বিজ্ঞায় চড়ে চলে গেছে।

‘চুঁচি করলে আর কি করা যায় বলুন ? সংগেধু পাওয়া করলে অবশ্য আদায় আমি করতে পারি, এটা ঠিকই, তবে কিনা আর একটা ব্যক্তি ! যাক — যাকগে ।’ আন্তবাবু শান্ত হলেন । এই মাত্র হাজির দুই টাকা লাভ করে কিংছেন — ছাতার ব্যাখাটা ভুলতে বেশি বেগ পেতে হ’লোনা তাই । পিয়ানোটার টাকা খুলে ওটাতে বেসুরো টাকা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি যন্ত্রটা কি পরিমাণে সুরেলা তারপর তাঁর কাজে হাজিরে তাঁরই আদায় করে আমাকে ছাড়লেন যখন, তখন রাত সাড়ে এগারোটা ।

এর কিছুদিন পরে প্রানো একটা মোটরগাড়ি আন্তবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ইঁকাতে দেখলাম । এ ধরনের গাড়ি যার হন ছাড়াও সব অংগ প্রভাংগই আওয়াজ করে নিশ্চয়ই এমন একটা মূল্য পেয়েছেন যে না কিনে থাকতে পারেন নি তিনি । আস্তাগলে দোকান থাকায় চট মুড়ি দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওটাকে ফুটপথের একধারে । মালিকের নতুন হাতেই খুব পানিকটা সেবা যত্ন নিয়ে একদিন ওটা কোথায় সরে পড়লো আর তার পাক্সা পাওয়া গেল না পুনরায় ।

আরও কিছুদিন পরে আমার বাড়ির ভিতর থেকে ঘোরতর আপত্তি এলো যে আন্তবাবুর দোকান থেকে আর মালমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না । ময়দা দেন তো ঘি পাওয়া যায় না; চিনি পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না ইত্যাদি ।

আন্তবাবুর জ্ঞানান্তরে গিয়ে জেনে এলাম । সন্তায় গন্যস্থিত আমদানির জন্ত লোক পাঠানো হয়েছে সুন্দরবনের পল্লী অঞ্চলে । গমের আটা আর ভয়সা বিয়ের জন্তে বিহারে ক্রেতা সমবায়ের সংগে যোগাযোগ চলছে । চিনির জন্ত জাভা কি সুমাত্রা দেশ থেকে আমদানির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । অতএব কিকিৎ মৈত্রী ধরতে হবে ।

কিন্তু মৈত্রী বেশিদিন পরে রাখতে গেলে রান্না ঘরের পাট ওঠাতে হবে । সুতরাং জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করলাম ।

আমার জব্বলপুর থেকে হঠাৎ ডাক আসায় কিছুদিনের জন্ত কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলো । মাত্র মাসেক কালের মধ্যেই ফিরে এসে দেখলাম মুন্সিখানার নোংরা সড়ক হয়ে গেছে । সেখানে প্রবাস্তন আসবার পথের আড়খানা রয়েছে । বিরাটাকার সেই প্রবাস্তন পিয়ানোটায় এককোণে ঝুঁকি করে দাঁড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যবোধহীন । তার গায়ে মোটা পিচবোর্ডে — আলতার

তুলি দিয়ে দাম লেখা হয়েছে, 'মাত্র দেড়শ টাকা।'

আন্তবাবু সেই পুরাতন মেজাজেই কাকে ধমক দিচ্ছেন. 'যান যান মশায়, এর মর্ম বোঝেন না তাই বাজে কথা বলে 'বেশি দাম, বেশি দাম' করছেন।'

'কাকে বলছেন, আন্তবাবু?' জিজ্ঞাসা করলাম অতিনম্র কণ্ঠে গারোজটার গোয়াকে উঠে।

'- আরে মশায়, ঐ যে; ঐ পাশের বাড়ির লোকটা। নেহাৎ আনাড়ি। এসব জিনিষের কদর ও কি বুঝবে বলুন তো? জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন সেই পুরাতন মেজাজে। দেখলাম, সেই মেজাজের ঝাঁজ যদিও বেড়েছে, কিন্তু আন্তবাবুর কোণার যেন 'চরম যন্ত্রনার দাগ, অস্তাবের প্রকটতা, অতি তীক্ষ্ণভাবনাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভালোম, অবস্থা লোকটার ভালই ছিলো একদিন, কিন্তু খেয়ালের কোঁকে যা করে বেড়িয়েছেন তাতে এটাই স্বাভাবিক।

খানিকটা সহ্যভুক্তি, কিছুটা শখ আর সম্ভার আকর্ষণে কাছে এসে বললাম, 'আন্তবাবু সত্যিই কি পিয়ানোটা দেড়শ' টাকায় বিক্রি করে আজ আপনি ঠকতে চান? কেননা আমি তো জানি কটা আপনি কি দামে কিনেছিলেন! কিন্তু আমার মনে হয়, যদি আপনি আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে ভালো দাম দেওয়ার লোক আপনি পেতে পারেন।'

আমার কথায় আন্তবাবুর মুখোখ টেক্সন হয়ে উঠলো। বললেন, 'না মশাই, এর কদর আপনার মতো ক'টা লোকই না বোঝেন?' বললাম, 'তা'লে শুটা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আমি পুরো দু'শো টাকায় আপনার লোকের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই।' এট বলে পিয়ানোর আগন্তে নয়, আন্তবাবুর অবস্থা কেবের দীনাবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের ডেরায় এসে উঠলাম।

মনে হলো আন্তবাবু অবস্থা নিপক্ষে আমার এট প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। অদীর আনন্দে বৃত্তিতে ভিজতে ভিজতে তিনি ছুটাছুটে ঘুটেব মাথায় ঘুট্টা তুলে মিনিট দশের মধ্যেই আমার দরজায় এসে হাঁক-ডাক শুরু করেছিলেন।

আমি তখনো জরুলপুরের ঘটনাপ্রলো সবটা স্ত্রীর কাছে বলে শেষ করতে পারিনি। দরজায় আন্তবাবুর চিংকারে আর বৃত্তির কাপটার মধ্যশীত কাছে এসে দাঁড়লাম। আন্তবাবুর হাতে টাকা দুশো শুধে দিতেই তিনি চমকে

উঠলেন। সৰ্বাংগ ভেজা আধবুড়ো এই ভজ্জলোক অৰাক বিশ্বয়ে আমাৰ মুখের দিকে তাকিয়ে ফাৰ্কাশে কৰ্ত্তে বলে কেললেন, 'গভিা ছু'শো টাকাই দিচ্ছেন ? হে হে, কিন্তু আমাৰ লেবেল এর চেয়ে পৰ্কাশ কম নিতে বলছে যে মশাই ?'

—'তা বলুক। ওটার কম দিলে আপনাৰ পকেট থেকে কতি হবে যে,' এই বলে আৰও কুড়িটি টাকা আনতে দ্বীকে ইংগিত কৰলাম।

আন্তবাবু টাকাটা গুণে নিৰ ফতুয়াৰ পকেটে রাখলেন। তাৰপৰ পকেট থেকে আট আনা পয়সা বেৰ করে কুলিদের হাতে দিয়ে ওদের বিদায় কৰলেন। একটু থেমে আমাকে সাচায়া কৰতে নিৰ্দেশ দিয়ে তিনি নিজেই যন্তটাকে টানতে লাগলেন আমাৰ ঘরের মধ্যে সেট করে দেওয়ার জন্ত। বললেন, 'ধকন, ধকন তো একটু. বো ঠাকৰুণের পছন্দ মতো জায়গায় এটাকে মানান লই করে পাৰমানেন্টলি বসিয়ে দিই। হোয়াট এ প্রাইজ ? দশজনকে দেখিয়ে গৌৰববোধ কৰতে পাৰবেন মশাই !'

আমি তাঁকে বাধা দিলাম। বললাম, 'আপনি বুদ্ধ মাতুষ, আপনি আৰ টানাটানি কৰতে যাবেন না। আমরা আগে জায়গা ঠিক কৰি, পরে ওটা আমরা সেট' করে নিতে পাৰবো।' চাকর ডেকে পিয়ানোটাকে একটু খুলো সবিয়ে হাৰ্কা করে নেওয়ার আশাও পোষণ কৰাছিল'ম মনে মনে।

বৃষ্টি বেশ কমে এসেছে। এইবার আন্তবাবু বাডি ফেৰাৰজন্ত নামতে উত্তত হলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাতের মধ্যে ছু'গানা দশটাকার নোট গুজে দিয়ে বিনয়-নয় কৰ্ত্তে বললাম, 'এমনই দিনে এই যন্তটা আনতে গিয়ে আপনাৰ আৰও যে লোকসানটা হয়েছিলো সেটা আমি ভুলিনি আন্তবাবু ! এই টাকাটার একটা ছাতা কিনে নেবেন, তা না হলে আমি খুব ছু'গ পাৰ কিন্তু।'

বৃষ্টিভেজা চোখ দুটো তুলে কি যেন বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু আমি তাঁকে বাধা দিয়ে প্রত্ন কৰলাম, 'এত ভাল জিনিসগুলি এতো কমদামে ডেড়ে দিচ্ছেন কেন, বললেন না তো আন্তবাবু ?'

চম্কে ফিরে তাকিয়ে সেট পূৰনো মেজাজে হাজার লোকের সংগে কথা বলার ভংগিতে উনি বললেন, 'আরে মশায় গ্রামে একশ' টাকা করে দানি জমি বিক্রি হচ্ছে। এবারে একটা বড়লড় কামিং খুলবো মতলব কৰেছি।' হো হো করে হাসতে হাসতে দ্রুত-গতিতে' এগিয়ে গেলেন।

আমি ও আমাৰ স্ত্রী না হেসে থাকতে পাৰলাম না।

লোকটা বোধহয়

দিব্যোশচন্দ্র লাহিড়ী

আবার সেই লোকটা ।

চোখাচোখি হস্তয়া মাত্রই যেন একটা ক্রোধ মিশ্রিত ঘৃণা শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল স্তূহাসের । সে বিরক্ত হল । আর ভাবল—লোকটা কে ? লোকটা কে ? ওকি সত্যি সত্যিই ভিখারি না পাগল ? ভবধুরে না স্পাই ? কি জানি । আজকাল কত শত লোকই তো কতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কে তার খোঁজ রাখে । আর বাগারই বা দরকার কি ? তুমি তোমার মত থাক —আমি আমার মত । রিক্স রিক্সর মত । না, রিক্স আমার মত । ঠিক হল না । আমি রিক্সর মত । কিংবা আমার ছ'জনেই ছ'জনার মত । জীবনটাকে কাটাতে হবে শরতের ঝকঝকে নীল আকাশে একখণ্ড উজ্জ্বল মেঘের মত । শিউলির হুগন্ধের মত । কিংবা গবিত বাজহংসের মত ।

অতএব স্তূহাস এগিয়ে চলে । সে মোটেই ক্রক্ষেপ করল না লোকটাকে । লোকটা এখনও ওপাশের লাইট পোস্টটার গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে । বোধহয় আকাশ দেখছে কিংবা লাইটপোস্টের মাথায় তারের জটা জালে কাকের বাসা । চেহারাট ও ঐতিক অমান । কাকের বাসার মতই ছয়ছাঁড়া এলোমেলো । পরনে তেল চিটচিটে পট্টমাথা ফুলপ্যান্ট, গায়ে ঘাড়াকটা বোতামহীন একট শাট । এক সময়ে হয়ত তার মং নীল ছিল । মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ । চোখের কোণে কালি । দৃষ্টি কেমন উদ্ভ্রান্ত । সব মিলিয়ে একটা বিধবস্ত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি ।—কিন্তু লোকটা কে ? ভিখারি না পাগল ? ভদ্র ঘরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই । কিন্তু কে লোকটা ? কে জানে ।—তবুও স্তূহাস এক-বার মুখ ঘুরিয়ে দেখল । সে তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে । দৃষ্টি সেই কাকের বাসার দিকেই । তাহলে নির্দ্বাং লোকটার মাথা খারাপ কিংবা । কিন্তু সেদিন তো সামনে এসে হাত পেতেই দাঁড়িয়েছিল অদ্ভুতভাবে । —

—একটা প্রশ্নের জবাব দিন ।

—কি দেব ?—রিক্সর ভাবনা নষ্ট করার স্তূহাস বিরক্ত হয়েছিল ।

—একুনি জবাব দিন ।

—কোথায় দেব ? হাতের ওপরে ?—সুহাস জুড় । —ভিখারির আবার এত ভণিতা কেন ! সোজা-সুজি বলেই হয় - তাকে দিন । এদের তাকে দেওয়াও পাপ । শক্ত সামর্থ্য চেহারায় অথচ খাটাবে না । পরিশ্রম করবে না । এদের উৎপাতেই দেশটা গোজায় গেল । ভুক-কুঁচকিয়ে চোখের দিকে তাকাতাই লোকটা বলেছিল,—একটু ভেবে উত্তর দিন । কেননা প্রায়টা পৃথিবীতে এই প্রথম ।

এ-তো আত্মা মুশকলি । তবুও রাগ চেপে সুহাস বলেছিল ; চটপট বলুন ।

পরম পিতা যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র সমাধি যদি সত্যি সত্যিই ভাঙতে হয় তাহলে জাতির জনক গান্ধীজীর সমাধি কেন রাজঘাটে হবে ?

—তার মানে ?

—তার মানে খুব সোজা—যীশুর কবর যদি কান্দীর উপত্যকার হয়ে থাকে তাহলে গান্ধীজীর স্মৃতি-বেদী কেন বম্বায় কিংবা বোম্বাইয়ের হবে না ?

—সত্যিই তো—‘হাসি’ চেপে সুহাস বলেছিল,—আপনি বরং এ বিষয়ে রিসার্চ করুন ।

—যোগ সাধনা করলে খাবার কম লাগে । আমাদের দেশের মুনি ঋষি যোগীরা প্রায় সকলেই বায়ুভুক ছিলেন । তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলে পৃথিবীর কোথাও কোনদিন ক্ষুধ প্রবলেন হবে না । আনন্দের কথা —আমরা আবার

—আপনি এর ওপরেও

—হঁ—বীসিস ! দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে দেব ঠিক করেছিল ।

- খুব ভাল, ডবল ডব্লিউরট পেয়ে যাবেন ।—সুহাস আর দাঁড়ানি । পাগল ভেবে মনে মনে হেসেছিলো আবার অহুকম্পাও অহুতব করেছিল ।—হেচারা । ভদ্র ঘরের শিক্ষিত ছেলে বলেই মনে হয় । কিন্তু পাগল হল কেন ? সত্যি সত্যিই পাগল হো ? না অন্ত কোন কারণে পাগল সেজেছে ? আজকাল কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই । একটু জেরা করলেই হয়ত দেখা যেত লোকটা পাগল নয়—শেষান্না বুড় । ফ্রিমিনাল । জেলপালানো আসামী । কিংবা স্পাই । আর যদি লোকটা প্রকৃতই পাগল হয় তবে কেন হয়েছে ? সুহাস একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগল সে কথা ।

এই ইশিয়া কিংস না ধরালে ভাবনাগুলো ঝিক 'হুংসই' হয় না। লম্বা দু'টো টান মেয়ে তার মনে হল ঐ পাগলটার কথা^১ সে ভাবছে কেন!—সভিই তো! পাঁচ-ষাটে পাগলের তো ছড়াছড়ি। তাহলে এত থাকতে ওর কথা কেন? কি জানি? লোকটা পাগল হল কেন?

দূর ছাই। স্কটারটা ঠিক থাকলে ওটা নিয়ে বের হলে এসব ছাই পাপ কিছুই ভাবতে হত না। দ্বিবিা হল করে দিকুর কাছে পৌঁছন যেত। আর দিকু হয়ত দুটু হেসে কপট গাভীরে বলত,—কি ব্যাপার, অলমরে যে?

—তোমার কাছে আসব তার আবার সময় অলমর কি?

—বা বে আমার বুঝি পড়াশোনা নেই, বাড়িতে বুঝি অস্ত্র কেউ নেই!

—থাকলেই বা। এই জান আজ আসবার সময় একটা অদ্ভুত পাগল দেখলাম। শিক্ষিত ভদ্র চেহারা—

—আমিও দেখেছি।

—কাকে?

—একটা পাগলকে। শিক্ষিত স্মার্ট অবুঝ ও অভিমানী। যখন তখন একটা মেয়ের বাড়িতে হানা দেয়—

—তুধু হানা দিয়েই কিন্তু কাস্ত হয় না। সুযোগ পেলেই যেকোনো আবার বলপূর্বক কাছে টেনে পটাপট তার ঝোঁটে গালে বুক —

—শেরানা পাগল তো, তাই—

—তাই ইচ্ছেটাও বলগাহীন, বুনা ঘোড়াও মতই সাহসী আর বেপরোয়া, স্তম্ভবাং

—ষ্ট্যাচু।

সেই লোকটাও কি এখন ষ্ট্যাচুর মতই দাঁড়িয়ে আছে লাইটপোস্টার নিচে? প্রায়টা যেন হ্যাঁওট মনে পড়ল স্মহাসের। এবং ইচ্ছে হল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু না—কি হবে পাগলকে দেখে যদি আবার চোখা-চোখি হয়ে যায় আর তখন যদি কাছে এসে শুধোর—পরম পিতা যীশুখৃষ্টের কবর যদি ভারতে হয় তাহলে জাতির জনকের—কিংবা যদি শুধোর সবাই বায়ুভুক হলে ইশিয়া কোন দেশে ফুড এক্সপোর্ট করবে বলুন তো? —তাহলে? বেচারা। মাঝা ঠিক থাকলে কি কেউ কখনও এ ধরনের প্রশ্ন করে? কিন্তু লোকটা কে? আর কেনই বা এরকম হল? হয়ত কোন গভীর শোক টোক পেয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার বউ কিংবা ছেলে

মায়া গেছে। অথবা দলবাজি করতে গিয়ে চাকরি খুঁজিয়েছে। কিংবা
হয়ত দেনার দ্বায়ে কেপা পেয়েছে। হুঁ-উ তাও হতে পারে। আদ্য
বার্ষ প্রেমের পরিণতিও হতে পারে। কিন্তু তা হবে কি করে? ভালবাসা
যদি লাচ্ছাই হয় তাহলে তা বার্ষ হবে কেন? তাই কি কখনও হয়। এখন
চেষ্টা করলেও কিছু কি—এই যাহ্, বোধ হয় ঘেরিই হয়ে গেল। কিছু কি
তাবছে কে জানে।

সিগারেটে শেষ টান মেয়ে সুহাস দ্রুত হাঁটতে লাগল। কেননা
কিছু বোধ এতক্ষণে পেয়েছে বসেই আছে। তার ঘেরি দেখে মনে মনে
চটেছে, আর তাবছে আচ্ছা ইয়েসপন্সিবল লোক। আর কিছু না হোক অন্ততঃ
অস্ত্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় পাড়চুয়াল হওয়া উচিত। একশ বার হওয়া
উচিত, সে কথা আমিই মানি। কিন্তু কি করব বল! ঐ লোকটাকে
আবার দেখেই তো কি সব যেন ভাবছিলাম। বাদও ওসব আজে-বাজে বিষয়ে
আমার মোটেই ভারা উঠিত নয়। তবুও ভাবছিলাম। কেননা ধরবার চেষ্টা
করছিলাম তোমার পিঠেরিতে লোকটা কৈন প্রাণীতে পাবে। প্রমিতকত নয়
কৃষকও নয়। যেহেতু চেহারাটা ভদ্র অতএব নির্বাণ কেবল-কুলেরই কোন
কলক। এরা পরিভ্রমে ভীত, পরচর্চায় মুগ্ধ, ধূষ খেতে প্রসাদ। এই
ক্রাসটাকে এবালিশ না করতে পারলে

কিছু ছটকটিয়ে উঠল,—তোমার সময় হল? আমি তো ভাবলাম

—খুবই দুঃখিত। অকারণেই দেহী হয়ে গেল তার ওপরে আবার
বাহনটি নেই।

—যাক নিশ্চিত। আমাদের কার দুটিও গাইবে। তাহলে আজ ৩ টি
হাটি পা-পা।—ছোট্ট করে এক টুকরো হাসল কিছু।

—তোমার সঙ্গে হাঁটতে তো আমার আপত্তি নৈই বরং পূর্ণিবীর দীর্ঘতম
পথটিও—কথা শেষ না করেই কিছু দিকে তাকাল সুহাস।

কিছু চোখ বড় বড় করে চাইল। নতুন কিছু বল।

—মানে হাঁটতে ভালই লাগে কিন্তু যদি আবার সেই লোকটা—

—কোন লোকটা? কিছু জিজ্ঞাস করল?

বাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুহাস বলল সেই লোকটার কথা।—
লোকটা সম্ভবতঃ পাগল। হয়ত চাকরি নেই। এদিকে ততলোকের চেলে,
লবাসরি তাকেও চাইতে পারেনা। হয়ত খেতে না পেয়েই পাগল হয়েছে।

—আই বেগ টু ডিকার। তুমি আমার খুশিদের সাবজেক্টকে ভিন্নজান করছ। জান আজ দুপুরেই ডক্টর বিশ্বাস আমার পেপারের কত প্রশংসা করেছেন। অ্যাকচুয়ালি আফটার ইণ্ডিপেন্ডেন্ট উই হ্যাভ প্রোগ্রেন্স্‌ ম্যাচ। রেগেন্সী ইন আওয়ার ইকনমি। তুমি বলবে দেশে ভিক্ষুক আছে। আমি বলব ওরা স্বভাবভিক্ষুক।

—তাহলে চারিদিকে এত ক্রাইসিস কেন? আর স্ত্রাশনাল ইনকামের বেলাতেই বা

—ক্রাইসিস! ইটস সেন্টপারসেন্ট আর্টিফিশিয়াল। তুমি দেখ। আজ কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত প্রত্যেকের হাতেই পয়সা আছে। যে মাঠে আগে একটার বেশি ফসল হত না এখন সেখানে তিনটি চারটি হেসে খেলে হয়ে যায়। চীন দেশে একটা লেবার ডেইলি কত আর্ন করে জান দশ আনা থেকে পাঁচ লিকে। আর এখানে—চার টাকা থেকে আট টাকা।

আজকের মধ্যবিত্ত মানেই অচ্ছল মধ্যবিত্ত। এই ক্লাশ লাক্সারির পেছনে প্রতিমাশে কত খরচ করে জান? •

সুহাস ইণ্ডিয়াকিংস ধরাল। একটা দীর্ঘ টান মেরে বলল,—জিনিশ-পত্রের দাম বেড়েছে স্বীকার কর তো?

—জাস্টিফায়েড। ইনকাম বেড়েছে—খরচও বেড়েছে। খিওরিটা হচ্ছে ডাবল ইনকাম, ডাবল এক্সপেন্ডিচার, ডাবল সেভিংস। তুমি পাঁচটাকা রোজগার করে চারটাকা খরচ করলে একটাকা জমে আর দশটাকা রোজগার করে আট টাকা খরচ করলে কত জমে?

—ওসব খিওরির কথা বাদ দাও।

—কেন বাদ দেব? ইটস্‌ সায়েন্স—সুতরাং তুমি যদি এখন গানের জোরে বল কেউ না খেয়ে থাকছে, কেউ অভাবে মরছে আইল নট সিগীভ।

—বিশ্বাস তো আমারও হয় না। কিন্তু প্রায়ট খবরের কাগজে

—কাগজ চালাতে গেলে ওসব লিখতেই হয়। তুমি যে কোন অতি সাধারণ লোককে একটু ভাল করে লক্ষ্য কর দেখবে ঘড়ি পেন টেবিল টেরিকট ট্রানজিষ্টার আছে। খেতে না গেলে ওসব আসবে কোথা থেকে? —ডুবাক-আমাদের আছে ঠিকই কিন্তু আগের মত নয়, না খেয়ে মরবার ষ্টেজে এখন আর কেউই নেই।

—ইগ্‌জাক্টলি। যে কোন লোকই কার কিনছে। লাখ টাকা দিয়ে

বাড়ি বানাচ্ছে, কথায় কথায় ইউরোপ ছুটছে।

রিক্স কথায় মোড় ঘোঁরা।—আমাদের কি দেখি হয়ে গেল! আমি অনেকক্ষণ থেকেই তৈরি হয়েছিলাম

—এমন কিছুই নয়। তবে মি: ভট্টাচার্য ভুল কৌচকাতে পাবেন। এই শুনেছ তো মি: গৌধুরী নাগপুরে একটা প্লান্ট খুলছেন!

—অজয় লিবিয়া যাচ্ছে সামনের দশ তারিখে।

—তোমার তো এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই না?

—এক কালের কেন—একালেও। —রিক্স হাসল। —আর অজয়ের কথা মনে আছে তো? ওর চিঠি কালই পেয়েছি। বালগেগিয়াতেই সেট্‌লড।

—আর আমবা কবে সেট্‌লড হবে?

—যে দিন খুশি। —এবার পুজোর মানালী যাবে? সবাকী বাধা জহরদারা প্রোগ্রাম করছে।

গল্পে গল্পে আলো-আঁধারি পথ হেঁটে ওরা যখন উৎসব বাড়িতে পৌঁছল তখন রাত প্রায় আটটা। ভিডেওর মধ্যে মিলে যাবার আগে সুহাস ফিস্ ফিস্ করে রিক্সকে বলল,—যেতে যেও না যেন। ফেরার সময়ও কিছু টেটেই যাব।

—তুমি বেশকিউ কর। মিলে পালের গমনাঙ্গির গল্প শুরু হলে

—একটু ভাড়াবাড়িট বেরিংয়ে পড়বে না হয়। তোমাকে আটকাবার চেষ্টা করলে য'তোক কিছু একটা বলে দিও।

—তুমি নিজে আবার—। রিক্স আড চোখে সুহাসের দিকে তাকাল।

—সুহাস হাসল। আমি একুনি বেরিংয়ে পড়তে পারি।

—তাই—রিক্স। দা বিউটিফুল ব্রেজিং

—ডোন্ট লাই।

—আই নেভার।

—সুশীলবাবু আপনাদের নিউ এষ্টাব্লিশমেন্টের রেসলঙ্গ কেমন?

—ওয়েল, নিঅণ্ড এক্সপেক্টেশন্স।

—কোল্ড ড্রিস্‌স, স্ত্রাব।

—নো ব্যান্ড্‌স।

—প্রগতিশীল লেখক লন্ডনে আমিই প্রস্তুত এনেছিলাম যে, গভর্নমেন্টের উচিত প্রতিটি প্রোগ্রেসিভ রাইটারকে অস্বস্তি; তিন সপ্তাহের আগে হলেও...

—বে অব বেঙ্গল ডিপ্রেসনের ফলে সর্বের প্রোডাকশন ফ্যাম্পার্ড হবে কিনা

বলুন তো ?

—আরে হুহাস যে, তোমাদের উৎসব কবে হচ্ছে ?

—বস্তার্তদের সঙ্গে চ্যাবিটি শো ? শাস্তর শাস্তর । কোন কিছ্য হিহো-
ইনকে দিয়ে...

—ওয়েলথ টাক্স তো দিয়েই যাচ্ছি, দিয়েই যাচ্ছি কিন্তু...

কথা আর শেষ হয় না । চ'রদিকে শুধু ঝকঝকে নারী পুরুষ—আর
ঝকঝকে কথা । কি জানে যে সময় কাটতে থাকে কেউ টের পায় না ।
হুহাস খুঁজতে থাকে রিক্ককে । রিক্ক চোখ টিপে ইসারা করে হুহাসকে ।
এবং এক সময় ওরা দু'জনেই নেরিয়ে পড়ে ।

হুহাস হাঁটতে হাঁটতে বলে, বেশ রাত হয়েছে কিন্তু ।

—একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে । ফ্রায়েড রাইস কত নই করেছি ।
জান ? —রিক্ক ঢেকুর তোলে ।

হুহাস ইতিয়া কিংস ধরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে । কিছুক্ষণ পরে
রিক্ক হাত ধরে বলে, সারা রাত ধরে এভাবে হাঁটলে কেমন হয় বল তো ?
ভালই হয় । তবে খানায় যাওয়ার প'সবিলিটি পূব ।

—তুমি বড্ড নেরসিক ।

—আমার গা খুব গুলোচ্ছে । কেমন অবস্থি লাগছে ।

—সে কি ? —হুহাস বাস্ত হল ।—বাড়ি গিয়ে না হয় দু'টো জেলুশিল
খেয়ে নিও ।

নির্জন রাস্তায় ওরা দু'জনে দ্রুত হাঁটতে লাগল এই রাতের অন্ধকারে গা
ঘেষাঘেঁষি করে হাঁটতে খারাপ লাগে না হুহাসের । মনে হয় রাস্তাটা আরো
বেশি অন্ধকার হলে যেন ভাল হ'ত । হুহাস আস্তে ডাকে,—রিক্ক

রিক্ক কোন উত্তর দেয় না ।

একটু পরেই গাঙ্গী মোড়ের আলো দেখা দেয় । হুহাস রিক্ক হাত
ছেড়ে দিয়ে বলে,—ওখানে নিশ্চয়ই কোন গাড়ি পাওয়া যাবে ।

রিক্ক কিছু না বলে আরো জোরে হাঁটতে থাকে । —

আর গাঙ্গী মোড়টা পার হতে গিয়ে রাস্তার মাঝে হঠাৎই উবু হয়ে বসে
হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলে ।

হুহাস দুহাতে শক্ত করে রিক্কর কাঁধ চেপে ধরে একটু জল পেলে ভাল
হত । কিন্তু কোথায় জল ? মিনিট দুয়েক ঐভাবেই কেটে যায় । পকেট

থেকে কহাল বেহ করে রিক্কে দেয় । রিক্‌ চোখ-মুখ হুছে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ।

আর তখনি রাস্তা জুড়ে কে যেন সামনে এসে বিরাট শব্দে হেসে ওঠে ।

রিক্‌ ভয় পেয়ে স্‌হাসকে জড়িয়ে ধরে ।

স্‌হাস বিস্ফাৰিত বিষয়ে দেখে বিকেলের সেই লোকটা কাকের বাসার মত বিধবস্ত সেই লোকটা তখন মহানন্দে পৰম তৃষ্টিতে রাস্তায় ওগলান ক্রায়েড হাইস চেটেপুটে খাচ্ছে ।

রিক্‌র সারা শরীরটা পৰম্বর করে কাঁপছে ।

স্‌হাসের কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাস্তা সাফ করে হাত চাটতে চাটতে লোকটা উঠে দাঁড়ায় । এবং উন্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল ।

স্‌হাসের খটকা লাগল—একি সেই লোকটা, না অস্ত্র কেউ ? এ লোকটার মুখটা যেন কেমন । সেই লোকটা তো—লোকটা কে দেখবার জন্যে সামনে তাকাতাই স্‌হাস ভয়ে কাঠ হয়ে গেল ।

দূরে গিয়েও লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে । এবং বিরাট বিরাট পা ফেলে এই দিকেই এগিয়ে আসছে । সারা রাস্তা জুড়ে তার ছায়া । ক্রমেই বড় হচ্ছে । ক্রমেই বড় হচ্ছে । একটা ভয়ঙ্কর পরিচিত মুখ স্থির দৃষ্টিতে দাঁতে দাঁত ঘষে এগিয়ে আসছে । এখন আর তাকে চিনতে অস্বীকার হচ্ছে না । সেই লোকটা । লোকটা বোধ হয় ..

স্‌হাস রিক্‌র হাত ধরে ছুটতে আরম্ভ করল ।

— — —

বন্যার জল স্বপ্ন
দেশ ভাষায়

অনুবাদক :
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর ! তুমি বিশাল এবং পরম শক্তিমান
কেন তবে আজ আড়াল ক'রেছ যা কিছু তোমার সত্য ও স্বন্দর ?
তুমি উদ্ভেঁষ মহাকাশ থেকে পাঠালে মৃত্যু আর মহামারী, তিন ভুবনের
দাকন অসম্মান !
তুমি স্বর্গের শোভাময়, মহাদেব ! নও, পাষণ্ডপূরীৰ বিষধর !
রাজত্ব ক'রে পৃথিবীর ; নেই সামান্ত উদ্বেগ ? নেই কোনো পরিকল্পনাই ?
পাপী যারা তারা মার খায়, মার খাওয়াই উচিত ; কিন্তু
পাপের ছায়াও মাড়ায়নি যারা, শকুন শেয়াল তাদেরও মাংস খায় ।
এ কী বিচিত্র স্বভাব তোমার, দেবতা ! এই কী তোমার রাজত্ব, তার শাস্তি ?
এই মহাদেশ শাসন করেন যিনি তিনি না তোমার প্রতিনিধি, ঈশ্বর ?
কীজন্তু তিনি বিবেকের কোনো কথায় দেন না কান ? কোনো লক্ষ্যই স্থির
নেই তাঁর ; অন্ধের মত ঘোড়েন এ দিকে, ওদিকে ?
যারাই শাসন করে দেশ তারা কবে যে শিথবে সহবৎ—
সামান্ত সংযম ভালোমন্দের বিচার !
মাতুষ্যের কোন ভয় না থাকুক তাদের, ভয় নেই স্বর্গকে ? *

প্রাচীন চীনা কবিতার (পূঃ পূঃ ৬ শতাব্দী) অনুবাদ ।

সূত্র : 'The Penguin Book of CHINESE VERSE'

পোকা শোল / সুধীরকুমার করণ

সে এখন বন্দী সেলে
কঠিন কংক্রিটে ,
কখন হুকুমনামা
পেয়াদাওয়া পড়ে যাবে
নির্ভেজাল মুখে,

ভারিই জন্তে বিন গোনা শুধু —

কখন নির্দয় ফাঁসি

কণ্ঠরোধ করে দেবে তার ।

এখন ভয়ের সঙ্গে

দিনরাত গুঠাবসা ;

ভয়ে ভয়ে —

সে এখন ফেলে দেওয়া

অসহায় বিড়ালের ছানা ।

সারারাত আস্তাকুড়ে ভয়ের নিশানা ।

বাইরে অনর্গল বৃষ্টি ।

সে এখন বন্দী সেলে

কঠিন কংক্রিটে ,

চৌকাঠ ভিড়িয়ে যাবে সাধা নেই তার ।

মাঝে মাঝে চমকে উঠে দেখে,

পোড়া শোল জ্যাস্ত হয়ে

তরতর সঁতার দিচ্ছে উঠোনের জলে ।

কোথায় আপেল / শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

গালফেলা সাহিত্যভাষায় লাল টুকটুকে গলে

আপেলকাটার মথমল আগাম

যদি পাওয়া যায়

সে কথা ভেবেই আমি পিছনের সীটে গদীয়ান

লভি। গদী ছিল

স্বন্দর কবিতা পড়ে বাহবা কুড়িয়ে

অনেকে না শুনে

কেতাদুস্ত আশপাশ

ট্যান্ডিচডা, নাসিংছোমে প্রদববেদনা ন্যূকি কমে যায়
 ফ্রিজে চম্বলেকের আহাৰ্য প্রস্তুত হতে থাকে
 এটলব গা ঘিনঘিন কণার এক ফাঁকে
 জানলা দিয়ে থুথু ফেলি
 মুখ ফিরিয়ে আপেল খুঁজতে গিয়ে
 মুখ ফিরিয়ে আপেলবাগানে
 কয়েকটি ইঁচুর মাত্র পায়চারি করে ।

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে (শ্রীহৃক্ত খোরানাকে নিবেদিত)

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে
 কেউ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ।

টেরাকোটায় কাজ দেখেছো তুমি
 দেখেছো অঙ্ককার
 সারি সারি ভাঙা মূর্তি
 এছাড়া কিছু জাওলা

গাছ-গাছড়ার তুচ্ছ জীবনবৃত্তান্ত—

এও ছিল ।

আর আসল পুঁথি যা
 সে তো সেই মন্দিরের ভেতরে

একেবারে গর্ভগৃহে

যেখানে সেই ব্রুডো কুস্তকার
 একদিন গড়ে তুলবেন
 ঈশ্বরের মুখ ।

পুণোহিত এনব কণাই বলতেন
 বলতেন কিভাবে সেট আশ্চর্য মুখ
 আবার এক মন্দিরের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে ॥

রক্তের জোয়ারে আসে

ব্রজগোপাল রায়

বুকের নাবাতা

এখনো প্রচুর রক্ত যেথে আছি অস্ত্রথের ।

বিষম বাতাসের শেষ মুহূর্তে গেলে

প্রচণ্ড উত্তাপ যেথে

যা'রে পড়বো অলৌকিক আকাশ থেকে

নতুন সূর্য হ'য়ে !

হৃদয়ের এই বিশ্বাস একদাশ মৌজমীর মতো

পুয়ে দেনে রেদাক্ত তীর—

চরিত্র-রক্তের আমন্ত্রণ হ'বে লোকালয় ঘিণে ।

প্রিয় মাতৃসেব স্বচ্ছ নিঃশ্বাসে ভেসে যাবে— হৃদয়

দেশাস্ত্রের গভীর টেকার মধো স্বপ্ন বুনে বুনে ,

প্রতিবেশীর নিকানো উঠোনে

দাঁড়াবো সহোদর জীবন উৎসবে ,

রক্তঝরা রূপিণ্ডগুলি বিছানো জামল মুক্তিকায়

রাজিহীন প্রভাতের প্রসন্ন কিরণের সোনালি ছায়ায়

খুঁজে পাবে ভাষা , আমাদের উৎস্রক বৃকে, চোখে যুগে

প্রিয় মাতৃসেব হৃদয়ের দৌরভ টলটল করবে স্মৃথে

মাতৃসেব এ-পৃথিবী মাতৃসেবই হ'বে !

কিশলয় চিবুকে চিবুক রেখে অস্ত্রাণের ক্ষেত্রে শিখর

গ'রাবে পালক ..

সময়ের নৌকা জোয়ারে জোয়ারে ভেসে যাবে

সমুদ্রের কাছাকাছি অথবা গভীর সমুদ্রে

যেখানে নদনদী ফিরে পায় বৃকেবা নাবাত ॥

[ছাক্ষ্মিক মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে পুনরেন্দু সিংহের আত্মজীবনী
দস্ত এসেছিলেন পাঁচপুশি, বাংলার মাঠ ঘাট থেকে চকিত শিল্পীদের তুলে নিয়ে
এসে ভাষাতত্ত্বম বাউলগান শোনাগোহবে তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ।
সঙ্গে যা'রে এনেছিলেন ববীন্দ্রস-গীতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারী ও দিগ্‌দিশারী
শান্তিন্দেব ঘোষকে । সেই প্রাণবন্ত অচল্যানে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমাকেও

অমিত্রগ জনানো হয়েছিলো। টেইশবের্জার হাতে অমৃতকণ তৎপর সেই
 তপ্ত দৃষ্টি মুখ দেখে সেদিন বুণাক্ষরেও টের শেলেন না আর মাত্র কয়েকটা
 লপাচ পর এট পাঞ্জাব নন্দিনী বংগবধু, সিদ্ধগ-গাও সংস্কৃতিসংগমে উদ্ভূতা
 কমলে কামিনী, রবীন্দ্রসংগীত ধারাকে যিনি ভারতে ও বহির্ভাষতে কণ্ঠ ও
 মনোহার কম গুলুগাতে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, তাঁর এই বর্ণিত দেহের অভ্যন্ত-
 রের প্রচণ্ড কর্মক্ষম যন্ত্রটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে! নিচের কবিতাটির মধ্য দিয়ে
 'চেতনিক' এই রবীন্দ্রপ্রসাদমন্ত্র গবেষক শিল্পীর স্মৃতি তর্পণ করছে।

সম্পাদক/চেতনিক]

রাজেশ্বরী দত্ত / পুলকেন্দ্র সিংহ

(১৯২০-১৯৭৬)

বুকডরা সূরের পিপাসা নিয়ে নিপাসা মিশেছে এসে
 জামসী এবস্ফূর্তমে কবিতার গাজেয় সজমে
 বধুকপে, প্রফুল্লিত পুষ্পরূপা, বহুদূর নক্ষত্রের বিচ্ছুরিত
 আলোর প্রতিমা স্বপীন্দ্রস 'গনী' !
 প্রণয়া আচার্যরূপে শাস্ত্রদেব, শৈলজার সম্মুখে লালনে
 রমনীয় স্নিগ্ধ শাস্ত্রানিকেতনে সুরধ্বনি সুরধুনী হল—
 আশ্চর্য অমেয় কণ্ঠে প্রাণ পেল রবীন্দ্রভাবনা নতুন অংবেগে
 তাই টেনিসির গৌরপ্রাসে, হাঠনের স্রোতে পরমা প্যারীর বৃকে
 ইফেল টাওয়ারে বাংলার গাঁয়ে গঞ্জে
 শুদ্ধব্রিত ধ্বনি সুরাকণ্ঠে প্রবাহিতা বাণী
 প্রাণপ্রদায়ণী ।
 সেই বাণী গাঁথা অ'ড়ে ভালবাসা 'দরে—
 সবার হৃদয়ে পঞ্চকূলে ময়ূরাকী ক'লে
 গেকুয়া মাটির বৃকে বাউলের গোপীযন্ত্রে
 মধুর মৃদঙ্গ বোলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে
 নন্দকিশোরের কণ্ঠে মনোহারী সুরে ভাগীরথী তীরে ।
 তাই মর্তমীমা তুচ্ছ ক'রে
 আজকের অকস্মাৎ এই চলে যাওয়া
 সেই গান, সেই সুর, সেই স্মৃতি নিত্যকার চিত্র ভ'রে পাওয়া
 সুরলোচক, তুমি হলে সূরের ঈশ্বরী
 রাজ-রাজেশ্বরী ।
 বাবু

তৃতীয়বর্ষ/চতুর্থ স.খা

জাতে-গাঁচে/ভাস্কর শর্মা

—কি যে সব ছাইভস্ম লিখছ। তুমি ভাস্কর শর্মা, না অগ্নিশর্মা ?
—সম্পাদক মশায়ের অমুদগীরণ আমার প্রতি ।

—আজ্ঞে, কি যে বলেন ! আপনার এ অগ্নিমূর্তি কেন ? আমি শর্মা
চর্মা নই, শুধু একটু লবণ হতে চাই ।

—লবণ ? সে কি ! কেন ?

আজ্ঞে,—মানে, লবণ, ভাস্কর-লবণ আর কি । তাহলে অন্ততঃ
আপনার সম্পাদকীয়টুকু 'ক' ভজম করার চেষ্টা করতে পারি !

* * *

“মুশিবাবাদে মাটির নীচে ট্যাবলেটের খনি,” খবরে প্রকাশ ।

হায় মুশিবাবাদ ! সোনা নয়, পেটোল নয়,—হয়ন কি কয়লাও নয় ?
শেষ অবশি শুধু ট্যাবলেট ! তাও যদি মানাডুবস হতো !

দেখো, গৌড়ো ; গৌড়ো, আরো গৌড়ো । অবশ্য অস্ত্র মাল না পেলেন
ফারাক্কী ত' শোমার গলিটাকের ট্যাবলেট হস্টে বটল । ডঃখ কিসের ?

* * *

পরীক্ষা কেন্দ্রে বিয়েবাড়ির চেয়ার-টেনিল উল্টে-পাল্টে বিপত্তি, পরীক্ষার্থী
বিপর্যয়, বিগত এক পরীক্ষার খবরে জানা গেল ।

তা, আগে-ভাগে পাতায় পাতায় রসগোল্লাটা পরিবেশন ক'রে দিলেই
ত' লাঠি চুকে যেন !

* * *

মাহেদেব আউৎদারদের ওপর লেভি দাগি হ'বে, আরেক স্তম্ভন ।

উদয়বজ্রের হুঁড়ো তখন আর দক্ষিণবজ্রের ভেঁটির মাড়,—আহা ! ম-বজ্র
আমার পেট-পিঠে গড়াগড়ি খেতে উঠে ক'রেছে ।

* * *

বহরমপুরে বিজ্ঞানভাড়া নিয়ন্ত্রণের সব প্রয়াস ব্যর্থ হ'লে নৈরাজ্য অব্যাহত ।
ভাড়া'র স-লোভিত তালিকা'র বোর্ড পরপ্রাচ্য থেকে বিজ্ঞানকেবাট নাকি
তলে ফেলে দিয়েছেন ।

মা ভেঃ ! জনাস্থিক সুনাম, রাষ্ট্রীয় পরিবহন নাকি বহরমপুরে বিজ্ঞান
চলাচল জাতীয়করণের সুপারিশ করবেন !

ভাট বুকি বিজ্ঞানে এক পদীবহন দেখি ।

* * *

“হাম দে, হামাবা দে—অ'মন! ভ'জন, আমাদের ডুইজন” ইতা ছাড়া
নাকি গভাস্কর নই খাউবার-পরিবার সমস্তা সমাধানের ।

হয় পরিবার পরিকল্পনা, না হয় থাইবাণু হারিমটর ? কিন্তু আরও একটা বিধান ত' ছিল। হয় অজয় মুখুজে কিম্বা প্রদীপ সেন ?

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন থেকে নাকি বছরের পরীক্ষা বছরেই হবে, এমন কি বছরে দুটো করেও হতে পারে—একটি ভুক্তকুরু ঘোষণা।

সে কি ! এ যে নাশকতা ! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে এইভাবে ধূলিমাখ করার মতগণের তীব্র প্রতিরোধ হওয়া দরকার,—বললেন এক বন্ধুপত্নী, যিনি গত পাঁচ বছর ধরেই এম এ পরীক্ষাধিনী, পাশও করেন না, ফেলও না।

* * *

‘এগার দশটা বছর হচ্ছে প্রগতিশীল দশক, সপ্তদশের, সর্বক্ষেত্রে।’

—ব্যাপ্যাম। আগের ত্রিটি দশক শুধু রুচ্ছসামান নামক অগতির একক ছিল। এখন শতকটার মতিগতি কি,—কে জানে !

* * *

রেজিস্ট্রি বিবাহ সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হবে—লোকসভায় চিন্তা-ভাবনা।

সিটিই চিন্তার কথা। একে কল্যাণদায়, তার ওপর আবার যদি বাণ-মায়ের বিয়ে দিতে হয় ‘আহলেই ত’ গেছি !

* * *

দকিহুশ্রেণীর সুবিধার্থে সুন্দরবন অঞ্চলে ভাসমান বাক্য সংবাদ পত্রে শিরোসারি (হেড লাইন)।

ধনিক শ্রেণীর ভুবন্য বাক্য আমরা অনেক দেখেছি। এখন ঘাটে ঘাটে হাটের দিনে বাক্য ভাসছে,—‘কপসী বাংলা !’ হালে পানির অভাব হবে না নিশ্চয়ই, কি বলেন সেন শর্মা মশাই ?

* * *

কিংসটনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টে ঈদের বোলাবরা গড়ে প্রতি ওতাবে চারটি করে বাউন্সার দিয়েছেন। ফলে খবরে প্রকাশ—জনা চারেক ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান দ্বীতিমত জখম।

খেলাটা কি সত্যিই ক্রিকেট ছিল ?

ইঠাং তোমার নামনে/অফুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইঠাং তোমার নামনে
অনন্ত কালের জন্যে গড় হয়েছি
বাড় সোজা করার স্পৃহা আমার বুঝি কোনোদিন
দেবে নাকো বাই
তেড়িরা কইরের মতো
অড়তার পচা পানা ছিন্ন তিন্ন ক'রে

এসো
দেখো
নিষ্ঠ পেতে দিয়েছি
লাগাও চাবুক
হে আমার বাম হস্তে
পুঞ্জিতা ঈশ্বরী

উৎখাপি এ-জ্বলিত
পাবে না নথয়ে খুঁজে আরো বহু রাত
এখনো লুকিয়ে রাখি
আঘাতে বিকৃত তবু
ইম্পাউন্ডের মতো জেদী বৃকের খাঁচার
গোলাপের ড্রাপে মুগ্ধ কবোফ হৃদয়টাকে
নিরালায় নক্সের অনন্ত ক্ষুধার ।

আপনার রক্ত কেউ চিহ্নিত করছে

অমূল্য জীবন

এত যে ভারত কিছু বেই তা দেখিয়েছেন
আপনাদের জেলার স্বাস্থ্য কর্মীরা।

কালেকটরেটের কর্মীরা।

প্রাথমিক-গণ এই রক্ত দান আন্দোলন হৃদয়ের দিব।

এগিয়ে আসুন আগনিও

বলেছেন জনাব আবদুল সাত্তার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

আমরাও তাই এগিয়ে এসেছি এই আন্দোলনে। শারীরিক ক্ষতি

যে হয় না তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন জেলার

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজে এবং অনেক

ডাক্তার নাস' আর স্বাস্থ্য কর্মীরা

তাঁদের রক্ত দিয়ে।

রক্ত দিয়েছেন জেলা সমাহর্তা নিজে এবং তাঁর নেতৃত্বে
কালেকটরেটের অনেক অফিসার ও কর্মীরা। আমি তাই জনগণকে
বিভিন্ন ক্লাবকে অনুরোধ করি—আমুন রক্ত দিন।

আপনার রক্ত একটি জীবন বাঁচাতে পারে।

অন্ততঃ ৩০/৪০ জন রক্তদাতার তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে
সরাসরি লিখুন।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কণ্ঠের সুর শ্রিলিঙ্গ

আমিও বলছি—

‘রক্ত দিত। আমি আপনাদের জীবন দেব।’

স্বাক্ষর—ডাঃ এল. এম. সিংহ

চিকিৎসক মেডিক্যাল অফিসার, মুর্শিদাবাদ

১৬-৬-৭৬

মুর্শিদাবাদ জেলা চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও

পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর

[মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য ও জন সংযোগ দপ্তর হাইড্রে প্রেসে প্রিন্ট]

অষ্টম আটম অঙ্কসারে 'চেতনিক' সম্পর্কে ঘোষণা

প্রকাশন স্থান : পোঃ ও জেলা মুন্সিফাবাদ
 প্রকাশন সাহিত্যিকতা : ত্রৈমাসিক
 মুদ্রাকর প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
 নাম জাতীয়তা ঠিকানা : অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়
 পোঃ ও জেলা মুন্সিফাবাদ, বঙ্গবন্ধু

আমি অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগে ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত
 বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্য।

আ: অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক, চেতনিক

১৯৭৬

পোঃ ও জেলা মুন্সিফাবাদ

গড়ুন : প্রবীণ কবি শ্রীরামলাল দাসগুপ্তের

● এবং যদিও তথ্যপি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের :

● সুগভীর খড়তুলি আত্মদে চিত্রকার করে

বিজ্ঞানবিহারী পুরস্কারস্বর অত্মদিত—

তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ :

● লং মার্চের কাহিনী / দাম ২ টাকা

প্লেথানভের অবশ্রুপাঠ্য

● ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা / দাম ৩ টাকা

● চীন গণ সাধারণতন্ত্রের সংবিধান / দাম ৮০ পঃ

বোম্বায়া বিশ্বনাথের সহজ অভিনয়যোগ্য

তীব্র শ্লেষাত্মক সামাজিক একাত্মিকা :

● সার্কাসের বাঘ / অবেশন / দাম ২ টাকা

বিশ্বদেব সুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলন :

● ছায়া আর দশ দিক

প্রকাশক : কবি ও কবিতা

১০ রাধা বাজতক ট্রিট, কলিকাতা—৬

CHETANIK (Progressive Lit. Qly) Year 3 No. 4

Edited & Published by ATUL CHANDRA BANERJEE from P.O. & Dist. MURSHIDABAD, WEST BENGAL & Printed by him from Cygnus Printing Co-operative Society Ltd, Berhampore, West Bengal.

‘চেতনিক’ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য :

‘দেশ’.....‘খ্যাত অখ্যাত সকলের লেখার ‘চেতনিক’ সাহিত্যে নিজস্ব কর্তৃত্ব তুলে ধরতে পেরেছে। খ্যাতি সাহিত্যপীতি না থাকলে এমন হয় না।’

‘যুগান্তর’ : ‘চেতনিক’ একটি সত্যিকারের মননশীল পত্রিকা...’

‘সত্যযুগ’ : ‘.....এই পত্রিকায় যে-সব রচনা স্থান পেয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।’

দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন) : ‘.....একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই পাতাগুলি উন্টোতে শুরু করি। কিন্তু দু’খণ্ডের সব প্রবন্ধগুলি পড়লাম। দেখলাম মফস্বল থেকেও ভাবাবার মতো পত্রিকা বের হতে পারে....’

অজ্ঞানানন্দকর রায় : ‘চেতনিক বেশ উচ্চাঙ্গের পত্রিকা হৈছে। কলকাতায়ও এর মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলি ভালোই লেগেছে। নির্ভয়ে ও অকপটে নিজের বক্তব্য বলে যান। মা ফলে সু কদাচন।...’

নারায়ণ চৌধুরী : ‘আপনার (‘চেনা গোলাপ’ সিরিজের) তিনসমূহ মাঝে মাঝেবের ওপর লেখাটি চমৎকার হয়েছে। গতদিনের পৃথিবীর এক ঝলক মিসি বাতাস যেন এসে গায়ে লাগলো। গজল ও গীতগুলির পাশে পাশে বাংলা সত্ত্ববাদ দিয়ে খুব ভাল করেছেন। আপনার ওস্তাদ কাদের বক্তার সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পড়ার ক্ষমতা অ’গ্রহণীয় হয়ে বইলো।’

(অনিচ্ছার সংগে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি এবারকার মতো প্রেস থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হ’লো।—স:)

হীরালাল দাশগুপ্ত : ‘বদরিদাস বাঘ মংগনি এবং ‘চেনা গোলাপ’ দ্বিতীয় কিস্তি প’ড়ে অনাবিল নিবিড় আনন্দ লাভ করলো। বিস্তৃত হয়ে ভালোমত একই লেখকের পক্ষে একই সময় এরকম দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা কী অসাধারণ শক্তিরই না পরিচায়ক। বাস্তবিকই প্রতিভা অসাধ্য সাধন করতে পারে।’

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ‘আপনাকে আগেও বলেছি ১৯৭৪-এর শাবদীয় সংখ্যা থেকে ‘চেতনিক’ অনেক উন্নত উঠে গেছে।’

কল্লভরু সেনগুপ্ত : ‘.....সম্পাদকীয় এবং ‘চেনা গোলাপ’ প’ড়ে আপনার প্রতি প্রকার আয়ি অভিভূত হয়েছি। আপনি ‘চেনা গোলাপ’ লিখে সংগীত জগতের উপকার করলেন। এর সংগে আরো সংগীত স্মৃতিকথা বুক করে ‘চেনা গোলাপ’কে একটি বই হিসাবে বের করা প্রয়োজন।’

বার্ণিক রায় : ‘চেতনিক’ সম্প্রতি কলকাতার যে কোন পত্রিকার মনকে হার মানাতে পারে.....’

বোম্বাই বিশ্বনাথন : ‘এমন সুন্দর ছিম্কাই পত্রিকা মুম্বাইবাসীকে বেসে কথা যায়! ‘চেতনিক’ না দেখলে না পড়লে বিশ্বাস হতো না।’

বিশ্বকর্ষ মুখোপাধ্যায় : (‘চেনা গোলাপ’ সম্পর্কে) ‘শ্রীহৃৎ অমিয়নাথ সান্নালের ‘স্বত্ব অতপে’-র পর এমন মাইকিলি মেজাজ বিশেষ মনে পড়ে না।.....’

